শরদিন্দু অম্‌নিবাস

শরদিন্দু অম্‌নিবাস

দ্বাদশ খণ্ড
অসঙ্কলিত রচনা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রথম সংস্করণ : ১৩৬৩ মুদ্রণ সংখ্যা ৫৫০০

নিবেদন

শরদিন্দু অম্নিবাস দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে এ যাবৎ সংগৃহীত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সকল রচনা সংকলন সমাপ্ত হল। কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা দিনলিপি এবং আত্মজীবনকথার সঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির চিঠিও এবারে প্রকাশ করা হল।

এই খণ্ডে প্রকাশিত শরদিন্দুবাবুর দিনলিপির কিছু অংশ (১৯৪৮-১৯৫২) সম্পূর্ণ নূতন। তখন তিনি বোম্বাই প্রবাসী, মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন, সুযোগ পেলে কয়েকটি সাহিত্যিক আড্ডায় যোগ দিতেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বহু পরিচিত বন্ধু ও সাহিত্যিকদের কথা বলেছেন এবং তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর কি মনের ভাব তাও অকুণ্ঠিতচিত্তে লিপিবদ্ধ করেছেন। সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তাঁর যে মতামত তা পাঠক-পাঠিকারা সর্বত্র যে স্বীকার করে নেবেন এমন মনে হয় না। কেউ কেউ বলেছিলেন এই অংশগুলি বর্জন করাই ভাল। এই সিদ্ধান্ত ঠিক বলে মনে হয়নি। মৃত সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত মতামতের উপর আমাদের কলম কিম্বা কাঁচি চালাবার চেষ্টা অনুচিত। জীবিতকালে যখন শরদিন্দুবাবু দিনলিপি লিখেছিলেন তখন হয়তো মনে করেননি এ জিনিস পরে প্রকাশিত হবে। যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখন তার উপর একটি আরবণ না থাকাই ভাল। অবশ্য শরদিন্দুবাবুর এই মতামতের সঙ্গে মনের মিল হবে এমন সাহিত্যরসিকের দেখা পেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত যিনি শরদিন্দু অম্নিবাস সম্পাদনা করেছেন এবং ডঃ সুকুমার সেন যিনি অম্নিবাসের দুটি খণ্ডের (প্রথম ও ষষ্ঠ) ভূমিকা লিখে দিয়েছেন—তাঁদের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

—প্রকাশক

সূচী	পৃষ্ঠা
কবিতা	১৫
গান	১৫৩
প্রবন্ধ : রম্যরচনা	১৯৯
দিনলিপি	২৩৯
মন-কণিকা	৩২৮
আত্মজীবনকথা	
আমার লেখক জীবনের আদিপর্ব	৩৮৩
হৃৎকম্প	৩৮৬
সংযোজন	৩৮৯
চিঠিপত্র	৪১১
গ্রন্থ-পরিচয়	৪৬৭
শিরোনাম-সূচী	৪৮৫
কবিতা ও গানের প্রথম ছত্রের সূচী	৪৯৩

কবিতা

প্রোষিত দয়িতার পত্র

প্রিয়তম,
জনম অবধি কার, তোমাপরে অধিকার
প্রিয় বলে ডাকিবার দিয়াছেন বিধি,
জানি না গো আমি তাহা, তবু ভাবি যদি আহা
পাইতাম তোমা হেন অলকার নিধি।

তোমার বিহনে শুধু, প্রাণ মোর করে ধূ ধূ
যেন রে শিকতাময় নিদারুণ মরু,
সুনিবিড় ছায়াদানে জুড়াও কাতর প্রাণে
তুমি এ সাহারা মাঝে সুশীতল তরু।

প্রাণের গোপন কথা প্রকাশিছে ব্যাকুলতা
বাহির হইতে মোহ মায়া পরিহরি—
লেখনী যে বাধ বাধ, কথা কহে আধ আধ
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে সরম প্রহরী।

ভাঙ্গি সরমের বাঁধ, প্রাণের ব্যাকুল সাধ
গিরিজা তটিনী সম ধায় তব পানে,
তুমি মম হে সাগর, তুমি মম হে নাগর
হতাশা দিওনা ঢেলে প্রোষিত পরানে।

করিবারে দাসীপনা ভেবেছিনু বাসিব না
বিপুল এ ধরা মাঝে কাহারেও ভাল,
আঁধারে একটি দীপ আকাশে চাঁদের টিপ
সম তুমি এ হৃদয় করিয়াছ আলো।

তাই আজ যেচে এসে পড়েছি চরণ দেশে
জেনো মোরে এ জগতে বড় অভাগিনী
নয়নে কিসের জ্বালা হৃদয়ে বিষের জ্বালা
কানে বাজে সকরুণে হতাশা রাগিণী।

প্রতিদিন উঠি ছাতে, হেরি তোমা সাঁঝে প্রাতে
তবুও হৃদয়াবেগ নারি নিবারিতে,
শত সাধ উঠে ফুটে লাজে পুন যায় টুটে
কত কর কত ভাবে অধমা নারীতে।

প্রভাত আলোক মিশে, বায়ু ধায় দিশে দিশে
কত কুসুমিকা তারে দিয়ে ফেলে প্রাণ,
পবন ত জানেনা তা, ফুল বোঝে নিজ ব্যথা
জানে সেই বুকে যার বিঁধে আছে বাণ

তাই এই বাচালতা চপল চটুল কথা
আনমনে কতশত বাতুল প্রলাপ,
এই বলে ক্ষমা কর, একটি কঠিন শর
ত্যজিয়াছে মোরে চাহি মদনের চাপ।
১৯১৫

নিশীথ-পথিক

নিশীথ রাতে বিজন পথে
একেলা চলিছ
ছিন্নপাতা সঙ্কুচিত
চরণে দলিছ।
গভীর নিশি, পথিক ওহে
বাদল ঘন গহন মোহে
নীরবে ফেলি চরণ দোঁহে
কোথায় চলিছ?

কেয়ার বনে মথিয়া উঠে
ব্যথায় পরিমল
বৃন্ত টুটে লুটিছে ভূমে
বকুল অবিরল।
শিহরি মরে বেতস পাতা
দুলিছে নব-নীপের মাথা
চাঁপার আঁখি গণ্ড বহি
ঝরিছে আঁখিজল।

সুপ্ত আছে—পথের পাশে
আঁধার কুটিরে
বাহুর-দৃঢ়-নিগড়ে-বাঁধা
হৃদয় দুটিরে;
আকাশ ঢাকা কাজল মেঘে,
আপন হারা ব্যথার বেগে

সজল বায়ু ভবন দ্বারে
পড়িছে লুটিয়ে।

তড়াগ বুকে চমক হানি
অশনি নাদিছে
পথিক তব উজল দুটি
নয়ন বাঁধিছে।
ফেলিয়া যারে এসেছ ঘরে
নিঠুর ওহে তোমার তরে
একেলা পড়ি ভূমির পরে
লুটায়ে কাঁদিছে।

কাহার প্রেমে পথিক তুমি
এমনি মজেছ
সুখের গেহ স্বজন বধূ
সকলি ত্যজেছ ?
কে তব কহ গোপন প্রিয়া ?
কাহার তরে আকুল হিয়া
এহেন রাতে স্বজন গৃহ
সকলি ত্যজেছ ?

১৭·১·১৯১৭

কাক

কাককে তুমি দেখতে নার ঘৃণা কর
দু'চক্ষের সে বালাই,
কারণ তোমার লুচির গোছা, দুগ্ধ খেয়ে
প্রত্যহই সে পালায়।
আরও কারণ স্বরটা তাহার মোটেই নহে
গানের সুরে বাঁধা
বর্ণও তার দেখে কেহ প্রীতিভরে
বলেনাক সাদা।
কিন্তু কভু দেখেছ কি কুলায় তাহার
যেখানে সে থাকে,
পাতায় ঢাকা নিলয়খানি— সেইখানেতে
দেখেছ কি তাকে ?

যেখানেতে সঙ্গিনী তার ডিমের উপর
বসে থাকে নীড়ে,
আপন বুকের উত্তাপেতে ডিমগুলি সব
ফুটিয়ে তোলে ধীরে।
পুরুষ তখন অনেক যত্নে চুরি করা
খাদ্য নিয়ে এসে,
মুখে করে খাইয়ে দেয় তার সঙ্গিনীকে
কতই ভালবেসে।
ক্রমে অন্ধ শাবকগুলি বড় হলে
তাদের গৃহে রেখে
ছুটবে তারা, চিন্তা তাদের আনতে হবে
খাদ্য কোথা থেকে।
এদিকেতে শাবকগুলি বসে থাকে
তাদের অপেক্ষাতে
দেখতে পেলেই চেঁচামেচি কলরবে
মহোল্লাসে মাতে।
তারা তখন একএকটিকে অগাধ স্নেহে
ডানার মাঝে নিয়ে
খাইয়ে দেয় সব উদর ভরে ছানাগুলির
ওষ্ঠে ওষ্ঠ দিয়ে।
তাহার পরে রাত্রি যখন চারিদিকে
গহন হয়ে আসে
ছানাগুলি বক্ষে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে
পরস্পরের পাশে।

ওরে ক্ষুদ্র কালিমাময় স্নেহবিহীন
হিংসা কুটিল মানুষ
তুমি কেবল অন্তঃশূন্য ধোঁয়ায় পোরা
রঙিন রঙের ফানুস।
বাইরে তোমার কতই আলো কতই দীপ্তি
কতই যেন ভাল
অন্তরেতে হিংসা ঘৃণার অন্ধকারে
মসীর চেয়ে কাল।
কাকের মত রুক্ষ দেহে পুষতে যেদিন
পারবে অমন স্নেহ
সেদিন জেনো স্বর্গ হবে কলুষময়
তোমার অধম গেহ।

৩-২-১৯১৭

প্রথম চুম্বন

এত লজ্জা ছি ছি সখি, পালাও না দূরে
ঘোমটা টানিয়া মুখে ত্বরিত চরণে
বিদ্রোহ বাজিয়া উঠে তব আভরণে
প্রতি পদক্ষেপে শুন চরণ নূপুরে।
কাছে এসে আরও কাছে বাহুযুগ ধরি
তোমারে বাঁধিয়া লই দুই বাহু পাশে
এত লজ্জা ছি ছি প্রিয়ে, প্রণয় তরাসে
কাঁপিছে তোমার বুক দুরু দুরু করি।
আমি জানি এ রোগের ভাল রসায়ন
কেমনে করিতে হয় লজ্জা নিরাময়।
যতনে চিবুক ধরি তুলিয়া আনন
সমস্ত হৃদয় করি অধরে সঞ্চয়
রক্তিম অধর দুটি করিব চুম্বন
পলাইবে লজ্জা দূরে মানি পরাজয়।

১২-৬-১৯১৭

পাষাণের মুখ

গিরি-ক্রোড়ে উপত্যকা মাঝে পল্লীখানি
নিবিড় পল্লব ঢাকা, বিহগ কূজিত।
পাশ দিয়ে বহে গেছে ক্ষুদ্র শৈবলিনী
উর্মিলা চঞ্চল গতি, যার স্বচ্ছ বুকে
সন্ধ্যা-সমাগমে নম্র পল্লীবধূ এসে
স্নান করি যেত, নিয়ে যেত আপনার
কলসে ভরিয়া তটিনীর উর্মিগুলি।
দূরে দূরে উঠিয়াছে পর্বতের শ্রেণী
চারিপাশে, গাঢ় শ্যামলতা দিয়ে ঢাকা,
অভ্রভেদী, আকাশেরে করিয়া ভ্রূকুটি।
ধ্যানমৌন তাপসের আশ্রমের মত
শব্দহীন গিরিদেশ, শান্ত গাম্ভীর্যের
চিরন্তন বাসভূমি। মাঝে মাঝে বঞ্চা
বাত্যা এসে গহ্বরে গহ্বরে করে যায়
নিষ্ফল ক্রন্দন—দীর্ঘ প্রতিধ্বনি তুলে।

পল্লীর পশ্চাতে দূর আকাশের ক্রোড়ে
সৌম্য দীর্ঘ পর্বতের চূড়া দেখা যায়—
দূর হতে মনে হয় যেন সেই চূড়ে
বিধাতার বজ্র দিয়ে খোদিত হয়েছে
বিরাট মনুষ্যমুখ—স্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল।

কতশত বর্ষ ধরে প্রকৃতির এই
ক্রীড়াসৃষ্ট বিপুল মনুষ্যমুখখানি
উন্নত ললাট তীক্ষ্ণনাসা প্রীতিপূর্ণ
ওষ্ঠাধর নিয়ে বরষিছে মৌনস্নেহ
নিম্নে ছায়া সুশীতল উপত্যকা পানে
কি গম্ভীর স্নেহমুখ—পিতার আশীষ-
পূর্ণ, উদার মহান, অনুকম্পাময়।
মনে হয় যেন ক্ষুদ্র দীন পল্লীটিরে
সেই মহাশিলামূর্তি রেখেছে ঢাকিয়া
প্রসারি অদৃশ্য পাখা, মনে মনে তারে
দিতেছে অভয়। কি সুন্দর, কি মহান।

সেই গ্রামে জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল—
কোন যুগান্তর হতে কেহ নাহি জানে,
শুনা যায় বহু পূর্বে একজন যুবা
বসেছিল উদাসীন, তটিনীর তীরে,
সেইদিন সে তটিনী মর্মরিয়া তার
কানে কানে বলেছিল গোপন বারতা—
'এই গ্রামে জনমিবে নিকট কি দূর
ভবিষ্যতে মহান পুরুষ এক যার
মুখ হবে ওই শিলা আননের
ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি।' এই জনরবটুকু
কতকাল ধরে ক্ষুদ্র পল্লীখানি ঘিরি
সঞ্জীবিত ছিল।

একদিন সন্ধ্যাকালে
সায়াহ্নের সূর্যরশ্মি আসি করেছিল
উদ্ভাসিত সেই বিরাট পাষাণ মুখ;
আর জননীর ক্রোড়ে বসি ক্ষুদ্র শিশু
এক পল্লী-কুটিরের দ্বারে চেয়েছিল
একদৃষ্টে তারি পানে—শিশুর নয়ন
অনিশ্চিত আতঙ্ক মিশ্রিত শ্রদ্ধাভরে
পূর্ণ হয়েছিল। মাতা বলিলেন তারে—
'শোন বাছা, একদিন অমনি সুন্দর

কান্তিপূর্ণ মুখ নিয়ে পুরুষ জন্মিবে
এই গ্রামে, যাহার হৃদয় ওই গিরি—
শৃঙ্গ সম উচ্চ হবে।' নীরবে বালক
শুনিল মাতার কথা, চিন্তাশীল নম্র
চোখে, তেমনি রহিল চাহি দূরে সেই
অনির্বচনীয় গরিমা মহান মুখে।
ক্ষুদ্র শিশু কৃষক তনয়,—জননীর
সাথে সাথে ঘাটে যেত অঞ্চল ধরিয়া
সহায় ছিল সে ক্ষুদ্র গৃহকার্যে তাঁর—
শান্ত মুগ্ধ শিশু, নাম পলাশ তাহার।
—বরষের পর বরষ ঘুরিয়া যায়;
বালক পলাশ বসে থাকে নদীতীরে
সন্ধ্যাবেলা দৈনিক কার্যের অবসানে
সঙ্গীহীন—কতবার ভুল হয়ে যায়
শুনিবারে তটিনীর মর্মর সঙ্গীত—
আনমনে চেয়ে থাকে দূর আকাশের
চিত্রপটে আঁকা মহা আলেখ্যর পানে।
পলাশের কাছে সেই সন্ধ্যা-অধিরূঢ়
সৌম্য শান্ত মর্মর প্রতিমা, চিরন্তন
সুখময় প্রহেলিকা বলে মনে হয়।
একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে পলাশ তাহারে
সম্বোধিয়া বলে—'হে মহান গিরিকূট,
তুমি কি আমারে ভালবাস? হে সুন্দর,
কথা কও, বড় ইচ্ছা শুনিতে তোমার
মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর! ওই হাস্যময়
অধরোষ্ঠ খুলে বলে দাও মোরে
কবে জনমিবে সেই জন যার মুখ
হবে তোমার মতন অমনি সুন্দর!'
এই বলি আবার চাহিত সেই দিকে,
মনে হত যেন প্রদোষের ম্লানালোকে
পাষাণের মুখে এক অতি গূঢ় মৃদু
স্নেহহাস ফুটিয়া উঠিত অলখিতে।
একদিন পলাশ শুনিল জনরব—
বহুদিন আগে এই পল্লী হতে নাকি
এক স্বজনবিহীন যুবা গিয়াছিল
অর্থ অন্বেষণ-তরে সুদূর প্রবাসে;
সেই পুনঃ ফিরিয়া আসিছে জীবনের
অপরাহ্ণে যাপিবারে আপন পল্লীতে
শেষ দিনগুলি। ঐশ্বর্য অপরিমিত
করেছে সঞ্চয়—কীর্তি তার দেশে দেশে।

জলনিধি ঢালিয়া দিয়াছে তার পায়ে
প্রপাতের বেগে মণিমুক্তা রত্নরাশি।
ধরণী আপন অন্ধকার গর্ভ হতে
আনিয়া দিয়াছে ভাস্বর হীরকরাজি।
জনরব শুনে গ্রামবাসী উল্লসিত
হয়ে কলরব জুড়ে ছিল—'এতদিনে
সত্যই আসিল পাষাণের প্রতিমূর্তি।'
একটি হৃদয় নীরবে স্পন্দিত হল—
শুধু পলাশের।

একদিন দেখা গেল
নদীতীরে উঠিতেছে অপূর্ব প্রাসাদ
মেঘের অমরাবতী সম, দীন পল্লী
গৃহগুলি উপহাস করি। শত শত শিল্পী
মিলি জগতের শ্রেষ্ঠ উপাদানে
গড়িয়া তুলিছে সুন্দর মর্মরগৃহ—
জ্যোৎস্নালোক উদ্ভাসিত অস্পষ্ট মধুর
স্বপ্নদৃষ্ট স্বর্গপুরী সম। পলাশের
মনে হল—'এমন সুন্দর স্বচ্ছোজ্জ্বল
দৃঢ়ীভূত করুণার মত গৃহ যার
সে নিশ্চয় পাষাণমুখের প্রতিচ্ছবি।'
নীরব উল্লাসে পলাশের ক্ষুদ্র হিয়া
পূর্ণ হয়ে গেল।
সংবাদ আসিল গ্রামে
কাল সূর্যোদয়ে নাকি মহাসমারোহে
স্ফটিক হর্ম্যের প্রভু আসিবেন গৃহে।
শুনে সারা রাত্রি কারো নিদ্রা নাহি হল।
অতি প্রাতে, কোকিল যখন মাঝে মাঝে
অনিশ্চিত স্বরে ফুকারি উঠিতেছিল
প্রভাতের বৈতালিক গীতি—সেই কালে
কৌতূহলী পল্লীবাসী যত শয্যাত্যাজি'
সমবেত হল পথের উভয় পাশে।
উদগ্রীব আগ্রহে উত্তেজিত কলস্বরে
দেখিতে লাগিল চাহি দূর পথপানে।
ক্রমে সূর্য পর্বতের অন্তরাল হতে
দেখা দিল, উপত্যকাক্রোড়বাসী সেই
পল্লীটির বিটপছায়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে
হানি সূক্ষ্ম অংশুজাল। বিটপবীথিকা
পল্লীপথখানি যেন অজিন বিছায়ে
করে নিল মহতের শুভ সংবর্ধনা।

কিন্তু প্রভাত বহিয়া গেল ধীরে ধীরে
সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুসুমের বুক হতে
নিঃশেষে শুষিয়া লয়ে শিশির বিন্দুটি।
ধরণীর সাথে প্রথম মিলনজাত
স্নিগ্ধ কোমলতাটুকু বিসর্জন দিয়ে
সূর্যদেব উষ্ণ হয়ে উঠিলেন ক্রমে।
কোকিল কাকলি অবসন্ন হয়ে এল।
কিন্তু কই? কেহ ত এল না? ক্ষুধাতুর
গ্রামবাসী যত উচ্চরবে জুড়ে দিল
বিবিধ জল্পনা। মিথ্যা কথা! গৃহে চল।
পাষাণ মুখের দোসর কি আছে কোথা?
—হেন কালে শুনা গেল অশ্বক্ষুর ধ্বনি।
সচকিত হয়ে সবে মিলে চেয়ে দেখে
চতুরশ্বযোজিত শকটে আসিছেন
মহাধনী—দুই মুক্ত হস্তে বিতরিয়া
দুঃখীদের স্বর্ণমুষ্টি। মহাজয়োল্লাসে
আকাশ বিদীর্ণ হল। ফুকারিল সবে—
'অবিকল অবিকল পাষাণ প্রতিমা।'
অদূরে বৃক্ষের মূলে একাকী পলাশ
রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়াছিল কম্প্র বক্ষে
উন্মুখ প্রত্যাশে। কিন্তু হায় একি হল?
পলাশের পঞ্জর ভেদিয়া এক দীর্ঘ
সকরুণ শ্বাস বাহির হইয়া গেল।
হায় হায়! এই নাকি পাষাণ প্রতিমা!
শীর্ণ নাসিকাগ্রভাগ বুভুক্ষুর মত
ঝুলিয়া পড়েছে;—ললাট অপরিসর
কালের গভীর রেখাঙ্কিত; কপোলের
লোল চর্ম যেন অন্তর্হিত হয়ে গেছে
অভ্যন্তর পানে; অধরোষ্ঠ দৃঢ়বদ্ধ;
চক্ষে ভাবলেশহীন কঠিন চাহনি।
জরাজীর্ণ মূর্তি। দেখিলেই মনে হয়
যেন এক বনপ্রান্তে বহুপুরাতন
কন্টকবৃক্ষের পল্লব ঝরিয়া গেছে
ঝঞ্ঝাবাতে, শুধু শীর্ণ শাখাগুলি আছে
কন্টক বিকাশি। পলাশ ফিরাল মুখ।
নিরাশা করুণ দৃষ্টি তার বহে গেল
দূরে পাষাণমুখের পানে। দেখিল সে
পাষাণ হাসিছে তেমনি প্রশান্ত হাসি

[অসম্পূর্ণ]

[১৯১৭]

একটি কাটি !

সেদিন যেতেছি আমি শ্বশুরবাটি,
চরণে পাদুকা হাতে বাঁশের লাঠি।
মেঘলা শীতের সাঁঝে,
যেতেছি প্রিয়ার কাছে
বিজন বিপথ দিয়া একেলা হাঁটি।
সেদিন যেতেছি আমি শ্বশুরবাটি।

এমন শীতের সাঁজ মেঘলা বেলা,
বধূর মনের ডাক কে করে হেলা।
মোর আসিবার আশে,
আছে সে জানালা পাশে
সমুখে জ্বালিয়া নিয়া দীপশিখাটি।
সেদিন যেতেছি আমি শ্বশুরবাটি।

পথে জনমানবের নাহিক সাড়া,
নিভৃত কুলায়ে পাখি ঘুমায়ে সারা।
দূর হতে শন্‌শনে,
আসে বায়ু কনকনে
সঘন কাঁপায়ে দিয়ে দাঁতের পাটি।
সেদিন যেতেছি আমি শ্বশুরবাটি।

তবু মোর মন আজ হরষ ভরা,
ভয় কি, এখনি শীত পলাবে ত্বরা।
সাথে আছে দু' প্যাকেট,
সিগার ও সিগারেট
মাঘের দেমাগ আজি করিব মাটি।
সেদিন যেতেছি আমি শ্বশুরবাটি।

অলখে শীতের প্রতি হাসিনু হাসি
মূঢ় শীত এখনি যে যাইবে ভাসি
এখনি সিগার চুমে,
ভরে দিব ধূমে ধূমে
জ্বালিয়া দেশালায়ের একটি কাটি।
সেদিন যেতেছি আমি শ্বশুরবাটি।

বিরাট সিগার এক ধরিয়া মুখে
বাহির করিনু দিয়াশলাই সুখে

বাক্স খুলিয়া দেখি,
হায় ভগবান একি ?
বাক্সে পড়িয়া আছে একটি কাটি।
সেদিন যেতেছি আমি শ্বশুরবাটি।

আর নাই আর নাই একটি মোটে।
দাঁড়ায়ে রহিনু ধরি সিগার ঠোঁটে
না জানিয়া একি ভুল,
বিধি আজ প্রতিকূল
নহিলে কপালে শুধু একটি কাটি।
সেদিন যেতেছি আমি শ্বশুরবাটি।

ছিন্ন মেঘের দল উঠেছে জেগে,
স্বনিয়া স্বনিয়া বায়ু বহিছে বেগে,
হেন প্রলয়ের পালা,
হেথা দেশালাই জ্বালা—
বৃথা আশা, তায় শুধু একটি কাটি।
সেদিন যেতেছি আমি শ্বশুরবাটি।

এখন এ কাটিটিরে জ্বালিব নাকি ?
যদি নিভে যায় তবে সকলি ফাঁকি।
সিগারেট না জ্বালিলে,
কাঁপিছে যকৃত পিলে।
সংশয় করিল বড় একটি কাটি।
সেদিন যেতেছি আমি শ্বশুরবাটি।

দিয়াশলায়ের কাটি হল না জ্বালা,
নিভিয়া যাবার চেয়ে না-জ্বালা ভালা।
যে ফুল শুকায়ে যাবে
থাক্ সে কুঁড়িরি ভাবে,
বাক্সে রাখিয়া দিনু একটি কাটি।
সেদিন যেতেছি আমি শ্বশুরবাটি।

১৭-১২-১৯১৭

সংকোচ

সজ্জা করে তোর সকাশে আসতে আমি ভাই
লজ্জা বড় পাই।
কি জানি তুই মনে মনে
হাসবি কিনা সঙ্গোপনে
ভাব্‌বি কিনা গোপন আমি
করেছি তোর ঠাঁই
আসল আমিটাই।
তাইত শুধু লজ্জা করে
কিছুনা সাজ সজ্জা করে
নিয়ে আসি তোর নিকটে
আপন নগ্নতাই
লজ্জা পেয়ে ভাই।

ইচ্ছা করে মনের কথা সরল ভাবে ভাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই।
চোখের আড়ে মুচ্‌কে হেসে
ভাবিস যদি আমি এসে
বড়াই করে তোর কাছেতেই
জানিয়ে দিতে চাই
নিজের যোগ্যতাই।
সেই ভয়ে তোর কাছে এলে
চোখের উপর ধরি মেলে
মনের যত আবর্জনা
মনের যত ছাই
মনের মন্দটাই।

গান গেয়ে তোর হৃদয়খানা ভুলিয়ে নিতে ভাই
সাহস নাহি পাই।
রাঙা দুটি অধর পুটে
হাসির রেখা উঠবে ফুটে
ভাববি, তোরে ভুলিয়ে নিতেই
গানটি আমি গাই
অন্য কারণ নাই।
তাইত হঠাৎ দেখলে তোরে
অমনি গান বন্ধ করে
মিথ্যা বলে বুঝাই তোরে
প্রচার করি ভাই
আপন অজ্ঞতাই।

২২-১-১৯১৮

চেনা

কেউ যে কারেও চিনিনাক
এটা নয়ক বাঁধন।
নাচাই যদি ভাগ্যে থাকে
নাচ্‌বো তুর্কী নাচন।
বুকের মধ্যে আছেন যিনি
লুকিয়ে আপন গর্তে
কি হবে তার মুখোস যদি
তাকেই নারি ধরতে ?
জগৎ মাঝে অনেক আছে
মিথ্যা হাসি চাওনি
কি হবে মোর পোড়াকপাল
কুড়িয়ে যদি তাও নি।

চাইনে রে মন চাইনে !
হাসিকথার অন্তরালে
স্নিগ্ধশুচিশুভ্রভালে
আছেন যিনি অন্তরধন
তাইনে রে মন তাইনে !

ভবের হাটে অনেক আছে
রাঙ্গা অধর ওষ্ঠ,
আছেন অনেক কালো নয়ন
আরও জ্ঞাতি-গোষ্ঠ।
চাঁপার মত অঙ্গুলি আর
বাণীর মত হাস্য
দন্তরুচি কৌমুদী আর
পরীর মত লাস্য।
এঁরা সবাই তাঁরি কেবল
রঙীন রঙের পর্দা
যিনি সকল নাটের গুরু
হাট বাজারের সর্দার।

চাইনে রে মন চাইনে !
হাসিকথার অন্তরালে
স্নিগ্ধশুচিশুভ্রভালে
আছেন যিনি অন্তরধন
তাইনে রে মন তাইনে !

তুর্কী নাচন নাচব আমি
আরও অনেক সইবো।
তুচ্ছ অপমানের বোঝা
উচ্চশিরে বইবো।
নয়ন অধর এরা সবাই
আছেন বাঁয়ে ডাইনে।
এঁদের আপনগুণের তরে
কারেও আমি চাইনে।
তারেই শুধু চিন্‌বো আমি
চেনার মত পাত্র যে,
বুকের মাঝে লুকিয়ে আছে
সারা দিবস-রাত্র যে।

চাইনে রে মন চাইনে!
হাসিকথার অন্তরালে
স্নিগ্ধশুচিশ্রভালে
আছেন যিনি অন্তরধন
তাইনে রে মন তাইনে।

২৩-১২-১৯১৯

নিষ্প্রয়োজন

আদৌ যারে চিনিনাক
তাঁরি বিষয় তর্কে
মেতে উঠি, আমরা আবার
নিন্দা করি পরকে!
কোথায় থাকেন, কেমন চালে
চলে থাকেন ঈশ্বর—
এসব ভেবে তর্ক করে
কি উপকার বিশ্বর?
কেমন ধারা চেহারা তাঁর
দেখেনি কেউ চক্ষে—
দূরে থাকুক ঘনিষ্ঠতা
এতেই ত নেই রক্ষে।

কস্‌নে কথা কস্‌নে!
বৃথা কথায় মিথ্যে মিথ্যে

ক্ষিপ্ত কেন করিস চিত্তে—
জবাব যদি পাবিই নারে
কি হবে তোর প্রশ্নে ?
তুমি বলবে—'সে কি কথা
ঈশ্বর আছেন স্বর্গে।
যাহার ইচ্ছা এই বিষয়ে
তর্ক করে মরগে।'
আমি বলব—'যিনি আমার
থাকেন না এই মর্তে
তাঁহার বিষয় চিন্তা আমি
পারব না ভাই করতে।
বিল্ব যদি গাছের ডালে
হয়েই থাকে পক্ক।
বায়স আমি সে দিক পানে
করব না ক লক্ষ্য।'

কস্‌নে কথা কসনে।
বৃথা কথায় মিথ্যে মিথ্যে
ক্ষিপ্ত কেন করিস চিত্তে—
জবাব যদি পাবিই নারে
কি হবে তোর প্রশ্নে ?
জ্ঞানী বলবেন—'মূর্খ বেটা
পড়িসনি ত শাস্ত্র—
ভগবান নয় ব্যক্তি বিশেষ
তিনি একটি আস্ত।
আছেন তিনি জগৎ জুড়ে
সবার মাঝে পূর্ণ।'
তবে আর কি ! হয়ে গেল
আমার দর্পচূর্ণ।
জগৎজুড়ে পূর্ণ হয়ে
কিম্বা হয়ে অর্দ্ধ,
আমার উপকারটা তিনি
কি করেছেন সদ্য ?

কস্‌নে কথা কস্‌নে।
বৃথা কথায় মিথ্যে মিথ্যে
ক্ষিপ্ত কেন করিস চিত্তে—
জবাব যদি পাবিই নারে
কি হবে তোর প্রশ্নে ?
ভক্ত আছেন—হরি নাম তাঁর

লেগেই আছে ওষ্ঠে,
তিনি বলেন—'আমার কানু
লীলা করেন গোষ্ঠে।
প্রণয়ছলে গোপিকাদের
বস্ত্র করেন হরণ
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশে আঁকা
তাঁহার রাঙ্গা চরণ।'
পবিত্রপ্রেমপন্থী তুমি
হে ভগবৎভক্ত!
নরনারীর মধ্যে যে প্রেম
এতই কি খুব শক্ত?

কস্‌নে কথা কস্‌নে।
বৃথা কথায় মিথ্যে মিথ্যে
ক্ষিপ্ত কেন করিস চিত্তে—
জবাব যদি পাবিই নারে
কি হবে তোর প্রশ্নে?
চন্দ্র আছেন অনেক দূরে
যোজন আড়াই লক্ষ
কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমি
পাতিয়েছি ভাই সখ্য।
ভগবানের চেয়ে তিনি
আমার অনেক আপনার,
কারণ তাহার বিষয় আমার
নেইক কিছু ভাবনার।
তিনি যে ভাই আছেন, এটা
একেবারেই সত্যি
সন্দেহ কি দ্বন্দ্বদ্বিধা
নেই তাতে একরত্তি!

কস্‌নে কথা কস্‌নে।
বৃথা কথায় মিথ্যে মিথ্যে
ক্ষিপ্ত কেন করিস চিত্তে—
জবাব যদি পাবিই নারে
কি হবে তোর প্রশ্নে?
স্বর্গে যিনি আছেন, করুন
স্বর্গেতে ঘরকন্না
আমার কাছে মর্ত্যভূমি
স্বর্গাদপি ধন্যা।
মর্তে যাঁরা থাকেন এবং

নহেন যাঁরা বাষ্প,
তাঁরাই আমার আপন আমি
তাঁদের ভালবাসবো।
নরনারী সূর্যতারা
চন্দ্রকিরণ পূর্ণিমার—
এদের সঙ্গে আমার মিলন
হয় যেন গো দুর্নিবার।

কস্‌নে কথা কস্‌নে।
বৃথা কথায় মিথ্যে মিথ্যে
ক্ষিপ্ত কেন করিস চিত্তে—
জবাব যদি পাবিই নারে
কি হবে তোর প্রশ্নে?

২৪-১২-১৯১৯

বিস্মৃতি

নিয়ে যাও পুরাতন, তোমার অন্তরভরা গ্লানি,
নিয়ে এস নূতন সম্বৎ,
ফেলে দিয়ে অতীতের বিমলিন ম্লান মালাখানি
নবীনের প্রফুল্ল সম্পদ!

অতীতের যত ভ্রম, যত বিফলতা, যত ত্রুটি—
তার তরে করিব না শোক।
নবীনের ক্ষমাহস্ত মুছে দিক কালের ভ্রূকুটি
বিস্মৃতি মঙ্গলময় হোক।

৩১-১২-১৯১৯

কার ছেলে ?

স্বপ্নে দেখি, তোমার কোলে যেন
শুয়ে আছে একটি কচি ছেলে ;
আমি যেন বলছি অবাক হয়ে—
'এটা আবার কোথায় থেকে পেলে ?'
একটু হেসে মুখটি করে নীচু
রইলে তুমি চেয়ে তারি পানে,
আমি বল্লুম, 'এটাকে ত কৈ
দেখা আগে যায়নি কোনখানে।
দেখি, দেখি, রংটাত বেশ ফর্সা
অনেকটা প্রায় আমার মতই হবে।
চোখ দুটো ? উঃ ধারাল ঠিক বর্শা !
এ ছেলেটি তোমার হতেই হবে।'

২৫-১-১৯২০

প্রথম বসন্তের হাওয়া

মাঘের সাঁঝে শীতের শেষে
বইছে বায়ু উন্মনা
আজকে পুরাতনের কথা
শুনবো না রে শুনবো না।
বাতাসে আজ পরশখানি হাসির মত
চোখের কোলে গড়ানো জলরাশির মত,
আজকে বসে ঘরের কোনে
ছন্দ যতি গুণব না !

ওরে আমার উতল বায়ু
অঙ্গে আমার পরশ কর।
অন্তরে মোর বুলিয়ে দে ওই
শিউরে ওঠা সরস-কর।
ভুলব রে আজ ভুলব যত ত্রুটির কথা
হবে এখন আপনভোলা দুটির কথা,
আবেগ ভরে ধরব চেপে
বুকের কাছে পরস্পর।

ছড়িয়ে পাতা উড়িয়ে দিলি
ব্যাখ্যা মনুসংহিতার
পুঁথির পাতা পায় না খুঁজে
শতাব্দীরই সঙ্গী তার।
টলে টলে উড়ছেরে তোর স্পর্শ পেয়ে
জরার মাঝে যৌবনেরই হর্ষ পেয়ে,
জেগেছে আজ ভস্মে-চাপা
নির্বাপিত বহ্নি তার।

মুক্ত ওরে, আমার প্রাণে
উদম হাওয়া লাগিয়ে দে।
বিকল পায়ে শিকল ছিঁড়ে
জাগিয়ে দে রে জাগিয়ে দে।
অশোক তলে ছড়িয়ে আছে শীর্ণ পাতা—
ঝরিয়ে দে মোর প্রাণের যত জীর্ণ পাতা,
চক্ষে আমার সকল-ভোলা
রঙীন নেশা রাঙিয়ে দে।

উপদেশ

ওগো প্রবীণ, বক্ষে যবে লাগবে কঠিন ব্যথা
প্রাণে যবে বাজবে তোমার ক্লেশ,
শুনো তখন তরুণ মুখের চপল বাচালতা
নিও তখন যুবার উপদেশ!
জীর্ণ বুকে তুষানলের নির্বাণহীন দাহ
নিয়ে কভু যুবার কাছে এলে
হাস্য ধারায় উচ্ছ্বসিত আনন্দ প্রবাহ
প্রলেপ রূপে অঙ্গে দেবে ঢেলে।
কণ্ঠে তোমার পরিয়ে দেবে পারিজাতের মালা
চন্দনেতে বক্ষ দেবে লেপে,
বিশ্ব যে রে তাদের কাছে রাজার রত্ন-শালা
কিছুই তারা নেয়না গুণে-মেপে।

ওগো প্রাচীন, শুভ্র কেতু উড়বে যবে মাথায়
জীবন যবে স্বল্প অবশেষ

খুঁজোনা তার মীমাংসা আর পুঁথির ছেঁড়া পাতায়
নিও তখন যুবার উপদেশ।
পক্ক মাথা কোটর মাঝে অনেক গলি-ঘুঁজি
শঙ্কা অনেক, অনেক অসুবিধা।
পথের তরে করবে যবে বিফল খোঁজাখুঁজি—
যুবা তখন দেখিয়ে দেবে সিধা।
বলবে তারা—নাহিত পথ দক্ষিণে কি বাঁয়ে
পথ যে শুধু সম্মুখপানে আঁকা।
ঋজু সে পথ শীতলকরা তরুর ছায়ে-ছায়ে
নাইক তাহার কোথাও আঁকাবাঁকা।
চৌমাথাতে দাঁড়িয়ে কেন ভাবছ ভাসা-ভাসা
পথের খোঁজে উজল চোখে চেয়ে,
পথের ধারে বকুলতলে যুবার যে রে বাসা
পথ-সাগরের সেই যে একা নেয়ে।

ওগো প্রাচীন, ঝাপসা চোখে আকুল দ্বিধা নিয়ে
পথের যবে পাবেনা উদ্দেশ,
নিরাশাতে অশ্রু যখন ঝরবে আঁখি দিয়ে
নিও তখন যুবার উপদেশ।
আপন প্রাণের চৌদিকিতে কঠিন গণ্ডী কেটে
থাকবে যখন বসে ঘরের কোনে
বদ্ধ হাওয়ার অবরোধে জানলা-দুয়ার এঁটে
হাঁপিয়ে যবে উঠবে ক্ষণে ক্ষণে,
বাহির পানে চাইতে তোমার চক্ষু যাবে জ্বলে
যুগল-ভুরু হবে সঙ্কুচিত,
দুঃসাহসের মাত্রা দেখে তোমার চরণতলে
অচল ভূমি রৈবে হয়ে ভীত,
গণ্ডী যখন নিগড় হয়ে থাকবে পায়ে ধরে
উচ্ছ্বসিয়া ডাকবে চোখে বান,
তখন শুনো বাহির হতে যুবার কণ্ঠস্বরে
মুক্ত-উদার আকাশ-ভরা গান।

ওগো প্রাচীন, জড়িয়ে যবে নিজের বোনা জালে
থাকবে না কো শান্তি-সুখ লেশ,
খুলে দিয়ে জানলা-দুয়ার দীপ্ত প্রভাত কালে
নিও তখন যুবার উপদেশ।
সন্ধ্যাবেলা আসবে যখন পরকালের ডাক
শিউরে যবে উঠবে হৃদয় কেঁপে
দৈন্যে যখন কণ্ঠে তোমার ফুটবে না গো রাগ
পাষাণ হয়ে থাকবে বুকে চেপে,

অনিশ্চিতের অন্ধকারে একলা চেয়ে চেয়ে
থেকো না কো আর মিথ্যা প্রবোধ আশে
যুবার চির-অমর গেহে যেও তখন ধেয়ে
দাঁড়িয়ো গিয়ে তাহার দখিন পাশে।
একটি কথায় বুঝিয়ে দেবে মরণ প্রহেলিকা
উচ্চে হেসে উড়িয়ে দেবে ভয়,
বক্ষে তোমার জ্বলবে তখন আশার প্রদীপ-শিখা
হৃদয়ে আর থাকবে না সংশয়।

ওগো প্রাচীন, আসবে যবে মৃত্যুদেবের রথ
ঘনিয়ে যবে আসবে মোহাবেশ
মিনতি মোর পড়োনাকো শ্রীমদ্ভাগবৎ
নিও তখন যুবার উপদেশ!

১৭-২-১৯২০

মালা

গভীর রাতে একলা আছি জেগে,
ঘরের মাঝে হয়নি প্রদীপ জ্বালা;
বুকের কাছে কেবল আছে লেগে
অমলদল যূথীফুলের মালা,
গেঁথেছিলাম সন্ধ্যা হবার আগে,
আকাশ যবে মেঘের রক্তরাগে
রাঙিয়েছিল ক্ষণেক ফাগে ফাগে
সাদা ফুলের আমার পুষ্পডালা।

মালা যখন গেঁথেছিলাম একা
বাতায়নে দাঁড়িয়ে নতমুখে
ভাবি নাই যে কাহার পাব দেখা
মধ্যরাতের মৌন-গভীর বুকে।
মালা গলায় পরিয়ে দেব কার
মনের মাঝে ভাবিনি একবার,
গেঁথেছিলাম যূথীফুলের হার
আপন মনে হার গাঁথারি সুখে।

মালা গাঁথা হল যখন শেষ
ফুরাল মোর যূথীফুলের ডালা
ঘরে তখন নাইক আলো লেশ
আকাশ জুড়ে তারার বাতি জ্বালা
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বাতায়নে
দখিন বায়ু শীতল পরশনে
আপন গলে দিলাম অন্যমনে
আপন হাতে গাঁথা যূথীর মালা।

শ্লথ বসন অলস নিশীথিনী
যূথীফুলের গহন পরিমলে,
চরণে মোর বাজিছে শিঞ্জিনী
দখিন সমীরণের খেলাছলে।
ওগো আমার বরমালার বর,
এ মালা কি আমার বুকের পর
পড়বে ঝরে শীর্ণ সকাতর
পাব নাকি দিতে তোমার গলে ?

১২-৩-১৯২০

ললাটিকা

ললাটে মোর পরিয়ে দেছে
অমর ললাটিকা
অরুণ তব ওষ্ঠাধরের
রক্ত আগুন শিখা।
সেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখায়
ললাট উজলিয়া
বাহির আমি হলাম আজি
জীবন পথে প্রিয়া।
পবন বেগে ছুটিয়ে দেব
অশ্বমেধের ঘোড়া
কীর্তিকলাপ করব রে লাভ
সারা ভুবন জোড়া।

ললাটে মোর পরিয়ে দেছে
অমর ললাটিকা

অরুণ তব ওষ্ঠাধরের
রক্ত আগুন শিখা।
আজি শ্যামল বেশে
ফিরছে বনে বনে
বাসন্তী রং উত্তরী তার
উড়ছে ক্ষণে ক্ষণে।
দখিন বায়ু কীচক বনে
বাজায় আজি বেণু।
সবার মাঝে ফিরব আমি
ফিরব একা একা
নীরব রণে করব রে জয়
যাহার পাব দেখা।

ললাটে মোর পরিয়ে দেছে
অমর ললাটিকা
অরুণ তব ওষ্ঠাধরের
রক্ত আগুন শিখা।
থাকবে না মোর বর্ম বুকে
থাকবে না কো তীর
রিক্ত করে ফিরব আমি
বিশ্বজয়ী বীর।
ত্র্যম্বকেরি চক্ষুজ্বালা
রয়েছে মোর ভালে
ঠকঠকিয়ে বহ্নিশিখা
নাচবে তালে তালে।
সবার বড় অস্ত্র যে মোর
ললাটশায়ী তিলক
তাহার বলে অমর আমি
করব রে জয় ত্রিলোক।

ললাটে মোর পরিয়ে দেছে
অমর ললাটিকা
অরুণ তব ওষ্ঠাধরের
রক্ত আগুন শিখা।
দর্পিত মীনকেতন যদি
আসে সমর দিতে
নিরস্ত্র তায় করব আমি
অমোঘ ভ্রূভঙ্গিতে।
নিষঙ্গে তার শুকিয়ে যাবে
চূত-মুকুল শর

ছিন্নধনু শিঞ্জিনী তার
. . লুটাবে ভূমি পর।
ললাটিকার রশ্মিতলে
নয়ন করি নত
পরাভূত কৃতাঞ্জলি
দাঁড়াবে মন্মথ।

ললাটে মোর পরিয়ে দেছে
অমর ললাটিকা
অরুণ তব ওষ্ঠাধরের
রক্ত আগুন শিখা।

১৩-৩-১৯২০

সুন্দর

নিন্দা তোমার অনেক শুনি
লোকের মুখে মুখে
সবাই বলে দাগ পড়েনা
কঠিন তব বুকে।
বজ্র দিয়ে গড়িয়ে গড়া
পাষাণ তব প্রাণ
নেই যেখানে এতটুকুন
স্নেহের কলতান।
তাই ভেবেছি তোমার সাথে
আমার পরিচয়
যোগ্য-যোজন বিবেচনায়
হবার কভু নয়।

মোহন বেশে এলে আমার সম্মুখে।
মুখটি তোমার দিব্য দিবা
চক্ষে তোমার প্রেমের বিভা,
তোমায় আমি বিদায় দেব কোন মুখে

তোমার আমার মধ্যে ছিল
অনেক ব্যবধান
মুক্তামাণিক রত্ন অনেক

অনেক অপমান।
আমি ছিলাম সিংহদ্বারে
দাঁড়িয়ে দীন বেশে
তুমি ছিলে রত্ন-সভার
জ্যোতি মধ্য দেশে।
শিরে তোমার কোহিনূরের
দীপ্ত শিরস্ত্রাণ,
হস্তে তোমার বিশ্বজয়ী
বজ্র ধনুকবাণ।

আসন ছেড়ে দাঁড়ালে মোর সম্মুখে।
মুখটি তোমার দিব্য দিবা
চক্ষে তোমার প্রেমের বিভা,
তোমায় আমি বিদায় দেব কোন মুখে!

চতুর তুমি নাগর ওহে
হরণ কর প্রাণ
অন্তরালে লুকিয়ে হান
হৃদয়ভেদী বান।
গহন রাতে স্বজন ছাড়ি
করাও অভিসার।
সংযমেরি বাঁধন ভাঙ্গ
অবোধ নায়িকার।
তোমার ভয়ে হৃদয়খানি
লুকাই ক্ষণে ক্ষণে
চক্ষু বোজা অন্ধকারের
ত্রস্ত আবরণে।

বংশীরবে এলে আমার সম্মুখে।
মুখটি তোমার দিব্য দিবা
চক্ষে তোমার প্রেমের বিভা,
তোমায় আমি বিদায় দেব কোন মুখে!

২-৪-১৯২০

এই প্রেম—নিকষিত হেম

ভালবাসি সে কি শুধু ভালবাসা দিতে ?
আর কিছু নয় ? স্বার্থহীন প্রেমাগ্নিতে
শুধু ঢেলে দিতে মর্ম-দ্রবিন আহুতি ?
আর তার পরিবর্তে এতটুকু দ্যুতি
এতটুকু বিনিময়-আশা যদি জাগে
দান নিঃশেষিত হৃদয়ের প্রান্তভাগে,
অমনি সমস্ত প্রেম ভালবাসা ব্রত
ব্যর্থ ভস্ম হয়ে যায় ফলভারনত
বৃক্ষসম, বাসনার বিদ্যুৎ পরশে !
এই প্রেম,
নিকষিত হেম !

সমস্ত জগৎ জুড়ি বরষে বরষে
শরতে বসন্তে হিমে প্রাবৃটে নিদাঘে
এই অহর্নিশ খেলা রাগ-অনুরাগে
মানব হৃদয় লয়ে ;—সজল নয়ানে
তৃষিত চাহিয়া থাকা দিগন্তের পানে
বঁধূর আশায় ;—দেবতার পদমূলে
নিত্য গুপ্ত আরাধনা, ফুল তুলে তুলে
মঞ্জরিত কামনার লতিকা হইতে ;—
স্ফুরিত বাহুর পাশে বাঁধিয়া লইতে
বিরহিণী একবেণী ধরা দয়িতারে
লক্ষ শতবার চুম্বিয়া চুম্বিয়া তারে
বিবশা করিয়া দিতে, গৃহপ্রত্যাগত
সুদূর ভ্রমণশ্রান্ত কর্মক্লান্ত ব্যথা অবনত
পথিকের কম্পিত আবেগ ;—এই সব
মিথ্যা আবর্জনা তরে ? প্রেমের গৌরব
ক্ষুণ্ণ করিতেছে এরা ?
নহে কভু নহে !
প্রেম নহে তপস্বীর নির্মম আগ্রহে
স্বার্থহীন আত্মবিসর্জন। প্রেম জয়,
প্রেম সুখ, প্রেম লিপ্সা, প্রেম বিনিময়।
এই প্রেম,
নিকষিত হেম।

হে প্রেম, তোমারে মোরা লইব বরিয়া
তরুণী প্রিয়ার মত—দু'বাহু ভরিয়া
বিজন, নিশীথ কক্ষে,—চরণে তোমার

বিলাস-তন্দ্রার মাঝে করিবে ঝঙ্কার
সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া দুটি মুখর নূপুর ;
অঙ্গের বসন ত্যজি সুখস্বর্গপুর
অমৃতবিহ্বল সম পড়িবে খসিয়া,
স্তনপরে কেশভার রবে বিলসিয়া,
অম্লান ললাটতটে ভ্রমরের মত
রহিবে কজ্জলটীকা মধুপানরত।
শুধু দুটি নেত্রতলে স্থির অচঞ্চল
চিরদীপ্ত শিশিরের মত সমুজ্জ্বল,
হিমাদ্রি তুষার শৃঙ্গে উষসির মত
দুই বিন্দু পবিত্রতা রহিবে জাগ্রত !

৯-৮-১৯২০

মিহির

হে মিহির, শুনেছিনু তোমার বারতা
জগতের প্রথম প্রভাতে ; তামসিনী
প্রকৃতির বুকে ছিল স্তব্ধ নিশীথিনী
বিরাট ভুজঙ্গের মত মধুপানরতা।

অজাত নক্ষত্র নভে নাহি ছিল জ্যোতি
নাহি ছিল নীহারিকা শুভ্র তনুলতা
অসীমের সিংহাসনে শুধু নীরবতা
বসে ছিল ধ্যানমৌন পাষাণ মূরতি।

সহসা উদিলে তুমি দিগন্ত উদ্ভাসি'
—অসীম সাগর তটে সৃষ্টির কমল—
প্রকৃতির প্রথম সন্তান। রাশি রাশি
অন্ধকার—গর্ভিণীর দুঃস্বপ্ন সকল—
টুটে গেল তোমার সহাস নেত্রপাতে,
জাগিল ঘুমন্ত বিশ্ব প্রথম প্রভাতে।

২৫-৮-১৯২২

সমাপ্তি

সকল কাজই শেষ করেছি
কাহার দোষ এ প্রিয়ে ?
বিদায় কালে অশ্রু তোমার
ঝরছে আঁখি দিয়ে।
সকাল বেলা যদি তুমি
আসতে কোন ছলে
ঠোঁটের কোণে একটু যদি
হেসেও যেতে চলে
সরম ভরে নয়ন যদি
নীচের পানে নাব্‌ত—
সারা দিনের কাজটি আমার
রৈত অসমাপ্ত।

দ্বিপ্রহরে মেঘ ছিল না
সূর্য ছিল খর
লতার শিরে ফুলগুলি সব
রৌদ্রে জ্বর জ্বর।
ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল
পারাবতের স্বর
সারা জগৎ দাঁড়িয়ে ছিল
নিকম্প নিথর।
তখন যদি কণ্ঠে তোমার
করুণ গীতি কাঁপ্‌ত
সারা দিনের কাজটি আমার
রৈত অসমাপ্ত।

সন্ধ্যা হয়ে এল আমার
ফুরাল সব কাজ
অশ্রু মুছে হাসি মুখে
বিদায় কর আজ।
সমাপ্তিরই অবসাদে
হৃদয় পড়ে নুয়ে
একটু হেসে সারা বুকের
বেদন ফেল ধুয়ে।

সমাপনের অন্ধকারে
তোমার হাসি মুখ
অমানিশার প্রদীপ সম
থাকবে জুড়ে বুক।

২৫-৮-১৯২২

আলো

আমার আঁধার ঘরে লুকিয়ে কেন
আপন শিখা ম্লান
ওগো আলো আমার আলো।
ওই একটুখানি শিখা
যেন অসীম অন্ধকারের ভালে
চাঁদের ললাটিকা।
আমার হৃদি পূর্ণ করে জ্যোৎস্না সুধা ঢালো
ওগো আলো আমার আলো।

আমার নেইক দিশা নেই সীমানা
নেইক প্রতিফলন
ওগো জ্বলন আমার জ্বলন।
শুধু শূন্য তারি বুকে
তব অনাহত দীপ্তিটুকু
ছড়িয়ে পড়ে দুখে।
বজ্রতেজে পুড়িবে কেন কিনারভরা কাল
ওগো আলো আমার আলো।

এবার জ্বলার মত জ্বলতে হবে
রুদ্রতেজে মাতি
ওগো বাতি আমার বাতি।
মোর ঘরের দিশে দিশে
যত মলিনতার চিহ্নগুলি
মিলিয়ে যাবে মিশে।
আঁধার ঘরে সূর্য সম মম রক্তশিখা জ্বাল
ওগো আলো আমার আলো।

৯-৯-১৯২২

একটা প্রেমের গল্প

এটা একটা ক্ষুদ্র প্রেমের গল্প,
ছন্দে লেখা—আখ্যানবস্তু খুবই অল্প—
কিন্তু আমার কাছে খুবই মধুর এবং প্রিয়,
কারণ পরম বরণীয়
আমার বন্ধুবরই হলেন এ গল্পটির নায়ক ।
তিনি একটি কবি এবং নায়ক—
কবিতা তাঁর খাতায়
লেখা আছে আড়াই দিস্তা পাতায় ;
এবং তাঁর চুলের তরঙ্গেতে
কবিত্বরস পিছলে পড়ে চাঁদের আলোয় ।
বন্ধুবরের নামটি হল——···
থাকগে এখন কি হবে নাম নিয়ে ।
মনে করুন নামটা তাঁহার ভুতো কিম্বা···
যদিও এতে আমার বন্ধুপ্রবর
মনে মনে হবে না খুব তুষ্ট ।
নিদেন তিনি দুষ্ট
লোকের কুৎসা থেকে পাবেন পরিত্রাণ ।
কিন্তু পাঠক ! করুন অবধান
যে গল্পটির নায়কের নাম গোবর কিম্বা ভুতো
সে গল্প বস্তুত
অতি হেয় এবং তুচ্ছ এবং অশ্লীল—
ভদ্রলোকের পড়বার মত এক তিল
তাতে পাবেই নাক থাকতে ।
তাই—পাঠকের মন রাখতে
নায়কের ছদ্মনামটা শ্রুতিমধুর দেখে রাখাই উচিত
আমিও অনেক ভেবে তাঁহার নাম রাখলাম—সুজিত ।

এখন, শ্রীমান সুজিত চন্দ্র সেন
হঠাৎ একদিন চড়ে পুরী ট্রেন
শ্রীক্ষেত্রেতে হলেন গিয়ে হাজির ;
যদিও, মানি, তাঁহার মত পাজির
তীর্থ দর্শন একেবারেই ছিলনাক লক্ষ্য,
কারণ পুরো আড়াই পক্ষ
থাকা সত্ত্বেও—এমনি কলি যুগ—
দিনের তরেও দেখেননিক জগন্নাথের মুখ ।

যাক সে কথা—সন্ধ্যা বেলা সেদিন

—বলাই আছে কবি তিনি নবীন—
নিয়ে হাতে পেন্সিল এবং খাতা
ধরতে গেলেন সমুদ্রকে তারি পাতায় পাতায়
কিন্তু এমনি ভগবানের লীলা
—তুচ্ছ নেহাত ইহার কাছে জলে ভাসা শিলা—
সুজিত চন্দ্র মুগ্ধভাবে সাগরতটে নেমেই
একেবার চমকে উঠে পড়ে গেলেন প্রেমে ।

ব্যাপারটা এই—দেখতে দেখতে জলনিধির সুনীল
বারিরাশি, খুঁজতে ছিলেন জাঁকাল এক মিল,
এমন সময় কণ্ঠে তাঁহার করল গিয়ে প্রবেশ
বালা কণ্ঠগীত ; তাতে গায়িকা যে নভিস্
সেটা সুজিত চন্দ্র পারলেন বেশ বুঝতে ;
এবং গায়িকাকে খুঁজতে
হল না খুব বেশি, কারণ তিনি
অদূরেতেই বসে ছিলেন—তারা সিমন্তিনী
সন্ধ্যারানির মত—মলিন বালুরাশির পরে
ছড়িয়ে পাদুখানি,—দুটি কমল করে
অস্ফুট অস্ফুট ভাবে গানের তালে তালে
হতেছিল বিচ্ছেদ ও মিলন ; প্রশান্ত কপালে
পড়েছিল সন্ধ্যাজ্যোতিঃ- ঠিক তাহারি নীচে
আয়ত নীল চক্ষুদুটি—কি যে
চঞ্চলতা মাদকতা ভরা—
সুজিত চন্দ্র ত্বরা
কাব্য লেখার খাতাখানি মুড়ে
এবং পেন্সিলটি পকেটেতে পুরে
সেই মেয়েটির সম্মুখেতে হলেন উপস্থিত,
এবং বল্লেন, 'আপনার গীত
শুনতে খুবই ভাল ;
কিন্তু তাতে নেইক বেশি সুরও এবং নেইক বেশি তালও ।
ওটা এমনিধারা হবে—'
বলেই যথাসম্ভব মধুর রবে
গানখানিকে আগাগোড়া গেয়ে
একবার একটু হেসে এবং কটাক্ষেতে চেয়ে,
কেহ কিছু বলা কহার আগেই
বসে পড়লেন বালিকাটির দক্ষিণ পার্শ্বভাগেই ।

বালিকা ত অবাক, কিছু ত্রস্ত ;
কিন্তু সুজিত চন্দ্র এমনিধারা মস্ত
ধূর্ত এবং ধড়িবাজ যে অতি সরল কথায়

যেন কতকালের চেনা এমনিধারা প্রথায়
বল্লেন, 'ভয় কি, আমি মানব,
নইক কন্দকাটা কিম্বা নিশাচর কি দানব ;
নাম সুজিত চন্দ্র সেন
বাড়ি কলিকাতা—নম্বর পদ্মপুকুর লেন ।'
কথা শুনে তরুণীটি হলেন কিছু ফুল্ল
এবং ইন্দীবর তুল্য
মুখখানিকে তাঁহার দিকে তুলে
টুকটুকে তাঁর ঠোঁট দুখানি খুলে
দন্তরুচি কৌমুদীতে সকল দিক ভরে
বল্লেন, 'একটু সরে
গিয়ে ভাল হত কথাবার্তা কইলে,
নইলে
দেখলে মোদের বসে থাকতে এত ঘেঁষাঘেঁষি
কেউ হয়ত ভাবতে পাতে আমরা শেষাশেষি
পড়ে গেছি পরস্পরের প্রেমে ।'
সুজিত উঠলেন ঘেমে
উচিত মত জবাব কোন পেলেন নাক খুঁজে,
এইটুকু যে
মেয়ে তাঁকে বাক্যছটায় করে দিলে চুপ
এতেই মনে মনে সুজিত দমে গেলেন খুব ।
যাহোক চতুর চূড়ামণি হলেন খুবই জব্দ
এবং গোবেচারীর মত করলেন না টুঁ শব্দ ।

তরুণীটির মুখ
দুষ্টামিতে ভরা ; মিষ্ট রহস্য কৌতুক
নৃত্য করে সদাই তাঁহার চোখের কাল তারায় ;
তাঁকে দুষ্টামিতে হারায়
এমন অল্প মেয়েই আছে ভূভারতে ।
যদিও আঠারোতে
পড়তে বাকি আছে মাস দু'তিন
তবুও অনুদিন
তাঁহার হাস্য উচ্ছ্বসিত মুক্ত প্রাণের হাওয়া
শিশুর সরলতার মতই অব্যাহত করছে আসা যাওয়া ।
তিনি বল্লেন, 'দেখুন বাবু সুজিত চন্দ্র সেন
আপনি যখন নিজের পরিচয়টি দিয়েছেন
তখন আমার উচিত হচ্ছে বলা
নিজের নামটি—যথা ইন্দুবালা ।
বাড়ির লোকে বলে আমায় ডল ।'
শুনে সুজিত মনে পেলেন বল

এবং বল্লেন, 'দুটি নামই আপনার উপযুক্ত
প্রথমটি কোর্মা এবং দ্বিতীয়টি সুক্ত ।'
উক্তরূপ প্রশংসাতে ইন্দুবালা সুখী
হলেন মনে মনে এবং ফুল্লমুখী,
বল্লেন অনেক কথা যাহার অধিকাংশই বাজে—
তরুণ হিয়ার মুগ্ধ প্রলাপ ; কিন্তু তাহার মাঝে
সুজিত চন্দ্র শুনতে পেলেন একটি গিরিনদীর
সরস কলকথা—আপন গতির বেগে অধীর
উচ্ছ্বসিত তনুর তটসীমায়
উদ্বেলিত উর্মিরাশি যৌবনেরি প্রভাত অরুণিমায় ।

সন্ধ্যা ক্রমে নিশার আলিঙ্গনে
মিশিয়ে গেল বনফুলের গন্ধ সম নিশীথ সমীরণে ;
অব্যক্ত উদ্বেগে
জলনিধির মন্দ্রধ্বনি গুমরিয়া উঠলো থেকে থেকে ;
কিন্তু তবু বেলার পরে বিজন দুটি প্রাণী
পরস্পরের বাণী
পরস্পরের সঙ্গসুখে বিভোর
ভুলে গেলেন তৃষ্ণা ক্ষুধা ভুলে গেলেন রাত্রি দিবা প্রহর
এমনি ভাবে কতক্ষণ যে তাঁরা
পিয়ে পিয়ে দুহুঁ দোঁহার বাক্যসুধাধারা
বসে থাকতেন সাগরতীরে শক্ত ভারি বলা—
কিন্তু হঠাৎ ইন্দুবালা
ঠিক আপনার পিছনে এক বিকট শব্দ শুনে
স্থান কাল পাত্রাপাত্র কিছুই না গুণে
'মা গো' বলে সভয়ে তাঁর মৃণাল বাহু ডোরে
বন্ধুবরের কণ্ঠনালী চেপে ধরলেন জোরে ।
ব্যাপারখানা একেবারেই তুচ্ছ
ইন্দুবালার পিছন দিকে ছিল এক অনুচ্চ
বালুস্তূপ ;
তারি অপর পারে তিনটি শিয়াল অপরূপ
সম্ভবত অনেক দিনের পরে
দৈবক্রমে দেখা হওয়ার মহাস্ফূর্তি ভরে
উচ্চ কণ্ঠে করতে ছিল সুমিষ্ট সম্ভাষণ,
'আরে আরে দাদা নাকি, আসুন'
'কে হে কে হে কেমন আছ ভায়া
ইনি হচ্চেন শ্রীমতী ফক্স তোমার ভ্রাতৃজায়া ।'
কিন্তু এঁদের দৈব সম্মিলনে,
এবং এঁদের তজ্জনিত উর্ধ্ব সম্বোধনে
বালুস্তূপের অপরপারে ত্রস্ত দুটি প্রাণী

নিয়েছিল পরস্পরে বুকের মাঝে টানি
বিভল ভীতি ভরে—
কিন্তু তাহা ক্ষণকালের তরে ;
পরক্ষণেই অসহ্য লজ্জায় সম্মোহনে মর্মাহত
ছিন্ন করে বাহুবাঁধন অপরাধীর মত
সরে বসলেন দূরে—
ইন্দুবালা নতমুখে, সুজিত চন্দ্র পকেটেতে হাত দুখানি পুরে ।
ইন্দু আপন আঁচলেতে করে মুখাবরণ
ভাবতে লাগলেন ছি ছি কেন হোল না মোর মরণ,
বন্ধুবরের মনে মনে হতে লাগল রাগ
শিয়াল না হয়ে কেন হোল নাক বাঘ ।
[অসমাপ্ত]

[১৯২৩ ?]

চিঠি

তুমি দেখছি মিহির ভায়া
লিখতে পার পদ্য বেশ ।
বাইরে থেকে যেটা দেখি
সেটা তোমার ছদ্মবেশ ।
অন্তরেতে রং ধরেছে
বর্ণচোরা রসাল হে
ঘরের কোণে জ্বালছ সুখে
নানা রঙের মশাল হে ।
আমরা দাদা একটা ভাষা
করতে পারি বরং জয়
তুমি কিন্তু এ বিষয়ে
সব্যসাচী ধনঞ্জয় ।
ইংরেজি ও বাংলা ভাষায়
দক্ষিণে ও বাঁ ধারে
হান্‌ছ কল্প পুষ্প-আয়ুধ
আলোক এবং আঁধারে
ঘা খেয়ে ভাই মরে আছি
জবাব দেব শক্তি নাই—
ব্যর্থ 'প্রফেসারের' কাছে
সকল রকম বক্তিমাই ।

বাগান ভরে গোলাপ কুঁড়ি
ফুটে আছে কুড়িয়ে নাও
মে মাসের এই মিঠে হাওয়ায়
বাসনা পাল উড়িয়ে দাও।
কাঁটার ঘায়ে নাহয় হবে
আঙুলগুলো রক্তময়,
এটা যে ভাই প্রাণের টানে
খামখেয়ালী সখ ত নয়।
পদ্মপাতে জলের মত
কখন আছি কখন নাই
কাজ কি বল উদাসভাবে
বসে থাকা একলা ভাই।

বৃন্তটিতে গোলাপ কুঁড়ি
ফুটে আছে দেখতে বেশ;
কিন্তু যদি চক্ষে তোমার
লাগল না তার রংয়ের লেশ
বুকে যদি পৌঁছল না
কাঁচা তাহার গন্ধটি
কানে ধরা পড়ল না তার
আধ আধ ছন্দটি,
ব্যর্থ তবে গোলাপ কুঁড়ি
ব্যর্থ তবে তোমার প্রাণ
সজীবতায় নবীনতায়
নিদারুণ এ অসম্মান।

তোমায় কি আর বলব বেশি
তুমি ত আর অবুঝ নও,
সবুজ বটে কিন্তু তবু
একেবারেই সবুজ নও।
গোলাপ কুঁড়ি পড়বে ঝরে
বিদায় নেবে বসন্ত
থাকবে শুধু শূন্য প্রাণে
ঝরা ফুলের সুগন্ধ।
হে মধুকর, পুষ্প প্রিয়ার
পিও অধর পরিমল
দেখনা ওই দাঁড়িয়ে বধূ
চক্ষে তাহার শিশির জল।

২৭-১-১৯২৩

মধুমাসে

এ মধুর মধুমাসে—
ধরণী হরষাকুল গলায় পরেছে ফুল
কবরী বেঁধেছে ফুলপাশে।
ফুলে ফুলে ফুলময়
আকুল মুকুলময়
মুগ্ধ মলয় বয়
দীর্ঘ নিশ্বাসে।
বঁধুয়া আসিবে বুঝি আজি
প্রকৃতি বসেছে বধূ সাজি'।
কুসুমে লুকায়ে স্মর
হানে খর ফুলশর
হিয়া কাঁপে থর থর
লাজ তরাসে।

২০-৩-১৯২৪

দখিনা

দক্ষিণ মেরুর গেহে সুপ্ত ছিল কুমারী দখিনা
তুষার পালঙ্ক পরে, হিমশুভ্র বাহুখানি রাখি
বিস্রস্ত কুন্তলতলে, তনুদেহ অযতনে ঢাকি
কুহেলি অঞ্চলে ; যেন সুপ্তসুর নন্দনের বীণা।

দিবা রবিদীপ্তিহীন, তন্দ্রালেখা আলোর নয়নে,
শব্দ মূর্চ্ছাগত, নিস্পন্দ নীরব শ্বাস নাহি বহে,
স্তিমিত নয়ন কাল ধ্যানমৌন স্তব্ধ বসি রহে
তুহিন আসনে—কোন জরাহরা মন্ত্রের সাধনে।

সহসা নয়ন মেলি সুনয়না জাগিল সুন্দরী,
—ললাট ছুঁইল তার রবি-রশ্মি সুবর্ণ-শলাকা—
তারপর লঘুপদে সিন্ধু তরি মেরুর অপ্সরী
উত্তরিল ধরণীর তনুতটে হিমবিন্দু-আঁকা।
উলঙ্গ ধরার দেহ রোমাঞ্চলে উঠিল শিহরি
শীতের কুজ্ঝটি সাথে উড়ে গেল কুন্দের বলাকা

১৯-২-১৯২৬

বৈশাখী

তুঙ্গী রবির রৌদ্র বিলাস সৈবে কে ?
ভৈরবের এই নৃত্যমাতন বইবে কে ?
সংজ্ঞা নাই— নাই ছায়া
দগ্ধ বায়।
মরীচিকা— দিক্ মায়া—
হায় রে হায়
ক্লান্ত মৃগের মৃত্যু তিয়াস সেই দেখে।

নির্ঝরিণী উপল বায় অস্থিসার।
নখর ঘাতে দীর্ণ হিয়া মৃত্তিকার।
তাম্রতালু আকাশ চায়
তৃষার জল।
ঈশান ভেদি আয় রে আয়
মেঘ বাদল—
তপ্তধরার বুক জুড়ানো বৃষ্টিধার।

বৈশাখী আয় দিগম্বরী ভৈরবী
অগ্নিযাগের কুণ্ডেতে তুই ঢাল্ হবি
অঙ্গার সব যাক নিভে
পঙ্ক হোক
যজ্ঞ টীকা পর শিরে
কর ভূলোক
শান্তি বারি শীতল ডুবে যাক্ রবি।

ধরণী তার চক্ষে পরুক প্রেমাঞ্জন
তটিনী তার বক্ষে ধরুক রোমাঞ্চন
সংজ্ঞা আয়—আয় ছায়া
আয় রে আয়
মরীচিকা— দিঙ্মায়া
ঐ লুকায়
বৈশাখী তার সঙ্গে আনুক প্রভঞ্জন।

৬-১১-১৯২৭

রজনীগন্ধা

জন্মান্তরে ছিলে তুমি পুষ্পবতী রাজার নন্দিনী
জাতিস্মর ফুল ! গর্বিত বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গিভরে
গজদন্ত পালঙ্কের কেন্দ্রাসীনা, স্ফুট বিম্বাধরে ;
সোনার সন্ধ্যায় বেণী বিনাইত রূপসী বন্দিনী ।

শ্বেতচন্দনের চিহ্ন আঁকি লয়ে চারু পয়োধরে
আয়ত নয়ন তটে টানিয়া কজ্জল তনুলেখা
নিতম্বে দুলায়ে দিয়ে মুক্তাময়ী মেখলার রেখা
দাঁড়াইতে মেঘমুক্ত চন্দ্রকরে প্রাসাদশিখরে ।

আজি তুমি দিবালোকে দাঁড়াও সলজ্জ অভিমানে
সঙ্কুচিত নতমুখে মুদিয়া কাতর আঁখি দুটি ;
সন্ধ্যায় মেঘের ছায়া সুরভি নিঃশ্বাস তব আনে
মর্মের নিগূঢ় কথা—আধ ব্যথা আধেক ভ্রূকুটি ।
বর্ষার প্লাবনে তব মুছে গেছে চোখের কজ্জল
অভিমানে মিশে গেছে অশ্রুর সজল পরিমল ।

১০-৮-১৯২৭

চন্দ্রমল্লিকা

দেবশিশু মুঠি খুলে ডাকিল রে—আয় চাঁদ আয় ।
মরাল বাঁকা যে গ্রীবা ভেসে গেল মানস সরসে ;
কাঁচলি পড়িল খসি অপ্সরীর ফুটন্ত উরসে
ঝরিল হাসির মুক্তা শিশুমুখে প্রভাত বেলায় ।
ললাটে পরিল চাঁদ কনকের টীকা
হেরিয়া আপন মুখ হাসিল মল্লিকা।

৮-১২-১৯২৭

সুপ্তা

ঘুমে অলসা
আঁচল খসা
নীবি বিবশা
কাঁচল খোলা,

হৃদি সরসে
শ্বাস পরশে
দোহল রভসে
রাতুল দোলা।

রাঙা কপোলে
আনার ফলে
অধরে দোলে
আনার কলি,
ভুরু যুগলে
নয়ন কোলে
কালো কজ্জলে
আলো বিজলী।

বেণী ভিতরে
থরে বিথরে
ফোটে নিথরে
বেলি চামেলি।

ডাকে মধুরে
উষা অদূরে
জাগো বধূরে
আঁখিয়া মেলি।

জেগোনা বালা
নিশীথ-আলা
জাগে নিরালা
রূপের বাতি।

জাগিছে কবি
রূপের ছবি
হৃদয়ে লভি
দিবস রাতি।

২৩-১২-১৯২৮

রুদ্ররূপ

(মালিনী ছন্দে)

ধেয়ে চলে আসে অন্ধ মেঘ
অন্ধকার ভূলোক ব্যোম,
তৃণদলে বহে ছন্দ বেগ
লুপ্ততেজ সূর্য সোম।
শনশনি মহাঝঞ্ঝাবাত
ঐ আসে ঐ আসে
বিজলি ঝলকে অকস্মাৎ—
দিন পলায় নৈরাশে।
বাজে ডিমি ডিমি ডমরু কার—
শোন রে শোন বজ্রনাদ
দশ দিশিভরি গমক তার—
রুদ্র তাল! রুদ্র ছাঁদ।
একি রণভেরী শৃঙ্গরব
বাজ্‌ল আজ ডঙ্ক রে—
করিছে কি মহামহোৎসব
প্রমথকুল শঙ্ক রে?
আলুথালু গজচর্মচীর
তাণ্ডবের উল্লাসে
ঝরিয়া পড়িল জাহ্নবীর
উৎসনীর চৌপাশে।
ঝাপটিয়া উড়ে ক্রৌঞ্চপাল
মুণ্ডমালা কণ্ঠে তাঁর।
ত্রিনয়নশিখা দীপ্ত ভাল
নাশে ভয়াল অন্ধকার।
—একি অপরূপ রূপ তোমার
দেখালে আজ ধূর্জটি
কোপানলে হল লুপ্ত মার
কাটে মায়ার কুজ্ঝটি।

২৭-১-১৯৩০

বঁধুরে

বঁধুরে—বঁধুরে
বাঁশী দরদী ডাকে মধুরে।
রাতি পোহায়
সখি লো হায়
মাথা নোয়ায়
দুখে বিধুরে
বঁধুরে—বঁধুরে!
জাগে স্মরণে কাজল দিঠি
বাজে শ্রবণে নূপুর মিঠি
বাঁশী পিয়াসী কাঁদে শুধুরে—
'বঁধুরে! বঁধুরে—'!

৩১-১-১৯৩০

সনেট

॥ ১ ॥

আমার অন্তরে সখি দুরন্ত কপাট
ঘুরিতেছে অহর্নিশ তোমারে ঘেরিয়া।
দূর হতে সশঙ্কিত তাহারে হেরিয়া
রুদ্ধ করে দাও তুমি মনের কবাট।

কদর্য রাক্ষসটারে করিব লোপাট
মনে করি, কিন্তু হায় আমি ক্ষুদ্র নর,
নিজেই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি নিরন্তর
কি জানি কখন করে অকর্ম অপাট।

এটারে লইয়া বড় হয়েছে মুস্কিল
লজ্জায় পারিনা যেতে তোমার নিকট
সর্বদা ফিরিছে সঙ্গে, ছাড়ে নাক' তিল
মাংসলোভী বুভুক্ষিত রাক্ষস বিকট।
মন যদি নাহি পাই—ওই দেহ প্রিয়া
পারিব না দিতে আমি রাক্ষসে সঁপিয়া।

২২-৬-১৯৩০

॥ ২ ॥

কিন্তু একথা সখি থাকিয়া থাকিয়া
বিদ্যুৎ চুমকসম জাগিছে এ চিতে—
কি জানি তোমারো যদি কাঁচা বুকটিতে
সূর্পনখা বসে থাকে বদন ঢাকিয়া।

এমনি মনের গায়ে কর্দম মাখিয়া
ভাবি মনে তুমিও বা আমার মতন
দেহের ক্ষুধায় খিন্ন, ক্ষুদ্র আয়তন
মন দূরে নাহি যায় দেহেরে রাখিয়া।

আমি বলি এসকল মিথ্যা আলোচনা।
রাক্ষস-রাক্ষসী মিলে করুক যা খুশি—
তোমাতে আমাতে আজ এসো সুলোচনা
শস্য ঘরে তুলে রাখি, পড়ে থাক ভূষি।
দেহ যদি দেহ চায় নিক্ না সে তাই—
আমি যেন তোমারও মনটুকু পাই।

২৪-৬-১৯৩০

কে দিয়েছে জীবনে জড়ায়ে ?
আনন্দের কুসুম ছড়ায়ে
জীবনের পথ মোর কে ভরেছে বর্ণে গন্ধে গানে
কে দিয়েছে রূপ-তৃষা,—যাহার সন্ধানে
মৃগতৃষ্ণিকার পিছে মৃগসম ছুটি অহরহ ?
—মনে নাই কোন সে শৈশবে স্নিগ্ধ মধু গন্ধবহ
প্রথম হৃদয় মম গিয়েছিল ছুঁয়ে
অস্ফুট চেতনাটিরে রূপে রসে অভিষিক্ত করে ;
পশ্চিম দিগ্বধূ কবে নদীজলে পা দুখানি ধুয়ে
শুভ্র মেঘাঞ্চলে মুছিয়া যাবকরাগ, মরি,
বিদায় মধুর মুখে বারেক চাহিয়াছিল ফিরে।
হেসেছিল হেরি মূক অপলক মুগ্ধ শিশুটিরে।
তারপর কৈশোরে যৌবনে
বসন্তের পুষ্পবনে বর্ষার প্লাবনে
শরতের চন্দ্রহাসে হিমের শিশিরে
সেই রস সঞ্চিত হয়েছে ধীরে ধীরে
হৃদয়ের সুধাভাণ্ড ভরি।

যৌবন অপ্সরী
কামনার পাত্রে ভরি রূপের মদিরা
ধরিয়াছে ওষ্ঠে মোর ;
লালস-অধীরা
রাগদীপ্তা নায়িকার স্খলিত নিচোর
উন্মন করেছে মন রভস ইঙ্গিতে ;
নাগরীর মদালস মুদিত আঁখিতে
সঁপিয়াছি মর্মের আহুতি ;
রতির আরতি
করিয়াছি ইন্দ্রিয়ের পঞ্চদীপ যতনে জ্বালিয়া—
রূপে-রসে রসে-রূপে অনুবিদ্ধ হিয়া
হর্ষ রোমাঞ্চিত তনু অতনুর পুষ্পশর ঘাতে !
কিন্তু তবু তৃষা না মিটিল,—আনন্দ বন্যাতে
অবগাহি না এল আলস ।
রূপানন্দরস
নিত্যকাল রহিল নূতন !

কে মিটাবে এই তৃষা ? কোথা সে নন্দন
রূপ যেথা অনাহত, নিস্তরঙ্গ আনন্দ সাগর,
প্রাণ যেথা লালস বিহীন ?
সুষুপ্তি জাগর
পূর্ণ যেথা তৃপ্ত যেথা—রূপে রসে আনন্দে বিলীন ?

৫-১২-১৯৩০

কিশোরীর প্রতি

তরুণী তোর মন কোথা আজ বল্‌লো
কোন্ ঠিকানায় হৃদয়খানি উধাও ছুটে চলল !
কিসের রঙে অধর হল রাঙা ?
মন্দ মৃদু চল্‌ন ভাঙা-ভাঙা ?
লুকিয়ে বুকে হান্‌লি লো কার কঠিন ভুরু-ভল্ল ?

চাউনিটি যে যায়না ধরা—চপল চোরা দৃষ্টি !
পলকপাতে কাহার মাথে করলি সুধা বৃষ্টি ?
সরম দিয়ে রাখলি ঢেকে মন—
হাসিটি ত রইল না গোপন

লাজুক হাসি করলে সারা ভুবন মধু-মিষ্টি !

হাসিটি তোর চাহনি তোর বলছে ওলো বলছে
ধরণী তোর পায়ের তলে সুধামগন টলছে
কূলে কূলে বান ডেকেছে তোর
ভাসিয়ে দুকূল বইছে জোয়ার জোর
বুক ছাপিয়ে লাবণ্যেরই বন্যা নেচে চল্‌ছে।

এখন তবে লজ্জা কেন সরম কেন. সই লো !
না হয় আজি চরণ তলে বসন পড়ে রইল।
না হয় নিলাজ মধু সমীর এল
দুলিয়ে অলক করলে এলোমেলো
পাপিয়া তোর মনের কথা সবার কানে কইল

নয়ন কথা হাসির পিছে রাখিসনে আর শাস্ত্রী
সরল চোখে মুখ তুলে দেখ্ প্রিয়ের কমকান্তি
হাস্‌বি যদি হাস অকপট হাসি,
মুখ ফুটে বল, 'বন্ধু ভালবাসি
আকাশ জোড়া আলোর মাঝে মুক্ত করে প্রাণ

১৭-৪-১৯৩১

গ্রীষ্ম

দীর্ঘ দিন
ক্ষণিক রাত,
সাঁঝ প্রভাত
প্রসাদ হীন ;
নাই শিশির-
বিন্দু লেশ
নাই সমীর
কম্প রেশ।

আলোক আজ
উগ্র মদ
ইরম্মদ
সূর্য রাজ !
নেত্র তাঁর

রোষ-কষায়
বিশ্ব-মার
ভস্মপ্রায়।

শুষ্ক ম্লান
চূতাঙ্কুর
অশোক ক্রূর
মুহ্যমান।
চম্পকের
তীব্র বাস
মূর্ছিতের
তপ্ত শ্বাস

জীবজগৎ
স্পন্দহীন
তাপমলিন
মূর্তিবৎ।
মৌন মূক
লুপ্ত সুর
নিরুৎসুক
তৃষ্ণাতুর।

দীর্ণ বুক
ধরিত্রীর
নাইরে নীর
বিন্দুটুক।
উষ্ণা তার
অঙ্গ ছায়
তৃষ্ণা তার
প্রাণ শুকায়।
কপিশ চোখ
নীল গগন
যোগ—মগন
সপ্তলোক।
বহ্নিযাগ
হোম শিখা—
রক্ত রাগ
তার টীকা!

জল কোথায়

কই রে জল ?
কই শীতল
বাদল বায় ?
কই রে হায়
মেঘ সুনীল
তরুর ছায়
মন্দানিল ?

আয় তিমির,
আয় মোহন।
আয় গহন
শ্রাবণ-নীর
দহন তাপ
হোক রে দূর—
খোল কলাপ
নাচ ময়ূর।

২৫-৪-১৯৩১

কবি আমি

কবি আমি রূপ-চিত্রকর ! নহি দ্রষ্টা নহি ঋষি
নহি জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী বিশ্লেষণে নিপুণ পণ্ডিত,
মণীষা ময়ূখে মোর মোহমসী হবে না খণ্ডিত,
বিদ্যার বিদ্যুৎ কভু দীর্ণ করিবে না অমা-নিশি।

আমি শুধু চেয়ে দেখি বিশ্বের বিচিত্র বর্ণরূপ
শ্রবণ ভরিয়া উঠে জগতের স্পন্দিত সঙ্গীতে
গন্ধে মোর মর্মধারা উচ্ছ্বসিয়া বহে তরঙ্গিতে
পরশরভসরসে পুলকিত প্রতি রোমকূপ।

সন্ধ্যা আসে, মৌনে হাসে বঙ্কিম চাঁদের মৃদু হাসি,
দিবা আনে দৃপ্ত জ্যোতি, কৃষ্ণা-নিশি নিবিড় কালিমা,
বিজন মধ্যাহ্নে বাজে বিষাদে আপনভোলা বাঁশী,
প্রিয়ার নয়নে মোর পিরিতির নাহি পাই সীমা।
আনন্দ আতঙ্ক বুকে, শিল্পী আমি, আঁকি চিত্ররাশি
আঁখি জলে মিশাইয়া রাগরক্ত হাসির লালিমা।

১৭-৫-১৯৩১

পথিক বধূ

আঁধার মেঘময়ী রাতি।
ভবন কোনে কোনে পবন স্বনস্বনে
শয়ন শিরে নাই বাতি ;
নদীর কূলে কূলে ঢেউ সে ফুলে ফুলে
গরজি করে মাতামাতি।

গহন সুনিবিড় নিশা ;
গোপন চপলার চকিত আঁখিঠার
পথিক নাহি পায় দিশা।
দাঁড়ায়ে বাতায়নে আকুল দু'নয়নে
চাহিয়া আছে মৃগদৃশা।

হায় রে মরমের কথা !
লুকায়ে মনে মনে রাখিল সযতনে
ঢাকিয়া যার ব্যাকুলতা—
কেন সে আজি এই বরষা নিশীথেই
হানিল নিদারুণ ব্যথা।

প্রবোধ হিয়া নাহি মানে,
আজিকে তার বুকে বাদল শতমুখে
বেদনা সূচীসম হানে,
শীকর মুখে তার মুছায় বারেবার
অগুরু গুরু অভিমানে।

অশনি ডাকে ঘন ঘন
ঝরিছে অনিবার মুষল চারিধার
পবন বহে শন-শন ;
ঘাটের পদমূলে আছাড়ি ফুলে ফুলে
তটিনী ভাঙে তন-মন।

আসিবে না কি আজ কেহ ?
শয়ন রবে হায় শীতল নিরাশায়
নীরব রবে কিরে গেহ ?
নয়নে টলমল করিবে আঁখিজল
সফল নাহি হবে দেহ ?

তালের তরু শিরে শিরে
উঠিছে হাহাকার, রোদন খরধার

মেঘের হিয়া চিরে চিরে।
কেয়ার বনে কার শিথিল কেশভার
ছড়ায় ঘন সুরভিরে!

আঁধার মেঘময়ী নিশা!
পথিকবধূ ওলো, কুসুমভূষা খোলো
বাদল মিটাবে না তৃষা।
নূপুর নাচিবে না কাঁকন বাজিবে না
হায় গো হায় মৃগদৃশা।

১০-৭-১৯৩১

প্রতিগ্রাহী

তুমি যা দিলে দান
গোপন মনে মনে
ভরিল দেহ প্রাণ
পুলক শিহরণে;
হাতের দান, সে ত
দু' হাতে নিতে পারি
বুকের দান এ ত—
বুকে যে ঠেকে ভারী।
কোথায় রাখি তারে
ভাবিয়া নাহি পাই
তোমারে বারে বারে
ফিরে তা দিতে চাই;
হৃদয় খালি করে
নিবাস রচি তার
তবু সে ঝরে পড়ে
উপচি চারিধার।
ভাবিয়াছিনু মনে
চাহিয়া লব কিছু
বিনয় সুবচনে
নয়ন করি নীচু—
চুলের দুটি ফুল
হাতের রাঙা রাখী
হাসিটি অনুকূল

অথবা স্মিত আঁখি।
তুমি তা মাঙিবার
দিলেনা অবসর
স্নেহের বারিধার
ঢালিলে শির 'পর।
ফিরিতে ছিনু ম্লান
কি লব তাই খুঁজে—
অতুল দিলে দান
আমার মন বুঝে!

১০ ভাদ্র ১৩৩৮

বিরহিণীর পত্র

রইব আর কতকাল সন্ধ্যাসকাল
তোমার তরে খিল খুলিয়া?
দেখে মোব দুয়ার খোলা আপনভোলা
পাড়ার যত বুলবুলিয়া
দ্বারে মোর ধরণা লাগায
গেয়ে গান রাত্রি জাগায়
কভু মোর খিড়িকি দ্বারে শিকল নাড়ে
মনের ভুলে পথ ভুলিযা।

কাটেনা দিনগুলো আর বাজিয়ে সেতার
নবেল পড়ে হাই তুলিয়া
রজনী হয়না মধুর পরাণ বঁধুর
হাসির রঙে রঙ গুলিয়া।
চলে যায় রাত্রি দিবস
নিরালা শূন্য বিবশ
বিরহের রুদ্ধ জ্বালায় নিদ্রা পালায়
উঠেছে মোর স্তন ফুলিয়া।

তুমি কি আসবে না হায় সন্ধ্যা ঘনায়
ঘড়ির কাঁটা যায় ঝুলিয়া
রজনী হয় উতলা,—প্রাণ পুতলা
শিউরে ওঠে চুলবুলিয়া।
জনহীন ঘরটি দ্বিতল
বিছানা শূন্য শীতল

তুমি কি শুকিয়ে যাবে আগুন তাপে
দেহটি মোর তুলতুলিয়া ?

এদিকে পড়শী যত মধুব্রত
তাকিয়ে আছে জুল্‌জুলিয়া
চায় যে আমার বুকে সকৌতুকে
কাটতে সুখে ঘুলঘুলিয়া
আমিও খিন্ন কাতর
বুকে দু'মণ পাথর
তুমিও নেই যে ঘরে আবেশ ভরে
চক্ষু আমার ঢুলঢুলিয়া।

বিরহে আর কত যুগ রইবে এ বুক
তোমার তরে খিল খুলিয়া ?
শেষে কি পাড়ার লোকে প্রেমের ঝোঁকে
পড়বে ঢুলে পথ ভুলিয়া !
যদি না এসো ত্বরিত
ঝরিবে চোখের সরিৎ
এ পাড়ার তরুণগুলো ঝাঁকড়া-চুলো
গাইছে গজল নজরুলিয়া।

১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

যা কুন্দেন্দু

কুন্দ-ইন্দু তুষার-ধবলা,
শ্বেতশতদল আসন যাঁর
বরবীণা যাঁর শোভে চারু করে
শুভ্র বসন মুক্তাহার।
ব্রহ্মাকেশবশঙ্কর আদি
বন্দেন যাঁর চরণ সদা
মুছান মোদের অজ্ঞানমসী
সেই মা ভারতী আলোকপ্রদা।

২৭-১০-১৩৩৮

বাল্মীকি

যৌবনে ছিলেন কবি রসলিপ্সু রূপরত্নাকর
সৌন্দর্যের দস্যুরাজ ! আষাঢ়ের মেঘে মেঘে ফিরি
আনিতেন বিদ্যুত আহরি ; লঙ্ঘি তুঙ্গ হিম গিরি,
সিংহের নখর হতে হরিতেন গজমুক্তাবর ।

তরুণ গরুড় সম চন্দ্রপানে বিস্তারিয়া পাখা
ছিনাইয়া আনিতেন সোমসুধা অমর কাঙ্ক্ষিত
কঠিন মন্থনে তাঁর মহাসিন্ধু ক্ষুব্ধ তরঙ্গিত
সঁপিত উর্বশীরত্ন —বিশ্বের প্রেয়সী পলাতকা ।

তারপর একদিন কোথা হতে এল রামরূপী
জীর্ণজরা—তত্ত্বের সাধনে বসিলেন কবিবর
দেহ তাঁর ছাইল বল্মীকে, ক্ষুদ্র কীট চুপি চুপি
রচিল সর্বাঙ্গে তাঁর আপনার মৃত্তিকা-বিবর ।
কোটি কীট পরিপূর্ণ স্তূপ হতে আজি অবিশ্রাম
উঠে আত্মগ্লানিভরা জরামন্ত্র মরা মরা নাম ।

২৪-১১-১৩৩৮

সত্য-মিথ্যা

ওরে কবি, আর কত দিন
ছদ্মবেশে আপনারে করিবি বঞ্চনা ?
নাহি তোর সত্যনিষ্ঠা নাহি তোর অনৃতে অরুচি ;
তুই শুধু উদাসীর মত
গৈরিক বসন পরি ফিরিস সতত
দ্বারে দ্বারে লাবণ্য যাচিয়া—
রূপের ভিক্ষুক তুই রসের পিয়াসী ।
মিথ্যা আত্মপ্রবঞ্চনা ভুলি
আজি তুই ফেলিয়া দে ওই দীন হীন
কপট গৈরিক
সত্যের উত্তরী, ভূমার সঙ্ঘটি,
উলঙ্গ নির্লজ্জ প্রাণে বল্ ঊর্ধ্বস্বরে,
'মিথ্যার উদ্গাতা আমি
রসের ঋত্বিক, রূপ-পুরোহিত ।'

আজি তুই মুক্তপ্রাণে মান্—
'এ ধরারে ভালবাসি আমি
সত্যমিথ্যা নাহি জানি—
জানিতে চাহিনা ।'
সত্য কারে কহি ?
নিশিদিন কর্মে ও আলসে
ভোজন বিলাসে
জীবন যাপন করা অন্ধকীট সম
এই সত্য নাকি ?
অথবা এ জগতেরে মিথ্যা বলে জানা
মায়াময় স্বপ্নসম—
এই সত্য ?
হায় কবি, এ অবধি
পূর্ণ সত্য কে দেখেছে চোখে ?
কোটি কোটি সত্যের কণিকা
মহাকাল সাগরের তীরে উপেক্ষিত পড়ে আছে
বালুমুষ্টি সম তাহারে ধরিতে চাহি—
অঙ্গুলির ফাঁকে অলক্ষিতে ঝরে পড়ে—
শূন্য মুষ্টি শূন্য থেকে যায়
পূর্ণ নাহি দেয় ধরা ।

মহাযোগী মহাকারুণিক
দাঁড়াইয়া জগতের দৈন্যের দুয়ারে
কহিলেন—
'এ জগৎ জরামৃত্যুভরা—দুঃখময়,
দুঃখেরে নাশিতে হবে ।'
ভক্তিনম্র বিমুগ্ধ জগৎ
শুনিল সে বাণী
পরম আশ্বাস লভিল জীবন যাত্রাপথে ।
কিন্তু হায়, এই কি সম্পূর্ণ সত্য ?
বিশ্ব শুধু জরামৃত্যুভরা ?
জানিনা বুঝি না ।
দেখি চোখে—আলোছায়া বিচিত্রা ধরণী—
হাসি অশ্রু বসন্ত শিশিরে জলদে বিদ্যুতে
চলিতেছে নিত্যলীলা ।
জ্ঞানী কহে জ্ঞাননেত্র মেলি—
'আমি ব্রহ্ম, আমি সত্য শুধু
মিথ্যা এ জগত ।'—এই সত্য সনাতন ?
কেমনে জানিব ?
নাহি জানি কিছু এই মর্ত্য পৃথিবীতে—

কেহ কিছু নাহি জানে ।
যদি কোনো দিন
বসিয়া সন্ধ্যার উপকূলে
সহসা শিথিল হয় জীবনের গ্রন্থিগুলি সব,
মনে হয় শূন্য ব্যর্থ উদ্দেশ্য বিহীন
জীবনের যত দিন কাটিল রভসে
রূপানন্দ মোহে—
অলীক স্বপ্নের ঘোরে ।
ওগো কবি, করিও না শোক,
জেনো মনে সেও মিথ্যা
জগতের অন্য সব সুখের মতন ।
হাসি মুখে করিও বিদায়
অতৃপ্ত চিত্তের সেই ব্যর্থ শূন্যতারে ।

এস কবি, আজি এই নির্জন প্রদোষে
তুমি আর প্রিয়া তব বসো মুখোমুখি ।
জানো তুমি, কাল ক্রীড়া করে
বিষধর সর্পের মতন,
কখন দংশিবে নাহি জানো ।
কেন তবে মিছে এই সত্যের জিজ্ঞাসা ?
পাত্র ভরি লও আজি স্নিগ্ধ সুধারস
রূপ-প্রেয়সীর হস্ত হতে ;
বল তারে—'ভালবাসি আমি
এই সুরা—
ওই তব মুকুলিত মুখের হাসিটি,
সত্য মিথ্যা যাক রসাতলে ।
আজি মোর দেহমনপ্রাণ
তোমাদের ওই রাঙা রাজীব চরণে সঁপিলাম ।'

১৪ ফাল্গুন ১৩৩৮

বেলা যায়

হায়
বেলা যায়
বেলা যায় কবি !
পশ্চিমের ঢলিল দীপ্ত রবি ;—
নাহি আর প্রভাতের হৈম বিভা বালার্ক-সুহাস
নাহি মধ্যাহ্নের খর অগ্নিময় ময়ূখ-বিলাস ;
আসন্ন সন্ধ্যার পূর্বরাগে
কালমূর্তি জাগে
ছায়া প্রায় !
হায় !

হায়
এ ছায়ায়
ম্লান স্বপ্নবৎ
মনে হয় মূর্ছিত জগৎ।
শীতবায়ু স্পর্শে দেহ—অনাগত রাত্রির জৃম্ভন—
সরসীর কম্পহীন কালো জলে কাটে আলিম্পন,
শরবনে বহে মর্মরিয়া—
কেঁপে ওঠে হিয়া
নিরাশায় !
হায় !

হায়
হৃদি ছায়
শঙ্কায় সঙ্কোচে
কেহ নাই আঁখি জল মোছে।
মাধব-মধ্যাহ্নে যবে ফুরাইলে শক্তির ভাণ্ডার
মত্ত চঞ্চরীক সম পুষ্পে পুষ্পে করিয়া সঞ্চার
কে জানিত সম্মুখে শর্বরী ?
যৌবন-অপ্সরী
ক্লান্ত কায়—
হায় !

হায়
অসহায়
ম্লান মুখচ্ছবি
চেয়ে চেয়ে কি দেখিছ কবি ?

পশ্চাতে আসিছে যারা উল্লাসে গাহিছে আজো গান
সম্মুখ হইতে আসে মরণের অধীর আহ্বান—
দাঁড়ায়েছ তুমি মাঝখানে
শূন্য রিক্ত প্রাণে।
বেলা যায়
হায়!

২২ চৈত্র ১৩৩৮

বাঙালী চিত্রকরের প্রতি

ওগো পয়োধর-পন্থী!
তুলির খোঁচায় ছিঁড়িয়াছ তুমি
কামিনীর কটি-গ্রন্থি।
সরম-চকিতা পল্লীর বধূ—
মেলিয়াছে তার যৌবন-মধু,
পুকুরের ঘাটে উড়েছে রূপের
নগ্ন বৈজয়ন্তী!
ওগো পয়োধর-পন্থী।

কত রকমের তনু!
দেখিলে সরমে মূর্ছা যাইত
মহাসংযমী হনু।
পীন-উন্নত আয়ত নিটোল
কম্পাসে আঁকা স্তন গোল গোল,
কাঠির মতন ক্ষীণ কটি যেন
বাঁকা মন্মথ-ধনু।
কত রকমের তনু!

ভেদিয়া সিক্ত বাস
ঝলকে ছলকে উছলিয়া পড়ে
যৌবন রাশেরাশ।
আড়াল কি ঢাকা বড় কিছু নাই,
আন্দাজে সবই দেখিবারে পাই,
আলো ও ছায়ার ইঙ্গিত করে
গোপনের পরকাশ—
ভেদিয়া সিক্ত বাস।

কারেও দাও না বাদ,
হারেম হইতে গিরি, জঙ্গল—
সব ঠাঁই পাত' ফাঁদ।
ভীল-সাঁওতাল-গোয়ালার মেয়ে,
রাজার-দুলালী তব সাড়া পেয়ে
বসন খুলিয়া সরম ভুলিয়া
দেখায় তনুর ছাঁদ।
কারেও দাও না বাদ!

হে নব-দুঃশাসন!
নিখিল-নারীর বসন কাড়িতে
করেছ কি সখা পণ?
তাই যদি সাধ অন্তর মাঝে,
তবে আর কেন? লেগে যাও কাজে—
আপন ঘরের দ্রৌপদীটিরে
আগে করো বিবসন,
হে নব-দুঃশাসন!

বাঙ্গালীর সন্তান
পাঠশালা থেকে শুরু করে দেয়
পয়োধর-সন্ধান।
যে-ছবিতে খাসা 'উচ কুচ' নাই,
সে-ছবি আঁকিয়া কি হইবে ছাই?
এমন ছবিতে বাড়ে কি কখনো
শিল্পীর সম্মান?
বাঙালীর সন্তান!

মোরা মনে মানি ভয়—
নগ্নপুরুষ আঁকিতে তোমার
অভিলাষ পাছে হয়!
অস্থির বড় শিল্পীর মন!
কিবা মতি হয় কি জানি কখন্—
দিতে শুরু করো পুরুষ-দেহের
ঘনিষ্ঠ পরিচয়!
মোরা মনে মানি ভয়!

ওগো পয়োধর-পন্থী!
বেপরোয়া হয়ে ছিঁড়িয়াছ তুমি
কামিনীর কটিগ্রন্থি।
মেলিয়া ধরেছ কঞ্চুকী আর
গুরু-নিতম্ব-শোভা-সম্ভার,

ছানিয়া তুলেছ নব-উর্বশী
রস-সমুদ্র মন্থি'—
ওগো পয়োধর-পন্থী !

১৩৩৮

পেশা পরিবর্তন

অস্ট্রেলিয়ান্ বুমেরাং ছোঁড়া শিখি,
নবীন লেখক আমি,
রচনা পাঠাই সম্পাদকের কাছে
ফিরে আসে পুনরায়—
বাঁকা বুমেরাং ঠিক।
আবার পাঠাই লেখা
আবার ফিরিয়া আসে—
হাত পাকিয়াছে বুমেরাং নিক্ষেপে !

পাঠাই কবিতা লিখে—
—প্রেম-পিচ্ছিল চুমু-চট্‌চটে লেখা—
সেও ফিরে চলে আসে
সম্পাদকেরে করিয়া প্রদক্ষিণ।
গল্প লিখিয়া লালসায় জরজর
লালা-নিষিক্ত পণ্যনারীর জীবনের খুঁটিনাটি—
ভাবি এইবার কাবু করিয়াছি শেষে
নিরেট সম্পাদকে।
সম্পাদকের ঝামা-কর্কশ প্রাণে
গল্পের রস পশে না একেবারে—
গল্প ফিরিয়া আসে
নীড়-প্রত্যাশী ডানা-ভাঙা পাখি সম।
লিখিয়া লিখিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ি ;
ওরে ও সম্পাদক,
কিছুতেই তুই ঘায়েল হবিনা কিরে ?
শেষে একদিন নেহাৎ বেজার হয়ে
এগারো ইঞ্চি থান ইট একখানা
নিক্ষেপ করি সম্পাদকের শিরে।

সাবাস ! কম্ম ফতে !
এগারো ইঞ্চি ফিরিয়া আসেনা আর।

এ ত বুমেরাং নয়,
গল্পও নয়—নয় কবিতার খাতা !
একটি ইটের সবেগ সঞ্চালনে
সাবাড় সম্পাদক !

বুঝিয়াছি নিঃযশ
ইট ঢের ভাল গল্প কবিতা হতে।
সাহিত্য সেবা ছেড়ে
ধরিব এবার গুণ্ডামি-করা পেশা—
নাম হবে—কালু সেখ !

বড় হওয়া

খোকা বলে, 'বাবা, কবে আমি বড় হব ?
তোমার মতন গোঁফ দাড়ি হবে মুখে ?'
মনে মনে হাসি' কহিলাম মনে মনে—
গোঁফ-দাড়ি হলে বড় হওয়া যদি যেত—
পৃথিবীতে তবে বড়র অভাব কোথা ?
গোঁফে ও দাড়িতে জঙ্গল হল দেশ—
কাঁচা গোঁফ দাড়ি পেকে হয়ে গেল সাদা—
কিন্তু তবুও হায়রে পৃথিবী খুঁজে
'বড়'র দেখা ত পেলাম না কোনোখানে।

বৌ কথা কও

বৌ কথা কও ! বৌ কথা কও !
কেন অকারণ মন ব্যথা সও।
মধু-প্রভাতে তুমি যাহা রও
বৌ কথা কও ! বৌ কথা কও।

মৃদু সমীরে দুলে লতা রে
অলি সরোজে খুঁজে কথা রে

রাঙা কপোলে হাসি এঁকে লও
বৌ কথা কও ! বৌ কথা কও !

নখলিখাটি আঁকা পলাশে,
কলি-চামেলি শশিকলা সে !
কেন লুকায়ে বুকে তৃষা বও !
বৌ কথা কও ! বৌ কথা কও !

পিউ পিওরে—পিউ পিওরে !
ডাকে পাপিয়া তরু-শিয়রে,
তুমি কি হেতু আঁখি মুদে রও
বৌ কথা কও ! বৌ কথা কও !

মন-প্রসূনে-মধু ভরা সে—
তবু রহিলে ভয়ে তরাসে ?
কেন নিরাশে অবনতা হও
বৌ কথা কও ! বৌ কথা কও !

কহে কোয়েলী কুহু কুহু রে—
প্রেম বিষাদে কাঁদে ঘুঘু রে !
বঁধূ সমীপে,—তুমি একা নও
বৌ কথা কও ! বৌ কথা কও !

যদি নিশীথে চিতে ক্ষুধা রয়
শশি-কুহেলি প্রেমসুধা বয়
স্মিত-সুহাসে প্রিয় সকাশে
বৌ কথা কও ! বৌ কথা কও !

৮ বৈশাখ ১৩৩৯

রাতপরী গো রাতপরী
ওড়না তোমার উড়ল নভে তারায় খচা উত্তরী
চাঁদের কোণা সীমন্তে
দুলিয়ে দিলে দিগন্তে
কটিতে কালপুরুষ, বুকে সপ্তঋষির সাতনরী
রাতপরী গো রাতপরী !

রাতপরী গো রাতপরী
নীলার অবতংস কানে, আঁচলটি নীলাম্বরী
কালো আঁখির ভ্রূভঙ্গে
আঁধার নাচে তরঙ্গে
বসন ঘিরে চুমকি জ্বলে খদ্যোতিকার রূপ ধরি
রাতপরী গো রাতপরী !

রাতপরী গো রাতপরী
অভিসারে চল্লে বুঝি ঝিল্লী নূপুর গুঞ্জরি ?
কোন জনহীন বনান্তে
ত্রিভুবনের অজানতে
আসবে তোমার অরূপ নাগর তিমির নদী সন্তরি
রাতপরী গো রাতপরী !

রাতপরী গো রাতপরী
নীলোৎপলের নীলপরিমল নীলনয়না অপ্সরী
শ্যামল তব শ্রীঅঙ্গে
যমুনা বয় বিভঙ্গে
কৃষ্ণসারের কস্তুরী গো কালাগুরুর মঞ্জরী
রাতপরী গো রাতপরী !

রাতপরী গো রাতপরী
নিদমহালার খুললে দুয়ার কোমল করাঘাত করি
ঘুম কুহেলি অলখ্যে
লাগালে মোর দু'চক্ষে
স্বপ্নে হাসি স্বপ্নে কাঁদি স্বপনলোকে সঞ্চরি ।
রাতপরী গো রাতপরী !

২৩ বৈশাখ ১৩৩৯

চন্দ্রচূড়াঙ্গনা গিরিবর তনয়া
গণেশ জননী আয়াহি মা,
কোটি চন্দ্র সূর্য তপ্ত হিম কিরণ
কনকবরণী আয়াহি মা,
মহিষাসুর ত্রাসিনী করাল হাসিনী
রণউল্লাসিনী ভুজঙ্গমা !
মধুমাধব সুস্মিতা হিরণমসি ভূষিতা
জোতির্ময়ী সুমধ্যমা !
হরউরসশায়িনী হরহরষদায়িনী
শিব-সোহাগিনী আয়াহি মা,
চরণ যুগ লাঞ্জন কষিত কাঞ্চন—
দেহি চিত-নিকষে আয়াহি মা।

১০ আশ্বিন ১৩৩৯

নিশি-মালঞ্চ

আকাশের তারার মত মালঞ্চে মোর
ফুটল যারা সন্ধ্যাতিমির ভরে'—
ভোর না হতেই পড়বে ঝরে ঝরে।
ওদিকে ওই শিউলি ফুলের ঝাড়
চিকমিকিয়ে জ্বাললো আলো তার,
যূথীবনের শ্যামল অন্ধকার
ফুলতারকার আলোয় গেল সরে
একটুখানি তরল হল ওরে !

ফুটেছে কামিনী ফুল মালঞ্চে মোর
হাস্নুহানা আর রজনীগন্ধা—
সাগরপারের ক্যাকটাস কাকবন্ধ্যা !
সন্ধ্যামণির পাপড়ি খুলে যায়—
সাঁঝের পিদিম সেই বুঝি দেখায় ;
মল্লিকা ফুল মুখটি তুলে চায়
আকাশে তার কই নিরমল চন্দা ?
আজকে কিগো অমানিশির সন্ধ্যা ?

রজনী ঘনিয়ে আসে, মালঞ্চে মোর
বাসর জাগে রাত-জাগুনি বেলি !
কুমুদ করে একলা জল-কেলি !
ভোমরা ঘুমায় কমলমণির বুকে
মৌমাছিরা বেড়ায় না ফুল শুঁকে
প্রজাপতি ওড়ে না কৌতুকে
রামধনু-রঙ্ হাল্কা পাখা মেলি।
রসিক-বঁধূ সবাই গেছে ফেলি।

নিশুতি নিশীথ রাতি, মালঞ্চে মোর
ফুলবধূরা করছে কানাকানি—
কি-কথা কয় কেমন করে জানি ?
নিশি-পবন চোরের মত আসে
ঘুরে বেড়ায় তাদের আশে পাশে
দেখতে যেন চায়, কারা ঐ হাসে
ঠোঁটের পরে রেখে আঙুলখানি
শুনবে যেন তাদের গুনগুনানি।

আঁধারে মুখ লুকায়ে মালঞ্চে মোর
মুখচোরা সব লাজুক ফুলের দল
ঘোমটা-আড়ে চায় দিঠি চঞ্চল।
সরম ভীরু—মরম খুলে তারা
জানে না ক' রসালাপের ধারা
অন্ধকারে গোপনে হয় হারা
প্রাণের মধু হাসির পরিমল
সরম-ভরা নরম আঁখির ছল।

জোনাকির চোখের আলো মালঞ্চে মোর
যখের মত পাহারা দেয় খালি—
ক্ষণেক তরে মুছায় অমা-কালি।
সেই জানে গো সেই জানে সব কথা
আমার ফুলের নিবিড় যত ব্যথা
শঙ্কাঢাকা প্রাণের ব্যাকুলতা
সেই জেগেছে প্রাণের শিখা জ্বালি—
অমানিশির অরূপ সে দীপালি।

প্রভাতের আলো যখন মালঞ্চে মোর
পড়বে এসে নবীন রবি করে—
ফুলগুলি মোর পড়বে ঝরে ঝরে !
সূর্যমুখী নয় যে তারা নয়

নয় যে চাঁপা নয় যে কুবলয়—
আলোয় তারা নয়ন মুদে রয়
কিম্বা করুণ পাতার মরমরে
তরুমূলে লুটায় থরে থরে।

৭ই পৌষ ১৩৩৯

ভোগের পূর্ণতা

মন চাহে ভোগ উপাদান। কিন্তু হায় ভোগ ক্ষুধা
মিটে কি বন্ধন মাঝে? গায়ে যার জড়ানো শৃঙ্খল,
প্রাণ যার অহরহ ভয়াতুর শঙ্কায় বিকল—
কেমনে ভুঞ্জিবে সেই পূর্ণপাত্র উগ্র দেবসুধা?
যে পাখি মেলিয়া ডানা আকাশে উড়িতে নাহি পারে,
নাহি জানে উর্ধ্বে কোথা নিষ্কলুষ বায়ু চলে ছুটি'
মন্দাকিনী-ধারা সম,—কৃপাদত্ত শস্যকণা খুঁটি'
লভিবে সে কোন্ সুখ রুদ্ধশ্বাস পিঞ্জর মাঝারে?
সঙ্কুচিত ক্ষুদ্র ভোগে তৃপ্তি মানে দীনাত্মা সে-জন,
যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হয়ে তবু হাসে শুধু মূঢ়মতি,
ক্ষীণ যারা বীর্যহীন পরাধীন ক্ষুদ্রসুখব্রতী
উচ্ছিষ্ট কদন্ন গ্রাসি' শান্তি লভে তাহাদের মন্।
শুদ্ধ মুক্ত ভোগ চাই,—অশঙ্কিত আনন্দের ডালি—
মহাকাল বক্ষপরে নাচে যথা উলঙ্গিনী কালী।

১০ পৌষ ১৩৩৯

প্রিয়ে ! হারু শীলে —(শেষে হারু শীলে !)
করিলে নাকি প্রেম-মণি-দানং ?
হায়রে একি ! পরাণ সখি, হারুকে গিয়ে শেষকালে
করালে সুখকমলমধু পানং !

সত্য যদি চটিয়াছিলে আমার পরে মানময়ী
দিলে না কেন বচনশরাঘাতং
শুনিলে গুটিকয়েক তব ধারালো বাণী শান্‌ময়ী
তখনি সখি হতাম আমি কাতং।

অথবা যদি কণ্ঠে মম ঘটাতে ভুজবন্ধনং
বসাতে খর-নখর ক্ষত গণ্ডে গো
অমিয় হ্রদে পরাণ মম করিত শুধু সন্তরণ্
স্বর্গসুখ পেতাম তদ্দণ্ডে গো।

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি লোহু-চুসনং
ত্বমসি মম পিরিতি-রতি সঙ্গিনী
করিলে কিনা আমায় ছেড়ে হারুর ঘরে ঘুষণং
ছি ছি ছি ! তুমি কেমন রস-রঙ্গিনী।

হারুটা অতি বেয়াড়া ছোঁড়া ফচ্‌কে পাজি চ্যাংড়া গে
তাহার 'পরে দারুণ দারু-খোরং—
দু'দিন পরে খেদায়ে দিবে হাসিয়া পিঠে খ্যাংরা গো
তখন হবে বিপদ অতি ঘোরং।

এখনো বলি, ফিরিয়া এসো আমার কাছে মানময়ী
হারুর মুখে মারিয়া পদ-পল্লবং
দুপুর রাতে শোনাব নিতি গজলগীতি তানময়ী
আবার হব তোমার হৃদি-বল্লভং।

৪-১২-১৯৩২

সাপ ও ব্যাং

সাপের মাথায় লাথি মেরে গেল ব্যাং
অবাক হইয়া দেখিলাম চেয়ে চেয়ে
পণ্ডিচারীর কর্তাভজার গ্যাং
শোধ তুলে নিল কর্তার নাম গেয়ে !
মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল বিনয় বাণী—
'বৈষ্ণব মোরা সুনীচ নিরভিমানী ;
প্রভুরে সুমুখে রাখি
মোরা পশ্চাতে থাকি ;
আর ঢিল ছুঁড়ি তাদের লক্ষ্য করে
যাদের সুমুখে যাইতে পারি না ডরে ।'

১৯ আশ্বিন ১৩৪১

দধি-মন্থন

একেলা সকাল বেলা
আপন মনে মইছ দই ।
পুছিনু—কি নাম তোমার ?
হাসছো শুধু—কইছ কই ?
গালেতে ঘোলের ছিটে
হাসি তাই বড় মিঠে ;
বুকেতে ঘামের ফোঁটা
মোতির মালা—বইছ ওই !
থাক্ না—বাড়ে বেলা—রেখে দাও
দধি-মথন ;
মেখলার নৃত্য-তালে হয় হোক
যতি পতন ।
আবার ঐ মিষ্টি হাসি !
তৃষা যে ফেল্‌ল নাশি'
তবে আর দধি-মথন
দুঃখ কেন সইছ সই !

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১

রাস্তা দিয়ে যেতে

রাস্তা দিয়ে যেতে
পড়ল চোখে বাসন্তী রং শাড়ি !
মন যে গেল মেতে—
পিছু নিলাম লজ্জা সরম ছাড়ি ।
ভাবনু মনে মনে—
পথের মাঝে, ওগো পরাণ-সখি,
আজকে শুভক্ষণে
তোমার সাথে করব চোখাচোখি ।
এগিয়ে চলি যতই
ততই দেখি নিতম্বটির নাচন ;
দুল্‌ছে বেশি স্বতঃই—
আজকে দেখি শক্ত হবে বাঁচন ।
না জানি ঐ মুখ
কেমন ধারা—কেমনতর হাসি !
প্রাণ করে · লুক্‌পুক্‌,
চালিয়ে চরণ হলাম পাশাপাশি ।
বাঁকিয়ে গলা আধা
চাইলে ফিরে ওগো নারী-রতন !
লাগল চোখে ধাঁধা—
মুখখানি ঠিক কোলা ব্যাঙের মতন ।
তার উপরে আবার
হাসলে যখন দন্ত নিকাশিয়া—
নামটি স্মরি বাবার
ছুট্টে আমি পালিয়ে গেনু প্রিয়া !!

১১ আষাঢ় ১৩৪১

দুটি চিত্র

শীতের দুপুর—রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠ,
ক্রিকেট খেলিছে বড় বড় দুই দল ।
সবুজ ঘাসের পরে
সাদা বেশ পরা খেলোয়াড় জন তের
দুজন আম্পায়ার,

মাঠটি ঘিরিয়া হাজার হাজার লোক
দেখিতেছে আঁখি মেলে।
কোনো ত্বরা নাই, খেলা চলিতেছে আয়াসহীন—
বল লোফালুফি, কখনো নিপুণ কাট্,
কখনো বাউন্ডারি।
কেহ বা হঠাৎ আউট হইয়া ধীর পদে চলে যায়,
অন্য প্লেয়ার আসে।
মনে হয় যেন, সত্যিই এটা খেলা—
নিপুণতা আর স্বচ্ছন্দতা মিলে
আমোদ করিছে শীতের মধুর রোদে—
বিদ্বেষ নাই—নাই রূঢ় রেষারেষি।

বিজন ঘরের কোণে
দুটি লোক বসে একমনে খেলে দাবা।
মুখে কথা নাই—স্থির নিশ্চল দেহ,
এ উহার পানে চাহিছে না চোখ তুলে,
ছকের উপর বদ্ধ দু'জোড়া আঁখি।
কভু একজন সহসা বাড়ায়ে হাত
টিপিয়া দিতেছে একটা বড়ে কি বল।
তারপর সব স্থির।
আবার খানিক পরে
'কিস্তি' বলিয়া গাঢ় ভাঙা ভাঙা স্বরে
দাবা বাড়াইয়া দিতেছে অন্যজন।
রুদ্ধশ্বাস ক্ষণতরে দুজনেই।
দেখে মনে হয় মোর
সর্ব অঙ্গে আখড়ার মাটি মাখা
দুইটা মল্ল সাপটি পরস্পরে
মরণান্তক কুস্তি লড়িছে যেন।

২৬ আষাঢ় ১৩৪১

বিধু'র রোমান্স

বিধু মোক্তার
দোকান খুলেছে এক পান-দোক্তার !
আমি কহিলাম—
'পানের দোকান শেষে—আরে রাম রাম
সে কহিল—'ভাই—

মোক্তারি করা আর পোষায় না ছাই !
তাহার কারণ
উহাতে হয় না আর জীবন ধারণ ।'
কহিনু আবার—
'দোকান দিলি না কেন কাপড় জামার ?'
শুনিয়া বিধুর
বদন সরোজ হল সরমে সিঁদূর !
ধীরে ধীরে কয়—
'তাহারো কারণ মোর আছে কতিপয় ।
প্রেয়সী আমার—
ঐ যে দোকান করে ঘুগনিদানার ।'
বিধু মোক্তার
কহিল কাহিনী তার—কি চমৎকার !
ফেলি নিশ্বাস
কহিল—'না দেখে নাহি হয় বিশ্বাস ।
প্রেয়সী আমার
নারী নয়—আসল সে কাবুলী আনার !
কাবুলী আনার
তবুও দোকান করে ঘুগনিদানার ।
হাসি মুখ তার
মনে হয় সারি যেন গজ-মুক্তার ।
কালো চোখ তার !
ঠোঁট দুটি রাঙা রাঙা পানদোক্তায়,
দেখে একবার
মিটল না সাধ তারে ফিরে দেখবার ।
ঘুরে ফিরে যাই
ঘুগনি ফুলুরি খালি কিনে কিনে খাই ।
হয় অম্বল
তবুও ঘুগনিদানা মোর সম্বল ।
করিল ঘায়েল
মুচকি হাসিটি আর বাদামের তেল ।
শেষে একদিন
কহিনু—'ঘুগনি খেয়ে তনু হল ক্ষীণ—
তবুও তোমার
মন কি পাব না ধনি ? আমি মোক্তার ।'
হাসির লহর
কানেতে ঢালিল মোর তীব্র জহর ।
সুন্দরী কয়—
'পানের দোকান ঢের ভাল মহাশয় ।
কর যদি তাই

বাঁচিবে দিনের শেষে আনা দু-আড়াই
করিলে যতন—
আখেরে মিলিতে পারে রমণীরতন ।'

তাই শেষটায়
খুলেছি দোকান এই বহু চেষ্টায় ।
প্রেয়সীর সাথ
মুখোমুখি বসে থাকি সারা দিনরাত—
জমিতেছে ভাব
দোকানেও কিছু কিছু হইতেছে লাভ ।
রয়েছি আশায়
প্রেয়সী ডাকিবে কবে চোখ-ইসারায় ।
এখন কেবল
দোকানের মাল করি অদল বদল ।
সারা দিনমান
ঘুগনি চিবাই আমি—সে চিবায় পান ।

২৭ আষাঢ় ১৩৪১

হিত-উপদেশ

বন্ধু, আমার হিত-উপদেশ শোনো—
যত খুশি ভালবাসো মেয়ে-মানুষেরে;
তাহারে ঘিরিয়া কল্পনা জাল বোনো
কোনো ক্ষতি নাই, হাসিব তোমারে হেরে
অলক্ত-লেখা বুকের রক্ত-রাগে
এঁকে দিতে চাও—মানা আমি করিব না ;
রাঙা কর তারে ফাল্গুনী ফাগে ফাগে
অঙ্গে জড়াও কঞ্চুকি জরী-বোনা ।

কিন্তু, বন্ধু, মোহের চশমা খুলে
সাদা চোখে কভু চেয়োনা নারীর পানে
প্রাণ-পালঙ্ক হতে তুলে মন-ভুলে
রাখিও না ঘর-করনার মাঝখানে ।
জীবনের স্বাদ তিতা হয়ে যাবে মুখে
মোহের মহিমা যেদিন যাইবে চুকে ।

৫ শ্রাবণ ১৩৪১

দুর্জয় মান

[শ্রীশ্রীপদ কোকনদ নামক যে পদ-সংগ্রহের পুঁথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে নিম্নোদ্ধৃত পদটি পাওয়া যায়। পদে কোন ভণিতা না থাকায় রচয়িতার নাম জানা যায় না। এ বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন। কেহ কেহ মনে করেন ইহা গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা। আমাদের কিন্তু সন্দেহ হয়, কোনও অবাচীন কবি প্রাচীন পুঁথির মধ্যে এই পদটি প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন ; কারণ কার্যকলাপ সম্পূর্ণ আধুনিক ধরনের। বিশেষজ্ঞদিগের মতামত আহ্বান করিতেছি।]

সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি —

মান ভরে যব কোপিনী সুন্দরী
করে ধরি টানল কাণ।
বিষম টানে মঝু কর্ণে হুতাশন
রহত কি যাত পরাণ ॥
কহিলুঁ বিনয় করি কাণ ছাড় ধনি
অতি সঙ্কট মম হাল।
রোখে উঠিয়া তব কেশ ধরি মঝু
আঁচড়ি দেয়ল গাল ॥
ধনি ধনি অব তুহুঁ রাখহ প্রাণ।
কোপ শরে তব তনু অতি জরজর
গাল ভৈল খান খান ॥
মিনতি করলুঁ হাম রোই রোই যত
পাথর দ্রব ভৈ যাই।
তবহুঁ সো রাই বিনয় নহি মানল
লোহিত-লোচনে চাই ॥
নিকটে যাই যব কর দুহুঁ ধারই
চাহিলুঁ টুটইতে মান।
নাসাপর মুঝ ঘুঁষি চলাওল
দারুণ বজর সমান ॥
মুণ্ড ঘুরি হম পড়লুঁ চরণ তলে
নয়নে হেরি আঁধিয়ার।
তবহুঁ সো কোপ— কঠিন-হিয় নাগরি
মোহে ন করল পিয়ার ॥
চরণ ধরিতে যব কর পরসারলুঁ
নিতম্বে মারল লাথি।
কুঞ্জ তেজি হম দ্রুতগতি ভাগলুঁ

আগ ভয়ে জনু হাতী ॥
এ সখি শুন শুন হম না যাব পুন
সো ধনি রণ-চামুণ্ডা ।
প্রেম হুতাশনে জীবন সংশয়
দেহ ভেল মঝু গুণ্ডা ॥
ব্রজ গোকুল অব ছোড়ি চললুঁ হম
চলি যাওব মধুপুরে ।
জীবন যৌবন অভয়ে ডারি দিব
কুবুজিক চরণ-নূপুরে ॥

১৮ ভাদ্র ১৩৪১

কাগজের ফুল

আমার বাগানে নাই তাজা ফুল, তাই
রচি বসে কাগজের ফুল
সুরভি করিতে তারে এসেন্স মিশাই
তবু কেউ করিও না ভুল ।
কাগজের ফুল এরা এইটুকু বুঝে
বিচার করিও মনোমত
সুন্দর লাগে যদি তোমাদের চোখে
সার্থক হবে মনোরথ ।

১৯ বৈশাখ ১৩৪২

সাবান-নীতি

মুসোলিনী কহিলেন, 'হাব্‌সীর বগলে যা গন্ধ
সাবান মাখাতে হবে তাকে ।'
হাব্‌সী কাঁদিয়া কয়, 'বগলে কি লাভ, কহ বন্ধু
গন্ধই যদি নাহি থাকে ?'
দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিম বাজিয়া উঠিল রণবাদ্য,
হুঙ্কারে কামারের বাচ্চা,—
'সাবান মাখিবি নারে ! দ্যাখ তবে করি তোর শ্রাদ্ধ
দাঁড়া তবে বর্বর ! আচ্ছা !'

সুসভ্য দেশ যত করতালি দিয়ে কয়—'বাহবা !
মুসোর বুদ্ধি বড় ধারালো
সাবান তাদের কালো বগলেতে লাগে যদি নাও বা
হাব্‌সীরা স্বাধীনতা হারালো ।'

জমিদার হাবু রায় দেখে শুনে হাসিলেন মুচকি
ফন্দিটা নয় ত হে মন্দ !
শিবু মোড়লের বৌ—বৌ নয়—যৌবন-বুঁচকি !
রূপ দেখে চোখে লাগে ধন্দ ।
শিবুটা কাটায় দিন বলদের লাঙ্গুল ধরিয়া,
বৌকে সাবান কেবা দিচ্ছে ?
অতএব হাবু রায় বৌটিরে আনিলেন হরিয়া
সাবান মাখানো শুধু ইচ্ছে !

৯ শ্রাবণ ১৩৪২

মৃন্ময়ী

ধরিয়া খোকার কান
তর্জন করি খোকার জননী বলে—
বজ্জাত ছেলে, খালি ধুলো নিয়ে খেলা !
চলত তোমায় এখনি নাইয়ে দেব ।
চিৎকার করে খোকা কাঁদে আর কহে—
ধুলো নিয়ে খেলা খেলতে যে ভাল লাগে !
—হায়, খোকা মোর তিন বছরের ছেলে !
ধূলা-মাখা দেহ কোলেতে তুলিয়া লয়ে
জিজ্ঞাসা করি—বল ত খোকন মণি,
ধুলো নিয়ে খেলা কেন এত ভাল লাগে ?
খোকা কাঁদে খালি, কারণ ত জানে না সে ।
অনেক কষ্টে থামাই কান্না তার ।
মা এসে তাহার ধোয়ায় হাত পা মাথা
আর বলে—তুমি ছেলের মাথাটি খেলে ।
আমি বলি—খোকা, শুনছ ত মা'র কথা ;
কখ্‌খনো আর খেলো নাকো মাটি নিয়ে ।

মিনিট পনের পরে
খোকা কোথা গেল খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি—

হায় হতোস্মি ! আবার বাগানে গিয়ে
বসিয়াছে খোকা ধূলির স্তূপের মাঝে ।
মুখে মাখিয়াছে বুকে মাখিয়াছে ধূলি
মুঠি মুঠি মাটি মাথায় দিতেছে তুলে !
স্তব্ধ হইয়া ভাবি
মৃন্ময়ি, তব একি এ নিবিড় মায়া ?
এতটুকু শিশু, তারো কচি বুকখানি
ভরিয়া দিয়াছ তোমার গহন প্রেমে ?

মিল

১ । ঠাট্টার সাথে গাঁট্টা ত বেশ মেলে
চোট্টার সাথে খোট্টার গলাগলি ;
বোতল বগলে দোতলায় উঠে গেলে
ব্র্যান্ডি ও demi-mondeতে ঢলাঢলি ।

২ । সঙ্গীতে মুখভঙ্গী থাকাই চাই
অবলা বিহীন তবলা নেহাৎ বাজে ;
সারঙ্গীতে কি নারঙ্গী-রস নাই ?
আঙুরের পায়ে ঘুঙুর মধুর বাজে ।

৩ । 'মারলে' বেবাক সারলে ত দেশটাকে
গার্বো বলিছে—'সারবো একটু দাঁড়া ।'
কাননবালার আননের মৌচাকে
ছোকরা-ফৌজ মৌজ খুঁজিয়া সারা ।

৪ । পল্‌কা নৃত্যে চল্‌কায় নারী দেহ
বল্‌কা রসের ফেনা উপচিয়া যায়
ঠমক দেখায়ে চমক লাগায় কেহ,
কঞ্চুলী কারো মন-চুরি করে হায় ।

৫ । ঢাকুরেয় যত নেই-আঁকুড়ের দল
রূপ-পাথারেতে কাটিছে ডুব-সাঁতার ;
বালিগঞ্জের কেলিকুঞ্জের ফল
যে-খেয়েছে তার পতন দুনির্বার ।

৬। ফ্রয়েডের যত বয়েদ নিয়েছি শিখে
লিবিডোর কাছে বাঁধা আছে সব টিকি,
যৌন-যন্ত্র চালায় জগৎটিকে—
গৌণ ত নয়, বাহিরে সে মৌনী কি ?

৭। রবীন্দ্রে মোরা কবীন্দ্র বলি কেন ?
মিলের রাজ্যে মিলিয়নেয়ার তিনি !
মিলগুলা তাঁর কিলবিল করে যেন
ঝিলমিল করে নাচে একরাশ গিনি।

৮। গুণটা গাহিতে কুণ্ঠা বড়ই হয়
নিন্দা করাটা চলে যে চিন্তা বিনা—
রসের সরসে হরষে বহে মলয়
পরশেতে নাচে প্রাণটা ধিনতাধিনা।

৯। গৃহিণীর সাথে গৃধিনী মিলাই যদি
অন্দরদ্বার বন্ধ হইয়া যাবে।
প্রেয়সীরে তাই শ্রেয়সীই সম্বোধি—
ভ্রান্তি হলেও প্রাণটি শান্তি পাবে।

১০। পুরুষের গাল বুরুষের মত কড়া
রমণী কপোল নবনী-কোমল কত ;
তবুও ত বেশ চলিতেছে প্রেমে-পড়া
মিলনের অনুশীলন অব্যাহত।

১১। মাদি ছাড়া বল সাদি করা যায় কাকে ?
আদিরস আর মাদি-রদ একই কথা।
গর্দানা-বাঁকা মদ্দারা চেয়ে থাকে
তাই ত সৃষ্টি হয়েছে পর্দাপ্রথা।

১২। যেদিকেই দেখি চলিছে মিলের তেলেনা
মিতালী মিলন মৈত্রী ও মেশামেশি,
দর্গার সাথে দুর্গা কেবল মেলেনা,
মোল্লায় ও রসগোল্লায় রেষারেষি।

১৪ পৌষ ১৩৪২

পুণ্য ফল

কৃচ্ছ্রব্রতে পুণ্য যদি বাড়ে
মোদের তবে কে বলে মহাপাপী ?
মোদের মত বল ত কার ঘাড়ে
চেপেছে বোঝা বিন্ধ্যাচল ছাপি !
কোথায় আছে এমনতর গাধা
বস্তা এত রয়েছে গাদা-গাদা ?

এসেছে মগ মারাঠি নানা জাতি
ভেঙেছে দাঁত, মেরেছে ঘুষি নাকে ;
পাঠান এসে মারিয়া পেটে লাথি,
কর্ণ দুটি মলেছে পাকে পাকে ;
মোগল দাদা হাসিয়া ফিকি ফিকি
কাটিয়া নিল সাবেক যত টিকি ।

ইংরেজেরেবলিতে নারি কিছু
সাগরপারী সাহেব জাতি সাদা
(ফিরিছে সদা পুলিস পিছু পিছু
বলিয়া কিছু কাজ কি বল দাদা !)
তাহারা শুধু উঠিয়া বসি' ঘাড়ে
মনের সুখে চরণ দুটি নাড়ে ।

মোদ্দা কথা পুণ্য হল জমা
কুতুবশাহী মিনার সম উঁচা ।
তাহার তলে মূর্তিমান ক্ষমা
সুখেই আছি নর্দমারি ছুঁচা ।
পুণ্যভারে চ্যাপটা হয়ে তবু
ধৈর্য মোরা হারাইনিকো কভু ।

কদলীপাতে খেয়েছি কচু-পোড়া
অন্যে যবে মেরেছে ননী-ছানা,
ন্যাক্‌ড়া দিয়ে ঢেকেছি তনু থোড়া
পড়শী সবে পরেছে সোনাদানা ।
নিতম্বেতে বুটের দাগা লাগে
হেসেছি তবু প্রভুর অনুরাগে ।

রাগিয়া কভু হয়েছি দিশেহারা
এমন কথা বলিতে পারে কেউ ?

রুলের গুঁতা মেরেছে পেটে যারা
তাদেরি পায়ে কেঁদেছি ভেউ ভেউ ।
কলসী-কানা মেরেছে যারা ছুঁড়ে
দিয়েছি প্রেম তাদেরি ঘুরে ঘুরে ।

স্বর্গে যাব মন্দ ইথে নাহি
মরিতে শুধু যে-কটা দিন বাকি,
তাহার পরে পুণ্য ছালা বাহি
যমদূতেরে বেবাক দিব ফাঁকি ।
এক্কেবারে হাজির হব গিয়া
ইন্দ্র-ধামে পুণ্য-ঝুলি নিয়া ।

খুলিয়া ঝুলি বলিব—"দ্যাখ দ্যাখ,
সুকৃতি কত করেছি জমা সেথা
পুণ্যফল জমেছে লাখো লাখো
এবার মজা লুটিব শুধু হেথা ।
অনেক গালি শুনেছি দাদা হুঁ হুঁ
কোকিল এবে ডাকুক কুহু কুহু ।

"অপ্সরীরা নাচুক মৃদু মৃদু,
পরিব মালা—লে আও পারিজাতে ;
বাহির কর বোতল-ভরা সীধু
ইন্দ্র, আজি তুলিব তোমা জাতে ।
উর্বশীরে আমার চাই খাস,—
মেনকা আদি খাটিবে ফরমাস ।"

অমনি যত অপ্সরীরা এসে
আমারে লয়ে করিবে কাড়াকাড়ি,
কেহবা সুধা পিয়াবে ভালবেসে
কেহবা গলা জড়াবে তাড়াতাড়ি ।
বসিয়া রব চরণ দুটি এলে
দন্তভাঙা বদনখানি মেলে ।

মৌজে কাটি' যাইবে দিবারাতি
হৌজে নামি করিব জলকেলি ;
হেথায় নাহি মারিবে কেহ লাথি
জুতার ঘায়ে ফাটাবে নাকো বেলি ।
করিয়াছিল মর্তে এসব যারা
নরক-নামা গর্তে পচে তারা ।

কুম্ভীপাকে ঘুরিছে এবে তারা

রৌরবেতে হতেছে রুটি-সেঁকা ;
এদিকে আমি লাগায়ে গোঁফে চাড়া
শচীর পানে চাউনি হানি বেঁকা ।
তাদের কথা পড়িলে মনে—হি হি—
হাসিয়া উঠি হরষে চিঁহি চিঁহি ।

নির্ভয়েতে বসিব সভা-মাঝে
ইন্দ্রে দিব উড়ায়ে মেরে তুড়ি,
চন্দ্র যদি আসিয়া বসে কাছে
তাহার দিব কানেতে সুড়সুড়ি ।
যেথায় খুশি ফেলিব পিক-থুতু
শনির পেটে লাগাব কাতুকুতু ।

গরম যবে চড়িবে কভু শিরে
উর্বশীর ঝাড়িব ঘুষি নাকে,
লেঙ্গি মারি' ফেলিব ঘৃতাচীরে
বিনুনি ধরি' টানিব মেনকাকে !
পুরুষ-রাগে হইয়া দিশাহারা
স্বর্গটারে করিব খাঁচা-ছাড়া ।

* * *

ঘাপটি মেরে রয়েছি আপাতত
মুখটি বুজে স্বর্গপানে চেয়ে ;
লাগাও জুতা কোঁৎকা লাঠি যত
একটি কথা বলিব না তা খেয়ে ।
এখন শুধু করিয়া যাব ক্ষমা
পুণ্যফল করিব খালি জমা ।

কৃচ্ছ্র করি' কালিমা-মাখা দেহে
রহিব বাঁচি' পারিব যতকাল,
তাহার পরে—তাহার পরে—হে হে
একটি কোপে করিব সবে ঘাল ।
তখন তোরা করিবি কিবা ওরে !
সুড়ুৎ করে যখন যাব মরে ?

২৪ পৌষ ১৩৪২

রাগ কোরোনা দাদা

সত্যি কথা বলব কেবল
শপথ করা মিথ্যে,
নিত্য নূতন রঙীন ফানুস
জ্বলছে আমার চিত্তে।
স্বপ্ন-ভরা দোকান আমার
ব্যবসা করি ফুর্তির,
রূপকথারই যোগান দিয়ে
করছি উদর পূর্তি।
কল্পনাতে ধোঁয়াচ্ছে স্রেফ
মিথ্যে গাদা গাদা
দোহাই তোমার—আর যা কর
রাগ কোরোনা দাদা।

রূপসীদের দেখলে পরে,
মনটা করে চুলবুল,
মনের ক্ষেতে ধান খেয়ে যায়
চটুল যত বুলবুল।
তাদের হাসি কথা এবং
কালো চোখের দৃষ্টি
নেশার মত মনের মাঝে
ঘটায় অনাসৃষ্টি।
দেখতে পেলেই আড়-নয়নে
তাকাই আধা আধা।
দোহাই তোমার—আর যা কর
রাগ কোরোনা দাদা।

পদব্রজে ঘুরে বেড়াই
জুতোর তলা ক্ষইয়ে
নেহাৎ দাদা ছাপোষা লোক
মোটর গাড়ি কৈ হে?
তাই তো যখন 'রোল্‌স' হাঁকায়
হামদো-মুখো মিন্‌ষে
মনের মধ্যে স্বতঃই জাগে
একটুখানি হিংসে।
কটমটিয়ে তাকাই, দেখি
ছিটিয়ে গেছে কাদা।
দোহাই তোমার—আর যা কর
রাগ কোরোনা দাদা।

কুৎসা শুনে হাস্য করি
প্রাণটা পরিতুষ্ট
বিশেষ যদি নারী-কেচ্ছা
প্রচার করে দুষ্ট
এবং তাতে মন্দ-মধুর
থাকে রসের গন্ধ—
রসিকতায় হই বেসামাল
আলগা নীবিবন্ধ।
আপনা হতে বেরিয়ে থাকে
দন্ত সাদা সাদা।
দোহাই তোমার—আর যা কর
রাগ কোরোনা দাদা।

দেশোদ্ধারের মিটিং করি
দেশবন্ধু পার্কে—
'স্বদেশটাকে চিবিয়ে খেলে,
সাগরপরী শার্কে—'
এমন সময় কনেস্টবল!
পালাই মেরে লম্ফ,
ঘরে ফিরে হাঁপাই—তবু
থামে না হৃৎকম্প,
রুদ্ধস্বরে বলি—'শালা
খোট্টা হারামজাদা।'
দোহাই তোমার—আর যা কর
রাগ কোরোনা দাদা।

ভাবছ তুমি, লোকটা আমি
লুচ্চা পাজী ভণ্ড
লুব্ধ ভীরু মিথ্যাবাদী—
মারবে শিরে দণ্ড?
কিন্তু দাদা তোমায় আমায়
প্রভেদ যে একচুল নাই
আমি তোমার মাসতুতো ভাই,
এতে তো আর ভুল নাই।
চেহারা ঠিক একই রকম
—নাকটি খাঁদা খাঁদা।
দোহাই তোমার—আর যা কর
রাগ কোরোনা দাদা

১৮ মাঘ ১৩৪২

গোপনপ্রিয়া

প্রিয়ারে মোর প্রথম পেলাম—এইখানে
এইখানে।
গোপন প্রিয়া—কেউ জানেনা —সেই জানে
সেই জানে।
ঝরনা যেথায় ঝর্ঝরিয়া যায় ঝরে—
ঝমর্ ঝমর্ বাজায় শিলা-পাঁয়জোরে
সেইখানে—এইখানে
প্রিয়ার সাথে গোপনমিলন—কেউ জানেনা
সেই জানে।
হঠাৎ ফিরে চমকে চাওয়া তরাসভরা
নয়না রে!
এমন কালো এত কোমল নয়ন বুঝি
হয়না রে।
অলকে তার ঝরনা-রেণু—ঝুমকো ফুলের
হার কানে।
প্রিয়ার সাথে ক্ষণিক মিলন—কেউ জানেনা
সেই জানে।
একটু হাসি একটু চমক একটু দিঠি ভঙ্গিমা
গাল দুটিতে একটুখানি বনফুলের রঙ্গিমা।
বনের পথে মিলিয়ে গেল কোন বিজনে
সেই জানে
প্রিয়ারে মোর প্রথম পেলাম—এই গোপনে
এইখানে।

১৯ মাঘ ১৩৪২

পথ চলা

পথ চলিতে
শুরু হয়েছে
সে যে কবে গো—
কোন সুদূরে
গেছে মিলায়ে
নাহি স্মরণে—
কভু একেলা

পথ বিজনে
ক্ষত চরণে,
কভু দু'জনে
কল-কূজনে
বেণু-রবে গো।

মেঘ বাদলে
কত কেঁদেছি
ঝরঝরিয়া ;
রবি দাহনে
অবগাহনে
তনু অবশে,
কম-কামলে
কত হেসেছি
নব রভসে,
হিম শিশিরে
হিয়া কেঁপেছে
থরথরিয়া।

পথ চলিতে
কভু পেয়েছি
খর তটিনী—
চল-চটুলা
কথা কয়েছে
কলকলিয়া
প্রিয়-প্রেয়সী
সম পড়েছে
গলে গলিয়া
কভু নেচেছে
কটি বাঁকায়ে
পটু নটিনী।

গিরি গহনে
কভু এসেছে
কুহু-যামিনী—
ঘন-তিমিরা
স্নেহ-নিবিড়া
কালো করুণা ;
নব-প্রভাতে
পুন হেসেছে

উষা অরুণা
—আমি চলেছি
দিবা-রজনী
—কভু থামিনি।

শুধু চলেছি—
কোথা চলেছি ?
কেবা বলিছে !
চাহি পিছনে
চলি সমুখে
দিশা হারায়ে
দেখি আকাশে
জ্বলে তারকা,—
ধ্রুব-তারা এ ?
বামে-দখিনে
আগে পিছনে
কত জ্বলিছে !

আমি চলেছি—
নাহি দিশারী,.
নাহি দিশা রে !
কোথা চলেছি ?
কারে চাহিয়া
দিন-যামিনী ?
পথ-কিনারে
মৃদু হাসিছে
ফুল-কামিনী,
তা'রা ক্ষণিকা
শুধু মিটাবে
ক্ষণ-তৃষা রে !

৫ ফাল্গুন ১৩৪২

আধুনিক-আধুনিকা

ঝগড়া অনেক করেছ হে আধুনিক
ওগো আধুনিকা, কোঁদল করেছ বহু
বাক্যের ধূমে আঁধার হল যে দিক

এ মক্-ফাইটে রাই ধৈর্যং রহু।
কপট কলহ হেরিয়া হাসিছে লোক
এ কেলেঙ্কারী এবার সাঙ্গ হোক।

ওগো আধুনিকা, তোমাদের আমি চিনি
কোপ-কটাক্ষে এ অধম ভুলিবেনা
শুনেছি বহুৎ কঙ্কণ কিণি কিণি
বচনের খোঁচা—তাও যে নেহাৎ চেনা।
মনের কথাটি যতই গোপন কর—
ভাবে ইঙ্গিতে ততই যে ধরা পড়।

জানি আমি ওই নীল নয়নের কোণে
বিদ্যুৎ আছে—বজ্র কোথায় সখি ?
ক্রোধ-বহ্নিই যদি জালিয়াছ মনে
শিখা তার কৈ ওঠেনা ত লকলকি !
বন্দুকে শুধু আওয়াজ কবিছ ফাঁকা
ভ্রূকুটির তলে হাস্যটি আছে ঢাকা।

আমি জানি, যারে মনে মনে ভালবাস
ছল ছুতা তার প্রতি পদে পদে ধর
দূরে হেরি যারে গোপনে মুচকি হাস
সে কাছে আসিলে মুখ গম্ভীর কর।
বাহিরে যতই অখ্যাতি তার গাহ।
মনে মনে তবু তাহারেই শুধু চাহ।

—আর আধুনিক, তোমারে কি আর বলি
আমিও একদা ছিলাম তোমারি মত
এখন না হয় যৌবন গেছে চলি
তবু একেবারে হই নাই তথাগত।
সত্য কথাটি বলিব হলফ্ নিয়া
তোমার মতন দেখেছি অনেক মিঞা।

খুঁত ধর যার কবিতায় নানা ছাঁদে
তারে না দেখিলে দুনিয়াটা ঠেকে ফাঁকা
তাহারি নিচোল-কবরী-আঁচল-ফাঁদে
জড়ায়ে মরিতে চাও তুমি দিন-রাকা।
লপেটায় ঘেরা ও-রাঙা চরণ দুটি
ঢেকে দিতে চাও কুঙ্কুমে মুঠি মুঠি।

তবে আর কেন মিছে এই রেষারেষি

কপট কলহ কাগজ-কলম-নাশা ?
দু'দণ্ড তরে বস দোঁহে ঘেঁষাঘেঁষি
দেখিবে তখন ভাব হয়ে যাবে খাসা।
দোষ-ত্রুটি কারো কিছু নাই—সব বাজে,
রসে টলমল হিয়া-দুটি শুধু আছে।

আধুনিক আর আধুনিকা কিছু নাই
তোমরা দু'জনে আদিম চিরন্তনী ;
আদম বাবার তুমি মাসতুত ভাই,
ঈভ্-জননীর সহোদরা তুমি ধনি।
অতএব আর ঝগড়া করিও না ক'
অভিজ্ঞ এই প্রবীণের কথা রাখ।

২ চৈত্র ১৩৪২

আগমনী

সঙ্গে যদি আনতে পার মা
দু চার বোতল খাঁটি তীব্র সোমরস
শঙ্করে ভুলায়ে, অয়ি হরমনোরমা,—
এ জোলো বাংলা দেশে জাগিবে হরষ ;
মাতাল হইয়া করিব তোমার পূজা
গিরীন্দ্র-তনুজা।
হারে রে রে রে রে করি বেড়াব ভুলিয়া দুঃখ শোক,
পরিধেয় বস্ত্রখানি বাঁধিব মস্তকে ;
—যাহা হয় হোক্—
পুলিস ধরুক কিম্বা গালি দিক ভব্য ভদ্রলোক।

এবার এন না, মাগো, গণেশ কার্তিকে
অপদার্থ পেট-মোটা টেরি কাটা সন্তান দুটিকে,
দেখিলেই অঙ্গ জ্বলে যায় ;
লক্ষ্মী আর সরস্বতী—এ দুটিও হায়
স্কুলে-পড়া যুবতীর ন্যায়
শুধু দেখিতেই ভাল—কাজের বেলায়
একেবারে অষ্টরম্ভা।
তাই বলি জগদম্বা,
এবার আনিও কতিপয়
বাছা বাছা কদাকার ভূত—

ফিচেল দুর্দান্ত পাজি দুষ্ট যেন হয় ।
আসিয়াই তারা যেন, যতেক পুরুৎ
সকলের টিকি উৎপাটিয়া,
পণ্ডিতের তিলক চাটিয়া,—
সারা বাংলা দেশ জুড়ি'
ফাঁসাইয়া মাড়ওয়ারী ভুঁড়ি,
মোল্লার ছিঁড়িয়া নূর,
আধুনিক তরুণেরে করি চানাচুর,
নাচিয়া কুঁদিয়া কাঁপাইয়া দিগ্বিদিক
একেবারে দক্ষযজ্ঞ বাধাইয়া দিক ।

থিয়েটার সিনেমায় হয়েছে অরুচি :
যত সব খেঁদি বুঁচি
হাড়গিলে শকুনির দল—
রঙ্গালয় করেছে দখল ;
তোমার ভূতের দল জুটুক সেথায়
ভৌতিক কেতায়
নাচুক বেতালা নৃত্য অসভ্য অদ্ভুত ;
দেশটারে লণ্ডভণ্ড করি
দ্রব করি যত অণ্ড, ভণ্ডদের খণ্ড খণ্ড করি
বেড়াক দুরন্ত যত ভূত !

বৃথা আশা ! মা আসিবে দেশে
সেই পুরাতন সাজে রাংতা-মোড়া বেশে,
সঙ্গে লয়ে কার্তিক গণেশে ।
আনিবে না সোমরস, আনিবে না ভূত—
জানে মাতা, মোরা আর্যসুত
অতীব নির্জীব রুগ্ন—সহিবে না পেটে
সোমরস—অকস্মাৎ যাবে পিলে ফেটে ।
ভূত দেখে হার্টফেল হবে বিলকুল
বঙ্গবীরকুল ।

অতএব এস মাগো পুরাতন বেশে
সঙ্গে লয়ে কার্তিক গণেশে,
অঙ্গে পরি মেকি সোনা ঝুটা মুক্তা পদ্মরাগমণি,
অধম সন্তান মোরা গাহি আজি তব আগমনী—
বাজাইয়া ঢাক ঢোল কাঁসি ও সানাই
পায়ে তব প্রণাম জানাই ।

প্র· কার্তিক ১৩৪৩

বটেই ত হে বটেই ত—

সংসারেতে এমন ধারা হাজার গণ্ডা ঘটেই ত।
মীর মুন্সী ফজলুমিঞা বিশহাজারি চেক কাটে
লাল বিবিকে তুরূপ করে চিড়িতনের টেক্কাতে ;
ধন-কপালে চাচা সায়েব—মন্ত্রীখেতাব পাইবে সে
খাজাপ্রজায় কাউন্সিলে নাচবে এবার রাইবেশে।
নতুন কিছু নয়ত ভায়া—নিত্যি এমন ঘটেই ত !
বটেই ত হে বটেই ত !

বটেই ত হে বটেই ত—
নীতিবাগীশ মূর্খগুলো মিথ্যে মিথ্যে চটেই ত।
সুন্দরী বৌ থাকলে ঘরে নজর দেবেই পাঁচজনে
সবাই ত আর ত্যাগ করেনি কামিনী আর কাঞ্চনে ;
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিও নয় পুরুষগুলো বাংলাতে
কাজেই শেষে বৌটিকে আর পারবে নাক সামলাতে।
বেরসিকের দল তা দেখে মিছিমিছি চটেই ত
বটেই ত হে বটেই ত !

বটেই ত হে বটেই ত—
সাধুলোকের নামেই যত মিথ্যে গুজব রটেই ত।
পাশের বাড়ির রসিকা ঝি—নামটি তাহার আহ্লাদী
ইচ্ছে হল তার সঙ্গে রসিকতায় পাল্লা দি—
একটু হাসি দুটো কথা—,অমনি যত বজ্জাতে
রটিয়ে দিলে কেচ্ছা এমন বলব না তা লজ্জাতে।
জিতেন্দ্রিয় হলেই অমন কুৎসা অনেক রটেই ত !
বটেই ত হে বটেই ত !

বটেই ত হে বটেই ত—
খুঁজলে পরে উকুন পাবে মহাদেবের জটেই ত।
বিল্বতলে বিল্লি বসে তুলসীমালা জপ করে
নেংটি ইঁদুর দেখলে পরে লাফিয়ে ধরে খপ্ করে
চোর দাগাবাজ ভক্ত-বিটেল সব শালা এই দুনিয়াতে
এক জোটেতে ঘুন ধরালে হিঁদুয়ানির বুনিয়াদে।
ভূত-পেরেতে উকুন বাছে মহাদেবের জটেই ত !
বটেই ত হে বটেই ত !

১৩৪৪

শরৎচন্দ্র

সত্যের কঠিন মাটি ভেদ করি খর শরাঘাতে
বহাইলে যে সলিল ধারা—সুবর্ণ ভৃঙ্গারে ভরা
নহে তাহা কূপোদক ; হে গাণ্ডিবী দীর্ণ বসুন্ধরা
বেদনার উৎসমুখ খুলি দিল অমৃত-বন্যাতে।

বেতসে বাজালে বংশী মৃত্তিকার গড়িলে দেবতা
পঙ্কমাঝে ফুটাইলে চন্দন চর্চিত শতদল
আকণ্ঠ করিয়া পান মৃত্যুজয়ী তীব্র হলাহল
অশ্রুতে মিশালে হাসি প্রেম সাথে প্রণয়ের ব্যথা

তোমার কুহকমন্ত্রে সত্য হল নবনী-কোমল
দুর্বল নারীর বুকে প্রেম হল কঠিন অশনি
আত্মপ্রতারণা ভুলি আপনারে চিনিনু আপনি
মিথ্যার জঞ্জালপুঞ্জে জ্বলিল তোমার নেত্রানল।
সত্যসুন্দরের রূপ দেখাইলে নয়নাভিরাম
শরতের পূর্ণচন্দ্র লহ মোর অন্তিম প্রণাম।

৭ মাঘ ১৩৪৪

বেঁচে সুখ নাই

দুনিয়ায় বেঁচে সুখ নাই
যদি হও অতি সুচরিত্র
বিবাহ করিয়া সুখে কাটাইতে চাহ যদি
জীবন পবিত্র
যত আছে পরকীয়া সকলেরে পরখিয়া
দেখিবার ইচ্ছাটি দমিয়া
গৃহিণীর প্রেমরসে ডুবিয়া আবেশভরে
কেবলি খাইতে চাও অমিয়া
দেখিবে দুদিন পরে ভাই
বয়স না হতে কুড়ি গিন্নি হয়েছে বুড়ি
কামনার আগুনের মুখে দিয়ে ছাই !
দুনিয়ায় বেঁচে সুখ নাই।

হও যদি দুরাচার লুচ্চাই

সে পথেও আছে কাঁটা পাদুকা এবং ঝাঁটা
বন্ধুজনের দুরছাই
পর যত নরকীয়া সামলাবে পরকীয়া
কাছে যায় সাধ্য কাহার
নাহি যদি মানো মানা শেষটা পুলিস থানা
অন্তিমে লাপ্‌সি আহার।
চৌদিকে শুধু কুৎসাই
ওদিকে ঘরের মাঝে ইস্তফা দিয়া কাজে
গিন্নিটি ঘনঘন যাবে মূর্ছাই
দুনিয়ায় বেঁচে সুখ নাই।

১৭ কার্তিক ১৩৪৫

স্বস্তিক

তোমারে হেরিয়াছিনু দূর হতে চিত্রপটে লিখা
ছায়া লোকময়ি! ঘনপুঞ্জীভূত বিজলীসম্ভার
লীলায়িত হয়েছিল তমোরুদ্ধ নয়নে আমার—
মেরুর আকাশপটে হিরণ্ময়ী অরোরার শিখা।
সহস্রলোচন পৃথ্বী হেরিয়াছে বিমুগ্ধ নয়নে
প্রীতির অঞ্জলি ভরি সঁপিয়াছে মস্তকে তোমার;
তুমি দূর স্বপ্নলোকে রচিয়াছ আপন আগার—
চিত্তাকাশ ছায়াপথে প্রতিভার কুসুম চয়নে।
একদিন কাছে এনু; অকস্মাৎ হল পরিচয়
স্বপ্ন হতে জাগরণে হেরিলাম নয়ন মেলিয়া
ক্ষণপ্রভা আরোরার দীপ্ত শিখা শুধু তুমি নয়
গৃহের অঙ্গনে তুমি আলো-শিশু বেড়াও খেলিয়া।
তুলসীমঞ্চের মূলে স্নিগ্ধ তুমি সন্ধ্যার প্রদীপ
সলজ্জ বধূর ভালে একবিন্দু কস্তুরীর টিপ।

১৪ পৌষ ১৩৪৫

গৌরী-মহেশ

জয় জয় গৌরী মহেশ
পিণাক বাদক চিত্ত উন্মাদক
সুরতটিনী-ধৃত-কেশ।
জয় জয় দেবি সমুজ্জ্বল-অঙ্গা
ধূর্জটি-অঙ্ক-বিলাস-বিভঙ্গা।
আদি সনাতন দম্পতি জয় জয়
অঙ্গে চন্দন লেশ।
জয় জয় গৌরী মহেশ।
সুরনর পালক ফণি-মণি মালক
চন্দ্র-ভাল বর-বেশ।
জয় জয় গৌরী মহেশ।

বাঁচিয়া থাকার দুঃসহ অপমান।
ইঁদুর লইয়া বিড়ালের খেলা যেন—
তাহারি মধ্যে কত কৌতুক হাসি!
ফাঁসীর আসামী মৃত্যুমঞ্চে উঠে
লোলুপ দৃষ্টি তাকায় নারীর পানে।
বাঁচিয়া থাকার নির্মম বিদ্রূপ!
বাঁচিয়া থাকার অর্থ কি জানে কেউ?
কিসের জন্য ভঙ্গুর দেহটারে
ব্যথার সঙ্গে নিত্য জুড়িয়া রাখা
গোদের সঙ্গে বিস্ফোটকের মত?
বাঁচিয়া থাকার নিষ্ঠুর প্রতারণা
চিন্তা করার লজ্জাবিহীন ফাঁকি!
সাগর মন্থি যে সত্য লভিয়াছ
কি তার মূল্য? সাগরের নীল জলে
কাপড় ছোপালে হবে কি নীলাম্বরী?
বাঁচিয়া থাকার দীনতা সবার বাড়া।
শতবার করে মরিয়া তবুও বাঁচা
সংশয় ভয় আশঙ্কা ভরা মন

একটু সুখের লালসায় চঞ্চল
চিরপদাহত কুকুর-ল্যাজের মত।
হায় রে মানুষ, তবু বেঁচে থাকা চাই।
কেন? কেন? মোরে বলিয়া দেবে কি কেহ?
হে বুদ্ধ, তুমি খুঁজেছিলে নির্বাণ।
কেন খুঁজেছিলে আশী বৎসর ধরে?
হাতের নাগালে বিষ কি পাওনি প্রভু।

২৬-৭-১৯৪০

পূজার চিঠি : জবাব

এল পূজা এবারে
পড়িতেছি পেপারে—
কথাটা সত্যি নাকি ভাই রে?
এদিকের আকাশে—
বাজারে কি বাতাসে
কোনো পাত্তাই তার নাই রে।

ওদিকের পুকুরে
কালো জলটুকুরে
কমল কি নির্মল করল?
রোদ হ'ল সোনালী?
খাল বিল প্রণালী
কুমুদ ও কহ্লারে ভরল?

শহর ও পাড়াগাঁয়
মেয়েদের সারা গায়
নতুন কাপড়-জামা চড়ল?
ছোটো ছেলে-মেয়ে সব
জুড়ে দিল উৎসব—
বোধনের ঢাকে কাঠি পড়ল?

মন করে ছটফট—
চ'লে যাই ঝটপট
কাজের শিকল বেড়ি ভাঙিয়া;
যত করি যাই যাই,
ট্যাঁক বলে—নাই নাই!

ট্যাঁকের চক্ষু উঠে রাঙিয়া ।

এদিকে শুনছি নাকি
পরিয়া পোশাক খাকী
শিগগিরি আসছেন শ্যামা মা
সমুদ্র-পার হতে
চাপিয়া বিমান-রথে
বাজাইয়া ডঙ্কা ও দামামা ।

ব্ল্যাক-আউট করে তাই
বসিয়া আছিরে ভাই,
আঁধার-সাগরে খাই চোবানি ,
মনে মনে ডাকি—ওমা,
মাথায় ফেলো না বোমা,
আর যা কর তা কর ভবানী ।

সুতরাং ভাই রে
আশা কিছু নাই রে
ঘরপানে ফিরিবার এবারে,
বরং অকস্মাৎ
গুরু শোক-সংবাদ
পাইলে পাইতে পার পেপারে ।

প্র· কার্তিক ১৩৪৭

অভয়ঙ্কর

বাঁশি ফেলে দাও, বিষাণ বাজাও বীর,
গগনে গগনে উতল হ'ল সমীর
সিন্ধু উঠেছে দুলিয়া
ঝড়ের দাপটে তরঙ্গ উঠে ফুলিয়া
নাচে প্রলয়ঙ্কর
মেঘের মাথায় রক্ত-কেতন তুলিয়া
আসে অভয়ঙ্কর ।

বাঁশি ফেলে দাও, বিষাণ বাজাও বীর,
বক্ষে বক্ষে অধীর হ'ল রুধির
দেউল গিয়াছে ভাঙিয়া

পড়ে আছে শুধু ভক্ত-শোণিতে রাঙিয়া
ধুলা-শিলা-কঙ্কর
ভ্রূকুটি-ভয়াল নয়নবহ্নি হানিয়া
এল অভয়ঙ্কর ।

বাঁশি ফেলে দাও, বিষাণ বাজাও বীর,
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু ডাকে গভীর,
মরণানন্দে মাতিয়া
গণনাথ নাচে তা-থৈ তাথিয়া তাথিয়া,
মত্ত দিগম্বর
শঙ্কাহরণ চরণ ধুলায় পাতিয়া
এল অভয়ঙ্কর ।

বাঁশি ফেলে দাও, বিষাণ বাজাও বীর,
খসিয়া পড়ুক ভয়-বিশীর্ণ চীর
ভয় নাই—বল হাঁকিয়া,
এসেছে করাল, সবারে ফিরিছে ডাকিয়া
ভৈরব শঙ্কর
জীবন-দেবতা শ্মশান-বিভূতি মাখিয়া,
জয় অভয়ঙ্কর ।

প্র· আশ্বিন ১৩৪৯

নাদ

[হৃদয়ে ভাবাবেগ সৃষ্টির পক্ষে অর্থযুক্ত শব্দ অপেক্ষা নিছক ধ্বনিই যে অধিক বলবান—একথা জানিতে আর কাহারও বাকি নাই । এই নাদ-ব্রহ্মই সমস্ত সৃষ্টির মূল, বস্তুত অর্থযুক্ত বাক্য নিরঙ্কুশ রসাস্বাদে বাধা প্রদান করে মাত্র । আমি তাই স্রেফ 'ভাষাশূন্য অর্থহারা' নাদের সাহায্যে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করিয়াছি । কবিতাটি বীররসাত্মক । পাঠকের মনোমত হইলে অন্যান্য রসের নাদ-কবিতাও লিখিবার ইচ্ছা আছে ।]

মট-মট-মট হুড়বট-কট গণ্ঠিয়া
ঘন্ন বিছুট রণ্টিয়া !

বল্লুক লুক বাণ্ডা
হণ্ডুল-গুল-ভাণ্ডা—
পণ্ডু-পুহিন গণ-গণ-গণ ষণ্ডিয়া !
চিম্পট কুটু ? গুম্‌ফট লগ ফন্দরে
ভণ্ডুর গুজু গন্দরে !
রুষ্কিলি কিল মুষ্কি
জর্ম-জটুল ফুস্কি
চিঞ্চিল চিন রণক-ধনক লন্দরে ।
কর-খল-মঘ ডাঙ্গুলি-রগ ভণ্টিয়া
দুম্বুল পিলু পণ্ঠিয়া !
ঐ ঝলঝলি হঞ্জে
কিক্কিড়ু দিলু ভঞ্জে
গম্বু- গজর লম্বুক পরিচিণ্টিয়া !
মট্ট-মটক হুঙ্ঘট-কট গণ্ঠিয়া !

প্র· বৈশাখ ১৩৫১

বিজয়িনী

অশ্রুধারায় চোখে পড়িয়াছে ছানি
আবছা হয়েছে ধরার মুরতিখানি
এখন কেবল কানে শুনি তার বাণী
বিচিত্র ধ্বনিজাল কাঁসর ঘণ্টা ঝাল !
তার মাঝে কলকুহরণ শুনি কার—
তরুণী আধুনিকার !

গর্জিয়া ধায় বিমান ট্যাক্সি জিপ
ছুটে চলে ট্যাঙ্ক মত্ত সরীসৃপ
শঙ্কায় ঢাকা নগর অপ্রদীপ !
সে সময় ফুটপাথে চটুল চরণ-পাতে
লঘু চঞ্চল পদধ্বনি শুনি কার—
তরুণী আধুনিকার !

রেডিও যন্ত্রে হুঙ্কারে ওস্তাদ !
বিলাতী ঐক্যবাদন সিংহনাদ !
প্রোপাগাণ্ডার উগ্র বিসম্বাদ !
সহসা মধুচ্ছ্বাসে ঊর্মিল কলভাষে

উচ্ছলি বহে সুর-সুরধুনী কার—
তরুণী আধুনিকার !

চারিদিকে ওঠে ঘন কান্নার রোল
চিৎকার হানাহানির গণ্ডগোল
কামানের মুখে বল্ হরি হরি বোল !
এ সবার মাঝখানে নির্ভয় কেবা আসে ?
হাসির মুকুতা সযতনে চুনি কার—
তরুণী আধুনিকার !

দুর্যোগ নিশা ; অন্তরে ব্যাকুলতা—
অভ্র গরজে কুলিশ-কঠোর কথা—
জলদের বুকে শিহরে তড়িল্লতা !
মত্ত ঝঞ্ঝাবাতে শ্রাবণ-গহীন রাতে
চরণছন্দে বাজে রুনুঝুনি কার—
তরুণী আধুনিকার !

মুখর ধরার বিপ্লব মাঝে, অয়ি
বিজয়িনী, তুমি যুদ্ধে হয়েছ জয়ী
কণ্ঠে নূপুরে কঙ্কণে বাঙ্‌ময়ী !
অশ্রু-নদীর তীরে তুহিন-কঠিন নীরে
প্রাণের আগুনে জ্বলজ্বল ধুনি কার—
তরুণী আধুনিকার !

প্র· শ্রাবণ ১৩৫১

সুরাসুর

কাক বলে, আমি কালো, কোকিলো তো তাই ;
তার চেয়ে আমি কিন্তু কিছু ভাল ভাই।
গলা বটে রুক্ষ তবু শিখেছি সভ্যতা,
কোকিলের মুখে কিন্তু কেবলি কু-কথা।
কোকিল হাসিয়া বলে, তা হ'লে কি হয়,
মিষ্ট সুরে করিয়াছি ভুবন বিজয়।
বেসুরে বলিলে 'বাবা' শোনে না তা কেউ,
সুরে 'শালা' বলো—ওঠে আনন্দের ঢেউ।

প্র· ভাদ্র ১৩৫১

হরি হরি

গৃহিণী ঘুমান শয্যায় হয়ে কাত
চুলের তলায় এলায়ে শিথিল হাত—
ভাবি, আহা মরি মরি !
জেগে উঠে ক'ন—'গরমে প্রাণটা যায়
দুজন কি শোয়া চলে এক বিছানায় !'
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি ।
সকাল বেলায় মেছুনী গয়লা সাথে
তর্ক করেন দৃপ্ত ভঙ্গিমাতে—
ভাবি, আহা মরি মরি !
খেতে ব'সে শুনি, উদাস্ কণ্ঠে ক'ন—
দুধ ও মাছের হয় নাই আয়োজন !
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি ।
তরুণ ঘোষের সাথে যবে কন কথা,
কি হাসি রঙ্গ ! কটাক্ষ চপলতা !
ভাবি, আহা মরি মরি !
পালা ভেঙে যায় যখন সে যায় চলি,
গম্ভীর মুখে পড়েন গীতাঞ্জলি।
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি ।
নূতন শাড়িটি অঙ্গে জড়ায়ে পরি'
ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখান্ বাখান করি'—
ভাবি, আহা মরি মরি !
দোকানদারের বিল্ যবে দেয় হানা
একশো সাতাশ টাকা ও এগারো আনা,
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি !
আয়নায় আঁখি রাখিয়া বাঁধেন চুল
কবরী ঘিরিয়া জড়ান অশোক ফুল,
ভাবি, আহা মরি মরি !
মোরে কন, আমি চলিলাম সিনেমায়,
নেমন্তন্ন করেছে অশোক রায়—
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি ।
মাসের পয়লা মাহিনা পাইলে, উনি
সলীল ভঙ্গে হাসিমুখে নেন গুনি,
ভাবি, আহা মরি মরি ।
সে টাকাগুলির কড়া-ক্রান্তি আর
দেখিতে পাই না নাগাদ মাসকাবার—
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি ।
পঞ্চশরের উত্তাপে দ্রব হিয়া

বিগলিত হয়ে করে যবে পিয়া পিয়া—
ভাবি, আহা মরি মরি !
কাছে যাই ; তিনি বিরস কণ্ঠে চাপা
যাহা কন, তাহা কাগজে যায় না ছাপা—
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি ।

প্র· ভাদ্র ১৩৫১

হ্যাঁচ্ছো

কবির গৃহিণী কবিরে ডাকিয়া
কহেন, 'শুনতে পাচ্ছ ?
ঘরে খিল দিয়ে একা একা
হচ্ছে কেবল ছাই পাঁশ লেখা ।
বাজার যাবেনা ? ওঠো শিগগির ।'
কবি কহিলেন, 'হ্যাঁচ্ছো ।'

কবিপ্রিয়া কন, 'এ কি জ্বালা । বলি
বাজারে কখন যাচ্ছ ?
ঘড়িতে বেজেছে পৌনে দশটা
এবার বেরিয়ে এস, হে স্রষ্টা,
অনেক লিখেছ, আর কাজ নেই ।'
কবি কহিলেন, 'হ্যাঁচ্ছো ।'

দুয়ার খুলিয়া সজল নয়নে
কবি কন মৃদু বাক্য—
'মুণ্ড-কোটরে কিছু ভাব নাই
নাকে কাঠি দিয়া দেখছি গো তাই
খুঁচিয়ে বাহির হয় কিনা কিছু
ভালো আইডিয়া—হ্যাঁচ্ছো ।'

১৫-৮-১৯৪৬

ধুঁয়া

রন্ধনশালাতে যাই
বঁধু তুয়া গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।

কেন ধুঁয়ারে কর লো অপরাধী ?
মিছে এ ছলনা সখি, কি কথা বল না সখি
লুকায়ে রেখেছ বুকে বাঁধি ?

সই, বলিতে বিদরে হিয়া
আমার নাগর যায় পর-ঘর
আমার আঙিনা দিয়া।

বুঝি নাগরে করেছ অনাদর ?
এবার বঁধুয়া এলে আঁখিজল দিও ঢেলে
পেতে দিও আধো-আঁচর।
বোলো তারে, ওগো বঁধু, তুমি মধু তুমি মধু
চরণ ধরিয়া তুয়া সাধি।
আমি ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।

১৯৪৬

অস্তগিরির পার্বতী

তোমারে হেরিনু অস্তবেলার সন্ধ্যারাগে
পার্বতী মেয়ে ! নয়নে আমার স্বপ্ন লাগে-
যৌবন-ব্যথা-তপ্ত তরুণ বসুন্ধরা
আদিম কালের পরশ-বরণ-গন্ধ ভরা !

কিশোরী ধরার কানন-লীলার কানীন সুতা,
নয়নে তোমার সদ্য-জাগার তন্দ্রালুতা।
কুন্তলে তব আদি-অরণ্য তিমির মায়া।
বর্ণে উছল আলো-ঝলমল কুহক-ছায়া।

নহ তুমি লোল বিলাস-বিভোল অবন্তিকা
নহ প্রগল্‌ভা নগর-ললনা ললৎ-শিখা।

শৈল ময়ূরী, হরিৎ মহীর হরিণী তুমি
ক্ষেত্র তোমার অস্তগিরির গহন ভূমি।

শিলা-সঙ্কট তুঙ্গ-শিখর নির্ঝরিণী
তোমার আলয় গহ্বর গুহা তমস্বিনী ;
দৃষ্টি তোমার উচ্ছ্রিত-আলো পূর্বাকাশে
চরণ শীতল শীকর-সিক্ত দূর্বাঘাসে।

অঙ্গ তোমার বন-তুলসীর গন্ধশুচি
অস্ফুটদল কুন্দধবল দন্তরুচি
কুচ-কপিত্থ গুঞ্জামালার বৃন্তে বাঁধা
কণ্ঠে কপোত-বধূর বিধুর কূজন সাধা।

তোমারে হেরিয়া জীবন-সাঁঝের মন্দালোকে
অনাদিকালের স্মরণ-কাজল লাগিল চোখে।
ধরণীর তুমি আদি মানবিকা বনোদ্ভবা
শাশ্বতী তুমি, ভাস্বতী তুমি সুদুর্লভা।

প্র· ২১ মার্চ ১৯৫৩

অমর তুমি

মরণ সাথে যুঝেছ বহু সমর তুমি বাপু
এসেছ ফিরে বিজয়টীকা ভালে
ভাবিয়াছিনু অজর তুমি অমর তুমি বাপু
জয় করেছ অজয় মহাকালে।
টুটিয়া মোহ সহসা চেয়ে দেখি
রক্তমাখা তোমার শব—এ কি !
মৃত্যুপুরে বাদ্য ঝম্‌ঝমর শুনি বাপু
জয় করেছে তোমায় মহাকালে।

পাঁজর-ভাঙা দীর্ঘশ্বাসে তোমায় ডাকি বাপু
অশ্রুজলে ভিজাই ধরণীরে
তোমার কাজ তোমার বাণী স্মরণে রাখি বাপু
তোমারে তবু পাব না কি গো ফিরে ?
তোমার দেহ আগুনে পুড়ে পুড়ে
ভস্ম হয়ে বাতাসে গেল উড়ে
তোমার প্রাণ প্রেমের মান রাখিবে নাকি বাপু
অশ্রুজলে ভিজালে ধরণীরে ?

মরণ সাথে যুঝেছ শেষ সমর তুমি বাপু
গিয়াছ চলি বিজয়টীকা ভালে
জেনেছি আজ অজর তুমি অমর তুমি বাপু
করেছ জয় অজয় মহাকালে।
কালের বুকে ধরার-ধূলি-মাখা
তোমার পদচিহ্ন রবে আঁকা
অমরপুরে বাদ্য ঝম্‌ঝমর শুনি বাপু
গিয়াছ সেথা বিজয়টীকা ভালে।

প্র· ফাল্গুন ১৩৫৪

মন

অনেক ঠেরেছি চোখ মনকে।
বুঝিয়ে বলেছি, ভাই,
তোর কোনো ভয় নাই
সব ভুলে থাক নিঃশঙ্কে।
আমি যা করি না-করি
সে তো রে ঘরের কড়ি,
তুই শুয়ে থাক্ না পালঙ্কে।
অনেক ঠেরেছি চোখ মনকে।

মন তবু ধরে আছে নিক্তি।
যখন যা কিছু চাই
ওজন করিছে তাই
যাচাই করিছে সব নিত্যি।
আমি বলি, কি বালাই,
চক্ষু বোজ্ না ছাই
একি তোর নীচ মনোবৃত্তি।
মন তবু ধরে আছে নিক্তি।

ডুবে ডুবে খেতে চাই জল যে।
ডুব দিয়ে দেখি, হায়,
মনকে এড়ানো দায়
মন-দিঘি করে টলমল যে।
যেখানে পালাতে চাই
কোথাও রেহাই নাই
রাগে মোর জ্বলে যায় কল্‌জে

ডুবে ডুবে খেতে যাই জল যে।

সুখ নেই সদা-উৎকণ্ঠা।
দুনিয়ার এত মজা
সন্দেশ খাজা গজা
আমার কপালে শুধু ঘণ্টা
ভেবে ভেবে এই সব
হয়েছি জরদগব—
খারাপ হয়েছে ভারি মনটা।
সুখ নেই—সদা উৎকণ্ঠা।

প্র· আশ্বিন ১৩৫৮

মানুষ ! মানুষ !

কল্পনা উন্মীল-পাখা উড়ে যায় উচ্চ বায়ুস্তরে
পৃথিবীর ক্লেদ-বাষ্প যেথায় ওঠে না,
যেথায় সূর্যের আলো চূর্ণ হয়ে শুধু
নীল রঙটুকু তার নিয়েছে ছানিয়া ;
অন্য রঙগুলি সব—রক্ত পীত সবুজের গুঁড়া—
ফেলিয়া দিয়াছে নীচে
জরা-করাঙ্কিত মাটির স্থবির স্থূল মুখে।

উত্তুঙ্গ ঊর্ধ্বতা হতে
দূর-বীক্ষ শ্যেন-চক্ষু মেলি
দেখি চক্র-দিগন্তের কলঙ্ক পরিখা।
সাগরের কালো জলে আণবিক বিষাক্ত বুদ্বুদ—
সবুজ শৈবাল-ঢাকা মাটির প্রাঙ্গণে
মানুষ-ক্রিমির সাথে মানুষ-ক্রিমির মহারণ।
সন্ধি-হীন এই যুদ্ধ, হিংসার শাশ্বত অভিযান
নখ-দন্ত শোণিত পঙ্কিল···

অনাহত দৃষ্টি কল্পনার,
কণ্ঠে তার বর্বর কৌতুক
খল খল হাসে অট্টহাসি—
মানুষ ! মানুষ !
দুর্গন্ধ গলিত-কুষ্ঠ কৃমিকীট জঘন্য মানুষ।
যুগযুগান্তর ধরে অযুত পুরুষ পরম্পরা

তপস্যা করেছে শুধু ক্রূর জিঘাংসার,
নিষ্ঠুর লোভের,
অভ্রংলিহ উদ্ধত মদের—
আপনার জয়স্তম্ভ রচিয়াছে আপন কঙ্কালে ।
অদূর ভবিষ্য পানে চাই—
অমৃতের পুত্রদের চিহ্ন সেথা নাই,
আছে শুধু ঊর্ধ্বে নীলাকাশ
আর নিম্নে কঙ্কাল মীনার ।

সহসা উন্মীল-পাখা কল্পনার খসে পড়ে ডানা
নেমে আসি উল্কার মতন
নিভে যাওয়া উল্কা-ভস্ম ধরণীর বুকে ঝরে পড়ে ।
ফিরে যাই পূতিগন্ধ নীড়ে,
জীবন-সঙ্গিনী যেথা প্রতীক্ষা করিয়া আছে
ক্লান্ত চোখে ক্ষুধার্ত জঠরে ।
বসি গিয়া তার পাশে
সুধাই কাকলি-ভরা সুরে—
বল, সখি, ভালবাসো কিনা ?

১১-১২-১৯৫৫

কাক কোকিল

কাকের বাসায় কোকিলের ডিম ফুটেছে
কাকদম্পতী খাবারের খোঁজে
দিগদিগন্তে ছুটেছে ।
কাক বলে, আদা কী চাঁদবদন, মরে যাই !
কাকিনী সুধায়, কি ছার জীবন
হেন ধন যার ঘরে নাই !
কোকিল শাবক খেয়ে খেয়ে মোটা হয়
আর ভাবে মুহু মুহু
কতদিনে মোর কণ্ঠে ফুটিবে কুহু !
কাকের বাসায় কালো হয়ে গেল অঙ্গ
ধিক দুর্জনসঙ্গ !

দড়ি কলসী

পৃথিবী মরেছে ডুবে সমুদ্রের জলে
ফুলে ঢোল হয়ে ভাসছে—
মহাদেশগুলো তার নিতম্ব উরস।
পৃথিবী মরেছে ডুবে হতাশার নোনা অশ্রুজলে—
মরুক, ক্ষতি কি ?
মোরাও কি মরছি না ক্লান্ত সাঁতারুর মত
হঠতার স্বখাত সলিলে ?
পৃথিবী মরেছে দুঃখ নেই
আমি শুধু ভাবছি—
দড়ি কলসী কোথায় পেল সে ?

মনমর্মর

অতীতের কথা স্মরিয়া
মন ওঠে মর্মরিয়া।

কবে কোন্ ঘনঘোর রাত্রি
আমরা দু'জন ছিনু যাত্রী
আকাশে হাসিয়াছিল বিদ্যুৎ
বৃষ্টি নামিয়াছিল ঝর্ঝরিয়া।
সেদিনের কথা স্মরিয়া
মন ওঠে মর্মরিয়া।

কেন মন ফিরে যায় অতীতে
স্মৃতির মুক্তামালা গ্রথিতে ?

কবে কোন্ উন্মন সন্ধ্যায়
ফুল ফুটেছিল নিশিগন্ধা
আমাদের দুটি হিয়া হর্ষে
পুলকে কাঁপিয়াছিল থরথরিয়া।
সেদিনের কথা স্মরিয়া
মন ওঠে মর্মরিয়া।

কেন মন ফিরে যায় অতীতে
দুঃখের সাগরবারি মথিতে ?

শ্মশানে পুড়িয়া হল ভস্ম
মোর হৃদয়ের সর্বস্ব
বিজন পান্থ আমি একাকী —
কালের চক্র ঘোরে ঘর্ঘরিয়া।
সেদিনের কথা স্মরিয়া
মন ওঠে মর্মরিয়া ।

তরুণী আধুনিকার উক্তি

আধুনিক তরুণ দেখে
হেসে হই কুটিপাটি
কত আর বলব বল
খোকাদের খুঁটিনাটি ।
চেহারা—তা মরে যাই
যেন তালপাতার সেপাই
প্যাঁকাটি হার মেনে যায়
হাত-পা খ্যাংরা কাটি ।

কথা কন চাঁদের সাথে
ব্যাথা পান ফুলের ঘায়ে
পড়ে যান দু'পা গিয়ে
জড়িয়ে পায়ে পায়ে ।
দুরাশা কম তবু নয়
নারীমন করবে বিজয়
কেবলি মুচ্‌কি হেসে
দেখিয়ে দাঁতের পাটি ।

রমণী চায় যে সদা
সাহসী শক্ত পুরুষ
বোঝেনা এই কথাটা
চুলেতে ঘষে বুরুষ ।
চাদরে মাখে আতর

প্রেমেতে কেঁদেই কাতর
নেংটি ইঁদুর দেখে
লেগে যায় দাঁতকপাটি।

বিশ্বদেব

কবে একদিন মনের অলস ক্ষণে
বাগান থেকে একটি ঝলমল গোলাপ তুলে
মনে মনে তোমাকে নিবেদন করেছিলুম
হে বিশ্বদেব !
স্বার্থ ছিল না, কামনা ছিল না, শুধু মনে ছিল
উৎসারিত ফোয়ারার মত নির্মল আনন্দ।
আজ আর সে আনন্দ নেই
নিষ্কলুষ নিষ্কাম সেই পরম মুহূর্ত চলে গেছে
থেমে গেছে প্রাণ-রসে উন্মুক্ত ফোয়ারা।
আজ তোমার কাছে যুক্ত করে চাইছি—
ফিরিয়ে দাও আমার সেই গোলাপ ফুলটি
হে বিশ্বদেব।

করবীর বিয়েতে

মেয়েগুলো চলে যায় শ্বশুরবাড়ি।
এটা কি মেয়েগুলোর কসুর ভারি ?
বাপের খাঁচাতে আর কতদিন থাকবে
কতদিন মিছিমিছি কিচকিচি ডাকবে ?
শ্রাবণের নীল নভে মেঘের খেলা
লগন এসেছে আজ পাখ্‌না মেলার।

তাই তারা চলে যায় শ্বশুরবাড়ি
বন্দ্য-চট্ট-ঘোষ-বসুর বাড়ি।
বাপ জ্যাঠা খুড়োদের ছলছল চক্ষু
অন্তরে আঁচড়ায় দুঃখ-তরক্ষু
তবুও বরের হাতে করে মেয়ে অর্পণ

এক সঙ্গে তার একটাকা বর-পণ।

করবী রবে না আর পরের ঘরে
করবী যাবেই যাবে বরের ঘরে।
সুতরাং প্রাণভরা আশিস জানাচ্ছি
ঘর-ভরা হোক তব বাচ্চা ও বাচ্চি।
নতুন গৃহের হও গৃহলক্ষ্মী
মধুভরা মৌচাকে মধুমক্ষী।

---

* 'বনফুল'-কন্যা করবীর বিবাহ উপলক্ষ্যে লেখা

ডাকু

ডাকাতের চেহারাটা অতীব ভয়ঙ্কর
অস্ত্রশস্ত্র দেখে বুক করে ধড়ফড়
কিন্তু শরীর তার সরু সরু দুর্বল
যদিও বদনখানি ঠিক যেন ফুটবল।

পাপু'র ছবি দেখে লেখা

চ তু রি কা

অপূর্ব বহ্নি

একি এ অপূর্ব বহ্নি জ্বালিয়া রেখেছ তন্বী
আপনার কুচে,
দূর হতে দহে গাত্র—হৃদয়ে ধরিবামাত্র
সব তাপ ঘুচে।

(অনুবাদ)

কোমলে কঠিন

কুন্দ জিনি দন্ত তব ইন্দীবর নিন্দিত নয়ান
অধরের মাধুরিমা নবীন পল্লবে
চম্পকে রচিত দেহ সলিলজে ললিত বয়ান
পাষাণে হৃদয় কেন গঠিত বল্লভে।

(অনুবাদ)

ভ্রান্তি

ডালিম হেরিয়া বিরহীর ফাটে হিয়া
আমি ভাবিতেছি ডালিম ফাটিল কিসে
ছিঁড়িল কি তারে নখের আঁচড় দিয়া
ভ্রান্ত বিরহী জর্জর প্রেম-বিষে ?

গান

স্বল্প আশা

রাজার মাথার মুকুট হতে না চাই
বিষ্ণুর বুকে কৌস্তুভ নাহি হব।
দুলিব রশনা গুরুনিতম্বশায়ী
নব যুবতীর কাঁচলি হইয়া রব।

হিংসা

চরণ ধরিয়া মৃদু মঞ্জীর বাজে,
হেম কঙ্কণ ঘিরে আছে বাহু দুটি,
ঘেরি কটিদেশ স্বর্ণ রশনা নাচে,
কণ্ঠ জড়ায়ে মণিহার পড়ে লুটি।
হিংসায় পুড়ে মরি
আমারে কোথায় স্থান দেবে সুন্দরি।

কর্তব্যচ্যুত

কেমন প্রহরী তুমি ছি ছি নীবিবন্ধ!
দিনে থাকো দৃঢ় সুকঠিন জাগ্রত,
রাত্রিতে হায় সুপ্তি শিথিল অন্ধ
চোর যবে ফিরে লুণ্ঠনকাজে রত।

দণ্ডলিপ্সু

ভাণ্ডারে তব থাক্ অনন্ত ধন
ফুলপল্লব থাকুক তোমারে ঘিরি।
সে সব চাহিনা,—কর শুধু অর্পণ
বক্ষে আমার কঠিন ও কুচগিরি।

পঞ্চবাণ

বুকে ওলো সখি বিঁধেছে পঞ্চবাণ
সারা নিশি মোর হৃদয় দহিল দুখে।
সজনি, প্রিয়ের পাঁচটি আঙ্গুল বুঝি
কাঁচুলি ভেদিয়া পশেছে তোমার বুকে!

হোলি

পিচ্‌কারি-রঙে আবৃত হল তনু
আবীর বর্মে ঢাকা দুটি পয়োধর।
আক্ষেপ করে হতাশ পুষ্পধনু
কোথা তরুণীর হানিবে কুসুমশর।

তরুণ-রীতি

তরুণ হেরিয়া তরুণী চাহিল ফিরে
তরুণীর পিছে ছুটিল তরুণ-আঁখি,
চোখের বাঁধন বেঁধে নিল দুইটিরে
বাহুর বাঁধন রয়ে গেল শুধু বাকী।

ততোধিক

হাসিটি তোমার ভালবাসি আমি প্রিয়ে
ভ্রূকুটি ভঙ্গী আরও মোর ভাল লাগে,
হাসিটি গঠিত শুধু অনুরাগ দিয়ে
ভ্রূভঙ্গ তব মাখা রাগ-অনুরাগে।

প্রথম ও শেষ

মনপ্রাণ মোর অর্পিয়াছিনু নাথে
প্রথম যেদিন হয়েছিল চোখোচোখি,
সবার অন্তে বাসকশয়ন রাতে
লজ্জাটুকুও সঁপিয়া দিয়াছি সখি।

অসহ্য

বিরহের জ্বালা হেরিয়া সখিরা হাসে
হাসে পিকবধূ— পতি মোর পরবাসী,
হাসুক তাহারা তাহে কিবা যায় আসে
সহেনা কেবল শরদিন্দুর হাসি।

দরদী

জ্যোৎস্না রজনী—শয্যায় বধূবর
নিধুবন শ্রমে শ্লথবাস বিহ্বল,
গবাক্ষে পশি শরদিন্দুর কর
মুছে নিতে চায় ব্যথিতার শ্রমজল।

জহুরী

রমণীর গলে মণিহার কেন দোলে ?
নিমেষের তরে পারেনা রহিতে স্থির ?
পরখ করে সে চতুর দোলার ছলে—
সরস পরশ কোন পয়োধরটির।

অবিশ্বাসিনী

সিন্ধুর ভালে সিন্দূর লেপি দিয়া
যেমনি সূর্য অস্ত অচলে ডোবে—
অমনি উর্মি ছুটে চঞ্চল হিয়া
শরদিন্দুর সুধাবিন্দুর লোভে।

মোক্ষ

সুখদুঃখের অতীত তুরীয় ভাব—
মুক্তি তাহারে বলে যত মূঢ় জন ;
আমি বলি তাহা মদঘূর্ণিত আঁখি
প্রেয়সীর নীবিবন্ধন বিমোচন।

অপচয়

শিশু বুকে ধরি চুম্বন করে ধনি
হেরিয়া আমার হিয়া বিদীর্ণ হয়।
কেমন স্বভাব সহিতে পারিনা আমি
চুম্বনধন অকারণ অপচয়।

তনুমন

মনের গোপন ভয়ভঙ্গুর কথা
বাহির হয়েছে সরম শাসন ছিঁড়ি,
তবে কেন সখি অকারণে দাও ব্যথা
অঙ্গ তোমার বসনাঞ্চলে ঘিরি ?

নিষ্প্রয়োজন

নাগর কাড়িয়া লয়েছে বসন, কেন লাজে অধোমুখ
অয়ি শঙ্কিতা নবীনা নাগরি নব অনুরাগ ভীতে।
তোমারে ঘেরিয়া চন্দ্ররশ্মি রচিছে চীনাংশুক
কি হইবে কহ অন্য বসন বসন্ত রজনীতে।

কবি ও নাগর

অনিলের মত ঘেরিয়া ঘেরিয়া কবি
ফুল-ললনার করে গুণ-গুঞ্জন ;
ভ্রমরের মত নাগর প্রবেশ লভি
অন্তর পুরে করে মধু ভুঞ্জন।

নিঃস্ব

মনেরে মথিল মন্মথ নিষ্ঠুর,
অঙ্গ তাহার অনঙ্গ নিল জিনি ;
তনুমনে তার আপনার কিছু নাই
প্রিয়ের চরণে কি দিবে সীমন্তিনী।

বিরহিণী

ঘন নিশ্বাস, গুমরিয়া ক্রন্দন,
কেশ কজ্জল এক হয়ে মেশামিশি,
চমকিত দিঠি, হিমতনু চন্দন
বিরহিণী নারী যেন বরষার নিশি।

শম্ভুর বর

বালিকা বয়সে অনন্যমনে শম্ভুর পূজা করি
ভুরু ভুজঙ্গ কটি ডম্বরু লভিল তন্বী বর,
ললাটে পাইল নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের কলা, মরি !
যুগল হইয়া বক্ষে স্বয়ং বসিলেন শঙ্কর।

মধু বিষ

দৃষ্টি তোমার চন্দন রস ঝারি,
স্নিগ্ধ শীতল—হৃদয় হরিল ধনি ;
হায় হতোস্মি ! নিকটে যাইতে নারি
ভ্রূভঙ্গ যেন উদ্যত কালফণি।

সোহাগিনী

ঘন নিশ্বাস, শীৎকার কুহরণ,
কেশ কজ্জল এক হয়ে মেশামিশি
চমকিত দিঠি, রোমাঞ্চ শিহরণ
সোহাগিনী নারী যেন বরষার নিশি।

রণসাজ

হে তন্বি, কর রণসাজ, পর কঞ্চুকী বুকে তব
ভুরু কার্মুকে অপাঙ্গ শর সংযোগ কর নিজ
ফাল্গুনরথে মলয়পতাকী আসে বসন্ত নব
সঙ্গে তাহার ভুবনবিজয়ী দুর্মদ মনসিজ।

স্বভাব

মলয় আহার চন্দনবনে ঘর
শম্ভুর শিরে বাস গঙ্গার পাশে
তবু ভুজঙ্গ কুটিল হিংসাপর—
স্বভাব না ঘুচে সজ্জন সহবাসে।

মিথ্যাখ্যাতি

স্নিগ্ধ শীতল সুধাংশুবান কবি
যশোগান তব গাহিয়াছে কালে কালে
তবে কেন চাঁদ বিরহিণী অবলারে
বিঁধিছ তোমার নিশিত অংশুজালে ?

বহুশত্রু

কলহ করিয়া বরনাগরের সাথে
একাকিনী কত যুঝিবে সজনি কহ ?
বিপক্ষে তব হয়েছে সম্মিলিত
বসন্ত চাঁদ মদন গন্ধবহ।

বিজয়িনী

নিষ্ঠুর বড় পুরুষের অনুরাগ
সবলে সকলি কাড়িয়া লইতে চায়,
সে নিষ্ঠুরতা সহিয়া সগৌরবে
হাসে নারী নিজ পরাজয় মহিমায়।

শাস্তি

মন যদি তব করে থাকি অপহরণ
শাস্তি আমারে সমুচিত দেহ প্রিয়া,
বাহুডোরে বাঁধ কণ্ঠ, চরণে চরণ
ভ্রূভঙ্গ হানি বিদীর্ণ কর হিয়া।

কুটিলা

কুটিল তব অলক ভুরু কুটিল কটি লেখা
কুটিল আঁখি মাখানো অহি বিষে
শ্রাবণ মেঘে তড়িৎসম কুটিল হাসি রেখা
সরলা সখি হইলে বল কিসে ?

ভারী

কলসীকণ্ঠ জড়ায়ে মৃণাল ভুজে
মন্থরপদে চলিয়াছ বরনারি !
প্রণয়ীজনের নয়নের জলে বুঝি
কলসী তোমার হয়েছে এমন ভারী ?

ততোধিক মনোজ্ঞা

অতিপিনদ্ধ বল্কল পরিধানে
রূপ যদি তব হয়ে থাকে মনোলোভা
খুলিয়া ফেলিলে ঐ চীরবাসখানি
শতগুণ ধনি বাড়িবে তোমার শোভা।

প্রথম শিক্ষা

ধরিনু পায়ে, কহিনু মৃদু বাণী
হলনা তবু প্রণয়ভয়ভঙ্গ—
এবার তবে আঘাত গুরু হানি
শিখাতে হবে রভসরসরঙ্গ ।

কিশোরী

প্রণয়বাণী সরমে বাধ-বাধ,
নয়ন দুটি ভ্রূকুটি নাহি জানে,
ধরিলে পাণি বিনয়ে কাঁদোকাঁদো ;
—বাড়িল ক্ষুধা কিশোরী-সুধা পানে ।

ণগ্রাহী

বাণীর পদ বিকচ কোকনদে
যে অলি পিয়ে অমল পরিমল
আজিকে তারে ভুলালো রূপমদে
প্রিয়ার আঁখি চপল শতদল ।
তাইত অলি এখন শুধু গুঞ্জে,
প্রিয়ার আঁখি-প্রসাদ বাণী-কুঞ্জে ।

রসনা যবে রুধিল বাণী-সীধু
রশনা তবু বাজিল মৃদু মৃদু,
বদন যবে সম্বরিল কথা
মদন শুধু করিল বাচালতা।

নীরবতার হেতু

কাটানু নিশি প্রিয়ের হৃদি লীনা
মরম কথা হলনা তবু বলা—
অধর তার অধর ছাড়িল না
নিদয় বাহু দিলনা ছাড়ি গলা

প্রতিবিম্ব

ত্রিদিবকামিনী উড়িতে আকাশপথে
দেখেছিল মুখ সরোবর দর্পণে
ছায়াখানি তাই মুকুরে রয়েছে আঁকা
কলিতে অলিতে মৃণালে কমলবনে।

প্রতিবিষ

নয়নের দিঠি মাখা সুধা হলাহলে
হানিয়া নিঠুরা দীর্ণ করিলে হিয়া!
গরলের জ্বালা সারা দেহে মোর জ্বলে
অমৃতের গুণে এখনো রয়েছি জরিয়া।

সতর্কতা

দিনে দিনে মোর যৌবন যদি যায়
রজনীতে সখি কি দিব প্রিয়ের পায় ?
তাই ত যতনে বাঁধিয়া রেখেছি তারে
নীবি কঞ্চুকী নূপুর চন্দ্রহারে।

আর একটিবার ফিরাও বালা
হরিণ-আঁখি-দ্বয়।
জুড়াই জ্বালা—শাস্ত্রে বলে
বিষে বিষক্ষয়।

(অনুবাদ)

সপ্তমী

হেরিনু তরুণী এক সুকোমল কলেবরা
অধর গোলাপকুঁড়ি আঁখি দুটি জলেভরা
চুলগুলি আলুথালু যেন তাহা ঢেলে সাজা
কাঁদিয়া কহিল ধনি—খাব আমি তেলেভাজা।

ভালবাসা

যারা কভু ভালবাসে নাই
তারা করে বিদ্রূপ তামাসা
হঠাৎ যখন চোখে পড়ে
অনাবৃত নগ্ন ভালবাসা।

কোথায় ?

সাগর তলে মুক্তা ফলে
তালের গাছে তাল।
আনন্দ ফল কোথায় ফলে—
আকাশ কি পাতাল ?

মনের মানুষ সনে
বাস করব বনে—
ইচ্ছা মনে মনে।

ক্ষগতা ?

কোথায় মথুরা যদুপতির
কোথায় অযোধ্যা রঘুপতির
এই সব দেখে বুঝে নে মন
নশ্বর অতি এই ভুবন।

ভুরু

দেখেছি ভয়ঙ্কব ভুরু !
ভুরু নয় শজারুর গুরু—
ভুরু দেখে বুক দুরু দুরু

ইতিহাস

নশ্বরের চিতাভস্ম
অহর্নিশি উড়িছে আকাশে
সেই ভস্ম অঙ্গে মেখে
মহাকাল অট্টহাসি হাসে।

দুনিয়ায় খাঁটি কথা হলনা বলা
যা কিছু বলেছি সব ছলনা-কলা।

তুচ্ছ

পোষা পায়রার পুচ্ছ
হোক না যতই তুচ্ছ
তাই দিয়ে কান চুলকাই
এবং পরম সুখ পাই।

ঝিলিমিলি নদী বয় আলোকে ও আঁধারে
আমরা বেঁধেছি ঘর সেই নদী কিনারে।

মনটা সবুজ যদি রয় গো
চুলগুলো সাদা হয়ে থাকনা
শরীরটা হয় হোক পঙ্গু
হৃদয় উড়ক মেলে পাখনা।

তিল তিল করে হাতের লিখন করিছ জমা
—গড়িতে কি চাও তিলোত্তমা ?

তোমার খাতার পত্রপুটে জমবে অনেক মধু
গোড়ায় আমি মৌচাকে ঢিল মেরে গেলাম শুধু।

ভিন্ন পথের যাত্রী মোরা দু'জন
ক্ষণের দেখা পথতরুর তলায়
তোমার হাসি রৈল আমার মনে
আমার সুর কি রবে তোমার গলায় ?

হাসির ঝিলিক

তোমার হাসির ঝিলিকটুকু
ছুরির মত রইল বিঁধে বুকে
বিনা দোষে শাস্তি দিতে
পারে তোমার ঠোঁটদুটি টকটুকে !

দন্তরুচি

তোমরা যখন এলে
হেসেছিলাম খৈ-ফোটানো হাসি ।
তোমরা এসে বসলে পাশাপাশি
গল্পগুজব জমল রাশিরাশি ।
সন্ধ্যা হল, একে একে উঠলে আসন ফেলে
যাবার সময় কাঁদিয়ে কেন গেলে ?

বেণুবনে বাজে বাঁশি—
'ভালবাসি—ভালবাসি—'
কানু ডাকে মুরলীতে—
'এস কুহকময় নিশীথে
চুপে চুপে সুনিভৃতে—'
মম চিত্ত মধু-পিয়াসী
মন না মানে বেণু-গানে—
ভালবাসি ভালবাসি ।

মনের কথা

তোমার কানে কানে আমার মনের কথা বলব
আমার মনের কান্না-হাসি আমার মনের গল্প।
তুমি যদি বিরক্ত হও, মনের কথা না শোনো
মনের কথা রইবে মনে, তুলবো আমার তল্প।

স্মৃতি

নিভৃত সুখের স্মৃতি
তাই নিয়ে নাড়াচাড়া
কে কবে বলেছে একটি মিষ্টি কথা
তাই করি তোলাপাড়া।

সন্ধ্যা হয়-হয়
মনটা ভয়-ভয়!

মানুষ ও ইঞ্জিন

ইঞ্জিন খায় না তো অন্ন
তাই সে সদাই থাকে চালু
মানুষ কেবলি খায় আলু
এবং ঘুমায় আলুথালু।

সত্যমিথ্যা

সত্য যদি মিথ্যা হত মিথ্যা হত সত্য
আমরা সবাই সত্যবাদী হয়ে যেতাম সদ্য।

একদা রবিবার সকালে
এল এক বীমাবাজ দালাল
দু'ঘণ্টা মিছিমিছি বকালে
মনে হল করি তারে হালাল (মানে জবাই)।
পরের রবিবার সকালে
আরবার এল সেই দালাল
কি জানি কি বলে-কয়ে ঠকালে
দেখি, আমি হয়ে গেছি হালাল (মানে জবাই)।

উপদেশ

পরকীয়াদের সঙ্গে বন্ধু
কোরো না ফস্টিনস্টি—
হঠাৎ রসের হাঁড়ি ফেটে যাবে
মাথায় পড়িলে যষ্টি।

এখন ও তখন

অঢেল ছিল যবে খ্যাঁট্
নিটোল হয়েছিল প্যাট্
আবার হয়ে গেছে flat.

তুমি কাজল দিও চোখে
আলতা পোরো পায়ে
শ্বশুরবাড়ি যেও
ময়ূরপঙ্খী নায়ে।

তোমার সাথে আমার
এক নিমেষের দেখা
তবু তোমার খাতায়
রইল আমার লেখা।

তাড়ি খাও

বাড়াবাড়ি কর কেন
তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও
বাড়ি গিয়ে দাড়ি নেড়ে
হাঁড়ি হাঁড়ি- তাড়ি খাও।

বসন্তে কোকিলো গাতি
চন্দ্রো হসতি নির্মলঃ
নরং দহতি কন্দর্পো
বুলবুলিস চুলবুলায়তে।

এক পা এগিয়ে যদি এক পা পিছাও
তার চেয়ে ভূমি পরে মাদুর বিছাও
এবং শুইয়া পড়, হাঁটিয়া কি কাম ?
আরাম হারাম হোক তবু সে আরাম।

অস্তগামী সূর্য বলে পূর্ণিমারি চন্দ্রকে
মিলন হবে আবার অমারাত্রে।

কলা

যারে মোরা কলা কই
আসলে সে কদলী
এসেছে ছদ্মবেশে
নামখানি বদলি।

নিজের জন্যে কেরোনা দুঃখু
এই দুনিয়ায় সবাই মুখ্‌খু।

তোমার দেখা পেতাম যদি একলাটি
মাথায় তোমার বসিয়ে দিতাম এক লাঠি।

এসেছে বরষা

মেঘে মেঘে সহর্ষ ঘর্ষণ
দুঃশাসন বায়ু করে
বিদ্যুতের কেশ আকর্ষণ
এইবার নামিবে বর্ষণ।

জানালা করিয়া ফাঁক
চুপি চুপি করিব দর্শন।

পরিচয়

তোমায় আমায় অনেক দিনের জানা
মোরা দু'জন দীর্ঘ পথের সাথী—
তুমি জানো আমি একটা গবেট
আমি জানি তুমি একটা হাতী।

আমি লিখি আপনমনে
যা বলো তাই বলো
ভাল যদি হয় তো হ'ল
না হ'ল নাই হ'ল।

আমায় জাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে যেও না
মিছে রাগিয়ে দিয়ে জ্বালিয়ে খেও না।

পুছিনু বানরে—কি চাই ?
সে কহিল, তুমি দেখ বসে বসে
কেমন দন্ত খিচাই।

তোমার নীল চোখের বিজলীতে
আমার বুক করেছ ছারখার
আবার তবে তাকাও কেন ফিরে
এ পোড়া বুক পোড়াবে কতবার ?

মনে আছে

মনে আছে চিকন চুলের মাঝখানে
ঋজুরেখা সিঁথির লিখন
মনে আছে ঝিনুকের মত দুই কানে
কান-ফুল সোনার ত্রিকোণ।
মনে আছে ঝিকিমিকি কচি দাঁতগুলি
উছলিত হাসির ফোয়ারা
মনে আছে, ভুলি নাই, কেমনে বা ভুলি
দীঘল চোখের কালো তারা।

পিসি

পিসিরে মোর খুঁজিনু দিশিদিশি
চিৎকারিয়া ডাকিনু—পিসি! পিসি!
দিল না কেহ সাড়া
পিসি কি তবে হয়েছে দেশছাড়া?
হঠাৎ নেশা ছুটিয়া গেল
আঘাত লাগি ভালে
—পিসি তো মোর ছিল না কোনো কালে।

তোমার মালা আমার গলায় পরিয়ে দিলে
রক্তে আমার নেশার আগুন ধরিয়ে দিলে।

নীরবে চলে গেল যারা
কিছু কি মনে মনে
বলে গেল তারা?

রাজকুলেশ গুণাকর রাম
প্রভু দীনজনে করুণা কর রাম।
শ্যামল শান্ত সুধাকর রাম
জয় বিশ্বতিমির হর ভাস্কর রাম।
হরধনুভঙ্গ ধনুর্ধর রাম
রণ-দুর্জয় বীর ভয়ঙ্কর রাম।
জনকসুতা হৃদয়েশ্বর রাম
জয় সুন্দর ভক্ত-মনোহর রাম।
জয় জয় রাম জয় জয় রাম।

ক্যানা ফুল

ফুলের গন্ধ নেই
তবু আমি হায় ধরা পড়লাম
রূপের বন্ধনেই।

অবচেতন

ভুলে যদি গিয়ে থাকো ক্ষতি কিবা তায়
আছি আমি তব অবচেতন গুহায়।

নরম-গরম

নরম দেখে শক্ত হও
গরম দেখে ভক্ত হও।

পরপারের খবর

মরণের পরপারে কী আছে
বিজ্ঞেরা সে-খবর দিয়াছে—
হয়তো নরক নয় স্বর্গ
কিম্বা শিবের অনুচর গো।

বেহদ্দ সুখ

দেশটার নাম 'এলাম' ELAM
হাজার তিনেক খৃষ্টপূর্বে
আমি সেথায় ছিলাম।

যখন মরে গেলাম
তখন আবার জন্ম নিয়ে
বাংলা দেশে এলাম।
রসগোল্লা খেলাম
বেহদ্দ সুখ পেলাম।

কল্যাণী তব জীবনের উপকূল
ফুলে ফুলে ভরে থাক
খেলিয়া বেড়াক নিতল গভীর নীরে
অরুণ চক্রবাক।

পাকিস্তানকে ভাল নাহি বাসি
সদা ভয়ে ভয়ে থাকি।
একটি জিনিস খেতে ভালবাসি
পাকিস্তানের পাখি।

কজ্জল-দূষিত আঁখি, রক্তটীকা শিরে
কুটিল ভ্রূভঙ্গ, কালো বেণীর নাগিনী
হৃদয়ে কুলিশ তোর, অয়ি সুভাষিনী
তবু কেন তোর পানে চাহি ফিরে ফিরে।

যেদিক দিয়েই পড়ো

'চপল' পায়ে যাচ্ছ কোথায় সখি
সফল হবে যাত্রা তোমার জানি।
নদীর চরে ডাকছে চকাচকি
অধীর বুঝি হচ্ছে হৃদয়খানি।

চন্দ্রা তোমার অতন্দ্র আঁখি দুটি
খুঁজে পায় যেন মনের মতন জুটি।

ভেবেছিলাম

ভেবেছিলাম অনেক কিছু,
সব ভাবনাই নিষ্ফল
অমৃত-বীজ পুঁতেছিলাম
খাচ্ছি কেবল বিষফল।

ক্ষুদ্রবৃহৎ

নিজেরে করিয়া ক্ষুদ্র চারিদিকে চাই
ক্ষুদ্র বলি কেহ পাশে নাহি দেয় ঠাঁই।
নিজেরে বৃহৎ ভাবি তাকাই আকাশে
তুঙ্গ-শির হিমালয় ব্যঙ্গ ভরে হাসে।

দেবতা বিদায়

দেহ-দেউলের বিদেহ দেবতাটিরে
এবার বিদায় দিব
মৃগমদবাস শিথিল উদাস আজি
রতি-দীপ নিব-নিব।
মাটির ঠাকুরে সাগরে বিসর্জিয়া
গঙ্গার জলে পাখালি ধুইব হিয়া
শিরায় শিরায় নূতন মন্ত্র জাগে
হর হর শিব শিব।

চন্দন

সজ্জন কোথায় খুঁজে পাইরে!
একে একে খুঁজিলাম
তীর্থ নগর গ্রাম
কোনো বনে চন্দন নাইরে।

শ্যাম ও কুল

এতদিন শুধু শ্যাম নিয়ে ছিলে সই লো
কুলের বাহিরে খেয়ে বহু গালাগালি !
এবারে তোমার সুমতি বুঝি গো হইল—
করিবে সজনি শ্যামে কুলে পালাপালি ?

পরস্পরের পিঠ চুলকিয়া
বসে থাকি মোরা আমড়াগাছে
মোদের সমান আর কে আছে ?

বিষক্ষয়

আর একটিবার আমার পানে হরিণ আঁখিদ্বয়
ফিরাও ধনি, শাস্ত্রে বলে বিষে বিষক্ষয় ।

মাস্টার বাবু হরি ঘোষ
মাথায় টাক কি ভীষণ
গোঁফ দেখে হয় পরিতোষ
যেন রে সুন্দর-বন ।

গোঁফে যদি যেত টাক ঢাকা
কি শোভা হত—মরি মরি
ঘুমুলেই শুরু হয় নাক ডাকা
ঘতর ঘোঁৎ—হরি হরি।

সেকাল ও একাল

জড়ায়ে গলা নিগড় বাহু দিয়া
বঁধুর বুকে হানিতে কুচ-কুলিশ !
সেকাল বলে বাঁচিয়া গেলে প্রিয়া
একাল হলে ডাকিতে বঁধু পুলিশ !

রাঙা করে নাও

গোলাপ, তোমারে ধরিনু বুকের মাঝে
বিনিময়ে তুমি কাঁটায় ছিঁড়িলে বুক।
রক্ত আমার দরদর ঝরিয়াছে—
সে অরুণিমায় রাঙা করে নাও মুখ।

শরবত

পর্বত বলে, শরবত খেতে চাই,
দারুণ গ্রীষ্মে প্রাণ করে আই ঢাই।
সারা দেহ দিয়া বাহিরায় তার ঘাম
ঝরঝর ধারে ঝ'রে যায় অবিরাম।
সে ধারা নামিয়া এসে

লবণাম্বুতে মেশে—
সমুদ্র বলে, ধন্য পাহাড় ভাই,
তোমারি কৃপায় শরবত খেতে পাই।

মেঘদূত

পয়লা আষাঢ় মেঘ এল অম্বরে !
মনে ভাবি, এরে কোথায় পাঠাই দূত ?
প্রিয়া তো কাছেই আছেন—রান্নাঘরে
পেঁয়াজ-খিচুড়ি করিছেন প্রস্তুত।
কহিলাম মেঘে, চলে যাও তুমি ফ্রণ্টে,
দেখে এস সব নিজে ;
ফিরে এসে ব'লো কানে কানে মৃদুকণ্ঠে
সত্য কথাটা কি যে !

ঊষা ও অরুণ মিলিত যখন পূর্বাকাশে
শিশির তখন করে ঝলমল দূর্বাঘাসে।
তেমনি স্নিগ্ধ শিশির সিক্ত জীবন হোক
মর্ত্যে রচুক অরুণ-ঊষার স্বর্গ লোক।

আমার পিদিম নিভবে যখন
তুমি তোমার ঘরে
দীপটি জ্বেলে রেখো।
অন্ধকারের সীমন্তে সই
সিঁদূর শিখা এঁকো।
দীপটি জ্বেলে রেখো।

বর্ষার গান

আহারে ওই ডাকছে ডোবায় ব্যাংগুলি
মনের সুখে ছড়িয়ে তাদের ঠ্যাংগুলি
আকাশেতে ছুটোছুটি মেঘে হাওয়ায় লুটোপুটি
ভূত পেরেতে দত্যি-দানায় খেলছে যেন ড্যাংগুলি।

গল্প শোনো : গোবরডাঙার গঙ্গাচরণ গাঙ্গুলি
প্রত্যহ ঠিক সন্ধ্যেবেলায় খেতেন তিনি ভাঙ গুলি।
বিস্তর তাঁর ছেলেপিলে নাতনি-নাতি অসংখ্য
গাঙ্গুলিদের দাপটে তাই গোবরডাঙা সশঙ্ক।
ছেলেরা তাঁর খেলত পাশা নাতিরা সব ডাঙ্গুলি
দাবা-বড়ে খেলতো স্রেফ গঙ্গাচরণ গাঙ্গুলি।

ডাকছে পাখি রাত-কুলায়
অভ্রদীপ ! অভ্রদীপ !
তোমার গায় হাত বুলায়
জ্যোৎস্নাভরা চাঁদের টিপ।

গান

॥ ১ ॥

তব পথ চেয়ে গেল বিভাবরী
এস প্রিয়, এস প্রিয়, মম প্রিয় !
বাঁধ প্রেমতীরে তব হৈম তরী
বরণীয় রমণীয় কমনীয় ।
তনু পাত্র ভরি মম প্রেম মধু
করে টলমল কর পান বঁধু
বঁধু পিও, বঁধু পিও, মম প্রিয় !
করে ঝলমল হিমে ফুলদল
হাসে রাঙা উষা সুখে জ্বলজ্বল
মিছে রাতি গেল—আঁখি ছলছল—
ওগো নিও—বুকে নিও—মম প্রিয় !

॥ ২ ॥

মন, তুই পাত্‌লি আসন ধূলায় রে !
এই ভাল ! এই ভাল !
গেছে তোর তরুর শিরে শাখার ভিড়ে
পাতায় ঢাকা কুলায় রে !
এই ভাল ! এই ভাল !
মন, তোর সজ্জা যা ছিল,
ওরে লোকলজ্জা যা ছিল,
হল সব জীর্ণ মলিন ধূলাতে লীন
কাঁটা ছিঁড়িল ।
এখন বস্‌লি নেমে
পথের 'পরে মাটির প্রেমে '
আপন মন-গড়া তোর গরব-মালা
গেল সে কোন্ চুলায় রে !
এই ভাল ! এই ভাল !

॥ ৩ ॥

ধীরে সখি ধীরে—
রিনি রিনি রিনি ঝঙ্কার উঠে
মঞ্জুল মঞ্জীরে ।

চল নীরব মৃদু গোপন পদপাতে
এই থির নিথর গভীর নিশীথ রাতে
গন্ধ গহন বাতে
চন্দন সুরভি রে।

অথির হৃদয় পিয় দরশন লাগি
অরুণ নয়ন দীর্ঘ রজনী জাগি
মিলন ক্ষণ মাগি
মিলন মন্দিরে।

॥ ৪ ॥

কালা তোমায় খবর দিয়ে যাই—
যমুনাতে আর সিনানে
আসবে না গো রাই।
যমুনা-জল কালো বরণ
লাবণি তার করল হরণ
কালো রূপে হৃদয় কালি
পরাণ পুড়ে ছাই।
যমুনাতে আর সিনানে
আসবে না গো রাই।

মিছে তুমি লুকিয়ে থাকো কদম্ব শাখে
মিছে তোমার মোহনবাঁশি নাম ধরে ডাকে।
রাই কিশোরী করেছে পণ
দেখবে না আর কালোর স্বপন
এবার মন-পাথারে নাইবে রাধা
নাগর যেথা নাই।
কালা তোমায় খবর দিয়ে যাই।

॥ ৫ ॥

বিষের ধোঁয়ায় ভুবন আঁধিয়ার
ওরে পথিক আলোক নাহি আর—
নাহি আর।
জগৎজোড়া কালো ধোঁয়ায়
জানিস না যে রাত্রি পোহায়
ও তোর বিষের জ্বালা বুকের মালা
জ্বলছে অনিবার

ভুবন আঁধিয়ার।
প্রিয় যারা হারিয়ে গেল
গভীর তিমিরে
কার হাত ধরে তুই জীবন-নদী
পাড়ি দিবি রে ?
নাই যে দিশা নাই দিশারী
সব হারালি হায় ভিখারি
তোর মনের বিষে এক নিমেষে
পোড়ালি সংসার।
ওরে পথিক আলোক নাহি আর
নাহি আর।

॥ ৬ ॥

আমি বেঁধেছি ঝুলনা।
বকুল-ঝরা বনে
ওগো ও অতুলনা
মিলন মধু-ক্ষণে
আসিতে ভুল না।
আজি সজল বায়ু বহে
থমকি রহি রহি
কানন মর মরে—
কোথা গো পিয় সহি।
যদি বরিষে রিমিঝিমি
ঘিরিয়া আসে তিমির
তবু গো অতুলনা
আসিতে ভুল না।
—আমি বেঁধেছি ঝুলনা।

॥ ৭ ॥

ওরে মন, মায়ার শিকল খোল্।
তোর চোখের জলে বান ডেকেছে
না'য়ের নোঙর তোল্
নেই যে রে তোর সঙ্গীসাথী
জ্বলছে তবু জীবন বাতি রে—
'দুখ-দাপটে ঝড়-ঝাপটে

কেউ দিল না কোল
ওরে মন মায়ার শিকল খোল।
চোখ ছাপিয়ে নামল বারিধার
কাজল কালো আঁধার চারিধার।
চলরে তবু চলরে একা
হয়তো পাবি তারির দেখা
ঘর ভেঙে যে ঘর ছাড়ালো
করল উতরোল।
ওরে মন মায়ার শিকল খোল।

॥ ৮ ॥

সেজন যদি স্বপন হয়ে আসে
মুখের পানে তাকিয়ে মৃদু হাসে—
আমি চাইনে আমি চাইনে জাগরণ।
জাগায় শুধু পথের পানে চাই
আপনমনে আপনি গান গাই
সকাল কাটে সন্ধ্যা বয়ে যায়
তবু পাইনে তবু পাইনে দরশন।
আমি চাইনে জাগরণ।
ঘুমের মাঝে লুকিয়ে আসে যায় সে
পরশ দিয়ে মরণ তরসায় সে।
জাগার চেয়ে স্বপন ভাল ওরে
তুই তাই নে তুই তাই নে ওরে মন।
তোর চাইনে জাগরণ।

॥ ৯ ॥

চপল দিনের আলো
সেই ভাল সেই ভাল।
নিশীথে ঘুমায়ে রই
সে আসিল কিনা
জানিতে পারি গো কৈ ?
পলক মুদিতে পাছে সে পলায়ে যায়
অনিমেষ আঁখি জাগিয়া রহিতে চায়
কেন আসে কেন হায়
ঘুমভরা নিশি কালো !

চপল দিনের আলো
সেই ভাল সেই ভাল।

॥ ১০ ॥

তোমারি তরে সাজাই আপনারে
কাঁকণ সিঁথি নূপুর চন্দ্রহারে।
চিকণ করি যতনে বাঁধি চুল
কবরী ঘিরি জড়াই যূথী-ফুল।

তোমার যদি নয়নে ভাল লাগে
ক্ষণেক তরে অধরে হাসি জাগে—
সফল হবে সকল আয়োজন
সফল মম জনম তনু-মন।

॥ ১১ ॥

আমারে করিও তব খেলার সাথী
পরাণ-প্রিয় ওগো পরাণ-প্রিয়
তোমার হাসিতে [তোমার গানে]
মোর দিবস-রাতি
ভরিয়া দিও ওগো ভরিয়া দিও।
যদি কাজের দিনে রহি সঙ্গে তব
তবে কাজের বেলা হবে রঙীন নব
দিব ক্লান্ত হিয়ার তলে আঁচল পাতি
মোর খেলার সাথী ওগো পরাণ-প্রিয়।

॥ ১২ ॥

আমি একাকিনী জাগি রজনী,
সজনী ওগো সজনী।
শয়ন শিরে দীপ নিব-নিব
যেন কাতর ঘুমে ;
নিশিগন্ধা ফুলে নিশিপবন চুমে
আমি, কেমনে কহ, তাহে নিবারিব ?
কুমুদ-চোখে ঝরে শিশিরকণা
সুখ-অশ্রু-ধারা

চেয়ে চাঁদের পানে ধনি আনমনা
আঁখি তন্দ্রাহারা।
মোর বিজন ঘরে দীপ-নিভিল রে
আমি গহন রাতি জাগি নিরজনে—
সজনী ওগো সজনী!

॥ ১৩ ॥

আমার মনে যে ফুল ফুটেছিল
আকাশের সূর্য তারে
শুকিয়ে দিল রে।
ধূলাতে পড়ল ঝরে সে
বাতাসের নিদয় পরশে
বুকে মোর কাঁটার বেদনা
বুক দুখিয়ে দিল রে।

আমার মনে চাঁদ—
আমার মনে চাঁদ যে উঠেছিল—
ও তারে প্রলয় মেঘে
লুকিয়ে দিল রে।

এ মনের মৌন অতলে
নিরাশার ঢেউ যে উথলে
জীবনের পাওনা-দেনা মোর
ওকে চুকিয়ে দিল রে।

॥ ১৪ ॥

ধীরে ধীরে ফ্যালো পা—ধনি
ধীরে ধীরে ফ্যালো পা
শ্রাবণে বারি-পিছল ধরণী।
বন পথ ছাইল অন্ধকারে।
বিজলী ক্ষণে ক্ষণে
চমকে ত্রাসে
মেঘ গরজিয়া
গভীর হাসে।
মুরছে হিয়া নীপ-গন্ধ-ভারে।

॥ ১৫ ॥

ওপথে দিসনে পা
দিসনে পা লো সই
মনে তোর রইবে না
সুখ রইবে না লো সই
যদি বা মন বাঁচে
কালো তোর হবে সোনার গা লো সই।
একেলা কাঁখে গাগরি
যমুনায় যাসনে নাগরি
পথে যে লুকিয়ে রয়
কালাচাঁদ ব্রজের মন-চোরা লো সই।

॥ ১৬ ॥

অমল যূথীর দলে
অলির আনাগোনা
কি কথা বলার ছলে
গানের জাল বোনা।
ভ্রমর নহে কবি
শুধু সে মধু-লোভী
লভিতে ফুল-সীধু
ছলনা-আলপনা।

ও যূথি বন-বধূ
দিওনা মন-মধু
শুকালে রসধারা
আর তো আসিবে না
অলি সে উন্মনা।

॥ ১৭ ॥

ফাগুনের পূর্ণিমাতে
একি চাঁদের মেলা
নয়নের পিচ্‌কারীতে
সখি রঙের খেলা।

হাসি আবীর মাখায়
আঁখি ফিরে তাকায়
মন উড়ে চলে
প্রজাপতির পাখায়।
পায়ে রুম-ঝুম-ঝুম ঝুম
বুকে সুখের কুঙ্কুম
আজি আঁচলে বেণীতে হেলাফেলা
—একি চাঁদের মেলা।

॥ ১৮ ॥

তুমি আমার শিউরে-ওঠা বুকের হরষ নাও।
ফেলে এলাম বরণ-মালা
অর্ঘ উপচারের থালা
শূন্য হাতে চলে এলাম মন হল উধাও।
তোমার দেখা পেলাম শুভক্ষণে
ভরল দেহ পুলক কম্পনে।
রোমাঞ্চিত এই তনু মোর
তোমার রসে মগ্ন বিভোর
নগ্নতার এ সরম পরে নয়ন তুলে চাও।

॥ ১৯ ॥

বঁধু, রাত পোহাল, এবার তুমি যাও
সাঙ্গ হ'ল লীলাখেলা
এসেছে বিদায়ের বেলা
এবারে বৈঠা তুলে ভাসাও ভেলা
আমার মাথা খাও।
ওদিকে যে পূবের আকাশ হচ্চে ফরসা
লুকিয়ে কোথাও থাকবে বঁধু নেই সে ভরসা।
পাড়ায় হ'লে জানাজানি
বাধবে বিষম হানাহানি
তখন চোখের জলে সাঁতার-পানি
মজবে তোমার নাও।
বঁধু এবার তুমি যাও।

॥ ২০ ॥

কেন পোহায় বল সুখ ফাগুন নিশা
সখি না মিটিতে বুকে প্রেম-তৃষা।
নব যৌবন টলমল গো
চল চঞ্চল গো—
চলে যায়—রহে না
তার তর্ সহে না
চোখে বিজলী হানে কালো কাজলদশা।
ফুলের বুকে আছে এখনও মধু
আছে অরুণ হাসি অধরে বঁধু
এস ধরিয়া রাখি
তারে ধরিয়া রাখি
যেন পোহায় না গো সুখ ফাগুন-নিশা।

॥ ২১ ॥

তুমি যাওনা চলে দূর
আবার আসতে হবে ফিরে
ওগো এই নদীটির তীরে।
আজ বিদায়ের সুর
বাজ্‌ল হৃদয় ঘিরে
বাদল ব্যথাতুর
নাম্‌ল আঁখিনীরে
এই নদীটির তীরে
তবু আসতে হবে ফিরে।
পারবে না গো তুমি থাকতে আমায় ভুলে
আসব তোমার ঘুমে জাগরণের কূলে—
কাঁদব তোমার দুখে হাসব তোমার সুখে
কাঁটার মত বিঁধে থাকব তোমার বুকে।
তুমি যাওনা চলে দূর
জানি আসবে আবার ফিরে
মিলন-সুমধুর
এই নদীটির তীরে—
আবার আসতে হবে ফিরে।

॥ ২২ ॥

ধিনাধিন্ তাধিন্ তাধিন্ !
আমাদের মরণ ডেকেছে—
ধিনাধিন্ তাধিন্ তাধিন্ !
আমাদের চিত্ত-দলে
আমাদের হৃৎ-কমলে
মা-কালী রক্ত-রাঙা
চরণ রেখেছে—
ধিনাধিন্ তাধিন্ তাধিন্ ।
আকাশে উড়ল যে ঐ
আগুনের হল্কা নিশান
বাতাসে বাজল মাভৈ
প্রলয়ের ডঙ্কা বিষাণ ।
আমাদের রক্ত-ধারায়
লাগে রঙ্ তারায় তারায়
মহাকাল সেই রুধিরে
বরণ ঢেকেছে—
ধিনাধিন্ তাধিন্ তাধিন ।

॥ ২৩ ॥

পাখি পিয়াল শাখে ডাকে পিয়া পিয়া
মোর কাঁপে হিয়া মোর নাচে হিয়া ।
আজ সকালে মোর কপালে
কে সোনার কাঠি দিল পরশিয়া ।
ফাগুন হাওয়া রাঙা ফাগে ফাগে
ভরে দিল তনু অনুরাগে
পূবেলি বায় গেল কুহেলি ছায়-মূরছিয়া ।
মাতাল মধু পিয়ে প্রজাপতি
তার পরশে নুয়ে পড়ে
লতা লজ্জাবতী ।
আজি বাটে বাটে ধেনুচারণ মাঠে
নাচে রাখাল করতালি দিয়া ।

॥ ২৪ ॥

যদি একা আসিলে মোর ফুলবনে গো
ফুলকলি চয়নে
কেন তবে শুনিয়া অলিগুঞ্জনে গো
চলে গেলে টল্‌মল নয়নে।
ওগো মোর চঞ্চলা ওগো মোর ক্ষণিকা
ব্যথায় বিঁধিল কিগো ঐ মন-মণিকা!
বাতাস চপল মনে অলক দুলায়ে
বুঝি বয়েছে
মৌমাছি কানে কানে মনের গোপন
কথা কয়েছে!
তাই গেলে চলিয়া আঁখি ছলছলিয়া
আমার মরম-হিয়া দলিয়া?
মনের কথাটি তবু লুকাতে পারিলে না
ধরা দিলে অলিগুঞ্জনে গো
ফিরে এস ফিরে এস মোর ফুলবনে গো
শেফালি বিছানো হিয়া-শয়নে।

॥ ২৫ ॥

রজনীর দীপশিখা—আহা—
মিটিমিটি আলো তার
এতটুকু আলোর কণিকা
চারিদিকে আঁধিয়ার।
সে আলোতে দেখা যায়
শুধু যে প্রিয়ার মুখ
নিবিড় চুলের সীমানায়
সিঁদুরের রেখাটুক।
বাহির আকাশে ঝঞ্ঝা বয়
ঝরে বারি ঝরঝর
প্রদীপের জ্যোতি-কিশলয়
ভয়ে কাঁপে থরথর।
তবু যে প্রিয়ারে দেখিতে পাই
এই মনে মোর সুখ
নিবিড় কেশের কিনারায়
সিঁদুরের শিখাটুক।

॥ ২৬ ॥

আলোর . চৌদিকে রে
বাদ্‌লা পোকা নাচে
উড়ে উড়ে নাচে রে পুড়ে পুড়ে নাচে।
বাহিরে জল ঝরে দামিনী চম্‌কায়
মেঘের বুকে বাজ গুরুগুরু গমকায়
আমার ঘরের কোণে
প্রদীপ ঘিরে রে
বাদলপরী নাচে
ঘুরে ফিরে রে—
বাদ্‌লা পোকা নাচে।
আহা কার বিরহে
ওদের বুক জ্বলে রে
সহ-মরণে তাই পুড়ে হবে ছাই
শিখানলে—
জুড়াবে সব জ্বালা চিতার মাঝে।
আলোর চৌদিকে রে
বাদ্‌লা পোকা নাচে।

॥ ২৭ ॥

তুমি আলোর ঝলক—
পলক ফেলিতে মোর নয়ন ঝলসি কোথা যাও
মেঘের অলক মাঝে হাসিয়া লুকাও।

তুমি বজ্র তুমি ঝঞ্ঝা
তবু তোমারেই শুধু তোমারেই মন চায়।
ঘরের কোণে টিমটিম-মৃদু আলো
আমি চাহিনা
চাইনা চাইনা দখিন সাগর ছোঁয়া
লঘু দখিনা।
আমি চাই তোমার ও উগ্র বেগুনী আলো
আমার চোখের মাঝে রূপের চিতা জ্বালো
আনো বহ্নি আনো বন্যা—
ঝড়ের ঝাপটে হানা দাও।

॥ ২৮ ॥

আগুন আগুন আগুন আগুন
জ্বলছে রে বনে বনে বনে বনে—
আহাহা করি আকাশ রাঙা
চকিত দশদিশি—ঘুম ভাঙিল রে
সুপ্তিশয়নপরে নীদ-অন্ধ-মূঢ়
প্রাণী জাগিল
চমকি ঝলসি উলসিয়া মনে—মনে—

॥ ২৯ ॥

[তাম্রলিপ্তির ঘাটে প্রত্যাগত বাণিজ্যতরী ভিড়িয়াছে। নাবিক-বধূরা সংবাদ পাইয়া গাহিতে গাহিতে ঘাটে যাইতেছে।]

সাগর পারের ডিঙা লাগল ঘাটে
চল্ চল্ চল্ রে—
নদীর কিনারে ঢেউ রঙ্গে উছল।
সাত সাগরের হাওয়া লেগেছে পালে
আশে পাশে ঢেউ নাচে তালে তালে
সোনার আলোয় নদী জ্বল্‌জ্বল্‌জ্বল্।
ঐ ডিঙাতে করে বিদেশী বঁধুয়া এল
নূপুর নাচা শঙ্খ বাজা উলু দে লো!
বরষ পরে বঁধু ফিরিল ঘরে
সুখে পথিকবধূর আঁখি ছল্‌ছল্‌ছল।

॥ ৩০ ॥

বৈষ্ণব গান গায় খঞ্জনী বাজিয়ে
—রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম!
চঞ্চল চক্ষের খঞ্জন নাচিয়ে
—রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম!
খঞ্জনী দুটি তার চিকিমিকি চিক্কণ
ঝিনিঝিন ঝিনিঝিন্ কি মধুর নিক্কণ
মিষ্টি হাসির সাথে কণ্ঠের কাকলি—
রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম!
বৈষ্ণবী লো তোর বুকের মাঝে

রাধার মনের কথা লুকানো আছে
শ্যামের বাঁশিটি সেথা সদাই বাজে
—রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম।

॥ ৩১ ॥

গগনে মেঘদল গরজি ফিরে।
গহন ঘনঘন কানন শিরে
কাঁপন লাগে দোলন লাগে
পাতার মরমরে শিহর জাগে—
বিজলী উলসায় ঘন তিমিরে।
গগনে মেঘদল গরজি ফিরে।
মিনতি করে কুহু শ্রাবণ রাতি
কাঁদিয়া কহে কোথা মরণসাথী।
ভাসিছে বিরহিণী নয়নধারে
পবন ছুটে ফিরে খুঁজিয়া কারে
কে আজি প্রবোধিবে অভাগিনীরে
গগনে গজরাজ গরজি ফিরে।

॥ ৩২ ॥

বাদলের বন্ধু গো আমার
আজ রাতে যে ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম
নেমেছে গোপন ধারা
রিম ঝিম ঝিম ঝিম।
নিরালা শয়ন 'পরে
আমি যে একলা ঘরে
বাইরে বাদল ঝরে
রিম ঝিম ঝিম ঝিম।
বন্ধু আসবে যদি এই তো লগন
রজনী নিতলরসে স্বপ্নমগন।
রেখেছি দুয়ার খোলা
আঁখি মোর তন্দ্রাভোলা
বুকেতে বাদল দোলা
রিম ঝিম ঝিম ঝিম।
বাদলের বন্ধু গো আমার।

॥ ৩৩ ॥

আমার একূল ওকূল দু'কূল গেল কালী
আমার জাত গেল মা ভবল না পেট
একি করলি করালী !
ভেবেছিনু মায়ার জলে
ভাসব সুখে খেলার ছলে
করব কেলি কমলদলে
মরাল মরালী।
মা তুই ধরিয়ে দিলি ব্যাধের জালে
ফাঁসি গলায় পরালি—
একি করলি করালী।
যদি টুটল মায়া-ঘোর
আমার নয়ন যে মা অন্ধ হ'ল
পাইনে দেখা তোর।
কেমন করে এই তিমিরে
তোর চরণে আস্‌ব ফিরে
ওমা অন্ধ ছেলের পায়ে যে তুই
শিকল জড়ালি
একি করলি করালী।

॥ ৩৪ ॥

ফাগুন ফুরায়ে আসে
বুকের মাঝারে চেয়ে দেখ প্রিয়
স্মৃতির স্বপন ভাসে।
চাঁদ ডুবে যায় পাণ্ডুর মুখে
চাতকিনী কাঁদে ব্যথা লয়ে বুকে
ফুল ঝরে যায় কামিনী শাখায়
যামিনীর বেণীপাশে।
চৈতী বাতাসে তাপিত বিরহ নিশ্বাস
অশ্রুজলের তপ্ত উছল উচ্ছ্বাস।
আঁখিতে তোমার সে কুহক নাই
উখন হিয়া করে যাই যাই
ফাগুনের মধু শুকায়েছে প্রিয়
তোমার মলিন হাসে।

॥ ৩৫ ॥

বাজ্ বাজ্ ডমরু বাজ্
নাচে ভূমানন্দে নটরাজ !
ডগমগ শিরে গঙ্গা
নাচে উছল তরঙ্গা
তাথিয়া তাথিয়া রুদ্রতাণ্ডবে
মাতিল ভূতসমাজ—বাজ্ !

উড়ে শূন্যে জটাজুট ভয়ানক
লকলক লেলিহ পিঙ্গল পাবক—
চরণতলে ধরণী থরথর
দোলে সিন্ধু—ডাকে হরহর
শঙ্কর দিগম্বর-সাজ—বাজ্ !

॥ ৩৬ ॥

দুখের সময় কেউ থাকে না কাছে
আমি একা বড়ই একা
তুমি আমার শূন্য বুকের মাঝে
ওগো বারেক দিও দেখা ।
আমি তোমায় মোর বেদনার কথা
বলব না গো প্রিয়
তুমি তোমার আনন্দেরই কণা
একটু আমায় দিও ।
দুঃখদহন সঙ্গসুধা সিঞ্চনে
নিভিয়ে দিও—শান্তি দিও
তোমার এ অকিঞ্চনে ।
আমি আর কিছু না চাই
পাইনি যাহা কারুর কাছে
তাই যেন গো পাই—
আঁধার রাতে একটু আলোরেখা
—মরমিয়ার দেখা ।

॥ ৩৭ ॥

নিঝুম রাতে কোন্ পথে চলি—
দিশারী ও দিশারী
আমারে দাও না গো বলি।
আকাশে আধখানা চাঁদ
আবছায়া আলো
বনানীর দূর কিনারে
তাও যে মিলালো।
আঁধারে ছায়া যায় ছলি।
—কোন্ পথে চলি।
ঘরে যে বন্ধ আগল
সকল দুয়ারে
নয়নে ঘুমের কাজল
স্বপন বিথারে।
চলেছি একলা পথে
কে ডাকে সুদূর হ'তে—
পাপিয়ার কাতর কাকলি।
—কোন পথে চলি।

॥ ৩৮ ॥

বাজ বাজ ডমরু—বাজ
নাচে ভূমানন্দে নটরাজ! বাজ!
শিরে গঙ্গা—নাচে তরঙ্গে
ডগমগ মন্দ্রমৃদঙ্গে
রুদ্রবীণ বাজে আজ—বাজ!
উড়ে শূন্যে পিঙ্গ জটা
জ্বলে ভালে—বহ্নি ছটা
আজি শম্ভু দিগম্বর-সাজ! বাজ!

॥ ৩৯ ॥

দুঃসহ ভানুতাপে রে
দুঃসহ ভানুতাপে
বিশ্বচরাচর কাঁপে রে—
ধূম-হীন অনল
চারিদিকে জ্বলজ্বল
লকলক বহ্নিকলাপে
দুঃসহ ভানুতাপে।
বায়স ডাকে—ত্রাহি!
বাতাস নাহি রে নাহি।
তৃষিত ক্লান্ত লতা
লুণ্ঠিত ধূলিলতা
দগ্ধ করে অভিশাপে
দুঃসহ ভানুতাপে।

॥ ৪০ ॥

যদি বসন্ত ফুরালো
তবু আছে তো হাসি
আছে তো আলো।
বুকে আছে ভালবাসা
সেথা মিলন-পাখি
বেঁধেছে বাসা
ছয়টি ঋতু জানে একটি ভাষা
চায় বাসিতে ভাল।
শ্রাবণ সোহাগ, নদী কূলে কূলে
ওঠো দুলে দুলে
শীতের প্রীতি জাগো কুন্দ ফুলে—
শরৎ শশী প্রেমসুধা ঢালো।
আছে তো হাসি আছে তো আলো।

॥ ৪১ ॥

আমি পরভৃতিকা
মোর কণ্ঠে আছে শুধু ভাষাটুকু
কু—কু—কু— ।

আমি অচিন পাখি—
ফুলগন্ধ মাখি
মলয় বায়ু বহে মোর পরিচয়
—আমি লুকায়ে থাকি ।

গাহি পঞ্চমসুরে মুহু মুহু
কু—কু—কু— ।

॥ ৪২ ॥

কে মোরে আপন রঙে রাঙিয়ে দিল রে !
সে আমার গরব নিল—
সরমে রাঙিয়ে দিল রে ।

ঘুমেতে মগন ছিনু, শিথিল তনু মন
নয়নে সাতরঙা স্বপন ।
কপালে সোনার কাঠি কে ছোঁয়াল
আনিল দিনের আলো ।
স্বপনের মাঝখানে ঘুম ভাঙিয়ে দিল রে ।

॥ ৪৩ ॥

মোরে কেউ ডাক দিলোনা ডাক দিলোনা
আজিকার এই আনন্দ উৎসবে ।
আকাশে জম্‌ল বাদল
বুকে মোর লাগল না দোল
হায় হায় রে—
বরষার মৃদঙ্গ-রোল
আজ কি বৃথা হবে ।
যখন ডাকল দেয়া
সে ডাকে সাড়া দিল কদম কেয়া ।

ওরে মোর বুকের বীণা,
কেন তুই বাজলি নারে বাজলি না ?
কেন তুই অনাহূত যোগ দিলিনা
ময়ূর্ দাদুর ডাহুক পাপিয়ার
উছল কলরবে।

॥ ৪৪ ॥

অজানা দূরের বাঁশি বাজল রে যার কানে
ওরে তার মন উড়ে যায় কোন গগনের পানে
সে কি রে রইতে পারে ঘরের খাঁচায়
মরা মন জোর করে সে আবার বাঁচায়
ছুটে যায় দিগঙ্গনার নীল আঙিনার মাঝখানে।
আঙিনায় খেলা করে মেঘশিশুরা
কপালে ইন্দ্রধনুর ময়ূর-চূড়া।
আমিও সেথায় যাব সেই অজানায়
যেখানে মন ভরে যায় কানায় কানায়
যেখানে মুক্তি ফেরে আনন্দেরই সন্ধানে।

॥ ৪৫ ॥

দুজনে কইব কথা কানে কানে—কানে কানে
যেন তা কেউ না জানে—কেউ না জানে।
যে কথা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া
তাহারি বেদন রবে গোপন-প্রাণে
দুজনে কইব কথা—
যদি রই দূরে দূরে—দূরে দূরে
তুমি রও পথের পরে আমি রই গৃহচূড়ে
তবুও ঘনিয়ে-আসা সন্ধ্যালোকে
দুজনে কইব কথা চোখে চোখে
দুজনে কইব কথা—
যদিবা দেখা না পাই হারাই দিশা
নয়নে নেমে আসে অন্ধ নিশা
তখনও ক্ষণে ক্ষণে—ক্ষণে ক্ষণে
দুজনে কইব কথা মনে মনে—মনে মনে
দুজনে কইব কথা—

॥ ৪৬ ॥

পান্থ হে গৃহহারা
যেও না তুমি যেও না—
পথে শ্রাবণ গহন ধারা।
আজি অন্ধ শর্বরী
ধরণী গিরি-দরী
অন্ধ শর্বরী
দিকে দিকে আঁধিয়ারা।
রহ রহ এ কুটিরে মোর
দীর্ঘ রজনী ভোর
রহ এ কুটিরে মোর।
আমি একাকিনী জাগি রাতি
জ্বলে নিভৃত বিজন বাতি
যেও না তুমি যেও না
করি শূন্য কুটির-কারা।
পান্থ হে গৃহহারা।

॥ ৪৭ ॥

আমার এ জয়-করা মন
হে প্রিয় লও তুলে
উদাসী আঁখি মেলে
কেন গো রও ভুলে।
দূরে ঐ ডাকল পাখি
কৈ তা শুনলে নাকি
ভোমরা কইল কথা
ঐ কাননের জুঁই ফুলে।
আজি এ বসুন্ধরা
হাসি-গান-গন্ধ ভরা
থেকোনা বন্ধ ঘরে
মরম দুয়ার দাও খুলে।

॥ ৪৮ ॥

ও কালো নয়ন
তোমারে কে বাঁধিল—কাজল দিয়া
আমার মন কাঁদিল—পিয়া পিয়া—
হিয়ার রতন—ও কালো নয়ন।

ও ডাগর আঁখি
আমায় কী করিলে চাউনি দিয়া
কেন প্রাণ হরিলে পিয়া পিয়া
বনের পাখি—ও ডাগব আঁখি।

ও চপল দিঠি
আমায় আর কি মনে রাখিলে না
কেন চোখের কোণে ডাকিলে না
মিঠি মিঠি—ও চপল দিঠি।

॥ ৪৯ ॥

আমি চাই ওর পানে আর ও ফিরে চায়
মোর পানে
আমাদের মন না মানে—
কেন তা কে জানে—কে জানে।
হাটের মাঝে লোকের মেলা যে
অজানা অচেনা সব—
কোলাহল হেলাফেলা যে
তার মাঝে ও একলা আমার মন টানে
কেন তা কে জানে—কে জানে।
ওর নয়ন মধু রে
আমার নয়ন ভোমরাকে ডাকে—
ও পরাণ বঁধু রে—
ও দূরের বঁধু রে!
তবু যে ক্ষণে ক্ষণে দেখা না পাই
চোখে হারাই
হাজার জনের মাঝখানে
কেন তা কে জানে—কে জানে।

॥ ৫০ ॥

আমার নয়নে আলোর বন্ধ দ্বার—
অন্ধকার—কেবলি অন্ধকার।
বারতা জানায় নব-মালতীর গন্ধ
বলে যায়—কী আনন্দ—
খুলে দিয়ে যায় আমার অশ্রুধার।
অন্ধকার—কেবলি অন্ধকার।

কে তুমি—আড়ালে লুকায়ে ছিলে
কাছে এসে—পরশ রস দিলে—
মধুকণ্ঠে করুণ কথা কহিলে? কে তুমি—
বলে দাও—ওগো বলে দাও
আলোর কেমন মূরতি কেমন রূপ
কেমন ছন্দ তার।
অন্ধকার—কেবলি অন্ধকার।

॥ ৫১ ॥

আসবে তুমি আমার ঘরে একলাই
বলব আমি—'শোনো দেবি, গান গাই।'
গান শুনে মা বলবে হেসে—
'সুর কোথায় রে সর্বনেশে!
ছিস্টিছাড়া গলা যে তোর বাজখাঁই।
তবু আমি শুনব এ গান একলাই।'

আমি তখন বলব—'মাগো, তাই তো
সত্যি আমার গলাতে সুর নাই তো।
কিন্তু তাতে কি আসে যায়
মনের কথা বল্‌ব তোমায়
এইটুকু মা তোমার কাছে চাই তো।
শুনবে তুমি—স্বর্গ আমার তাই তো।'

॥ ৫২ ॥

তুমি মনের মাঝে লুকিয়ে থাকো
বাইরে এসো না
ও আমার মনের বাসনা।
বাইরে অনেক কানাকানি জানাজানি
আলোছায়ার দোল্‌দোলানি দোল্‌দোলানি
সেই দোলাতে দুলব যখন
তোমার কথা তুলব না
রবে নীরব রসনা—
ও আমার মনের বাসনা।
তোমার সাথে কইব কথা চুপে চুপে
জানবে না কেউ মন ভরেছে পূজার ধূপে
সেই হবে মোর সন্ধ্যারতি সেই উপাসনা
ও আমার মনের বাসনা।

॥ ৫৩ ॥

আমার কল্পনাতে চলছে জালবোনা
জলের ওপর জলের আল্পনা।
আমরা দুজন বাঁধব সুখ-নীড়
অজানা কোন হিমসাগরের তীর
রইব দূরে—কারুর মানা মানব না।
কল্পনাতে—
মোদের ছোট্ট খেলাঘর
খেলব মোরা নতুন বধু-বর
সোনার স্বপন প্রেমের স্বপন ভাঙবোনা
কল্পনাতে—
ডাকবে ময়ূর মোদের আঙ্গিনায়
নাচবে হরিণ তরুণ ভঙ্গিমায়
মোরা দেখব শুধু ভুলেও তাদের বাঁধব না
কল্পনাতে—

॥ ৫৪ ॥

সাবধান ! হুঁসিয়ার ! পাখি না পালায়
ঐ দ্যাখ ডানা বুঝি মেলছে !
চুপ্ চুপ্—পাখমারা শিকারী
তীর ধনুকের খেলা খেলছে !
চল্ মোরা দূরে যাই পালিয়ে।
সাম্‌লে সাম্‌লে ! কোথা যাবি পালিয়ে
মোদের পরাণে আগ্ জ্বালিয়ে ?
মরেছি মরেছি মোরা সব মরেছি
ব্যাধের বাঁধনে বাঁধা পড়েছি
শিকারীর ভীমজালে পড়েছি
আর পালাবার পথ নাইরে !
মরি মরি মরি হায় হায় রে
আমরাও ধরা পড়েছি—
বুকে বিঁধেছে বুকে বিঁধেছে
তোদের চোখের বাঁকা বঁড়শি।
আমরাও ধরা পড়েছি।

॥ ৫৫ ॥

এই জনমে আমার মনে
মরি আকাশ কুসুম ফুটিল না
তোমার ঠাঁই নাই গো একটি কণা
পূজাবেদী মূলে রাঙা জবা তুলে
আমার সাঙ্গ হবে—আরাধনা।
এই জনমে—

যদি কোকিল ডাকে কুহু রবে
আমার মনের দুয়ার তবু বন্ধ রবে।
আমি চাইব না গো আঁখি তুলে
কথা কইব না গো মনের ভুলে
রব দূরে দূরে রব অন্যমনা।
এই জনমে—

কেন আকাশ ডাকে গুরুগুরু
বুকে তরাস জাগে দুরুদুরু।
জানি জানি এ বেদনা রৈবেনা যে

আবার ফুটবে আলো মেঘের মাঝে
আবার অন্ধকারে ফলবে সোনা—
এই জনমে—

॥ ৫৬ ॥

যদি মরমের কথা বলিতে সরম লাগে
সখি তুমি গান গেয়ে তাহা বলিও
বন মরমর সম কম্পিত অনুরাগে
সুর-ঝরণার মতো গলিও।

লজ্জামধুর ভয়ভঙ্গুর বাণী
ঢেকে দিবে তারে সুরের আঁচলখানি
সংকেতভরা বঙ্কিম মনোরথে
তুমি অভিসারপথে চলিও।

যদি কণ্ঠে তোমার সুর নাহি ওঠে ধ্বনিয়া
নূপুর কাঁকন বাজে না রণিয়া রণিয়া
তবে ক্ষণেকের তরে লুকায়ে দশন-রুচি
অরুণ অধরে হাসিটি ফেলিও মুছি
মোর মুখপানে চেয়ে আঁখি দুটি ছলছলিও।

॥ ৫৭ ॥

ও বুড়া তোর লজ্জা কি নাই রে!
এখনও তুই জানলা দিয়ে তাকাস যে বাইরে?
এখনও তোর ক্ষুধার নাহি শেষ
এখনও চাস মোণ্ডা মিঠাই দধিতে সন্দেশ
আর কত কি চাস
কত না ছাই পাঁশ।

বুড়া তোর জানলা দুয়ার বন্ধ করে দে
মনটাকে তুই রাখ্‌না রে বেঁধে।
যা পেলে আর কিছুই চাইবি না রে

তাই আছে তোর বুকের ভাণ্ডারে।
ওরে পাগল তারেই খুঁজে নে
আপন সিন্দুকে তোর পাওনা বুঝে নে।

॥ ৫৮ ॥

নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কি সুখ পেলি ?
শাখাতে ফুট্‌ল যে ঐ জুঁই-চামেলি
ওরা তো ফিরবে না আর
আঁধারে মরণ-ছায়ার
মিলাবে পাখ্‌না মেলি।

ওরা যে কানন-বধূ—ছল জানে না
বুকেতে উছল মধু—মন মানে না
তুই কি তাদের মতই
বিলাবি আপনাকে সই
মিছে তোর জনম যাবে
নয়নের অশ্রু ফেলি।
কি সুখ পেলি।

॥ ৫৯ ॥

নমো নমো হে সূর্য
তুমি জীবন-জয়তূর্য
জবাকুসুমসঙ্কাশম্
সকল কলুষ তমোনাশম্
নমো নমো হে সূর্য
তুমি জীবন জয়তূর্য।
চির-জ্যোতির্ময় অন্তর-পঙ্ক
বহ্নি-প্রবাহে কর অকলঙ্ক।
তব কাঞ্চন লাবণ্য
যুগে যুগে ধন্য হে ধন্য
সুন্দর ত্রিভুবন পূজ্য
নমো নমো হে সূর্য

॥ ৬০ ॥

নাচরে চিত্ত চকোর
আওল নন্দ কিশোর।
চাঁদ-চন্দনে অঙ্গ রঙ্গিয়া
নাচত মাখন-চোর
নাচ রে চিত্ত চকোর ॥

চূড়া পর, মরি, পিঞ্ছ নাচত
নাচে গলে বনমাল
মণিমঞ্জীর চরণ পর চঞ্চল
চপল করে করতাল ॥

নাচরে শ্যাম কিশোর
নাচরে মোখন-চোর
বৃন্দাবন চিতচোর
(গোপবধূ মন) প্রীত-রস-ঘন
পুলকভরে তনু ভোর।
নাচরে চিত্ত চকোর ॥

॥ ৬১ ॥

আমি একা একা
প্রেম-সাগরে তরী ভাসাই।
সেথা জোয়ারের জল উছলে
চাঁদের কিরণ ভেঙে ভেঙে
ঢেউয়ের মাথায় দীপালি জ্বলে—
শুধু চঞ্চল নীর—নাহি তীর—
নাহি যে তটরেখা।

চাই যার দেখা—
যারে খুঁজে খুঁজে অকূলে তরণী বাই
সে কি অতলে লুকায়ে আছে।
সেথা মুক্তা কি ফলে পান্নার ডালে
ঝিনুক-ঝরানো গাছে।
সেথা প্রবাল গুহায় শঙ্খের গায়
কত ছবি আঁকাবাঁকা।

দিগন্ত রেখা
ছাড়ায়ে পারায়ে কিছু নাই।
অসীম সাগর নাগরদোলায় নাচে
মোর তরণী ঘিরে—বলে আছে
যারে চাও সে যে আছে—
আমি সেই—
আমি ছাড়া কিছু নেই
আমি একা একা।

॥ ৬২ ॥

চোখের জলে বুক ভাসালি মিছে
ও তোর বন্ধু গেল আন্-আঙিনায়
চাইল না সে পিছে।
আঁচল ভরা নতুন-ফোটা জুঁই
কার তরে আজ মালা গাঁথিস তুই
সে তো আসবে না—
ভালবাসবে না।
চোখের বারি ঢালবি যত ঢাল্
প্রেমের বাতি জ্বালবি যদি জ্বাল্
আঁধার তবু আঁধার তবু ওরে
রইবে জেগে মন-প্রদীপের নীচে।

॥ ৬৩ ॥

যে কথা কয়ে গেলে আঁখি ঠারে
কেমনে সুগোপনে রাখি তারে।
সে কথা বহে বায়ু মরমরি
শিহরে বেণুবনে থরথরি।
সে কথা গাহে পাখি গানে গানে
ভ্রমরা গুঞ্জরে কানে কানে।
সে কথা জানে বাঁকা শশিলেখা
আকাশে হাসে তাই একা একা।
সে কথা চিরনব অবিনাশী
'সজনি ভালবাসি ভালবাসি।'

॥ ৬৪ ॥

বনানীর কানে কানে কি গোপন বার্তা রটে ?
হল মিল কার সাথে কার কথাটা নূতন বটে !
হাসে ওই জুঁই-চামেলি
চাঁপা চায় নয়না মেলি
আঁকা রয় চাঁদের হাসি আকাশের চিত্রপটে।
প্রিয়া মোর, চোখ দুটি তোর কেন আজ আধনিমীল
মুখে তোর মিলায় বাণী বেণীটি আধ-শিথিল ?
ছলনার এই কি সময় ?
ধরা আজ অমৃত-ময়
চুঁইয়ে পড়ছে সুধা চাঁদের শতছিদ্র ঘটে।

॥ ৬৫ ॥

আমার প্রদীপ নিভবে যখন তুমি তোমার ঘরে
প্রদীপ জ্বেলে রেখো
অন্ধকারের সীমন্তে সই সিঁদূর শিখা এঁকো
প্রদীপ জ্বেলে রেখো।
তুমি কাজল দিও চোখে খোঁপায় দিও ফুল
কানে যবাঙ্কুরের দুলিয়ে দিও দুল
আয়নাখানা ধরে সখি মুখটি আপন দেখো
প্রদীপ জ্বেলে রেখো।

আস্‌ব না আর আমি ওগো দুঃখ কিবা তায়
কতই এমন আসে কতই চলে যায়।
তোমার বাতায়নে আসবে নতুন হাওয়া
নবীন ফাল্গুনের চাঁপার গন্ধ ছাওয়া
মধুর হেসে সখি
তারে বরণ করে নিও
সুগন্ধ তার অঙ্গে তোমার মেখো
প্রদীপ জ্বেলে রেখো।

॥ ৬৬ ॥

তোমায় আমায় যখন মিলন হবে
ধরার মাঝে জরা-মরণ
তখন কি আর রবে !
ষড় ঋতুর অযুত ফুলের ডালা
রচবে কেবল একটি মিলন-মালা
অশোক নীপ কুন্দ কমল-বালা
একটি সুতায় থাকবে গাঁথা সবে।
আকাশ কি গো রইবে জলদ ছাওয়া
অথবা ধীর বইবে মলয় হাওয়া
তোমার আমার দুটি হৃদয় ঘিরে
রাগ-রাগিণীর নৃত্য হবে কিরে—
চন্দ্রতারার বরণ-বাতি শিরে—
মাতবে ত্রিলোক মিলন মহোৎসবে ?

॥ ৬৭ ॥

অন্ধকার, হে করুণ অন্ধকার,
ঘুচাও আলোর অরুণ অহঙ্কার।
চঞ্চল আঁখি খঞ্জনে, হে তিমির,
বাঁধ অঞ্জনে সুনিবিড়
সুপ্তি মৃদু সমীর
ঢালুক গন্ধভার।
দাও বিরাম, হে অভিরাম
কোমল অন্ধকার।

॥ ৬৮ ॥

সুখের মাঝে স্মৃতি বেদনাভরা—
আঁধারে আলো
এই ত ধরা—
ওগো এই ত ভাল।
সরমে মুখে যার কথা না ফুটে

প্রণয় বুকে তার গুমরি উঠে—
বিজলী ছটা নভ-উজল-করা
এই ত ধরা—
ওগো এই ত ভাল।
হারায়ে যাওয়া পুন ফিরিয়া পাওয়া
নিকটে পেয়ে দূরে চলিয়া যাওয়া
হাসিতে আঁখিজলে হৃদয়-হরা
এই ত ধরা—
ওগো এই ত ভাল।

॥ ৬৯ ॥

চঞ্চল নদী নীরে
রবি-কর ঝলমল্
কে তুমি বসিয়া তীরে
ঘাটে তরী টলমল ?
নদীতে এল জোয়ার
কূলে থেকো না গো আর
ডাকিছে মহা-পাথার—
কল্লোল কলকল্।
ওগো যাত্রি, খোলো তরণী
আসে রাত্রি ঘন-বরণী
কালো কুন্তলে ঢাকি ধরণী—
বেদনায় ছলছল।

॥ ৭০ ॥

সই লো তুই বল্
কেন তোর ভোমরা চোখে জল !
ডালিম-ফুলী রাঙা ঠোঁট দুটি
কেন গো উঠছে ফুলে ফুলে
করবী আপনমনে টুটি
পড়ছে খুলে খুলে !
বঁধু কি চায়নি লো ফিরে

কানে গান গায়নি লো ধীরে !
লুকানো তাই বুঝি হাসি
শুকানো বুকের পরিমল ।

॥ ৭১ ॥

মেঘ-বিতান তলে নাচে বাদলপরী
মরি মরি ।
তার আঁচলে জ্বলে—বিজলী জরী
মরি মরি ।
তিমির ঢাকা কালো গগন-পটে
জল চলকি পড়ে ভরা মেঘের ঘটে
নীপ বকুল বনে, নব-বধূর মনে—
সুখ-বেদন-লাগা ওঠে গন্ধ ভরি
মরি মরি ।

॥ ৭২ ॥

মনে কে লুকিয়ে আছে—মন জানে
মরমের কোন গহনে—কোনখানে
—মন জানে ।
মনের মানুষ মনের মাঝে রয়
মনে তাই মলয় বায়ু বয় ।
গান উথলে বুকের মাঝে কোন্ টানে-
মন জানে ।
আজকে যে ওই পিউ পাপিয়া ডাকে
শিউলিবনের ফুল-ঝরানো শাখে
মুকুল-ভরা
চাঁদ ওঠে ফুল ফোটে বঁধুর সন্ধানে
সেকথা কেউ জানেনা—মন জানে ।

॥ ৭৩ ॥

আমার জন্মতিথি
বরষে বরষে ফিরে আসে নিতি নিতি।
ওগো জীবনের তিথিগুলি মোর
তোমাদের গেঁথে গেঁথে
মোহন মালিকা দিব কার কণ্ঠেতে ?
কবে আসিবে গো আমার নবীন অতিথি।
না জানি কেমন রূপ তার
ঘুম ভাঙাবে যে সুপ্তার
কানে কানে মোর শিখাবে পিরিতি রীতি।

॥ ৭৪ ॥

পিয়াল বনে আমার প্রিয়া বেড়ায় ঘুরে
ছন্দ হয়ে।
প্রজাপতির পাখা অথির ; ছুটে অধীর
অন্ধ হয়ে।
হরিণী চমকি ফিরিয়া চায়
ভ্রমরি গুমরি গুমরি গায়
পিয়াল ছায় মলয় বায় সুখে ঘুমায়
গন্ধ হয়ে।
ঝরে কুসুমের রেণু-কণা
কানন-বধূবা আনমনা
নূপুর পায় প্রিয়া আমার নেচে বেড়ায়
ছন্দ হয়ে।

॥ ৭৫ ॥

চাঁদের কোলে ঘুম কুহেলি
ফুরায় রাতি হায় সখি
ঘুমের দেশে জোয়ার এল
নয়ন ডুবে যায় সখি।
তোমার আঁখির দীপশিখাটি
পড়ছে ঢুলে আলসে
আঁচলখানি লুটায় ভুঁয়ে

কোন্ স্বপনের লালসে।
ওগো সাকী ওগো প্রিয়া
পিয়াও মোরে রূপ-সুরা
অন্তরে আজ উঠুক জেগে
তন্দ্রাপুরীর অপ্সরা।
ললাটে মোর পরাও টীকা
তোমার অধর কুঙ্কুমে
জাগিয়ে রাখো চেতনা মোর
ঐ নূপুরের রুমঝুমে।

॥ ৭৬ ॥

দেহে বল চিত্তে বল
চল পথিক এগিয়ে চল
নাই পিছন নাই নীচু বিঘ্ন নাই পথ ঋজু
চিত্তে বল মন উছল
চল পথিক এগিয়ে চল্।

পিছল পথ অন্ধ রাত, বন্ধু তোর ধরবে হাত
ধরার গায় তোদের পায়
এগিয়ে-চলা চরণ-ঘায়
ফুটবে লাল থল-কমল
চল পথিক এগিয়ে চল।

॥ ৭৭ ॥

ভোমরা জানে কুসুম ফোটাতে
খুলে বন্ধ কলি গন্ধ ছোটাতে।
কানে তার কয় সে গুঞ্জরি
ওলো ও ফাগুন-মঞ্জরী
তোলো—সই মুখটি তোলো
সরমের ঘোমটা খোলো—
থেকো না ঘুমিয়ে বোঁটাতে।
কলিকা চোখ মেলে হাসে
ঝরে তার আতর বাতাসে
সুধাময় রসের ফোঁটাতে।

॥ ৭৮ ॥

এ কোন অতিথি বকুল বনে
এলে শুভ লগনে
যেথা বিরহিণী আকুল মনে
আছে চেয়ে গগনে।
সহসা এল বাতাস
সিঞ্চি শীতল শ্বাস
নিভিল প্রেম-হুতাশ
বাদল বরষণে।
পিয়াস মিটিল চাতকিনীর
ঝরে সুরভিত কেতকী-নীর—
গুরু গুরু ডাকে মেঘ গভীর
দামিনী পরশনে।

॥ ৭৯ ॥

পল্লীবধূ সন্ধ্যা হল
জলকে চল জলকে চল।
দিঘির জলে নামে কালো ছায়া
মায়াবিনী
বীথি পথে চল পল্লীজায়া
পথ চিনি—
আসে রাত্রি সাথে লয়ে কাজল মায়া
পল্লীবধূ ওগো জলকে চল।

তুলসীমূলে দীপ হয়নি জ্বালা
সন্ধিক্ষণে
বেণীবন্ধে নাহি নবমল্লীমালা
সঙ্গোপনে।
ফুরায় বেলা ওগো পল্লীবালা
জলকে চল।

॥ ৮০ ॥

নিশীথ রাতে
বাজিল তব হেম নূপুর
রুণু ঝুনু রুণু চরণ পাতে।
হে অভিসারিণী
কানন পথে গোপনচারিণী—
একি কুহক-মধুর রঙ্গ !

নীলাঞ্চলে ঢেকেছ উজল অঙ্গ
তবু ডাকে—তবু ডাকে
মম মুগ্ধ তনু-হিয়াকে
তব মঞ্জীরধ্বনি নৈশ-বিজন-রাতে
রুণু ঝুনু রুণু গুঞ্জন বন-বাতে।
উতল অন্তরে কি সুখ সন্তরে—
অঙ্গে পুলক শিহরে সাথে সাথে
নিশীথ রাতে।

॥ ৮১ ॥

যদি হাতে হাতে ছোঁয়া লাগে
মরমে শিহর জাগে।
যদি নয়নে নয়নে চায়
পরাণ গলিয়া যায়।
আঁখির মিনতি-বাণী
বুকের পরশ মাগে।
আকুল পিয়াসা-ভরা
অধরে কেন গো হাসি ?
সরমে মরমে-মরা
তবু বাজে প্রেম-বাঁশী।
চিনি গো ও-খেলা চিনি
শুধু মন নিয়ে ছিনিমিনি
শুধু হৃদয় দলিয়া যাওয়া
ক্ষণিকের অনুরাগে।

॥ ৮২ ॥

আঙুর বনের সাকী
শিরীন শরাবে ঢুলুঢুলু দুটি আঁখি।
অধর-মধুর মহুয়ার মোহরসে,
আফিমের কলি বিহ্বল মদালসে
কপোলের পরে স্বপনতন্দ্রাতুরা,
লালিম চোলিতে ভরা ডালিমের সুরা।
এ কোন মদিরা আনিলে পাত্র ভরি
যৌবন-ফল নিঙাড়ি আঙুর পরী ?
কামনা-বনের সাকী
তনু-পেয়ালার রসে মোর রাঙা আঁখি।

॥ ৮৩ ॥

জানিনা জানিনা গো আপন মন-কথা
স্বপন-লোকে বুঝি ঘুমায় সে-বারতা,
ভাষায় ফোটেনা যা ঝরেনা চাহনিতে
গোপন সে কথাটি বুঝিয়া চাহ নিতে।
কি ছলে কহি বল আঁখি যে ছলছল
হৃদয় টলমল—কেমনে কহিব তা ?

॥ ৮৪ ॥

চোখের জলে বুক ভাসালি মিছে
ও তোর বন্ধু গেল আন্‌-আঙিনায়
চাইল না সে পিছে।
জ্বল্‌ল যদি প্রেম আরতির আলো
ঘুচল না ত সংশয়েরি কালো
আঁধার তবু আঁধার তবু ওরে
রইল জেগে মন-প্রদীপের নীচে।

॥ ৮৫ ॥

তোর আঙিনায় ফুল ফুটেছে সই
আমি গন্ধে পাগল হই।
মন-মাতানো ফুল

আমার মন করে আকুল
আমি কেমন করে একলা ঘরে রই।
চাঁদনী রাতে দাঁড়াই যদি
তোর আঙিনায় গিয়া
কাছে ডাকবি না কি প্রিয়া!
মনের কথা দুটি
বলবি না মুখ ফুটি?
নয়নে তোর রসের লহর
করবে না থৈ থৈ?

॥ ৮৬ ॥

আজি উজল মন মন্দির
সুন্দর এলো
তারে বরণ করিয়া নে লো।
নয়ন সলিল ধারে
ভুজ-বন্ধন হারে
মন মন্দির দ্বারে
বরণ করিয়া নে লো।
সৌর মুকুট শিরে—শোভে শিরে
কনক পীত চীরে—ধীরে ধীরে
সুন্দর এলো
তারে হৃদয়ে বরিয়া নে লো।

॥ ৮৭ ॥

গায়ে তোর দাগ লেগেছে রাইলো
সোনার গায়ে শ্যাম-কাজলের
দাগ লেগেছে রাইলো।
জল আনিতে যমুনায় গেলি
গাগরি রইল পড়ে নয়ন ভরে
শ্যামের কালো রূপ নিয়ে এলি।
মনে অনুরাগ জেগেছে রাইলো
ভোমরা-ছোঁয়া হেম কমলে
দাগ লেগেছে রাইলো।

॥ ৮৮ ॥

দরশ বিনে মোর নয়ন দুখায়
দূর পথের পানে চেয়ে থাকি
আঁখি ঝরে কভু—কভু শুকায়।
বুকের আঁধারে প্রদীপশিখা
কাঁপে আশার বায়ে
বহি শ্রবণ পাতি—
ঐ নূপুর বাজে বুঝি রাঙা পায়ে।
মরি হায় হায় রে—
কোন বৈরাগী খঞ্জনী বাজায়ে যায় রে।
মোর আশার দামিনী মেঘে লুকায়।

॥ ৮৯ ॥

আমার কাজ ফুরালো
ঘুচল রে সব চিন্তা
এবার শুধু গাইব রে গা
নাচব তাধিন ধিন্‌তা।
কাজের বোঝা ভাবনা ভাবার দায়
ঠাকুর ঐ রৈল তোমার পায়
এখন থেকে—
খাটবে তুমি ভাববে তুমি
আমি নাচ্‌ব তাধিন ধিন্‌তা।
আমার কাজ ফুরালো—

॥ ৯০ ॥

বাদল এল রাতে ঘুম-চোরা
শিহর-ভরা তনু শীতল-করা।
উতল বায়ু গেল দুয়ারে কর হানি
বিজলী-বধূরা—দিল যে হাতছানি
হাসিয়া বলে গেল চোখের ইসারায়
সখিলো, অভিসারে চলেছি মোরা—
বাদল এল রাতে ঘুম-চোরা।

বিজন ঘরে—কুহু রাতে
মোর কাজল ধুয়ে গেল আঁখিপাতে
মরম কাঁদে বঁধু পিয়াসাতে।
বিরহিণী আমি, ও পূরবী
কেন আমার বুকে ভরে দিলে—
কদম বনের—বকুল বনের—কেয়ার বনের
ঐ সুরভি!
কেন কেড়ে নিলে নয়নে ঘুম—
কেন ঢেকে দিলে অঝোর ঝোরা।
বাদল এল রাতে ঘুম-চোরা।

॥ ৯১ ॥

আজু মম মন্দিরে আওল পিয়তম
সুন্দর হৃদি রঞ্জন
আনন্দ বিজুরী থির ভেল অন্তরে
রোমে রোমে হরষণ।
কি কহব প্রীতি কি ওর-
ওমুখ হিমকর অমিয়া সরোবরে
ডুবল নয়ন চকোর।
কোকিলকুল অব পঞ্চম কুহরউ
মধুর মলয় বহু মন্দা
তনমন যৌবন সকল ভেল মঝু
জীবন কুসুম সুগন্ধা।

॥ ৯২ ॥

পায়েলা মোর চপল হল
তব বাঁশীর সুরে
শ্যামলিয়া, ওগো শ্যামলিয়া
তুমি কত দূরে—
বুকের কাছে—তবু কত দূরে?
যে পথে যাই খুঁজে না পাই
ঘন কুঞ্জবনে,
সোহাগ ভরে বাঁশী ডাকে

অলি-গুঞ্জরণে—
ওগো প্রিয়া, তুমি কত দূরে
বুকের মাঝে তবু কত দূরে।

॥ ৯৩ ॥

তোর বর বুঝি ঐ এল!
দোরের আড়াল থেকে সখি
লুকিয়ে দেখে নে লো।
ঘোড়ায় চড়ে আসছে বুঝি বর
বুকখানি তোর কাঁপছে থরথর
এখন তোরে ঘরের কোণে
রাখবে ধরে কে লো?
বর হবে তোর হাজার-রণ-জয়ী
ঘোড়ায় তোরে তুলবে ধরে সই
বুকের চাপে চুলগুলি তোর
করবে এলোমেলো।

॥ ৯৪ ॥

তুমি রণজয় করে ফিরে এসো।
প্রণয়-দীপ্ত আঁখি
মুখের উপরে রাখি
দিও অধরে অধর হৃদয়েশ।
আমি রব পথপানে চাহি।
নিমেষে বরষ অতিবাহি'।
সমরে জিনিয়া অরি
বিজয়-মুকুট পরি'
তুমি ফিরে এসে ভালবেসো।

॥ ৯৫ ॥

চেয়োনা মনচোর চুরি করি
গালি দিব
ভিজা বসন মোর—লাজে মরি—
গালি দিব।

হাঁচলে ঘুচেনা সরম কালা
হানো আঁখি বুকে একি জ্বালা !
ডালি দিব না ত গলে মালা
গালি দিব ।
জানি রাতে কুলে কালি দিব
তনু-মন পায়ে ঢালি দিব ।
দিনে তবু বঁধু দিনে তবু
আঁখি তুলে নাহি চাব কভু—
চেয়োনা—হেসোনা—নহে প্রভু
গালি দিব ।

॥ ৯৬ ॥

পবন বহিছে পূরবৈয়াঁ
এমন বাদল দিনে
কে রহে বঁধুয়া বিনে ?
তুমিও চলিলে হতে সৈয়াঁ ।

আকাশ বাজায় বুঝি শঙ্খ
নীলাম্বরীর ফাঁকে
দিক্-তরুণীর আঁখে
বিজলী ঝলকে অকলঙ্ক ।

জীবনের এই শুভলগ্ন
চন্দ্র স্বাতীর কোলে
খিরিতির হিন্দোলে
দোদুল রভস-রসে মগ্ন ।

পবন বহুক পূরবৈয়াঁ রে
মৃদু বৃষ্টির কণা
করে দিক উন্মনা
তৃষিত অধীর বর-সৈয়াঁরে ।

প্রবন্ধ : রম্যরচনা

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ

যদি এলে তবে এত দেরি করে এলে কেন ? আমার প্রভাতের কোমল জ্যোতিঃ অবহেলা করে, দ্বিপ্রহরের তীব্র আলোক অগ্রাহ্য করে আমার সন্ধ্যায় ম্লান আঁধারে আলোকে, প্রভু, কেন তুমি দেখা দিলে ? যেদিন আমার হৃদয়ে তরুণ উষালোক প্রস্ফুটিত করেছিলে, সেদিন কেন বুঝিয়ে দাওনি, যে সেই উষালোক তোমারি আলোর দ্যুতি ? যেদিন একটা উদ্দাম আলোকচ্ছটা সহসা আমার সম্মুখে এনেছিলে, সেদিন সেই বিচ্ছুরিত আলোকে জগতের উলঙ্গ কঙ্কালখানা না দেখিয়ে, তোমার নিজের মূর্তি কেন দেখাওনি প্রভু ? তুমি পূজ্য একথা জানাবার আগেই কেন তুমি আমার পূজার অধিকার কেড়ে নিলে ? আজ যদি এসেছ, তবে আমার পূজার অধিকার ফিরিয়ে দাও। কই, কেন দিলে না ? মরুভূমির মত হৃদয়খানা আমার তপ্ত একবিন্দু আকিঞ্চনকে শুষে নিয়ে, আবার আমাকে তার ঘূর্ণিময় পিঙ্গল আবর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার আর শক্তি নেই। যে শক্তি একদিন মরুভূমির উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসে নিঃশেষিত করেছি, সেই শক্তির এক কণামাত্রের জন্য আজ হাহাকার করছি। কিন্তু যা যায় তা বুঝি আর আসে না, যা ভাঙে তা বুঝি আর গড়ে না।

আমি তোমার কি করেছি যে তুমি আমার শৈশবের অজ্ঞতায় আমার জীবনের লক্ষ্য, প্রেমের শান্তি, বিশ্বাসের নির্ভর সব কেড়ে নিলে ? ওরে নিষ্ঠুর, ওরে নির্মম, ওরে পরস্বাপহারী, তুমি শিশুর হাত থেকে তার জীবনের অমূল্য পাথেয় কেন কেড়ে নিলে ? কিন্তু না, সবি তো তোমার। তুমি ক্ষণিকের জন্য যা দিয়েছিলে তা আবার নিয়ে নিয়েছ। তোমার জিনিস তুমি নিয়েছ। কিন্তু যদি নিলে তো দিয়েছিলে কেন ? উষার তরুণ জ্যোতিতে আমার নয়নে সুখের মোহ সঞ্চার করে মুহূর্তে কেন তাহা নিভিয়ে দিলে ?

আজ এই জীবনের পাণ্ডুর প্রদোষে আমি জীর্ণ, বিবশ, পরিত্যক্ত হয়ে একেলা জনহীন পথের ধারে বসে আছি, তুমি লুকিয়ে দেখা দিলে। বুঝি মেঘের কূলে কূলে হাসি ফুটে উঠল। হে নির্দয়, হে করুণাময়, তুমি এসো, আরো কাছে এসো।আমার জীর্ণ বক্ষকে নিবিড় আলিঙ্গনের শান্তিময় স্পর্শে পুণ্য করে দাও।

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ
আমার লহগো নমস্কার।

অভাব

একটা অভাব অনুভব করছি। কিছু ছিল, এখন নেই, এরকম অভাব নয়। যেন কি পাবার কথা, পাচ্ছিনে। জীবনটা বড় অলস দুর্বহ বোধ হচ্ছে। অতীতের দিকে যখন চেয়ে দেখছি, তখন এমন একটা মুহূর্ত পাচ্ছি না, যেটাকে সার্থক বলে মনে করতে পারি। হৃদয়টা একটা অবসাদে ভরে যাচ্ছে। তারপর যখন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করছি, তখনও দেখতে পাচ্ছি সেই শুষ্ক মরুভূমির মত একটা বিরাট অলস শূন্যতা। একটা মরীচিকার সজীব তীক্ষ্ণ ছলনা

পর্যন্ত নেই। জীবনটা হাহাকার করে উঠছে। কিন্তু হাহাকারের একটা প্রতিধ্বনি পর্যন্ত ফিরে এসে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে না।

আমি কি চাই ঠিক বুঝতে পারছি না। বোধহয় একটা তীক্ষ্ণতা —অনুভূতির তীব্রতা। জীবনে তীব্র সুখ কখনও অনুভব করিনি—তীব্র দুঃখও না। এমনকি লালসার তীব্র উপভোগ থেকেও বঞ্চিত হয়েছি—নিজেকে বঞ্চিত করেছি। মাঝে মাঝে একটা উন্মাদ আনন্দ মনের মধ্যে কল্পনা করেছি। প্রথমত বোধহয় বুঝি এই আমার হৃদয়ের গহ্বর বুজিয়ে দেবে। কিন্তু না—কিছুক্ষণ পরেই এই অনুভূতিটুকু এমন অসাড় হয়ে যায় যে একটা অনন্ত দিগন্তব্যাপী শূন্যতা ভিন্ন আর কিছুই চেতনা থাকে না।

কেমন করে এই শূন্যতা শাশ্বতভাবে পূর্ণ হবে ? মরণ কি জীবনের এই ফাঁকটুকু পরিপূর্ণ করে দিতে পারবে ? মরণের মধ্যে এমন অসীমতা, এমন তীব্রতা আছে কি ? যদি থাকে, তবে হে মৃত্যু, তোমার অনুভবনীয় অন্ধকারে আমার সারা জগৎ ঢেকে দাও। কবির মত আমাকে তোমার তীব্র পূর্ণ উপভোগে নিমজ্জিত করে দাও :

ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে
এসো বরবেশ।
আমার পরানবধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালবেসে
ধরিবে তোমার বাহু, এখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি নিয়ো,
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বনদানে
পাণ্ডু করি দিও।

ও হেন্‌

এই প্রতিভাবান মার্কিন গাল্পিকের নাম বাংলা দেশে সুপরিচিত নয়। সে জন্য বাংলা দেশকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। পাশ্চাত্য সাহিত্য আমরা বেশির ভাগ ইংরেজের মারফৎ পাই ; এমন কি, যে কণ্টিনেণ্টাল সাহিত্যের নামে বর্তমান তরুণদল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে তাহাও ইংরাজি ভাষার ছাঁচে ঢালাই হইয়া তবে তরুণদের নিকট সরবরাহ হয়। মূল ফরাসী জার্মান রুশ সাহিত্যের রসোপলব্ধি করিবার অধিকার অতি অল্প সংখ্যক তরুণেরই আছে।

ও হেন্‌ মার্কিন ; তিনি ইংরাজি ভাষাতেই গল্প লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার রচনা ইংলণ্ডে আদর পায় নাই। আদর পাওয়া দূরের কথা, মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার নাম পর্যন্ত ইংলণ্ডের বড় কেহ জানিত না। অথচ আমেরিকায় তাঁহার বই কোটি কোটি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে এবং এখনো পুরা দমে হইতেছে।

বাংলাদেশে ও হেন্‌ অপরিচিত থাকিবার কারণ, ইংরেজ তাঁহাকে এতকাল আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে নাই ; এবং স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া রত্ন অনুসন্ধান করিবার অভ্যাস আমাদের নাই। এখন ক্রমশ O. Henryর প্রতিভা বিলাতে স্বীকৃত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তাহার

রসাস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু এখনো সাধারণ্যে তাঁহার সম্যক পরিচয় পায় নাই। মোপাসাঁর নাম জানে না এমন লোক বাংলাদেশে নাই, কিন্তু ও হেন্‌র নাম কয়জন শুনিয়াছে ?

ও হেন্‌ high-brow (অভিজাত শ্রেণীর) লেখক নহেন—তিনি সার্বজনীন লেখক ; তাই তাঁহার রচনা পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিচারে সকলকেই স্পর্শ করে। Problem লইয়া তিনি কখনো মাথা ঘামান নাই—তাঁহার একমাত্র সমস্যা মানুষ—মনুষ্য প্রকৃতি। তাঁহার গল্পের মধ্যে মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্য যেরূপ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে মানুষগুলিও তেমনি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ও হেন্‌র গল্পগুলি ছোট—কিন্তু তিনি বৃহৎ পটে ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহার তুলিকায় দীন কুলিমজুর ভবঘুরে হা-ঘরে হইতে কোটিপতি পর্যন্ত বিবিধ চরিত্র বিচিত্ররূপে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেহই বাদ যায় নাই। অবশ্য একথা সত্য যে আমেরিকার তথা নিউ-ইয়র্কের ছাপোষা গৃহস্থ (lower middle class) লইয়াই তাঁহার অধিকাংশ গল্প রচিত ; কিন্তু সার্বজনীন মানবতাই তাহার সমস্ত রচনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। তিনি তাঁহার 'The Four Million নামক গল্প সংগ্রহের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'Not very long ago some one invented the assertion that there were only 'four hundred' people in New York City who were really worth noticing. But a wiser man has arisen—the census taker—and his larger estimate of human interest has been preferred in marking out the field of little stories of the four million.'

কানাডার প্রসিদ্ধ সমালোচক ও রসিক Stephen Leacock লিখিয়াছেন—'The time is coming let us hope when the whole English speaking world will recognise in O Henry one of the greatest masters of modern fiction.'

ও হেন্‌র লিখিবার ভঙ্গি অতি অদ্ভুত। ইংরাজি ভাষা লইয়া এমনভাবে ভেল্কী খেলাইতে আর কেহ পারেন নাই। শব্দের উপর তাঁহার অসামান্য অধিকার দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। হাসি খুশি ঠাট্টা তামাসার ভিতর দিয়া তিনি যে ভাবে অতি মর্মান্তিক কথা সহজে সাবলীল ভঙ্গিতে বলিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা আর কোথাও দেখিতে পাই না। Mark Twain-এর মত হাস্যরসিক সাহিত্য ক্ষেত্রে অতি অল্পই জন্মিয়াছে, কিন্তু তিনি মূলত একজন humourist ছিলেন। O Henryকে সে হিসাবে ঠিক humourist বলা চলে না ; অথচ তিনি humourএ Mark Twain অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন নহেন। হাস্যরসকে O Henry তাঁহার রচনার মূলবস্তু করেন নাই—ইহা তাঁহার গল্পের বাহন মাত্র। এবং সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই হাস্যরসকে সূত্র (medium) করিয়া ইনি অতি করুণ মর্মস্পর্শী ভাবও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে ও হেন্‌র প্রকাশ ভঙ্গির তুলনা নাই

ও হেন্‌ দুইশত গল্প লিখিয়া গিয়াছেন—বারোখানি সরু ভল্যুমে এই গল্পগুলি নিবদ্ধ। এই দুইশত গল্পের মধ্যে কোন্‌ দশটি সর্বোৎকৃষ্ট, রুচিভেদ তাহার অনেক তালিকা আছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার যেগুলি ভাল লাগিয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দিলাম,—

A Municipal Report (Strictly Business), Past One at Roony's (Strictly Business), The Furnished Room (The Four Million), The Man Higher Up (The Gentle Grafter), Mammon And The Archer (The Four Million), Gift of the Magi (The Four Million), Cupid a la Carte (Heart of the West), A Harlem Tragedy (Trimmed Lamp), The Higher Abdiction (Heart of the West), By Courier (The Four Million).

সংগ্রহ হিসাবে তাঁহার The Four Million, Strictly Business, Heart of the

West, The Voice of The City এই চারখানি বই সর্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া মনে হয়।

উপসংহারে ও হেন্‌ সম্বন্ধে একজন ইংরেজ সমালোচকের উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ও হেন্‌র প্রতিভার সবিস্তার আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, এই শক্তিশালী অনাদৃত লেখককে বাঙালী পাঠক সমাজের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়াই আমার কর্তব্য শেষ করিব।

'It is in the sheer art of a narration and in the breadth and depth of his knowledge of humanity and his sympathy with it that he chiefly excels. He wastoobig a man to be nothing but an artist and the biggest artist for that reason. He has none of the conscious stylist's elaborate little tricks with words for he is a master of language and not its slave. He seems to go as he pleases writing apparently whatever words happen to be in the ink, yet all the while he is getting hold of his reader's interest, subtly shaping his narrative, with the story-teller's unerring instinct, generally allowing you no glimpse of its culminating point until you are right on it...what matters is that in these twelve volumes of his he has done enough to add much and permanently to the world's sources of pleasure, and enough to give him an assured place among the masters of modern fiction.'

উদাহরণ স্বরূপ ও হেন্‌র একটি গল্পের অনুবাদও আগামী সংখ্যায় দিব। ইহা ও হেন্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প না হইলেও তাঁহার লিপি চাতুর্য ও লিখন ভঙ্গির উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অনুবাদ সর্বাংশে মূলানুগ নয়, ও হেন্‌র ভঙ্গি বজায় রাখিয়া স্থানে স্থানে সামান্য একটু ভাবের পরিবর্তন করিয়াছি—প্লট ঠিক আছে। ভাষান্তরিত করিবার সময় নানা কারণে মূলের সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায় ; এ গল্পেও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু তবু যতটুকু সৌন্দর্য আছে তাহাই পাঠককে মূল পড়িতে উৎসুক করিয়া তুলিবে এই ভরসায় গল্পটি প্রকাশ করিব।

ও হেন্‌র বই পড়িবার সময় বাঙালী পাঠক আর একটা মজা পাইবেন। ও হেন্‌র কত গল্পের প্লট যে বাংলায় বেমালুম পাচার হইয়া গিয়াছে তাহা জানিতে পারিবেন।

আদিরস

সাহিত্য ধর্মের সীমানা লইয়া কয়েক বৎসর পূর্বে যখন বাঙ্গালা মাসিকপত্রের খোলা ময়দানে দারুণ দাঙ্গা বাধিয়া গিয়াছিল এবং উক্ত সীমানার দুই দিক্‌ অগণিত লাঠি সড়কির আবির্ভাবে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় 'রস ও রুচি' নাম লইয়া একটি ছোট্ট প্রবন্ধ একখানি মাসিকপত্রের পৃষ্ঠাতে আত্মপ্রকাশ করে। প্রবন্ধটির সর্বাঙ্গে হাতিয়ার বাঁধা ছিল না বলিয়াই বোধহয় রণক্ষেত্রের এত নিকটে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও রণমত্ত যুযুৎসুগণ তাহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করেন নাই।

এই প্রবন্ধের লেখক ছদ্মবেশধারী সব্যসাচীর মত শমীবৃক্ষ হইতে তূণ নামাইয়া যে কয়টি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাদের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগে একটু হাসির ঝিলিক লাগিয়াছিল। এই হাসির ঝিলিকটুকুই বোধ করি শরাঘাতের সুতীব্র বেদনাকে অপনোদিত করিয়া আহতের মনে সম্মোহন মায়া বিস্তার করিয়াছিল ; তাই অচিরকাল পরেই দেখা গেল, বিরাটের গোধন নির্বিঘ্নে তাহার গোগৃহে ফিরিয়া গিয়াছে এবং রক্তপাত যদি হইয়া থাকে তো সে অতি সামান্যই।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির প্রারম্ভে আত্মগোপনকারী ফাল্গুনী বৈদিক ঋষির মুখ দিয়া আধোআধো ভাষা বলাইয়াছিলেন, 'কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তাধি'—অগ্রে যাহা ছিল তাহা কাম। এই কাম বস্তুটা লইয়াই তক্‌রার—ইহাকে সাহিত্য-সীমানার দখলভুক্ত করা যাইতে পারে কি না, এই বিতণ্ডাই তুমুল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার মীমাংসায় প্রবন্ধকার উপসংহারে লিখিয়াছিলেন—'রস কি তাহা আমরা বুঝি, কিন্তু বুঝাইতে পারি না।...যে সব উপাদান আমরা হাতের কাছে পাই, তার সবগুলিই অখণ্ড রসবস্তু নয়, অল্পবিস্তর অবান্তর খাদও আছে। নির্বাচনের দোষে, মাত্রাজ্ঞানের অভাবে অতিরিক্ত আবর্জনা আসিয়া পড়ে, অভীষ্ট স্বাদে বিবাদী স্বাদ উৎপন্ন হয়।...এত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভোক্তার রুচি গঠিত করিয়া, কল্যাণের অন্তরায় না হইয়া যাঁর সৃষ্টি স্থায়ী হইবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।'

উপস্থাপিত সমস্যার সমাধান হিসাবে ইহা যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়। কিন্তু কথাটা ঐখানেই শেষ হয় না। সাহিত্যের সীমান্তস্থিত যে বস্তুটা লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছিল, সেটা আদিরস নয়—কাম। আদিরস সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত কি না, এ প্রশ্ন একেবারেই নিরর্থক—অনাদিকাল হইতে ঐ রসটি সাহিত্যের সর্বোচ্চ স্থান জুড়িয়া বসিয়া আছে। তাহাকে এখন উৎখাত করিবার চেষ্টা করিলে সাহিত্যের বড় কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না, ঠক বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া যাইবে। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে, প্রশ্ন তাহা নয়, প্রশ্ন কামকে লইয়া।

কিন্তু কাম ও আদিরস যদি মূলত অভেদ হয়, নাম ভিন্ন তাহাদের আর কোনো প্রভেদ না থাকে, তাহা হইলে শুধু নামান্তর ধারণের অপরাধে কামকে সাহিত্য-সীমানার বাহিরে রাখিবার প্রয়াস যে ঘোরতর অবিচার, তাহা না বলিলেও চলে। অপিচ, তাহাদের মধ্যে শুধু গোত্রগত সাদৃশ্য ভিন্ন আর কোনো একত্বের লক্ষণ যদি না থাকে, তবে কেবল সৌসাদৃশ্যের সূত্র ধরিয়া কামের সাহিত্যগণ্ডীর মধ্যে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টাও নিরতিশয় গর্হিত, সন্দেহ নাই। এখন আমাদের বিচার করিতে হইবে, কাম ও আদিরস একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ কি না। যদি তা না হয়, তাহা হইলে কামকে জাতে তুলিয়া লইবার জন্য এত মাথাফাটাফাটিই বা চলিতেছে কেন। এ সমস্যার একটা আশু সমাধান বড়ই জরুরী হইয়া পড়িয়াছে।

যে রঙ দিয়া ছবি আঁকা হয়, সেই রঙ এবং তদ্দ্বারা অঙ্কিত ছবি এক বস্তু নয়—এ কথা স্বীকার করিতে বোধ করি কাহারও বুদ্ধিতে বাধিবে না যদিও ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ঐ রঙই ছবির একমাত্র সৃষ্টি উপকরণ। চিত্রার্পিতা নারীর নাক, মুখ, চোখ ইত্যাদি সবই দেখিতে পাইতেছি অথচ রঙের মধ্যে ঐ সমস্ত দেহাবয়ব একটাও নাই। তাই রঙ যখন ক্যান্‌ভাস্ আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে, চিত্রিতার রূপ তখন ক্যান্‌ভাস্ ছাড়িয়া মানুষের অন্তরে রসলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে। রস ও রসের উপকরণে তফাৎ ঐখানে।

বস্তুত, অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, অলঙ্কারশাস্ত্রে যে কয়টি রসের নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিরই অন্তরালে মানুষের দেহ বা প্রবৃত্তিজাত একটি বা একাধিক রিপু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ধরা যাক, বীর-রস। ক্রোধরিপুর সহিত মদরিপু মিশ্রিত করিয়া যে রঙটি উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারাই বীররসের ব্যঞ্জনা। হাস্যরসটি বহুরূপী রস, তাই সকল সময় ইহার রিপুগত উপকরণ সমান হয় না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রিপুর সংমিশ্রণে ইহার সৃষ্টি। এইরূপ সর্বত্র। পঙ্কজাত পদ্মের মত নবরসের মূলও রিপুপঙ্কে নিবদ্ধ।

সুতরাং দেখা গেল, আদিরস ও কামের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু দুটা এক বস্তু নয়। ইভল্যুশনের প্রক্রিয়ায় বনমানুষ পরিবর্তিত হইয়া মানুষ হইয়াছে। এখন মানুষের যে স্থানে অবাধ প্রবেশাধিকার আছে, সম্পর্কের খাতিরে বনমানুষকেও সেখানে ঢুকাইয়া দিলে অনর্থের সম্ভাবনা অপরিহার্য হইয়া উঠে এবং ভদ্র শান্ত শিষ্ট মানুষ এই অনধিকারপ্রবেশে নিরতিশয় চিন্তান্বিত ও ভীত হইয়া প্রতিবাদ করিতে শুরু করিয়া দেয়। ভদ্র ধুতি কাপড় পরা মানুষের

পক্ষে এইরূপ আপত্তি অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত বলা চলে না।

সাহিত্য ধর্মকে যদি একটা সীমানাবিশিষ্ট রাজ্য বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে এ কথা কল্পনা করাও কঠিন নয় যে, সেই রাজ্যের frontier-এ নয়টি রস সশস্ত্র প্রতিহারীর মত অনবরত পাহারা দিতেছে। রীতিমত passport দেখাইয়া তবে সে রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। Boot legging যে একেবারে চলে না তাহা নয়, কিন্তু ধরা পড়িলে smuggler কে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয় এবং চোরাই মাল বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়।

আজকাল এই চোরামালের চলন বাঙ্গালা সাহিত্যের বাজারে মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। ইহার একটা সুবিধা এই যে,এ মাল সস্তায় পাওয়া যায়, সুতরাং এক জাতীয় লোকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত রুচিকর। তাহারা প্রকাশ্য ভাবে এই মালের ব্যবসা করিতেছে, ধরা পড়িলে বলে ইহা smuggled মাল নহে, এই দেখ Customs houseএর ছাপ রহিয়াছে, স্বয়ং আদিরস ইহার উপর সহি দস্তখৎ করিয়া দিয়াছেন।

এই জুয়াচুরি ধরিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ; কাম যে রসবস্তু নয়, তাহা বুঝিবার দিন আসিয়াছে।

কাব্যকে রসাত্মক বাক্য বলা হইয়াছে। সাহিত্যকেও নির্ভয়ে তাহা বলা চলে ; কারণ, রসের যেখানে অভাব, সাহিত্যের সদ্ভাব সেখানে জন্মিতে পারে না। 'সাহিত্য' শব্দের মূলগত তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি করিলে তাহা সহজেই বুঝা যায়।

কেহ কেহ এই কথা অস্বীকার করিয়া বলিতে পারেন—'না, সত্যও মানুষের মধ্যে সহানুভূতির সম্পর্ক—সাহিত্য—স্থাপন করিতে পারে, রসই একমাত্র সংযোগকর্তা নয়।' তাঁহাদের আপত্তি ব্যাপকভাবে সত্য হইলেও সাহিত্যের বেলায় অভ্রান্ত নয়। সত্য যে সম্পর্কের সৃষ্টি করে, তাহা ব্যবহারিক সম্পর্ক, প্রয়োজনের সম্পর্ক—আনন্দের সম্বন্ধ নয়। তাই সাহিত্যগণ্ডীর মধ্যে নিছক রসবর্জিত সত্যের স্থান নাই।

রসের নিরপেক্ষ বিচারে আধুনিক খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক রচনাও সাহিত্য পদবাচ্য নয়। কারণ, আদৌ রসসৃষ্টি বস্তুতন্ত্রের উদ্দেশ্য নয়—সত্যনিষ্ঠাই তাহার একমাত্র আদর্শ।

আদিরস রসের রাজা—রসরাজ, তাহাকে তাহার উচ্চ আসন হইতে নামাইয়া নগ্নমূর্তি কামকে সেই আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিলে, realism-এর সত্যনিষ্ঠা আপন রূঢ়তার লজ্জায় আপনি অধোমুখ হইয়া পড়িবে এবং সেই সঙ্গে নবরসের নবরত্ন-বেষ্টিত সাহিত্য-বিক্রমাদিত্যের ললাটে পঙ্কতিলক পরাইয়া দেওয়া হইবে।

শারদী

তখন আমার বয়স বোধকরি পনের-ষোল বৎসর, স্কুলে ফার্স্ট কি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। ইতিপূর্বে লুকাইয়া নবেল পড়িতে শিখিয়াছি। মনে আছে ফোর্থ ক্লাসে থাকিতে প্রথম ইংরেজি নবেল পড়িতে আরম্ভ করি। বেশি কিছু বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু কল্পনার এমন একটা নিরঙ্কুশ ভাব ছিল যে না-বোঝা অংশটাও মনে মনে গড়িয়া লইয়া সগর্বে সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যাইতাম। দৌড়ের মুখে ঘোড়া যেমন বড় বড় খানা ও উচ্চ বেড়াও পার হইয়া যায় আমার ধাবমান কল্পনাও তেমনি বহু সঙ্কটস্থান অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করিয়া যাইত। ছোটখাট বাধাবিপত্তি ভ্রূক্ষেপ করিবার মত মনের অবস্থা তখন আমার নয়।

পড়িবার কৌতূহল আছে অথচ অভিধান দেখিয়া অর্থ বুঝিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার ধৈর্য নাই, এরূপ অবস্থায় অপরিণত কল্পনা, লীলা-বিলাস দেখাইবার খুব বড় ক্ষেত্র পায়। এত অল্প বয়সে দুর্বোধ ইংরেজি নবেল পড়ার ফলে শুধু ঐটুকুই আমার লাভ হইয়াছিল। আর যাহা হইয়াছিল তাহার হিসাব খতাইয়া দেখিতে গেলে লোকসানের অঙ্কটাই বড় হইয়া পড়ে। এখনো, বই পড়িতে পড়িতে কোনো কঠিন স্থানে ঠেকিয়া গেলে, অসহিষ্ণুভাবে তাহাকে অবহেলা করিয়া অগ্রসর হইবার অভ্যাসই রহিয়া গিয়াছে।

এমনি ভাবে কল্পনানন্দে মগ্ন হইয়া আছি, বাংলা বই পড়িতে ভাল লাগে না। বাংলা বই আগাগোড়াই বোঝা যায়, সেখানে বুদ্ধি খেলাইবার অবকাশ নাই, তাই বাংলা বইয়ের উপর অশ্রদ্ধার ভাবই প্রবল। 'নীলবসনা সুন্দরী', 'লালপন্টন' মনকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না। এইরূপ অবস্থায় হঠাৎ একদিন হাতে পড়িল 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', গ্রন্থাবলীর সব কখানা বই এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিলাম। উত্তেজনার অন্ত নাই—আমার কল্পনার সাহায্য না লইয়া স্বাধীনভাবে আনন্দ দিতে পারে এমন বই বাংলায় আছে? রঘুনাথজী হাবিলদার সরযূ চন্দ্ররাও জুখলাদার দুর্জয় সিংহ আমার মাথার মধ্যে বাসা বাঁধিল। স্বপ্নের ঘোরে জীবন কাটিতে লাগিল। ইংরেজি নবেল পড়া একরকম ছাড়িয়া দিলাম।

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের পালা। এ পর্যন্ত বাংলা নবেল পড়া কার্যটি লুকাইয়াই চলিত। বাবার ভয় বাংলা বই পড়িলে ছেলে অকালে পাকিয়া উঠিবে। ইংরেজি নবেলের বেলায় তাঁর আপত্তি ছিল না কারণ তাঁর ধারণা ছিল এই সূত্রে আমি ইংরেজি ভাষা শিখিব। শব্দ পদ ইত্যাদি নোট করিয়া মুখস্থ করিবার উপদেশও তিনি অনেক দিয়াছিলেন, কেবলমাত্র ভাষা শিখিবার জন্যই যে ইংরেজি উপন্যাস পড়ার প্রয়োজন একথা বুঝাইতেও ত্রুটি করেন নাই।

ত্রুটি ছিল অপর পক্ষে। ভাষা শিখিবার অদম্য উৎসাহবশতই ইংরেজি বই পড়িতাম না—পড়িতাম গল্পের নেশায়।

একদিন গভীর রাত্রে আলো জ্বালিয়া চুপি চুপি 'বঙ্গ-বিজেতা' পড়িতে পড়িতে মা'র কাছে ধরা পড়িয়া গেলাম। মা আলো নিভাইয়া বই কাড়িয়া লইয়া গেলেন। পরদিন জেরার মুখে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। অন্য বাংলা বই পড়িতে ভাল লাগে না অথচ রমেশ দত্তের বই পড়িতে পড়িতে মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। মা শুনিয়া সদয় হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, এই বইখানা পড়। এটা হয়ে গেলে অন্য বই দেব।' বলিয়া আলমারি খুলিয়া 'আনন্দমঠ' বাহির করিয়া দিলেন।

চ্যাপ্‌ম্যানের হোমর পড়িয়া বোধ করি কীট্‌সের এমনি হইয়াছিল। একি ব্যাপার! জীবন প্রভাত এবং বঙ্গ-বিজেতাও যেন ইহার কাছে খেলো হইয়া গেল। আনন্দমঠের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কিছুই বুঝিলাম না, কিন্তু রোমান্সের অপূর্ব গন্ধে স্নায়ুশিরা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিল।

বঙ্কিমবাবুর সব উপন্যাস একে একে পড়িয়া শেষ করিলাম। সেই পনের বৎসর বয়সে, তাঁহাকে আমার প্রাণের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোচ্চ আসনে বসাইলাম। তারপর অনেকগুলি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক মহাপ্রতিভার লেখাই পড়িয়াছি। কিন্তু আমার সেই পুরাতন দেবতাটি আজও তাঁহার পুরাতন আসনে অটল হইয়া বসিয়া আছেন। সেখান হইতে তাঁহাকে টলানো দূরের কথা আজ পর্যন্ত কেহ তাঁহার পাদপীঠ স্পর্শ করিতে পারিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও একদিন শেষ হইয়া গেল। তখন নূতন খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টায় চারিদিকে হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সহিত তখন পরিচয় হইয়াছে কিন্তু তাঁহার ছোট গল্পের রস সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, এ যেন আঙুরের মত এতটুকু রস, রসনাতেই মিলাইয়া যায়, পেট ভরেনা—মনের ক্ষুধা থাকিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের রসোপলব্ধি আসিল অনেক বিলম্বে। তখন তাঁহার 'ক্ষুধিত পাষাণ' বারবার বভুক্ষুর মত

গিলিয়াও আশা মিটিত না ; দুঃখিত হইয়া কেবলি ভাবিতাম—কেন গল্পটা তিনি শেষ করিলেন না, কেন ইরাণী ক্রীতদাসীর হৃদয়-বিদারক কাহিনীটা তিনি উহ্য রাখিয়া দিলেন।

গল্পের প্রতি প্রবল আসক্তি ক্রমে আমার মনকে মাসিক পত্রিকার দিকে আকর্ষণ করিল। কত গল্প উপন্যাস যে মাসিকের পৃষ্ঠা হইতে পড়িয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কোনোটিই মনের উপর গভীর দাগ কাটিতে পারে নাই, কেবল একটি উপন্যাসের জন্য মাসের পর মাস 'প্রবাসী'র পথ চাহিয়া থাকিতাম—শ্রীনিরুপমা দেবীর 'দিদি'। এই ঘরোয়া রোমান্সটি আমার প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছিল। সেদিনকার অস্থির প্রতীক্ষার কথা স্মরণ করিয়া আজ বুঝিতে পারি গল্পটা আমার উপর কি নিবিড় মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিল। সুরমা অমর চারু আমার কাছে কল্পনাসৃষ্ট চরিত্রমাত্র ছিল না ; তাহারা জীবন্ত মানুষ ছিল। তাহাদের সহিত একান্তে বসিয়া কত গল্প করিয়াছি, এমন কি সুরমাকে যে মনে মনে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলাম সে কথা স্বীকার করিতে আজ আর লজ্জা নাই। মানুষের প্রাণের সহিত এত নিকট এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় পূর্বে কখনো হয় নাই।

একটা কথা কিন্তু এইখানে বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে রোমান্সের যুগই চলিতেছে—এ বিষয়ে যেন কেহ সন্দেহ না করেন। চরিত্রগুলি যতই পরিচিত হোক, আবহাওয়া যতই ঘরোয়া হোক, দুঃখদৈন্যের কথা যতই সত্য হোক, শরৎচন্দ্র অবধি যত লেখক গল্প লিখিয়াছেন সব গল্পই রোমান্স। মোপাসাঁ বা ম্যাক্সিম্ গোর্কির মত খাঁটি রিয়ালিস্ট আজও বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহা বাংলার পক্ষে সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলিতে পারি না ; তবে আমার বোধহয়, যেদিন সাহিত্য-ক্ষেত্রে সত্যকার রিয়ালিস্টের আবির্ভাব হয় সেদিন তার রসের ফসলে অজন্মা দেখা দেয়,—সাহিত্যের সেটা ডিকেডান্স্। ফুল এবং ফল দুই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তখনই গাছ কাটিয়া জ্বালানি তৈয়ার করিবার সময়।

সে যা হোক, এইভাবে বিরাট ক্ষুধা ও স্বল্প আহারে যখন কৃচ্ছ্রব্রত ব্রহ্মচারীর মত দিন কাটিতেছে, তখন কোথা হইতে উঠিয়া আসিলেন শরৎচন্দ্র! নাম জানিনা, তাঁহার লেখা পূর্বে কখনো পড়ি নাই—একদিন 'যমুনা' নামে এক মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ চোখে পড়িল—'পথ-নির্দেশ'। সর্বগ্রাসী বুভুক্ষার বশে গল্পটি পড়িতে বসিলাম। গল্প যখন শেষ হইল তখন আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইল তাহা প্রমাণ করা অসম্ভব। কোথা হইতে কি হইয়া গেল! এ কি গল্প পড়িলাম, না আমার চোখের সম্মুখে দুইটি নিপীড়িত আত্মার অরুন্তুদ বিয়োগব্যথা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম? কেন এমন হইল? কেন গুণী জোর করিয়া হেমকে বিবাহ করিল না? হেম যে একান্তভাবে তাহারই! জগতের কোন বিচারালয়েই যে একথা অস্বীকার করিতে পারিবে না, সেই হেমকে গুণী তুচ্ছ একটা সামাজিক বাধার জন্য ছাড়িয়া দিল!

মনুষ্যহৃদয়ের মূক অব্যক্ত ট্র্যাজেডির যে চিত্র দেখিলাম পূর্বে এমনটি আর দেখি নাই। বাস্তব-জগতে অনেক দুঃখকষ্টের ছবি চোখে পড়িয়াছে—সেজন্য কষ্টও পাইয়াছি বিস্তর। কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে একটি বস্তু অধিকাংশ সময় প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়—সেটি ঐ দুঃখকষ্টের স্রষ্টা হেতু। নিপুণ লেখকের হাতে সেই হেতুগুলি পরিস্ফুট হইয়া ঘটনাকে যে তীব্র স্পষ্টতা দান করে, সংসারক্ষেত্রে সেই স্পষ্টতার দেখা মিলে না। তাই যখন প্রতিবেশীর কন্যা পিতার দারিদ্র্য সহিতে না পারিয়া কেরাসিন তেলে পুড়িয়া মরে তখন আমরা কষ্ট পাই বটে কিন্তু ততটা পাই না যতটা পাইতে পারিতাম যদি ঐ আত্মঘাতিনী মেয়েটির প্রত্যেক চিন্তাকণা আমাদের কাছে ধরা পড়িত। নিজের শোক তাই পরের শোকের চেয়ে বেশি আঘাত করে। তাই প্রতিভাবান লেখকের অঙ্কিত চিত্র সত্য ঘটনার চেয়ে মনের উপর বেশি দাগ কাটে। সত্য ঘটনা সময় সময়

কবিকল্পনা অপেক্ষাও বিচিত্র রূপ ধরিয়া প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু কবিকল্পনা যেরূপ রসে পরিপ্লুত হইয়া পাকা ফলটির মত আমাদের তৃপ্তি-বিধান করে, সত্য ঘটনা কোনো কালেই তাহা পারে না। একটি সত্য ঘটনার পশ্চাতে যে অনাদিকালের উদ্যোগ সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া সত্য চিরদিন নীরসই রহিয়া যায়।

নূতন বিবাহের পর প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন পরস্পরের মধ্যে বিভোর তন্ময় হইয়া থাকে, বাহিরের জগৎ আবছায়া হইয়া যায়, আমারও ঠিক তাহাই হইল। শরৎবাবুর সৃষ্ট জগত সত্য হইয়া দাঁড়াইল, পারিপার্শ্বিক বাস্তব পৃথিবী ছায়াময় হইয়া গেল। ভালমন্দ বিচার করিয়া উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ধারণ করিবার শক্তি তখন আমার হয় নাই,—এখনই যে সে শক্তি অর্জন করিয়াছি একথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তবে ভাল-লাগা মন্দ-লাগার দিক দিয়া বলিতে পারি—এমন করিয়া ভাল লাগাইতেও আর কেহ পারেন নাই। শরৎচন্দ্রের যে বই পড়ি তাহাতেই নিজের গূঢ় অন্তরাত্মার মর্মলীন অতি গোপন কথাগুলি যেন বিচিত্র রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করে। প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠে। এ কোন গুণী, আমারই হৃদয়টাকে বীণা করিয়া তাহার সপ্ততন্ত্রীতে অহরহ অঙ্গুলি চালাইয়া অপূর্ব সঙ্গীতে আমার অন্তরের অন্ধ্র-রন্ধ্র পরিপূর্ণ করিয়া দিল ?

তাহার পর হইতে এইভাবের মশ্‌গুল হইয়া আছি প্রায় দশ বৎসর। শ্রীকান্ত, দত্তা, পল্লী-সমাজ, গৃহদাহ, বিন্দুর ছেলে কতবার করিয়া পড়িলাম তবু তৃপ্তি নাই। তাহার উপর আবার নূতন গল্পের বন্যা আসিতেছে। ভারতবর্ষের পৃষ্ঠাগুলা যেন ইন্দ্রজালে ভরিয়া উঠিল। শুধু একখানি বই আমি দুঃখিতভাবে পাশ কাটাইয়া গেলাম—দেবদাস। শরৎবাবুর লেখা মন্দ বলিয়া নিজের কাছেও স্বীকার করিবার সাহস নাই কিন্তু তবু, কেন জানিনা, দেবদাস আমার অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। নিজেকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলাম যে ওটা তাঁহার কাঁচা হাতের লেখা—১৯০০ সালের রচনা—তাই বোধহয় এমনটা হইয়াছে। শরৎবাবুর লেখা ভাল লাগিবে না এটা যে তখনকার দিনে আমার কত বড় মর্মপীড়ার কারণ ছিল, তাহা আজ গভীরতর নৈরাশ্যের মধ্যে বুঝিতে পারিতেছি।

'দেবদাস'-কে আলাদা করিয়া রাখিয়া দিলাম, ওটা যেন শরৎবাবুর লেখাই নয়। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে যে কূলপ্লাবী রসের বান ডাকিয়াছে, তাহাতেই ডুবিয়া রহিলাম। আমার মনের ভাবটা তখন এইরূপ ঃ আর কি ! শরৎবাবু যখন আছেন তখন আর আমাদের ভাবনা কি ! তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী হইতে রসের ফোয়ারা চিরদিন এমনি উৎসারিত হইতে থাকিবে। কোনোদিন তাহার হ্রাস হইবে না।

বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল। তারপর একদিন 'দেনা পাওনা' দেখা দিল। 'দেনা পাওনা' পড়িয়া অজানা আতঙ্কে বুক দমিয়া গেল। এ কি হইল ! চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে দূর হইতে রাহু যেমন তাহার করাল ছায়া ফেলিয়া চন্দ্রকে সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয় এ যেন সেই রাহুগ্রাসের পূর্বাভাস। শরচ্চন্দ্রের সে দীপ্ত নিষ্কলঙ্ক জ্যোৎস্না কোথায় গেল ! তাঁহার সে উজ্জ্বল অনাহত দীপ্তি এমন ঘোলাটে হইয়া গেল কি করিয়া !

বুঝিলাম, যাহা কল্পনা করিতেও পারি নাই তাহাই ঘটিয়াছে। জোয়ারের জল চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, কখন অলক্ষিতে ভাঁটার টান ধরিয়াছে। বস্তুত, দেনা পাওনায় এই ক্রমশ ক্ষীয়মান দৌর্বল্য খুব অল্পই প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু তবু নির্জলা খাঁটি দ্রব্যে যাহার রসনা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, জল মিশাইয়া দিলে সে ভেজাল ধরিবেই—তাহাকে ফাঁকি দেওয়া চলিবে না, তা জলের মাত্রা যত অল্পই হোক।

তারপর একে একে আরো অনেক গল্প বাহির হইয়া শেষে 'শেষ প্রশ্নে' গিয়া সমাপ্তি লাভ করিল। শরৎচন্দ্র হয়তো এখনো অনেক লেখাই লিখিবেন কিন্তু গাল্পিক শরৎচন্দ্রের নামের

পিছনে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গিয়াছে। উদিবে না উদিবে না অস্ত গেছে সে গৌরবশশী। একথা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া অনুভব করিতেছি।

'পথের দাবী' একটা অদ্ভুত বস্তু। দেশাত্মবোধের এত বড় একটা সংহিতা বোধহয় আর বাংলায় রচিত হয় নাই ; কিন্তু গল্প হিসাবে পথের দাবীর স্থান কোথায় ? সব্যসাচী, ভারতী, সুমিত্রা, অপূর্ব সকলেই বিশিষ্ট চরিত্রের মানুষ বটে কিন্তু তাহাদের চরিত্রের সংঘাতে গল্প জমিয়া উঠিল না। নির্যাতিত দেশের দৈন্য অপমানের চিত্রগুলি পৃথক পৃথক ভাবে ফুটিয়া উঠিল কিন্তু গল্পের মধ্যে তাহারা ঐক্য লাভ করিল না— অসম্বদ্ধ ভাবে অপরিচিতের মত যেন অবাক হইয়া পরস্পরের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। যাহা মানুষের চিরন্তন হাসিকান্নার বেদনানন্দের সংঘাতে রসের রসায়নে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারিত তাহা কেবল ন্যাশানালিজ্‌মের ধারাবাহিক লেকচার হইয়াই রহিয়া গেল !

'শেষ প্রশ্নের' কথা ছাড়িয়া দিই। লেক্‌চার দিবার নেশা যখন মানুষকে পাইয়া বসে তখন তাহা প্রতিভাবান ব্যক্তিকেও যে কতদূর পথভ্রষ্ট করিতে পারে 'শেষ প্রশ্ন' তাহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু এমনটা ঘটিবার কারণ কি ? শরৎচন্দ্র সহসা মধ্য গগনে অস্তমিত হইলেন কেন ? রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ আছে—তিনি মধ্যাকাশে নির্বাপিত হন নাই, ধীরে ধীরে অস্তাচলমুখী হইতেছেন। অর্ধশতাব্দীব্যাপী যে প্রচণ্ড কিরণ তিনি বিকীর্ণ করিয়াছেন তাহার ফলে হীনপ্রভ হইয়া সন্ধ্যার রক্তরাগে পশ্চিম দিগন্ত জ্যোতির্মণ্ডিত করিয়া অস্তমিত হওয়াই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। ইহাই প্রকৃতির রীতি—ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কোন নালিশ নাই। কিন্তু শরৎবাবু ? তিনিও কি এমনি ভাবে জরার প্রভাবে ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন ?

না। শরৎচন্দ্র পরিপূর্ণ পৌর্ণমাসীর রাত্রে সহসা রাহুগ্রস্ত হইয়াছেন। কেমন করিয়া হইলেন তাহার ইঙ্গিত পূর্বে কিছু দিয়াছি।

মানুষের মন লইয়া যাঁহাকে কারবার করিতে হয় তিনি মানুষকে সমাজ হইতে পৃথক করিয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারেন না। দেখিতে গেলেও সে দেখা সত্যকার দেখা হয় না। শরৎচন্দ্রও তাই তাঁহার মানসপুত্তলিগুলিকে সমাজবন্ধনের সহস্র পাকে জড়াইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। সমাজ কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি, সমবেত মানুষের রীতি নীতি প্রয়োজন ও সংস্কার আশ্রয় করিয়া তাহা গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সমাজের সঙ্গে যখন মানুষের দ্বন্দ্ব বাধে তখন তাহা এক মানুষের চিত্তবৃত্তির সহিত অন্য মানুষের চিত্তবৃত্তির সংঘাত ভিন্ন আর কিছুই নয়।

শরৎবাবুর গ্রন্থে এই দ্বন্দ্ব খুব বেশি ফুটিয়াছে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে তিনি প্রধানত এবং সর্বাগ্রে একজন কথাশিল্পী, সমাজের পীড়ন অত্যাচার এগুলি তাঁহার গল্পের উপাদানমাত্র। তাই তিনি যখন এই উপাদানগুলি সুনিপুণভাবে ব্যবহার করিয়া গল্প লিখিয়াছেন মনুষ্য চরিত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন তখন তাঁহার মত কথাশিল্পী বাংলায় বিরল। গল্পের প্রাণবস্তু মানুষ,—সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই—এই বাণী কথাশিল্প সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। শরৎচন্দ্র তাঁহার পূর্বতন উপন্যাসগুলিতে এই মহাবাণীরই অনুসরণ করিয়াছেন।

কিন্তু সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। কবে এই মহা অনিষ্টের সূচনা হইল জানি না কিন্তু ইহার প্রথম প্রকাশ্য লক্ষণ দেখিতে পাই 'অরক্ষণীয়া'তে। সহসা গাল্পিক শরৎচন্দ্র সংস্কারক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার লেখনী মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া সমাজ সংস্কারের একটা অস্ত্র হইয়া দেখা দিল।

'পল্লীসমাজ'ও তাঁহার একখানি ছোট উপন্যাস। ইহাতে আমাদের পল্লীজীবনের অনেক পাপ দুষ্কৃতি ও অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এখানে সামাজিক সমস্যা কোথাও গল্পকে

অতিক্রম করিয়া মুখ্য আসন গ্রহণ করে নাই—তাই সৃষ্টি হিসাবে 'পল্লীসমাজ' অনবদ্য অপরাজেয়।'অরক্ষণীয়াতে'দেখি ঠিক তাহার উল্টা, মানুষগুলা খাটো হইয়া কন্যাদায় সমস্যাকে অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়াছে। তাই 'পল্লীসমাজ' যখন ললিতকলার গৌরবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপ-সৃষ্টির পাশে সগর্বে আসন অধিকার করে 'অরক্ষণীয়া' তখন বিষ্ণুশর্মা ও চাণক্য পণ্ডিতের দ্বারে প্রবেশার্থিনী হইয়া দীননয়নে দাঁড়াইয়া থাকে।

অনেক দায়িত্বহীন সমালোচক এই দিকে শরৎবাবুকে প্ররোচিত করিয়াছে। তিনি একজন মস্ত সমাজ সংস্কারক এই বলিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া তাঁহার মনেও এই ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিয়াছে যে সত্যই তিনি একজন সমাজ সংস্কারক। সেই অবধি তাঁহার গল্পের সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। কবি হঠাৎ ঋষি হইয়া পড়িলে তাঁহার যে দুরবস্থা হয়, ঋষিত্ব বজায় রাখিতে তাঁহাকে যেমন অনেক অকবিজনোচিত কাজ করিতে হয়, গল্প লেখকও সংস্কারক হইয়া উঠিলে তাঁহাকে বহু বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। কৃষ্ণনগরের যে কারিগর চিরদিন পুতুল গড়িয়াছে এবং পুতুল গড়ার দিকেই যাহার প্রতিভা স্ফূর্তি পাইয়াছে সে যদি একদিন স্থির করিয়া বসে যে রঙের ভাঁড় ও তুলি লইয়াই সে ইংরেজকে বহিষ্কৃত করিয়া দেশের দুর্গতি মোচন করিবে তবে তার চেয়ে করুণ ব্যাপার আর কি হইতে পারে? শরৎবাবুও ঠিক সেই পথ ধরিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

শরৎবাবুর লেখাতেই কোথায় একস্থানে পড়িয়াছিলাম যে তিনি একবার কোথাকার সাহিত্য সভার সভাপতি হইয়া যাইতেছিলেন, পথে কবিবর রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন —'অভিভাষণের বদলে একটা গল্প লিখে নিয়ে যেও।' কথাটা কতদূর মর্মান্বেষী তাহা বোধহয় সেদিন শরৎবাবুও বুঝিতে পারেন নাই। বিধি বিড়ম্বনায় আমরা আজ তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি।

আমাদের দেশে একটা গ্রাম্য কথা আছে—খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল করলে এঁড়ে কিনে। শরৎবাবু গল্পের সূক্ষ্ম তাঁত বুনিয়া চলিয়াছিলেন বেশ ছিলেন, হঠাৎ এক বৃষ খরিদ করিয়া কাল করিয়া বসিলেন। এখন এই দুর্দান্ত বৃষটি তাঁহার তাঁত ভাঙিয়া ঝুনা মল্‌মল্ ছিঁড়িয়া একাকার করিয়া দিয়াছে।

স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম আশ্রয় করিয়াছে তাই শরৎ আজ শস্যসম্পদহীন ; অশ্লেষার আশ্লেষে চন্দ্র আজ ক্ষয়িষ্ণু।

প্রশ্ন উঠিতে পারে সমস্যাপ্রধান বা didactic গল্প কি পূর্বে কেহ লেখে নাই? Ibsen, Bernard Shaw-র লেখা কি ব্যর্থ? তাহার উত্তর এই যে শরৎচন্দ্র Ibsen বা Bernard Shaw নহেন, তিনি শরৎচন্দ্র। কোট প্যান্ট পরিলে সাহেবকে ভাল দেখাইতে পারে কিন্তু শরৎচন্দ্রকে ভাল দেখায় না। ধুতি চাদরেই তাঁহাকে সাজে ভাল। সুতরাং ধুতি চাদর পরিয়াই তাঁহার বেড়ানো উচিত।

আমি জানি আমার সহিত অনেকের মতে মিলিবে না। কিন্তু ইহা আমার সমালোচনা নয়, প্রথম পরিচয় হইতে আজ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের লেখা কি ভাবে আমাকে স্পর্শ করিয়াছে তাহারই অকপট ইতিহাস। ইহা আমার ব্যক্তিগত ভাল লাগা-না-লাগার ইতিবৃত্ত। তবে একথাও সত্য যে যদি আমার এই অনুভূতি অন্যান্য রসলিপ্সু ব্যক্তির অনুভূতির সহিত অভিন্ন হয় তবে আমাদের এই উপলব্ধির ইতিহাসটুকু বৈজ্ঞানিক সমালোচনা না হইলেও একেবারে মূল্যহীন নয়। আর ভাল লাগা-না-লাগা ব্যতীত রসবস্তুর অন্য কোনো মাপকাঠি আছে কিনা তাহাও আমি ঠিক জানি না।

ব্যথিত চিত্তে আজ কেবলি মনে হইতেছে শরৎচন্দ্র এই ধূলা-মাটি-ভরা সুখদুঃখানুবিদ্ধ ধরণীর পরিক্রমা ত্যাগ করিয়া অন্য পথে যাত্রা করিয়াছেন এবং পৃথিবী হইতে ক্রমেই বহুদূরে চলিয়া যাইতেছেন।

শরৎচন্দ্রের হিউমার

গত কার্তিকের 'বিচিত্রা'য় 'শরৎচন্দ্রের হিউমার' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। হিউমারের পছন্দসই বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজিয়া না পাওয়ায় লেখক ইংরাজি কথাটিই ব্যবহার করিয়াছেন এবং ঐ হিউমারের উদাহরণস্বরূপ শরৎচন্দ্রের লেখা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত বা উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন।

'হাস্যরস' কথাটা হিউমারের প্রতিশব্দ হইতে পারে কি না এ লইয়া তর্ক করিলে তর্ক বাড়িয়াই যাইবে। তবে একথা বোধ করি নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে যে, হাস্যরস কথাটার অর্থ যত ব্যাপক, হিউমারের অর্থ তত ব্যাপক নয়। যাহা কিছু হাসির দ্যোতক তাহাই হাস্যরস। অতএব হাসি 'ঠোঁট চিরে'ই বহির হোক আর 'বুক চিরেই' বাহির হোক, যাহা ঐ হাসির উৎপাদক তাহাকে হাস্যরস বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু হিউমার সম্বন্ধে ঠিক ও কথা খাটে না কারণ হিউমার হাস্যরসের একটা রূপবিশেষ। বস্তুত হিউমার ও হাস্যরস দু'টা স্বতন্ত্র জিনিস নয়—একটা অন্যের অন্তর্গত।

লেখক গোস্বামী মহাশয় হিউমারের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা 'অবশ্যি' অংশত স্বীকার্য। 'দুনিয়ার আজগুবি অসামঞ্জস্য কিছু দেখলেই আমাদের হাসি পায়, কিন্তু সেই অসামঞ্জস্যের চিত্র যখন আমাদের নানাবিধ অনুভূতিকে যুগপৎ নাড়া দিয়ে সক্রিয় করে তোলে, তাই হয় তখন হিউমার।' বেশ, বুঝিলাম। কিন্তু 'হিউমারের সূক্ষ্ম পর্দা বুনতে টানায় যদি দেয়া হয় হাসি ত পড়েনে দিতে হয় অশ্রু' একথার অর্থ ঠিক বোধগম্য হইল না। লেখক কি বলিতে চান যে অশ্রু হিউমারের একটি অপরিহার্য উপাদান ? Inseparable ingredient ? তাঁহার উপমার ভঙ্গী হইতে সেইরূপ সন্দেহই হয়। কিন্তু ইহাই কি হিউমারের যথার্থ definition ?

Dictionary খুলিয়া দেখিলাম humour-এর অর্থবিশেষ এইরূপ —That mental quality which gives to ideas a ludicrous or fantastic turn and tends to excite laughter or mirth; a quality or faculty akin to wit but depending for its effect rather on kindly human feeling than on point or brilliancy of expression. চোখের জল, টানাপোড়েনের নামগন্ধও নাই। আমরা সাদা কথায় যাহাকে রঙ্গরস বলি, একেবারে ঠিক না হোক, কতকটা তাই। মোটকথা এইযে,যে হাসিতামাসায় জ্বালা মর্মপীড়া নাই। এতদিন সহজ বুদ্ধিতে আমরাও ইহাই বুঝিয়া আসিতেছিলাম। অকস্মাৎ গোস্বামী মহাশয় অশ্রুজলের ধাক্কায় সমস্ত যেন ওলট্ পালট্ করিয়া দিলেন।

Humour-এর সঙ্গে অশ্রুর নিকটতার কথাটা কিন্তু অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। বোধহয়, প্রথম শুনি শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরীর মুখে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর। প্রমথবাবু 'হাসির গানের' প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন —'দ্বিজেন্দ্রলালের হাসি অশ্রুর খুব নিকটেই ছিল।' কথাটাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসি অশ্রুর খুব নিকটেই ছিল বটে। 'রাজা ও রানী'র দেবদত্তের ভাষায় বলিতে গেলে দ্বিজেন্দ্রলালের মনের ভাবটা ছিল,—

'না হাসিয়া করিব কি ? অরণ্যে রোদন ?
সেত বালকের কাজ। অহর্নিশি আর
রোদন না হয় সহ্য, তাই মাঝে মাঝে
রোদনের পরিবর্তে শুষ্ক শ্বেত হাসি
জমাট অশ্রুর মত তুষার কঠিন।'

স্বীকার করিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ কারণেই দ্বিজেন্দ্রলাল যে একজন humourist

ছিলেন একথা কি সিদ্ধ ?

সে যাক, প্রমথবাবুর এই উক্তির পর কেমন করিয়া জানি না আমাদের মনে একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে কান্নার রেশ না থাকিলে হাসি উচ্চ অঙ্গের হয় না। একথা মানি যে হাসি ও অশ্রুর সংমিশ্রণে যে রস উত্থিত হয় তাহা 'মেঘ ভাঙ্গা রৌদ্রের ন্যায়' শিল্পীর সাধনার ধন। কিন্তু তাহা হাস্যরস নহে, হিউমার ত নহেই বরঞ্চ করুণ রসের একটি আলোক প্রতিভাত চিত্র। হাস্যরসের দ্বারা করুণ রসের কারুণ্য পরিস্ফুট করা যায় কিন্তু ইহার বিপরীত সম্ভব নয়।

আর এক কথা। সরস উজ্জ্বল ভাষার চাতুর্য এবং হিউমার এক জিনিস নয়। যে লোক সর্বদা হাসিমুখে কথা কয় সে যে সর্বদা হাস্যরসাত্মক কথাই বলিবে এমন কোনও মানে নাই। শরৎচন্দ্রের লেখা সেইরূপ—উজ্জ্বল, সুস্মিত, গূঢ়রস, যেন সর্বদা কোন প্রচ্ছন্ন কৌতুকে হাসিতেছে! ইহা রচনার এক অপূর্ব ভঙ্গী,—কিন্তু ইহাকে হিউমার বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না।

কিন্তু যাক সে কথা! হিউমার অর্থে যদি অশ্রুনিষিক্ত হাসিই বুঝা যায়, তাহা হইলে গোস্বামী মহাশয় যে উদাহরণগুলির দ্বারা উহা চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সেগুলি কি সুপ্রযুক্ত ? প্রথমেই তিনি Falstaff-এর এক উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও উহার মধ্যে হাসি কিম্বা অশ্রু কোনোটারই সন্ধান পাইলাম না—স্পষ্ট cynic-এর উক্তি। উহার মধ্যে বা পরবর্তী প্রশংসা-পত্রে হিউমার কোথায় ?

তারপর শরৎচন্দ্রের হিউমারের দৃষ্টান্ত। প্রথমেই বর্মার পথে জাহাজের ডাক্তার ও খালাসীদের ঘটনা। এই যদি হিউমারের দৃষ্টান্ত হয় তবে আমরা নাচার। ইহা হাস্যরস রঙ্গরস ব্যঙ্গরস ভাঁড়ামি পরিহাস কৌতুক, Humour Satire Irony, টানা পোড়েন কিছুই নয়—ইহা আমাদের দেশীয় লোকের মনোভাবের উপর জ্বালাময় তীব্র মন্তব্য। এরূপ স্থানে হিউমার অবতারণার অপবাদ দিলে শরৎচন্দ্রের মানহানি করা হয়।

তারপর পর্যায়ক্রমে শ্রীকান্তেরর মাছ চুরির সম্পর্কে সর্পভীতি, টগর বোষ্টমীর জাতিরক্ষা, দীনু ভট্‌চাজের ক্ষীরমোহনপ্রীতি, 'ছোটবাবু'র বর্মাস্ত্রীত্যাগ, পার্বতীর কপালকাটা ও 'বড়দিদি'তে ব্রাহ্মণ দিয়া স্বামীর ছবি দাহ করার কাহিনী, (শেষের দুটি grim humour) হিউমারের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। কোনও একটা মর্মস্পর্শী কথা ক্রন্দন-করুণ নাকি সুরে না বলিয়া সহজ স্বাভাবিক অথচ তীক্ষ্ণ সরস ভাষায় বলিলেই যদি হিউমার হইয়া দাঁড়ায় তবে ত বড় ভয়ানক কথা। নীরু দিদির মৃত্যুটাও তবে একটা humour, শ্রীকান্ত এবং অন্নদা দিদির জীবন-যাত্রাটা একেবারে হাস্যরসে ওতপ্রোত!

আসল কথা বলিতে ভয় হয়—গোস্বামী মহাশয় একজন প্রফেসার—তিনি হিউমার কথাটার ঠিক মর্মগত নির্দেশটি ধরিতে পারেন নাই—তাই এই বিড়ম্বনার সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' 'গোড়ায় গলদ' পড়ুন, দেখিবেন সেখানে হিউমারের ছড়াছড়ি, এমন কি নিছক হিউমার ছাড়া আর কিছু নাই। শরৎচন্দ্রের মধ্যে হিউমার নাই এমন কথা অতি বড় অবাচীনও বলিবে না। কিন্তু যে উদাহরণগুলি দিয়া প্রফেসার মহাশয় শরৎচন্দ্রের হিউমার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেগুলি হিউমারের উদাহরণ নয়। বস্তুত সেগুলির বেশির ভাগই করুণরসের উদাহরণ। গোড়ায় গলদ হইয়া গিয়াছে।

তবে শরৎচন্দ্রের বাক্‌চাতুর্য সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহার সত্য পূর্বেই স্বীকার করিয়াছি। সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে না।

করুণ ও হাস্যরস

করুণরস ফেনাইতে নাই—সংক্ষিপ্ততাই করুণরসের প্রাণ। তাহাকে ফলাও করিয়া প্রসারিত করিয়া লেবুর মত চটকাইলে উহা ক্রমশ তিক্ত হইয়া উঠে। করুণরসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায় ; পাঠকের মন ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠে। করুণরসটি হইবে মুক্তার মত, এক বিন্দু অশ্রুর মত—ক্ষুদ্রতার মধ্যেই সম্পূর্ণ। তবে তাহার মাধুর্য প্রাণ স্পর্শ করিবে। স্মরণ রাখা চাই যে, করুণরসের উদ্দেশ্য পাঠককে দুঃখ দেয়া নয়, তাহার মনকে রসে অভিষিক্ত করা। করুণরসও যাহাতে পাঠকের তৃপ্তিদায়ক হয় সেই চেষ্টা লেখকের করিতে হইবে।

হাস্যরস ঠিক ইহার বিপরীত ; যত তাহাকে ফেনাইয়া হাল্‌কা করা যায় ততই ভাল। হাসি হাল্‌কা বলিয়াই তাহা প্রচুর পরিমাণে দরকার হয়। প্রকৃত হাস্যরস ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হইলেও ক্লান্তি আনে না। লঘু খাদ্য যেমন অপর্যাপ্ত খাইলেও অজীর্ণ হইবার ভয় থাকে না, ইহাও তাই। (বড় বড় আর্টিস্ট ঠিক ইহাই করিয়াছেন)। দুঃখকে প্রকাণ্ড করিয়া দেখাইয়া কোনো লাভ নাই, কিন্তু হাসিকে বড় করিয়া দেখাইয়া লাভ আছে—জগতের আনন্দবৃদ্ধি হয়। জগতের আনন্দবৃদ্ধিই আর্টিস্টের সাধনা। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে মানুষকে শুধু কাঁদাইলে চলিবে না, হাসাইতে হইবে। হাসি ও কান্নার মেঘরৌদ্রে মনের আকাশ আচ্ছন্ন থাকিবে কিন্তু মেঘ যেন কম থাকে, রৌদ্রের স্বর্ণচ্ছটা যেন মেঘের গায়েও সোনার রঙ ফলাইতে পারে। সূর্যের কিরণে মেঘ যেন হাসিয়া উঠে, মেঘের ছায়ায় সূর্যের জ্যোতি যেন ম্লান না হয়।

অম্বর যদি মেঘে মেদুর হয় তাহা যেন ক্ষণকালের জন্য হয়। চপলার দ্যুতি যেন ক্ষণে ক্ষণে তাহার অন্ধকারকে জ্যোতির্ময় করিয়া তুলে, মেঘরন্ধ্রচ্যুত জ্বলদর্চিরেখা যেন পতাকার মত উড়িতে থাকে—বর্ষণের বারি যেন ময়ূরের কণ্ঠ হইতে আনন্দর কেকাধ্বনি বাহির করিতে পারে।

শোক বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠের আর্তধ্বনির মত হ্রস্ব হোক, আনন্দ ঝরনার হাসির মত অফুরন্ত হোক—শিল্পীর ইহাই আদর্শ।

৪ আশ্বিন ১৩৩৯

স্টাইল

স্টাইল কাকে বলে ? যখন শুনি, অমুকের একটা বিশিষ্ট স্টাইল আছে বা অমুক খুব সুন্দর স্টাইলে বাংলা লেখে, তখন বিস্ময়বোধ হয়। স্টাইল কি ? নির্ভুল ভাষা লেখাই কি স্টাইল ? নিজের মনের কথাকে স্পষ্ট করে সুন্দর করে ব্যক্ত করতে পারার নাম কি স্টাইল ? তা যদি হয় তবে এর স্টাইলের সঙ্গে ওর স্টাইলের তফাৎ এমন কথা শোনা যায় কেন ? যাঁরা ভাল করে মনের ভাব পরিস্ফুট করতে পারেন তাঁদের সকলের স্টাইলই তো সমান হবে।

ক্রিয়াপদকে প্রথমে বসিয়ে তারপর কর্তা কর্ম বিশেষ্য বিশেষণের জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে বিশিষ্ট স্টাইল তৈরি করবার চেষ্টা আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। এই জাতীয় লেখকেরা বোধহয় মনে করেন যে প্রচলিত ও সাধারণ প্রথার বহির্ভূত একটা কিছু করলেই সেটা বিশিষ্ট স্টাইল হয়ে

দাঁড়াবে। 'নিয়ে এল এক পেয়ালা চা অনীতা—' লিখেই এঁরা নিরতিশয় আত্মপ্রসন্নতা অনুভব করেন এবং নিজেকে একজন conscious stylist বলে মনে করে স্ফীত হয়ে ওঠেন। নির্বুদ্ধিতার যে উচ্চস্তরে এই জাতীয় স্টাইলের সৃষ্টি হয় সেখানে চিন্তাবস্তুর বালাই নেই।

কিন্তু একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বড় বড় লেখকের লেখায় পরস্পর থেকে বেশ একটু পার্থক্য পাওয়া যায় যাকে ভাল বা মন্দ বলে নির্দেশ করা যায় না। যেমন বঙ্কিম ও রবীন্দ্রের লেখা। দুজনের লেখার ভঙ্গী এক নয় অথচ একটা অন্যটার চেয়ে ভাল একথাও বলা চলে না। এই পার্থক্যটাই সাধারণে style বলে পরিচিত হয়েছে।

কিন্তু এই স্টাইলের তফাৎ কেন হয়েছে সেটাও ভেবে দেখা উচিত। বঙ্কিমবাবু যে-সব বাংলা শব্দ ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন রবিবাবু তদতিরিক্ত কিছু ব্যবহার করেননি। তবে style-এর তফাৎ হল কেন?

আসলে চিন্তার ভঙ্গী সকলের এক নয়, সেইজন্যই লেখার ভঙ্গীতে তফাৎ হয়। রবিবাবু যে angle থেকে বস্তুকে দেখেন বঙ্কিমবাবু সে angle থেকে দেখতেন না। তাঁদের চিন্তার lineও (পথ) ছিল আলাদা। তাই বঙ্কিমবাবুর চিন্তা স্বভাবত এক আকার গ্রহণ করেছে এবং রবীন্দ্রের চিন্তা অন্য আকার পেয়েছে। এখানে নিজের বৈশিষ্ট্য বাঁচিয়ে লেখবার চেষ্টা কোনো পক্ষেই নেই—আছে কেবল নিজের নিজের চিন্তাকে সবচেয়ে ভাল রূপ দেবার অভিলাষ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে চিন্তার বিশিষ্টতাই স্টাইলের বিশিষ্টতা সৃষ্টি করে। যেখানে স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা নেই সেখানে স্বাধীন style আসতে পারে না। সেখানে থাকে কেবল—'নিয়ে এল এক পেয়ালা চা অনীতা'—এই ধরনের উৎকট ভাষা। অবশ্য পা উঁচু করে মাথা দিয়ে হাঁটার যদি কোনো স্বাধীন স্টাইল থাকে তো এতেও আছে।

সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে শরৎবাবুর লেখার style বদলে গেছে। তার কারণ এ নয় যে তিনি বাংলা শব্দ বর্জন করে অন্য কোনো ভাষায় লিখছেন। তার আসল এবং একমাত্র কারণ, পূর্বে তিনি যে পথে চিন্তা করতেন, তাঁর দৃষ্টি ও অনুভূতি যে ধরনের ছিল এখন তা বদলে গেছে। তাই তাঁর আভ্যন্তরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে style-এও প্রভেদ দেখা দিয়েছে। প্রভেদটা বিবর্তনমুখী কিনা সে বিচার অন্যে করবেন।

যাঁরা পরের style অনুকরণ করেন তাঁরা হয় নিজেরা মস্তিষ্কহীন নয় তো তাঁদের ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত বাহন নেই বলে অন্যের style গ্রহণ করেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে ভাষার দৈন্যবশত অন্যের ভাষা ধার করাকে মার্জনা করা যেতে পারে—কিন্তু কয়েক দিয়ে কী লিখে রবীন্দ্রনাথের স্টাইল অনুকরণ করার মত হাস্যকর চেষ্টা খুব অল্পই আছে।

Chesterfield সত্যই বলেছেন, 'Style is the dress of Thoughts'. তাই পোশাকটাই যে সর্বস্ব নয় সেটা স্মরণ রাখতে হবে। Thoughts বাদ দিয়ে যারা style রচনা করে তারা দর্জির দোকানের পোশাক পরা dummy তৈরি করে মাত্র।

১০ কার্তিক ১৩৩৯

ডিটেকটিভ গল্প

ডিটেকটিভ গল্পের প্রতি আমাদের শিক্ষিত সমাজের একটা অবজ্ঞার ভাব দেখা যায়। সাহিত্যের যাঁহারা high brow তাঁহারা নাক সেঁটকান—যেন ওটা অস্পৃশ্য। কাম-কম্‌প্লেক্স লইয়া যাঁহারা কারবার করেন তাঁহাদের তো কথাই নাই—তাঁহারা মনে করেন রিরংসা ভিন্ন জগতের আর সব কিছুই শিল্পীর চিন্তা ও চিত্রণের অযোগ্য। বুদ্ধির সহিত যে বস্তুর সংস্পর্শ আছে তাহা তাঁহাদের এলাকায় পড়ে না।

অথচ Edgar Allan Poe ডিটেকটিভ গল্প লিখিয়াছেন,Conan Doyle তো লিখিয়াছেনই এমন কি Chesterton ও Hilaire Belloc ও বাদ যান নাই।

ইংল্যান্ডের popular literature এখন ডিটেকটিভ গল্পে পূর্ণ। Wodehouse বলিয়াছেন; 'England is full of...reading each others detective stories.' তামাসাচ্ছলে বলিলেও কথাটার মধ্যে সত্য আছে।

কিন্তু আমাদের দেশে উহার প্রতি সাধারণের এত অশ্রদ্ধা কেন ? প্রথম কারণ, যাঁহারা এদেশে সর্বাগ্রে গোয়েন্দার গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অক্ষমতা। তাঁহারা গোড়াতেই জিনিসটাকে খেলো করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সাহিত্যরস বাদ দিয়া গল্প লিখিয়াছেন তাই প্রকৃত রসিক ব্যক্তির রস-পিপাসা তাহাতে মিটেনা। ডিটেকটিভ গল্প যেন অন্ত্যজের ঘরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাই সে বর্ণশ্রেষ্ঠদের কাছে হেয় ও অবজ্ঞাত হইয়া রহিল। ইহা ডিটেকটিভ গল্পের দোষ নয়—দোষ তাহার জন্মদাতাদের। দ্বিতীয় কারণ, বিদেশ হইতে তৃতীয় শ্রেণীর ডিটেকটিভ গল্পের আমদানী। এই বিদেশী গল্পগুলা জাপানী টিনের খেলনার মত অত্যন্ত cheap (শস্তা), বুদ্ধিতে ও সাহিত্যরসজ্ঞতায় যাহারা শিশু তাহাদেরই আনন্দ দিতে পারে। ইহাদের অভ্যাগমে আমাদের intelligent মন ডিটেকটিভ গল্পের উপর আরো বিরূপ হইয়া উঠিল।

কিন্তু ডিটেকটিভ গল্প সত্যই অবজ্ঞার নয়। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্র এত প্রশস্ত যে তাহা অসীম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুত তাহার সীমানা টানিয়া গণ্ডী নির্দেশ করা একেবারে অসম্ভব। যাহা কিছু কল্পনা করা যায়, তাহাই কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু হইতে পারে। যিনি Rudyard Kipling-এর গল্প পড়িয়াছেন তিনি একথার মর্ম বুঝিবেন।

ডিটেকটিভ গল্প যদি অপাংক্তেয় হয় তবে historical romance ও অপাংক্তেয়। দুয়ের মধ্যে তফাৎ কোথায় ? একটা অতীতের romance, অন্যটা বর্তমানের romance। যদি ডিটেকটিভ গল্পকে আমরা ঘৃণা করি তবে ন্যায়তঃ 'রাজসিংহ' 'Ivanhoe' কেও ঘৃণা করিতে বাধ্য। যাঁহারা 'রাজসিংহ' বা 'Ivanhoe'কে নিকৃষ্ট বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ডিটেকটিভ গল্পকে ঘৃণা করুন আমার কিছু বলিবার নাই।

আমি ডিটেকটিভ গল্প লিখি—লিখিয়া তিলমাত্র লজ্জা অনুভব করিনা। ব্যোমকেশ আমার প্রিয় সৃষ্টি, তাহার সংস্পর্শে আসিয়া আমার মস্তিষ্ক ও কল্পনা stimulated হয়। ব্যোমকেশের গল্পে যদি সাহিত্যরস না থাকিয়া শুধু thrill ও শস্তা sensation থাকে তবে সাহিত্য বিচারকগণ তাহাকে দ্বীপান্তরিত করুন আপত্তি নাই। কিন্তু যদি তাহা থাকে তবে শুধু ডিটেকটিভ বলিয়া তাহাকে শাস্তি দিবার অধিকার কাহারো নাই।

২১-৮-১৩৩৯

নবীনের শিক্ষা

বাংলা সাহিত্যে যাঁহারা অতি আধুনিক বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের লেখার মধ্যে একটা আদর্শকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা দেখা যায়। সে আদর্শটা পশ্চিম হইতে ধার করা। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ধারা বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়া এখন যেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—সেই উপস্থিতটাকেই বাঙালী অতি-আধুনিক আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং সেই ছাঁচে সাহিত্য গড়িতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মনের ভাবটা এই যে উহারা যাহা লিখিতে পারে আমরা তাহা লিখিলেই বা দোষের হইবে কেন?

কেন যে দোষের হইবে, অত্যন্ত নিকটদর্শী বলিয়া ইঁহারা দেখিতে পান না। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে। বয়ঃপ্রাপ্ত বড় ভাই ধূপমান করে দেখিয়া সাত বছরের ছোট ভাইও যদি সিগারেট ফুঁকিতে আরম্ভ করে তবে তাহা দেখিয়া আমরা কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করি? মুখে না হোক মনে মনেও বলি—জ্যাঠা ছোঁড়া! পরকাল একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে!—অতি আধুনিকদের সম্বন্ধে ঠিক একথাগুলাই সর্বাগ্রে মনে আসে।

ইংরেজি সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। তার একটা বহুযুগব্যাপী প্রাচীন আভিজাত্য আছে। চসারের কাল হইতে আজ পর্যন্ত এই ছয়-সাত শত বৎসর ধরিয়া ধারাবাহিকভাবে ধীরে ধীরে তাহারা এই সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে; ইটের পর ইট গাঁথিয়া এই গগনভেদী ইমারৎ খাড়া করিয়াছে। এখন এই ইমারতের দেয়ালে সীলিংয়ে যদি তাহারা ফ্রেস্কো আঁকিয়া তাহার শোভা বর্ধন করিতে চায়—এমন কি কুশ্রী করিয়া তুলিতেও চায় তাহাতে ইমারতের কোনো ক্ষতি হইবে না। তাহার magnificent outline ইহাতে তিলমাত্র জখম হইবে না। পরবর্তী generation আসিয়া দেয়ালে চুনকাম করিয়া আবার নূতন ছবি আঁকিবে। এ যুগের কুশ্রীতা মুছিয়া যাইবে--broad background যাহা ছিল তেমনি থাকিয়া যাইবে।—বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে একথা বলা চলে কি?

আধুনিক বাংলা ভাষার বংশানুক্রম তিনপুরুষ পর্যন্ত পাওয়া যায়—তার আগে আর কিছুই নাই। বর্তমান শরৎচন্দ্র, অস্তমিতপ্রায় রবীন্দ্রনাথ এবং বংশপ্রতিষ্ঠাতা বঙ্কিমচন্দ্র। ঐতিহাসিকেরা যাহাই বলুন ধারাবাহিক সাহিত্য বঙ্কিমের পূর্বে পাওয়া যায় না। সুতরাং বাংলা ভাষার বয়স দাঁড়াইল ৬০/৭০ বৎসর—অর্থাৎ হামাগুড়ি শেষ করিয়া এখন অতি কষ্টে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। যেটুকু চলিতে পারে তাহাও হাঁটি হাঁটি পা পা। এই ছেলেকে এখনই দাদার দেখাদেখি সিগারেট ধরাইবার চেষ্টা নবীনেরা করিতেছেন। ইমারতের উপমাটা টানিয়া আনিলে বলিতে হয়, ভিতের গাঁথুনি সবেমাত্র মাটি ছাড়াইয়া উঠিয়াছে ইহারি মধ্যে নবীনেরা তাহার গায়ে নানা রকম ফ্রেস্কো আঁকিতে শুরু করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে গাঁথুনির কাজ ও ফ্রেস্কোর দশা শেষ পর্যন্ত কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা অনুমান করা শক্ত নয়।

বোঝা দরকার যে ইট-পাথর চুন সুরকির কাজ এখনো বিস্তর পড়িয়া রহিয়াছে—সাহিত্যিকগণ এখন সেই পরিশ্রম-পূর্ণ হাড়ভাঙা খাটুনি খাটুন—ঈশ্বর কৃপায় একদিন ইহার বীম-বরগা চড়িবে কিন্তু তাহারো অনেক দেরি। ইতিমধ্যে আমরা কুলিমজুরের মত ইট-সুরকি বহন করিয়া থাকি—যাঁরা রাজমিস্ত্রি আছেন তাঁরা গাঁথুনির কাজ করুন। ইঞ্জিনিয়ারগণ পরিদর্শন করুন, প্ল্যান করুন—কমজোর স্থান ভাঙিয়া পুনর্গঠন করুন। ভরসা আছে, বহুজনের বহুযুগের সাধনায় যখন এই অট্টালিকা আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে তখন দেশবিদেশ হইতে বহু লোক আসিয়া এই তাজমহলের দিকে বিস্ময় মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিবে।

হে অতি-আধুনিক শিল্পী, সেই সময় তুমি আসিও। যদি পারো, এই মহাশিল্পের দ্যোতনায় অনুপ্রাণিত হইয়া ইহার অঙ্গ চারুচিত্রিত করিও; তোমার শিল্প স্থায়ী হইবে। আর যদি তোমার

শিল্প এই প্রাসাদের প্রতিভা - (অনুভাব) পরিপন্থী হয়—তাহা দুদিন পরে মুছিয়া যাইবে। প্রাচীর সুধালিপ্ত করিয়া আবার নবনব শিল্প জন্মগ্রহণ করিবে। তুমি থামিবে না—কিন্তু এই মহান সৌধচূড়া চিরদিন গগনলেহী হইয়া থাকিবে।

১৭ পৌষ ১৩৩৯

কবিতা ও মিল

কাব্য লেখক কেউ কেউ বলেন শোনা যায় যে কবিতায় মিল একটা উৎপাত, কবির বক্তব্যকে সে নিজের তাগিদে ভাল করে পরিস্ফুট হতে দেয় না। তাঁরা তাই Walt Whitmanএর দোহাই দিয়ে free verse লেখেন। এ ধরনের লেখায় তাঁদের বক্তব্য কতদূর বেশি পরিস্ফুট হয় তা বোধহয় তাঁরাই বলতে পারেন—কারণ পাঠকেরাও বড় কিছু পায় না।

যাঁরা মিলকে একটা অবশ্য ত্যাজ্য বন্ধন বলে মনে করেন, তাঁদের বিশ্বাস, কাব্য জিনিসটা তাঁদের বক্তব্য মতামত বা তত্ত্ব প্রকাশ করবার একটা যন্ত্র মাত্র। কিন্তু বস্তুত কি তাই? আমাদের তো মনে হয় কাব্য হচ্ছে মনুষ্য হৃদয়ের irresistable একটা emotion, একটা দৈবী আবির্ভাব—এ আর্বিভাব যখন হয় তখন মানুষ কাব্য না লিখে থাকতে পারে না। কথা গুণে গুণে যারা কাব্য লেখে তারা কাব্য লেখে না। তারা লেখে ছড়া।

সত্যিকার কাব্যলক্ষ্মী যখন হৃৎকমলে উদিত হন, তখন তিনি সর্বালঙ্কারভূষিতা হয়ে পায়ে মিলের মঞ্জীর বাজিয়ে আসেন। কাজেই তাঁকে যখন আমরা পাই তখন মিল অলঙ্কার সুদ্ধই পাই—মিলের জন্য বাইরে খুঁজে বেড়াবার দরকার হয় না। তখন যে কবিতা আমাদের হাত থেকে বার হয়, তার মিল আপনি এসে জোটে, তার পদে পদে ছন্দের ঝঙ্কার আপনি বেজে ওঠে।

এমনও কদাচ দেখা যায় যে কাব্যলক্ষ্মী নিরাভরণ বেশে দেখা দিলেন। তখন ঐ রিক্ততাই তাঁর স্বরূপ—সেই রূপেই তাঁকে বরণ করে নিতে হবে। তাকে তখন বাহ্য অলঙ্কার পরাবার চেষ্টা যেমন পণ্ডশ্রম তেমনি বিড়ম্বনা।

কাব্যলক্ষ্মীর এই নিরাভরণ নগ্নরূপ ক্বচিৎ দু'একজন কবির কবিতায় দেখতে পাই—মনে হয় মিল বা অলঙ্কারের আড়ম্বর থাকলে এসব কবিতা নষ্ট হয়ে যেত।

মোটের ওপর রবীন্দ্রনাথের কথাটাই ঠিক—ল্যাজ আর কবিত্ব টেনে বার করা যায় না। যাদের প্রাণে কাব্য নেই অথচ কবিতা লেখবার সখ আছে—মিলের ওপর আক্রোশ তাঁদেরই। তাঁরা টেনে ল্যাজ বের করতে চান, ফলে ল্যাজও ভাল করে বেরোয় না এবং মানুষের চেহারাটাও নষ্ট হয়ে যায়।

১ অগ্রহায়ণ ১৩৪০

উভকামী মন

প্রতি মানুষেরই মনের দু'টি দিক আছে। এই দুই দিককে যথাক্রমে Active ও Passive অথবা Male ও Female দিক বলা যেতে পারে। প্রতি পুরুষের মধ্যেই এক অজ্ঞাত স্ত্রীলোক রয়েছে আবার প্রতি স্ত্রীলোকের মধ্যেও এক অজ্ঞাত পুরুষ রয়েছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় পুরুষ ও স্ত্রী এতো পরস্পর বিরোধী জিনিস একত্রে থাকবে কি করে ? একজন পুরুষ আবার স্ত্রীলোক—তেমনি একজন স্ত্রীলোক একটি পুরুষও—এ কেমন ধারা ? এ যেন সোনার পাথরবাটি।

বিজ্ঞানের দিক থেকে কিন্তু এটাই সত্যি। প্রতি মানব-মনই স্ত্রী-পুরুষের সংমিশ্রণ। আমাদের কাছে এটা আজগুবি মনে হবার কারণ আমাদের ভুল চিন্তাধারা। আমরা স্ত্রী ও পুরুষ এই দুটো দিককে পরস্পরবিরোধী বলে ভাবতে শিখেছি। অথচ এই শিক্ষার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ছোটবেলা থেকে যেমনটি শুনেছি তেমনটি শিখেছি—সেটাকেই সত্যি বলে ধরে নিয়েছি। আর এই এত দিনের সত্যি বলে জানার বিরোধী কোনও জ্ঞান যদি আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়, আমরা তৎক্ষণাৎ তার সত্যতায় সন্দেহ করি। সেটাকেই অবাস্তব ভাবি। তাই মানসিক গঠন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা যখন বলেন যে প্রতি মনেই স্ত্রী-পুরুষ একসাথে বাস করছে তখন আমাদের অদ্ভুত মনে হয়। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে—স্ত্রী ও পুরুষ মন আলো-আঁধারের মত পরস্পর বিরোধী নয়। এরা পরস্পর পরিপূরক। প্রকৃতির নিয়মেই এ দু'টি দিক প্রতি মনের মধ্যে রয়েছে আর এই দু'টি দিক যে মনে যত সুষ্ঠুভাবে (harmoniously)রয়েছে—সে মন তত বেশি সুস্থ, সক্রিয় ও সবল। অবশ্য এই স্ত্রী-পুরুষ গুণগুলি প্রত্যেকের মধ্যে সমমাত্রায় নেই। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় ইহা বর্তমান। তাই স্বভাবতই দেখা যায় কোনও পুরুষের মধ্যে মেয়েলীপনা একটু বেশি আবার কোনও স্ত্রীলোকের মধ্যে পুরুষালীভাব বেশি। ফ্রয়েড মনের এই দুই যৌন দিকের নাম দিয়েছেন—Bi-sexuality (উভকামিতা)।

কোনও মনের মধ্যে যদি এই দুই দিকের কার্যকরী সুসঙ্গতি (Workable harmony) নষ্ট হয় তাহলে সেখানে নানারূপ মানসিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। পুরুষের মধ্যে যে স্ত্রী-গুণ (Female trait) রয়েছে সেই স্ত্রী-গুণ পুরুষকে অপর স্ত্রীলোকের দিকটা—তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভালো-মন্দ বুঝতে সক্ষম করে। তেমনি স্ত্রীলোকের মধ্যে যে পুরুষ-গুণ (Male trait) রয়েছে তা স্ত্রীলোককে পুরুষের কামনা-বাসনা ও সুবিধা-অসুবিধা বুঝতে সক্ষম করে। কাজেই কোনও পুরুষের এই স্ত্রী-গুণ যদি সুনিয়ন্ত্রিত (Properly adjusted) না থাকে—অর্থাৎ বাধা প্রাপ্ত হয়ে অবদমিত (Repressed) হয় তাহলে সেই পুরুষ স্ত্রীলোকের প্রতি সহানুভূতিহীন ও স্ত্রীবিরোধী হবেন। স্ত্রীলোকের বেলাও তাই। স্ত্রীলোকের পুরুষ-গুণ অবদমিত হলে সে স্ত্রীলোক পুরুষকে বুঝতে সক্ষম হবেন না। তিনি পুরুষের প্রতি উদাসীন অথবা বিরক্তিপূর্ণ হবেন। তাই বিবাহিত দম্পতির দু'জনের মধ্যে কারও যদি কাজ চলা মত মানসিক সুসঙ্গতি না থাকে তাহলে বিবাহিত জীবন কলহ-দ্বন্দ্ব ও অশান্তিপূর্ণ হয়ে থাকে।

আসলে দম্পতিযুগলের মধ্যে যৌন ঈর্ষা ও তজ্জনিত কলহের উৎস এই মানসিক দ্বন্দ্বে বর্তমান। স্ত্রীলোকের মধ্যে যে পুরুষ-দিক রয়েছে সেই পুরুষ-দিক যৌনতৃপ্তি পায় স্বামীর পুরুষ ইচ্ছার সাথে একাত্মিক (Identified) হয়ে। তেমনি পুরুষের মধ্যে যে স্ত্রী-দিক রয়েছে সেই স্ত্রী-দিক যৌন তৃপ্তি পায় স্ত্রী ইচ্ছার সাথে একাত্মিক হয়ে। তাই স্বামী ও স্ত্রীর অজ্ঞাত স্ত্রী ও পুরুষ-দিক যত বেশি পরস্পরের স্ত্রী ও পুরুষ-দিকের সাথে একাত্মিক হতে পারে মিলন তত মধুর হয়। কাব্যিকভাবে আমরা যাকে 'মধুর মিলন' বলে থাকি তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এই মানসিক একাত্মিকতায় (Identification)।

এখন দেখা যাক কোনও স্ত্রী বা পুরুষের একাত্মিকতার ক্ষমতা বাধাপ্রাপ্ত হলে কিরূপ মানসিক বিপর্যয় ঘটতে পারে এবং কেমন করে। পুরুষের স্ত্রী-গুণ যদি অবদমিত হয় তখন সেই স্ত্রী-গুণ স্ত্রীর স্ত্রী-ইচ্ছার সাথে একাত্মিক হয়ে যৌনতৃপ্তি খোঁজে। অথচ অবদমন থাকার দরুণ এরূপ পুরুষ সোজাসুজিভাবে নিজেকে স্ত্রীলোক কল্পনা করেও তার স্ত্রী-ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন না। তখন এই স্ত্রী-ইচ্ছা বিপরীত ভাবে তৃপ্তি খোঁজে। এই স্ত্রী-ইচ্ছা তখন পরিণত হয়—যৌনঈর্ষা (Sexul jealousy), সন্দেহ (Suspicion) ও ভ্রান্তবিশ্বাসে (Delusion)। আর এগুলি নিক্ষিপ্ত হয় (Projection) স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি। এরূপ স্বামী তখন স্ত্রীকে ভ্রষ্টা বা অপর পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ভাবতে থাকেন এবং স্ত্রীর জীবনকে বিষময় করে তোলেন। যদি স্ত্রী বাস্তবে হাজারও সতী সাধ্বী হয়ে থাকেন তবু এরূপ স্বামী তা বিশ্বাস করেন না। স্ত্রীর ভ্রষ্টামি সম্বন্ধে স্বামীর বিশ্বাস হবে দৃঢ়। এ সন্দেহ ও বিশ্বাস ভ্রান্ত হলেও স্বামী প্রবলভাবে আঁকড়ে থাকবেন একে। তার কারণ এই বিশ্বাস ও সন্দেহের মাধ্যমে তার নিজের স্ত্রী-ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে। স্ত্রী অপর পুরুষকে দিয়ে সঙ্গম করাচ্ছেন—স্বামীর এই বিশ্বাসের ও সন্দেহের উৎস রয়েছে স্বামীর নিজের স্ত্রীলোক হয়ে অপর পুরুষের নিকট যৌন সুখ ভোগের যে ইচ্ছা তার মধ্যে। এ জাতীয় স্বামী তাই স্ত্রীকে বাড়ির বাইরে যেতে দেবেন না। নিজে বাড়ির বাইরে গেলে স্ত্রীকে তালাবন্ধ করে দেবেন। বন্ধু-বান্ধবের সে বাড়িতে যাওয়া বন্ধ হবে।

অনুরূপ ব্যাপার ঘটে থাকে স্ত্রীলোকের পুরুষ-গুণ অবদমিত হলে। স্ত্রী তখন তার পুরুষ-ইচ্ছাকে স্বামীর পুরুষ-ইচ্ছার সাথে একাত্মিক করে তৃপ্তি পেতে পারেন না। আবার কল্পনায় নিজেকে পুরুষ ভেবেও নিজের পুরুষ-ইচ্ছা চরিতার্থ করতে পারেন না। কিন্তু ইচ্ছা—সে ছাড়বার পাত্র নয়। যেমন করেই হোক সে নিজেকে তৃপ্ত করবে। তাই স্ত্রী-ইচ্ছাকেও এক্ষেত্রে বিপরীত পথ নিতে হবে (Indirect wishfulfilment)। স্ত্রী তখন স্বামীর চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হবেন। তার স্বামীর প্রতি যৌনঈর্ষা জাগবে। তিনি ভাববেন তার স্বামী বুঝি বাইরে বাইরে অপর স্ত্রীলোককে ভালবাসেন এবং নষ্টামি করেন। স্ত্রীর কোনও বান্ধবী বা অপর কোনও স্ত্রীলোক বাড়িতে এলে—তখন তিনি নিজের স্বামীর ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি আচার-আচরণ ও কথাবার্তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন ও নানা অযৌক্তিক অর্থ আরোপ করার প্রয়াস পাবেন। অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণে দেরি হলে তো আর রক্ষাই থাকবে না। সেদিন ঝগড়া হবে তুমুল।

মানসিক সুসঙ্গতির অভাবে শুধু যে দাম্পত্য জীবনই অশান্তিপূর্ণ হয় তাই নয়। যে কোনও ব্যক্তির মনে স্ত্রী ও পুরুষ—এই দুই দিকের দ্বন্দ্ব (Conflict) বাধলে তার নানারূপ মানসিক রোগ হতে পারে। যে রোগগুলিকে আমরা সাধারণভাবে Neurosis বা Psychosis বলতে পারি। এই রোগের দরুণ ব্যক্তির জীবনের সুখ-শান্তি, ভোগ-তৃপ্তি ও কর্মক্ষমতা বিভিন্ন মাত্রায় ব্যাহত হতে পারে। তাই প্রতি মনের এই দুই দিকের একটা কার্যকরী সুসঙ্গতি (Workable harmony) বাঞ্ছনীয়। যে সব ক্ষেত্রে এরকম সুসঙ্গতির অভাব দেখা যায় সেখানে মানসিক চিকিৎসার দ্বারা মনের দ্বন্দ্ব দূর করে তার সঙ্গতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আধুনিক মনোবিজ্ঞান—বিশেষ করে Psycho-Analysis বা মনঃসমীক্ষা এ বিষয়ে অত্যাশ্চর্য ভাবে কার্যকরী হয়েছে।

আপন পর

দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানে যিনি সঙ্গদান করেন তিনিই বন্ধু। গত তিন চার বছরে বাঙালীর জীবনে উল্লিখিত বিপর্যয়ের কোনটিই বাদ পড়ে নাই ; সুতরাং কে বন্ধু কে শত্রু তাহা চিনিয়া লইবার সুযোগ তাহার যথেষ্ট ঘটিযাছে। শ্মশানের চিতার আলোয় বাঙালী কি বন্ধুর মুখ চিনিতে পারে নাই ?

নোয়াখালিতে বাঙালী হিন্দুর বুকে শূল বিঁধিয়াছে। মুখের সহানুভূতি আমরা অনেক পাইয়াছি কিন্তু কৈ বাঙালীর এই হৃদয়শল্য উদ্ধার করিতে অহিন্দু কেহ তো আসিল না। সুদূর গুজরাত হইতে এক হিন্দু—এক কৌপীনধারী সন্ন্যাসী আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তৃণাদপী সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু তিনি আর্ত বাঙালীর দ্বারে দ্বারে অশ্রুজল মুছাইয়া ফিরিতেছেন। তিনি মহাপুরুষ একথা ভুলিয়া গিয়া আজ ইহাই শুধু মনে হইতেছে যে তিনি হিন্দু। হিন্দুর মত হিন্দুর বন্ধু আর নাই।

তারপর বেহার। বাঙালী হিন্দুর নিগ্রহ বেহারী হিন্দুর গায়ে লাগিয়াছিল ; এই নিষ্ঠুর অবমাননা সে সহ্য করিতে পারে নাই, সংযম হারাইয়াছিল। এই অসংযম ধর্মসঙ্গত কিনা, রাজনীতির পরিপন্থী কিনা সে বিচার আমরা করিব না। আমরা শুধু দেখিব শ্মশানের আলোয় বন্ধুর মুখ। আমরা ভাবিব, কি করিয়া এই প্রীতির ঋণ শোধ করিব। প্রীতি দিয়াই প্রীতির ঋণ শোধ হয়।

ভাবতবর্ষের চতুষ্কোণে যেখানে যত দূরেই হিন্দু থাক, তাহার বুকে নোয়াখালির আঘাত বাজিয়াছে, যাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁহারাই একথা জানেন। বোম্বাই প্রদেশে এখনও যে ধিকিধিকি আগুন জ্বলিতেছে তাহাও নোয়াখালির আগুনের ফুল্‌কি।

বাঙালী হিন্দুর আপনজন কে এখনও কি তাহারা বুঝিবে না ?

হিন্দু ভিন্ন হিন্দুর অন্য বন্ধু থাকিতে পারে না এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। যাঁহারা সম্প্রদায়ের গণ্ডী ছাড়াইয়া মানবতার বিস্তীর্ণতর লোকে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, মুসলমান হোন, ক্রিশ্চান হোন তাঁহারা আমাদের বরেণ্য। কিন্তু যেখানে রক্তের আকর্ষণে রক্ত সাড়া দেয়, নাড়ীর টানে প্রান্তিক ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়া যায়, আমাদের প্রীতি ও আত্মীয়তা সেইখানেই নিবেদিত হইবে।

ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি হিন্দুর সহিত বাঙালী হিন্দু একাত্মতা অনুভব করুক, তবেই সে অভয় হইবে সুস্থ হইবে নিরাপদ হইবে। ইন্দুর্দ্বিলক্ষং কুমুদস্য বন্ধুঃ যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম্।

যাদের করেছ অপমান

১লা শ্রাবণ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় শ্রীপ্রথমনাথ বিশী লিখিত 'রাষ্ট্রভাষা ও রাষ্ট্রলিপি' পাঠ করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। আজকাল বাংলা ভাষায় ছাপার অক্ষরে যাহা কিছু বাহির হয় তাহার পনেরো আনা রাজনীতি, এমন কি গল্প-উপন্যাসও রাজনৈতিক কুস্তির আখড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙালী যেন সব ভুলিয়া রাজনৈতিক মল্লযুদ্ধে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই দুর্দিনে

প্রমথবাবুর ধীর অপ্রমত্ত রচনাটি আমাদের মনে এই আশ্বাস জাগাইয়াছে যে বাংলাদেশে হয়তো এখনও এমন কয়েকজন মানুষ আছে যাহারা নির্লিপ্তভাবে চিন্তা করিবার এবং অরুচিকর সত্য কথা বলিবার শক্তি হারায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, বাঙালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলে বঙ্কিম বলিতেন, বাঙালী কাঁদিতে ভালবাসে, কাঁদিবার একটা সুযোগ পাইলে সে কৃতার্থ হয় এবং কাঁদিতে কাঁদিতে উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইয়া যায়। বাংলা দেশে মাথুরের পালা যেমন জমে তেমন আর কোনও পালা জমে না।

সম্প্রতি বাঙালী কাঁদিবার অনেকগুলি ভালভাল ছুতা পাইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ধুয়া তুলিবার লোকের অভাব নাই। তাহারা সমস্বরে চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে—বাঙালীকে কেহ দেখিতে পারে না, বাঙালীকে অবাঙালীরা অপমান করে, বাঙালীর সম্পত্তি বেহারীরা কাড়িয়া রাখিয়াছে, ওড়িয়ারা বাঙালীকে ধাক্কা মারে—। একটু আত্মসম্মানবোধ থাকিলে বাঙালী এমন হাটে বাজারে নির্লজ্জের মত কাঁদিয়া বেড়াইতে পারিত না। পাঞ্জাবের অর্ধেক গিয়াছে। তাহাদেরও দুর্দশার অন্ত নাই ; কিন্তু কৈ তাহারা তো এমন বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতেছে না।

বাঙালী হয়তো রুখিয়া উঠিয়া বলিবে, কেন কাঁদিব না ? অপমানিত হইলে কে না কাঁদে ? নিশ্চয় কাঁদিব। এই কথার পিঠে কথা ওঠে, বাঙালীকেই বা সকলে অপমান করে কেন ? বাঙালীর গায়ে যেমন বেহার আছে, বেহারের গায়ে তেমনি যুক্তপ্রদেশ আছে, যুক্তপ্রদেশের গায়ে মধ্যপ্রদেশ আছে, তার গায়ে বোম্বাই আছে। ইহারা তো পরস্পর অপমান অনাদর করে না। বাঙালী কী করিয়াছে যাহার জন্য তাহার নিকটতম প্রতিবেশীরা তাহার প্রতি বিমুখ।

বাঙালী বলিবে, নিছক আক্রোশ, বাঙালীর বুদ্ধি বেশি তাই সকলে তাহাকে হিংসা করে।

ইহাই যত নষ্টের গোড়া—বাঙালীর বুদ্ধি বেশি।

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে স্বীকার করিতে হয়, বাঙালীর বুদ্ধি আছে। জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য যদি বুদ্ধির নিদর্শন হয় তবে বাঙালীর বুদ্ধি আছে। কিন্তু বুদ্ধি যত আছে, বুদ্ধির দম্ভ তাহার শতগুণ। বাঙালী কবিরা বাঙালীর এই দম্ভে ইন্ধন যোগাইয়াছেন। ফলে বাঙালীর স্ফীত অভিমান এখন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। এবং এই অভিমানই তাহার যত দুঃখের কারণ হইয়াছে।

যাহার বেশি বুদ্ধি আছে তাহাকে সকলে ঈর্ষা করে একথা সত্য নয়। যাহার টাকা বেশি তাহাকে লোকে ঈর্ষা করিতে পারে কিন্তু বুদ্ধির জন্য কেহ কাহাকেও ঈর্ষা করে না। বরং শ্রদ্ধা করে, সম্ভ্রম করে, উপদেষ্টা এবং নেতারূপে স্বীকার করে। একদিন ছিল যখন বাঙালীকে অন্য প্রদেশের লোক শ্রদ্ধা করিত ; আজ বাঙালী সেই শ্রদ্ধা কেন হারাইয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখার প্রয়োজন আছে। ইহা একদিনে হয় নাই। ইহার পশ্চাতে একটি নাতিদীর্ঘ ইতিহাস আছে।

ইংরেজ যখন ভারতবর্ষে প্রথম রাজ্য ফাঁদিয়া বসিল তখন বাংলাদেশই ছিল তাহার কর্মতৎপরতার কেন্দ্র। ব্যবসা এবং রাজ্যচালনার প্রয়োজনে তাহারা একদল কেরানী সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করিল এবং বাঙালীকে হাতের কাছে পাইয়া তাহাকেই বিলাতী শিক্ষা দিয়া নিজ প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া লইল। ইহাই বাঙালীর বিলাতী শিক্ষার সূত্রপাত।

বাঙালী যে-সময় ইংরেজি শিখিল সে সময় ভারতের অন্য প্রদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হয় নাই। রাজকার্যের প্রয়োজনে বাঙালী বাংলাদেশের বাহিরে প্রেরিত হইল। সেখানে ইংরেজের প্রতিভূ অথবা খাসভৃত্যরূপে সে খুবই মর্যাদা পাইল। তখনকার বাঙালীর দায়িত্ববোধ ও কর্মনিষ্ঠা ছিল। সুতরাং এ মর্যাদা তাহার অপ্রাপ্য নয়।

ক্রমে অন্য প্রদেশের লোকও আধুনিক শিক্ষা পাইল। তাহারাও কেরানী উকিল হাকিম ডাক্তার হইল। ইতিমধ্যে বাঙালী প্রবাসগামীরা ও তাঁহাদের বংশধরেরা প্রবাসে বসবাস আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল ; এবং তত্তৎ প্রদেশস্থ লোকের উপর প্রভুত্ব করা তাহার জন্মগত অধিকার

বলিয়া মনে করিতেছিল। স্থানীয় লোকেরা যখন শিক্ষিত হইয়া উঠিল তখন স্বভাবতই সংঘাত বাধিল।

এই সময় প্রবাসী বাঙালীরা বড় নিন্দনীয় ব্যবহার করিল। বুদ্ধির গুমর তাহার চিরদিনই আছে, প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাবে তাহা বিকৃত হইয়া ব্যাধির আকার ধারণ করিল। প্রবাসী বাঙালী স্থানীয় অধিবাসীদের অবজ্ঞা করিয়া অপমান করিয়া নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু অপমান ও ঔদ্ধত্য কে কতদিন সহ্য করে! যাহারা বাঙালীকে পূর্বে শ্রদ্ধা করিত তাহারাই তাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিল। আগে বাঙালী নহিলে চলিত না, এখন শিক্ষাব্যাপ্তির পর বাংলার বাহিরে বাঙালী ফালতু হইয়া গেল।

আজ বাঙালী বাংলার বাহিরে যে তাড়না খাইতেছে, ইহাই তাহার মূল ইতিহাস। কবি বলিয়াছেন, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। বাঙালী আজ প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। এই প্রায়শ্চিত্তের আগুনে পুড়িয়া যেদিন সে স্বস্থ হইবে নিরভিমান হইবে সেদিন তাহার ভাগ্য ফিরিবে। তার আগে নয়।

কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দ

সংস্কৃত ভাষায় অনেক ছন্দ আছে। ছন্দগুলির দুই ভাগ—অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দই প্রধান।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রত্যেক পাদে নির্দিষ্ট সংখ্যার অক্ষর থাকে, কমবেশি করা যায় না। কোন্ অক্ষরটি দীর্ঘ হইবে কোনটি হ্রস্ব হইবে তাহাও নির্দিষ্ট থাকে। ছন্দে অনেকগুলি অক্ষর থাকিলে মাঝে যতি দিতে হয়, এক নিশ্বাসে পড়া যায় না। এই যতির স্থান, অর্থাৎ কয়টা অক্ষরের পর বিরাম থাকিবে, তাহাও নির্দিষ্ট থাকে। যেমন মালিনী ছন্দ—ন ন ম য য যুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ। পনেরো অক্ষরের ছন্দ ; লঘু গুরু অক্ষরের বিন্যাস এইরূপ—ললল ললল গুগুগু লগুগু লগুগু ; অষ্টম অক্ষরের পর যতি। এইরূপ সর্বত্র।

কতকগুলি স্বাভাবিক দীর্ঘস্বর আছে। উপরন্তু যুক্ত অক্ষরের আগেরটি দীর্ঘ হইয়া যায়, কারণ যুক্তাক্ষরের প্রথম অক্ষরার্ধের ধাক্কা পড়ে গিয়ে পূর্বের অক্ষরটির উপর। অনুস্বার বিসর্গযুক্ত অক্ষরও দীর্ঘ হইয়া যায়। চরণের সর্বশেষ অক্ষরটি হ্রস্ব হইলেও প্রয়োজনানুযায়ী দীর্ঘ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই মোটামুটি নিয়ম। হসন্ত অক্ষরের স্বাধীন সত্তা নাই, উহা পূর্বের অক্ষরে যুক্ত হইয়া পূর্বাক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া তোলে।

বাংলায় বেশি ছন্দ নাই। পয়ার ছন্দ বোধহয় সংস্কৃত বসন্ততিলক ছন্দ ভাঙিয়া তৈরি হইয়াছে। আগে বাংলা কবিতায় যুক্তাক্ষরকে এক অক্ষর ধরা হইত, এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই

অক্ষর ধরা হয়। 'বনফুল' যুক্ত অক্ষরকে একই কবিতায় কখনও এক অক্ষর ধরেন, কখনও দুই অক্ষর।

বাংলা কবিতায় হ্রস্ব দীর্ঘের প্রভেদ বড় একটা ধরা হয়না, আমরা দীর্ঘকে সব সময় দীর্ঘ উচ্চারণ করি না। অথচ অক্ষর সংখ্যা ঠিক রাখিয়া হ্রস্ব দীর্ঘের বিন্যাসই সংস্কৃত অক্ষরেরও ছন্দের প্রাণ। বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা ছন্দ বোঝেন তাঁরা বলেন সংস্কৃত ছন্দের মত এমন ছন্দ পৃথিবীতে নাই।

কবিতাকে যাঁরা ছন্দের বাঁধন হইতে মুক্তি দিতে চান তাঁদের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু যাঁরা ছন্দ ভালবাসেন তাঁরা সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে নিটোল বাংলা ছন্দের প্রবর্তন করিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্র দত্ত আংশিকভাবে সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁরা অক্ষরের সংখ্যা ঠিক রাখেন নাই, ধ্বনির মাত্রা বজায় রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু চেষ্টা করিলে সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কোনও প্রকার অঙ্গহানি না করিয়া বাংলায় কবিতা লেখা যায়। ভারতচন্দ্র তোটক তূণক প্রভৃতি ছন্দে বাংলা কবিতা লিখিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৌতুকছলে মন্দাক্রান্তা ছন্দে লিখিয়াছিলেন—

ইচ্ছা সম্যক ভ্রমণ গমনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিক্লী মন উড়ুউড়ু একি দৈবেরি শাস্তি ॥

এখানে অক্ষর সংখ্যা ও হ্রস্বদীর্ঘের বিন্যাস ঠিক আছে। মন্দাক্রান্তা সতেরো অক্ষরের ছন্দ, দশম অক্ষরের পর যতি।

নিম্নে কয়েকটি অল্পাক্ষর সংস্কৃত ছন্দ ও বাংলায় তাহার উদাহরণ দেওয়া হইল। দীর্ঘকে দীর্ঘ করিয়া পড়িলে ছন্দ ধরা পড়িবে।

ছন্দের নাম—প্রিয়া। পাঁচ অক্ষরের ছন্দ, চারি চরণ। গুরুলঘু বিন্যাস—ল ল গু ল গু।

কি কুতূহলে বিজলী জ্বলে ?
কি কথা বলে ছলনা ছলে ?

ছন্দের নাম—শশিবদনা। ছয় অক্ষরের ছন্দ। ল ল ল ল গু গু।

অবিরল ছন্দে বিগলিত ধারা
দ্রবময়ি গঙ্গে ! তুমি মণিহারা।

সোমরাজী। ছয় অক্ষরের ছন্দ। ল গু গু ল গু গু।

মহী কম্পমানা চলে সৈন্যরাজী
উড়ে বৈজয়ন্তী চলে হস্তিবাজী।

মধুমতী। সপ্তাক্ষর ছন্দ। ল ল ল ল ল ল গু।

চপল মধুমতী কুটিল পথ অতি।
থমকি চল সতী ললিত লঘু গতি।

হংসমালা। সপ্তাক্ষর ছন্দ। ল ল গু গু ল গু গু।

শরতে হংসমালা বিহরে বালুতীরে
তটিনী বারিধারা বহিছে ধীরে ধীরে।

মণিমধ্য। নয় অক্ষরের ছন্দ। গু ল ল গু গু গু ল ল গু।

বঞ্জুল ছায়া কুঞ্জ তলে মঞ্জুল মালা তার গলে
কাতর রাধা কাঁদি কহে নাগর-আগে প্রাণ দহে।

চম্পকমালা। দশ অক্ষরের ছন্দ। গু ল ল গু গু গু ল ল গু গু।

কণ্ঠবিলগ্না চম্পকমালা গন্ধনিমগ্না রাত্রি বিশালা
চন্দনপঙ্কে শীতলদেহা একলি নারী নির্জন গেহা।

মত্তা। দশ অক্ষরের ছন্দ। গু গু গু গু ল ল ল ল গু গু।

মেঘে কে ঐ গরজিল মাভৈ
নাচে তা থৈ ডিমিডিমি তাথৈ।

ভ্রমর

আমার বাড়ির সম্মুখের বাগানে সূর্যমুখীর ঝাড়ে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। ছোট ছোট কৃষ্ণতার পীতপক্ষ ফুলগুলি, সারা দিন সূর্যের পানে নির্নিমেষ চাহিয়া থাকে। চাহিয়া চাহিয়া তাহাদের চক্ষু ক্ষরিয়া যায়, তবু চাহিয়া থাকে। তাহারা নাকি সূর্যকে ভালবাসে।

আমি জানালার কাছে বসিয়া লিখি, আর মাঝে মাঝে বাহিরে তাকাই। দেখি, একটা ভ্রমর আসিয়া জুটিয়াছে। কুচকুচে নীল রঙ, স্বচ্ছ পাখায় সপ্তবর্ণের বিচ্ছুরণ ; সে সূর্যমুখীর ঝাড়টাকে বন্ বন্ করিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে। ক্ষণেকের জন্য একটা ফুলের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিয়া লইতেছে। আবার বন্ বন্ করিয়া ঘুরপাক খাইতেছে।

স্পষ্টই বোঝা যায় সে গাছটাকে পাহারা দিতেছে। গাছটার উপর সে নিজের অধিকার স্থাপন করিয়াছে, আর কাহাকেও কাছে আসিতে দিবে না। যদি কোনও প্রজাপতি বা মৌমাছি তাহার গাছের কাছে আসে, অমনি সে তাড়া করিয়া তাহাদের খেদাইয়া দেয়। এমন কি ছোটখাটো পাখিরও ওদিক দিয়া যাইবার উপায় নাই, ভোমরা ক্রুদ্ধ গুঞ্জন করিয়া তাহাকে তাড়া করিবে।

প্রাণীজগতে ভোমরা অতি নিম্নশ্রেণীর জীব ; মস্তিষ্ক নাই, কেবল পাঁচটা ইন্দ্রিয় এবং খানিকটা স্নায়ুতন্ত্রী। কিন্তু তবু তাহার অধিকার-বোধ জন্মিয়াছে, অয়ং নিজঃ এই জ্ঞান টন্‌টনে।

কোথা হইতে এই অধিকার-বোধ আসিল ?

জীববিজ্ঞানী বলিলেন, উহা স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি ; বহির্জগতের সহিত আপোস করিবার ফলে জন্মিয়াছে। যদি ওই প্রবৃত্তি না জন্মিত তবে ভোমরা বাঁচিত না। Natural Selection.

হয়তো বাঁচিয়া থাকার প্রধান শর্ত স্বার্থপরতা। এই বস্তু আমার, ইহা আমি আর কাহাকেও দিব না, নিজে ভোগ করিব—ইহাই মৌলিক বৃত্তি। কাম ক্রোধের পরেই লোভ। প্রাণী যত ঊর্ধ্ব স্তরে উঠিতে থাকে অন্য রিপুগুলিও ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়।

আবার এই আদিম অধিকার-বোধ হইতেই প্রেম—অহৈতুকী প্রীতি—উচ্চতম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি—আসিয়াছে।

যাহা আমার বলিয়া বুঝিয়াছি তাহার জন্য প্রাণ দিতেও আমি প্রস্তুত। যাহা আমার তাহা আমি ছাড়িব না, প্রাণপণে বুকে আঁকড়াইয়া থাকিব, পালিব পুষিব যত্ন করিব। বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে বিষয়ে আসক্তি জন্মে। এই আসক্তিই লৌকিক প্রেম নামে অভিহিত—ইহা নিকষিত হেম নয়। সকাম ভালবাসা।

কিন্তু একবার ভালবাসা যখন পাওয়া গেল, তখন নিষ্কাম ভালবাসা কল্পনা করা কঠিন হইল না। এইভাবে ধীরে ধীরে মানুষের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি আসিয়াছে। পঙ্কের মধ্যে যাহার মূল

সেই পঙ্কজ সহস্রার হইয়া শোভা পাইতেছে।

ফারমান

বারো শতাব্দী আগেকার কথা, খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আরম্ভ। ভারতবর্ষ তাহার ঐহিক পারত্রিক এবং সাংস্কৃতিক সকল সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়াছে ; তাহার মনে আর কোনও সংশয় নাই। অবশ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রাজা আছেন ; তাঁহারা খেয়ালখুশিমতো পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করেন, কিন্তু তাহা শাস্ত্রসম্মত ক্ষাত্রধর্ম বলিয়া কাহারও মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটে না। উদর পরিপূর্ণ করিয়া আহার করিবার পর মানুষ যেমন আলস্যপূর্ণ তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে, ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গে তেমনি একটি অলস তন্দ্রাবিলাস পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। জাতির মানসজীবনে এই মোহমন্থর জড়তা শুভসূচক নহে।

আকস্মিক আঘাতে তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। মুহম্মদ বিন্ কাশিম নামক সপ্তদশবর্ষীয় বালক ইরাক হইতে দলবল লইয়া সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিল। মুসলমানের সহিত ভারতের এই প্রথম সাক্ষাৎকার ; ইসলাম ধর্মের বয়স তখন নব্বই বৎসর।

ভারতবর্ষ ইসলাম ধর্মকে দেখিল না, দেখিল একদল নিষ্ঠুর লোভী মুসলমানকে। তাহারা অবশ্য বেশিদিন রহিল না : লুঠপাট করিয়া, নারীধর্ষণ করিয়া, মন্দির অপবিত্র করিয়া চলিয়া গেল। এই ক্ষণিক পরিচয়ে ভারত চমকিত হইল, বিরক্ত হইল ; কিন্তু তাহার আত্মপ্রসন্নতা ঘুচিল না। বর্বর, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি আখ্যা এই উপদ্রবকারীদের চিহ্নিত করিয়া ভারত আবার তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিল। অতীতে এইরূপ বর্বর ম্লেচ্ছ জাতি যে বার বার বাহির হইতে আসিয়া তাহার নির্বিঘ্ন শান্তি তোলপাড় করিয়া দিয়াছে, ঐতিহাসিক স্মৃতি না থাকায় সে তাহা স্মরণ করিতে পারিল না এবং প্রতিকার চিন্তাও করিল না। অতীতকে রূপকথার অবাস্তব লোকে লইয়া গিয়া অলৌকিক পুরাণ-কাহিনী রচনা করাই ভারতবাসীর অস্থিমজ্জাগত ধর্ম।

তারপর নূন্যাধিক তিন শত বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে ইসলাম ধর্ম শান্ত বেশে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ কোনও ধর্মকেই উপেক্ষা করে না, ইসলামকেও সে সহজ সমাদরে স্থান দিয়াছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্মের নিকট ভাবতবর্ষের শিখিবার কিছু ছিল না ; তাই আরব দেশে যে-ধর্ম মানুষকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল, হিন্দুস্তানে তাহা সামান্য ঔৎসুক্য মাত্র উদ্রিক্ত করিল। দাক্ষিণাত্যের এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাহার প্রভাব নিবদ্ধ হইয়া রহিল, উত্তর ভারত তাহার কিছুই জানিল না।

একাদশ শতকে আসিলেন গজনীর সুলতান মামুদ। ভাইকে হত্যা করিয়া দাসীপুত্র মামুদ পিতৃ-সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন। ইনিও দস্যু ; অর্থাভাব ঘটিলেই ইনি ভারত লুণ্ঠন করিতে আসিতেন। একবার নয়, দুইবার নয়, সতেরোবার তিনি ভারত লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিলেন : তাঁহার পরাক্রম পাঞ্জাব লঙ্ঘন করিয়া গুজরাত পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছিল। সোমনাথের মন্দির তিনি শুধু লুণ্ঠন করেন নাই, দূষিত করিয়াছিলেন।

ভারতবাসী এই উপদ্রব প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই ; মুসলমানের উপর তাহার দারুণ বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। কিন্তু বিধিবদ্ধ সংস্কারের মোহমন্ত্রে তাহার পৌরুষ তখন স্তিমিত ; এই অনভ্যস্ত আততায়ীকে কি করিয়া প্রতিরোধ করিবে, তাহা সে ভাবিয়া পায় নাই। ধর্মযুদ্ধই

তাহার কাছে একমাত্র নীতিসঙ্গত যুদ্ধ ; অধর্মযুদ্ধ যাহারা করে, তাহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিবে কী প্রকারে ? ভারতীয় রণবিদ্যা তখন পদে পদে নীতিশাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলে ; যে দুর্বৃত্তগণ ছলে বলে কৌশলে কেবল কার্যসিদ্ধিকেই যুদ্ধেব মূলমন্ত্র বলিয়া জানে তাহাদের নিকট নিগৃহীত হওয়া ছাড়া তাহার আর গতি কি ?

তস্করবেশে ভারত-প্রবেশ মুসলমানের এই শেষ। অতঃপর শতাধিক বর্ষ পরে যিনি আসিলেন, তিনি রাজ্য জয় করিয়া উপনিবেশ স্থাপনের জন্য আসিলেন। দস্যুবৃত্তিতে স্থায়ী লাভ হয় না। মহম্মদ ঘোরী কয়েকবার ভারত আক্রমণ করিয়া অবশেষে কান্যকুব্জ পর্যন্ত উত্তর-ভাবত নিজ অধিকাবে আনিলেন। যে ধূমকেতু মাঝে মাঝে আসিয়া চারিদিক ছারখার করিয়া দিয়া চলিয়া যাইত, তাহা এখন বুকের উপর চাপিয়া বসিল। মুসলমান রাজা হইল, ভারতবাসী হিন্দু হইল তাহার প্রজা।

মহম্মদ ঘোরী ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যে অংশ জয করিলেন, তাহার অধিবাসীরা আকৃতি-প্রকৃতিতে পাঠান হইতে বিশেষ পৃথক ছিল না। অন্য অবস্থায় হইলে ইহারা অতি শীঘ্র বিজেতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া যাইত। কিন্তু বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে সহজে সদ্ভাব জন্মে না ; বিজেতা বিজিতকে অবজ্ঞামিশ্র ঘৃণার চক্ষে দেখে ; পরাজিতের মনে থাকে পরাজয়ের গ্লানি। পাঠান রাজশক্তি ভারতের জনশক্তির সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে মিশিয়া গেল না, বরং অত্যন্ত প্রখরভাবে স্বতন্ত্র হইয়া রহিল। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের একটা চিহ্ন চাই, বিজিতকে অবজ্ঞা করিবার একটা লক্ষণ চাই। মুসলমানের চক্ষে ধর্মের প্রভেদই সবচেয়ে বড় প্রভেদ বলিয়া ঠেকিল। নির্জিত ভারতবাসীর উপর তাহারা জিজিয়া কর বসাইল।

কিন্তু পাশাপাশি বাস করিয়া মানুষ চিরদিন পর হইয়া থাকিতে পারে না। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ক্রমশ পরিচয় হইল, যদিও তাহা সম্পূর্ণ বে-সরকারী ভাবে। মুসলমান দেখিল, হিন্দুরা মানুষ নেহাৎ মন্দ নয় ; হিন্দুরা দেখিল, মুসলমানদের তাহারা যেরূপ দৈত্য-দানব মনে করিয়াছিল, তাহা নয়, তাহারা মানুষই বটে। মানুষের অন্তরের মধ্যে যাহা সর্বজনীন, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের মধ্যে তাহার সন্ধান পাইল।

বিদ্যা সংস্কৃতি আচার ব্যবহারের বিনিময় আরম্ভ হইল। মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে যে একটি সতেজ ঐহিকতা আছে, ভারতবাসী যাহা বহু পূর্বে জীবন-ব্যাপারের হিসাব হইতে বাদ দিয়াছিল, তাহাই আবার নূতন করিয়া তাহার ভাল লাগিল। ধর্মজীবনে না হোক, ব্যবহারিক জীবনে সে এই ইহলৌকিকতা স্বীকার করিয়া লইল। মুসলমানেরা ভারতবাসীর নিকট পাইল সঙ্গীত সাহিত্য স্থাপত্য কারুকলা। তাহাদের সামান্য যাহা কিছু ছিল, তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব নূতন সৌন্দর্যচেতনা গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

এই নূতন সৃষ্টি ব্যাপারে স্রষ্টা যে প্রধানত মুসলমান তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যে পরদ্রব্য আত্মসাৎ করিতে পারে, সেই ধনী হয়, ইহাই জগতের নিয়ম। কিন্তু সৃষ্টির উপাদান বহুলাংশে ভারতীয়। কুতবমিনার বা তাজমহল মুসলমানের সৃষ্টি, কিন্তু ভারতীয় শিল্প-সংস্কার না থাকিলে উহারা সৃষ্ট হইতে পারিত না।

এইরূপে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মিশ্রণ-ক্রিয়া চলিতে লাগিল। ভারতে মুসলমানের রাজ্য যেমন প্রসার লাভ করিতে লাগিল, মিশ্রণও ততই গাঢ় ও ব্যাপক হইল। ক্রমে হিন্দু-অধ্যুষিত সারা হিন্দুস্তানই মুসলমান রাজশক্তির কবলে আসিল।

এই প্রকার পরিস্থিতির মধ্যে যদি ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত, তাহাতেও বিস্ময়ের কিছু ছিল না। ইতিহাসে বহু দেশে বহুবার এরূপ হইয়াছে ; আরবের মুসলমানেরাই ইরাণ তুরাণ মিশরের সমস্ত অধিবাসীকে নিজধর্মে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। ভারতের অধ্যাত্ম চেতনা যে-স্তরে অবস্থিত, সে-স্তরে উঠিয়া তাহাকে পরাস্ত করা ইসলাম ধর্মের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ভারতবাসীর মধ্যে যে

সামান্য অংশ ইসলামধর্ম গ্রহণ করিল তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জবরদস্তি বা ঐহিক সুখ-সুবিধার লোভে গ্রহণ করিল।

কিন্তু তবু সকল ধর্মই এক মহান সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুধর্মকে মুসলমান ধর্মের দিবার কিছু ছিল না, এজন্য ইহা প্রমাণ হয় না যে, ইসলাম ধর্ম নিকৃষ্ট। হিন্দুধর্মে পাথর-পূজা হইতে অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত নানা অধিকারভেদ আছে, কোনটিই অবজ্ঞেয় নয়। তেমনি ইসলাম ধর্মও হিন্দুর অবজ্ঞেয় নয় ; ইহা অধ্যাত্মবোধের একটি স্তর বলিয়া সমুচিত শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত। তাই ভারতবর্ষে যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল না, তাহারাও ইসলামকে উপেক্ষা করিল না। আল্লোপনিষৎ নামে এক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, ইহা তাহার একটা প্রমাণ, ।

লৌকিক স্তরে আদান-প্রদান চলিল। পীরেব দরগায় হিন্দু সিন্নি চড়াইতে আরম্ভ করিল, মুসলমান হিন্দু পূজা-পর্বে যোগ দিল। সত্যপীর নামক যৌথ দেবতার আবির্ভাব হইল। আর আবির্ভাব হইল কবীর নানক প্রভৃতি সমদর্শী ভেদজ্ঞানহীন ধর্মনায়কগণের। যেমন একদিন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম হিন্দুর বেদবিহিত ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া উহাকে নূতন আকৃতি দান করিয়াছিল, ভারতের ইসলাম ধর্মও তেমনি হিন্দুধর্মের সহিত মিলিয়া এক নূতন ধর্মচেতনা গড়িয়া তুলিবার উপক্রম করিল।

মুসলমান রাজশক্তি দীর্ঘকাল এই মিলনোৎকণ্ঠা স্বীকার করিয়া লয় নাই ; শাসকের চক্ষে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ ছিল। কিন্তু একদিন আসিল যখন আর তাহাও রহিল না। ইতিমধ্যে পাঠান গিয়া মোগল আসিয়াছে। মোগল সম্রাট একদিন বুঝিতে পারিলেন, তিনি ভারতের মানুষ ; ভারতের সকল অধিবাসীর সহিত তিনি একাত্মতা অনুভব করিলেন। জিজিয়া কর উঠিয়া গেল। আইনের চক্ষেও হিন্দু-মুসলমানের আর প্রভেদ রহিল না।

রাজশক্তির অনুমোদন পাইয়া মিশ্রণক্রিয়া দ্রুত অগ্রসর হইল। ব্যবধান ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আগ্রহ দুই পক্ষেই সমান। এই বিপুল আগ্রহের ফলে কয়েকটি কৃত্রিম মতবাদের সৃষ্টি হইল—আকবরের দীন ইলাহী ধর্ম তাহার অন্যতম। কিন্তু তাহাতে কোনও ক্ষতি হইল না অকৃত্রিম হৃদয়ধর্ম বহু বিচিত্র পথ ধরিয়া মিলনের সঙ্গমতীর্থ অভিমুখে প্রবাহিত হইল।

আকবর শাহ ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল যোগ করিলে মোট প্রায় পঁচাত্তর বৎসর হয়। শতাব্দীর তিন পাদ ধরিয়া এই মিলনের সমারোহ চলিল। রাজাদের মনে ধর্মবিদ্বেষ নাই, তাই প্রীতির পথ নিরঙ্কুশ। এমন এক সময় আসিল, যখন ভারতের কোনও কোনও স্থানে মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে ধর্ম পরিবর্তন না করিয়া বিবাহের রীতি প্রবর্তিত হইল। হিন্দুর মেয়ে যদি মুসলমানকে বিবাহ করে, তবে সে ইসলামীয় বিধি বিধান পালন করিবে ; এবং মুসলমান কন্যা যদি হিন্দুকে বিবাহ করে, তবে সে হিন্দু আচার পালন করিবে। মুসলমান ও হিন্দুর সামাজিক আচার-ব্যবহার যে কতদূর সমতা লাভ করিয়াছিল, ইহা হইতে অনুমান করা কঠিন নয়।

যদি এই মিলন-প্রচেষ্টা আরও এক শত বৎসর অব্যাহত থাকিত, তাহা হইলে হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানের ধর্মভেদ সম্পূর্ণ ঘুচিয়া যাইত ; একটি বিপুল ধর্মবৃত্তের মধ্যে উভয়েরই স্থান হইত ; বর্তমানে যেমন সনাতনধর্মী শাক্ত শৈব বৈষ্ণব জৈন বৌদ্ধ ব্রাহ্ম সকলেই একটি অবিরোধী ধর্মসমবায়ের মধ্যে বাস করিতেছে, মুসলমানেরাও তেমনি নিজধর্মের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন না দিয়া এই সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত হইত। বেদদ্রোহী বুদ্ধের ন্যায় কালে মহম্মদও অবতার বলিয়া গণ্য হইতেন এবং পূজা পাইতেন।

কিন্তু তাহা হইতে পাইল না। চতুঃসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরের মনেও ক্ষুদ্রতা থাকে। সাজাহানের মনে এই ক্ষুদ্রতা ছিল। যে-যুগে দরিদ্র কবি চণ্ডীদাস উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই, সেই যুগে আলী হজরৎ সাজাহান বলিলেন,—'সবার উপরে মুসলমান সত্য !' ইতিহাস ঔরঙ্গজেবকেই দায়ী করিয়া থাকে, কিন্তু এই অনর্থের প্রবর্তক সাজাহান। পিতৃ-পিতামহের ধারা প্রতিরোধ করিয়া তিনি এক নূতন ফারমান জারী করিলেন।

সর্বনাশা এই ফারমান। ফারমানে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল, হিন্দু আর হিন্দু থাকিয়া মুসলমানীকে বিবাহ করিতে পারিবে না ; বিবাহ করিতে হইলে তাহাকে ধর্মত্যাগ করিয়া মুসলমান হইতে হইবে।

বিষবৃক্ষে ফল ধরিল।

স্যার যদুনাথ সরকার তাঁহার 'হিস্ট্রী অব্ ঔরঙ্গজেব' গ্রন্থে ঘটনাটি এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

In Bhimbhar, another district of Kashmir, Hindus and Muslims used to inter-marry and the wife, whatever might have been her father's creed, was burnt or buried as her husband used to be Hindu or Islamite. But in October 1634, Shah Jahan forbade the custom and ordered that every Hindu who had taken a Muslim wife must either embrace Islam and he married anew to her, or he must give her up to be wedded to a Muslim. This order was rigorously enforced.

Vol.I, p.54 f.n.

অতঃপর ঔরঙ্গজেব তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকাল ধরিয়া এই বিষ ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়াছিলেন। এই বিষে জর্জরিত হইয়া মোগল সাম্রাজ্য শেষ হইয়াছিল। এই বিষের প্রতিক্রিয়া আমরা আজিও ভোগ করিতেছি।

শিল্পীর স্বাধীনতা

প্রশ্ন : শিল্পী ক ?

উত্তর : যাঁরা রসসৃষ্টি করেন তাঁরা শিল্পী।

প্রশ্ন : যাঁরা রসগোল্লা সৃষ্টি করেন তাঁরাও কি শিল্পী ?

উত্তর : না। তাঁরা কারিগর।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা কী বস্তু ?

উত্তর : যে অবস্থায় বাইরের নিষেধ থাকে না সেই অবস্থার নাম স্বাধীনতা।

প্রশ্ন : অন্তরের নিষেধ যদি থাকে ?

উত্তর : অন্তরের নিষেধ আমরা মানতে পারি, না মানতেও পারি, সেখানে আমাদের স্বাধীনতা আছে।

প্রশ্ন : শিল্পীর স্বাধীনতা কাকে বলে ?

উত্তর : যিনি নিজের রুচি সংস্কৃতি এবং ইচ্ছা অনুযায়ী শিল্প সৃষ্টি করেন তাঁকে আমি স্বাধীন শিল্পী বলি।

প্রশ্ন : মনে করুন, কেউ যদি লোভের বশবর্তী হয়ে বড়লোকের স্তুতি রচনা করে, তাকে কি স্বাধীন শিল্পী বলব ?

উত্তর : স্বাধীন বলতে পারো, শিল্পী না বললেও চলে।

প্রশ্ন : শিল্পীকে আইন মেনে চলতে হয়। তাতে তার স্বাধীনতার হানি হয় না ?

উত্তর : ভাল আইন স্বাধীনতা হরণ করে না, উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করে। কিন্তু এমন

কয়েকটি রাষ্ট্র আছে যেখানে শিল্পীর স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার অধিকার নেই, রসসৃষ্টি করবার অধিকার নেই, সত্য কথা বলবার অধিকার নেই। আমাদের দেশেই ইংরেজের আমলে এ অধিকার ছিল না, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। এমন আরো উদাহরণ আছে।

প্রশ্ন : কিন্তু রাষ্ট্রকে বিপ্লবের হাত থেকে বাঁচানো কি রাষ্ট্রপতিদের কর্তব্য নয়?

উত্তর : অবশ্য। যুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় মানুষ বিশেষ আইন তৈরি করে নিজের স্বাধীনতা নিজে খর্ব করে। সেটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়, অস্বাভাবিক অবস্থা। রোগ হলে গায়ে ইন্‌জেকশনের ছুঁচ ফুটিয়ে রোগ সারাতে হয়।

প্রশ্ন : তাহলে দাঁড়ালো কি? শিল্পীর স্বাধীনতা বস্তুটা কী?

উত্তর : শিল্পীর স্বাধীনতা অতি সাধারণ বস্তু। স্বাধীন দেশে সাধারণ মানুষ যে-সব স্বাধীনতা ভোগ করে তারই একটা। যদি কোনো শিল্পী স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করে উচ্ছৃঙ্খলতা করেন, অশ্লীলতা করেন, তাঁকে শাসন করার জন্যে আইন আছে। যদি কেউ রাষ্ট্রবিপ্লব প্রচার করেন তাঁকে শিল্পী বলব না প্রচারক বলব, অপপ্রচারককে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রকৃত শিল্পী চিরদিনই স্বাধীন। যে দেশে রাষ্ট্রীয় মতবাদ শিল্পীর স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে সে-দেশে প্রকৃত শিল্প তৈরি হয় না। খাঁচায় বদ্ধ পাখি ডিম পাড়ে' না।

বারোয়ারী শিল্প

চলচ্চিত্র বা ফিল্ম তৈয়ার করা একটি বারোয়ারী শিল্প—ইহাই প্রায় সর্বজনীন ধারণা। একজনে কিছু করিতেছে না, পাঁচজনের বুদ্ধি বিচার ও বৈজ্ঞানিক নৈপুণ্যের সমবায়ে একটি শিল্পবস্তু সৃষ্ট হইতেছে। অবশ্য এই সমবেত স্রষ্টাদের মধ্যে একজন প্রধান আছেন যাঁহাকে কর্ণধার বলা চলে। তিনি যে শুধু শিল্প-তরণীটির কর্ণ ধারণ করিয়া থাকেন তাহাই নহে, সহযাত্রী শিল্প-কর্মীদের কর্ণের প্রতিও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে।

একজন গল্প লিখিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি চিত্রনাট্য রচনা করিলেন ; সংগীত ও আবহ সৃষ্টির জন্য আর একজন গুণীর প্রয়োজন হইল। তা ছাড়া আলোকচিত্র-শিল্পী, শব্দ-ধারক, নট-নটী এসব তো আছেই। ইহাদের কাহাকেও বাদ দিলে ফিল্ম তৈয়ার হইবে না ; একটি সম্পূর্ণ ফিল্ম তৈয়ার করিতে হইলে ইহাদের প্রত্যেকটিকে একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ফিল্ম বা চলচ্চিত্রে গল্প বলার শিল্প প্রকৃতপক্ষে বারোয়ারী শিল্প।

রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের সৃষ্টিক্রিয়া পরীক্ষা করা যাক। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, কোনও একজন লেখক একটি নাটক লিখিলেই নাটকের সৃষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ হইল না। হয়তো উহা স্বকীয় সাহিত্যগুণে উচ্চস্তরের রসবস্তু বলিয়া পরিচিত হইল ; কিন্তু যতক্ষণ উহা অভিনয়ের সাহায্যে দর্শকের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত না হইতেছে ততক্ষণ উহার নাটকীয়তা স্বীকৃত হইতেছে না।

বারোয়ারী শিল্প

নাটককে রসজ্ঞ দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করাও একজনের কর্ম নয়। সেখানেও নট-নটী, সুরকার, পট-শিল্পী, আলোক-শিল্পী, সবই চাই। অর্থাৎ গল্পকে রূপদান নামক সৃষ্টি কার্যটি পাঁচজনের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে সাধিত হইতেছে। তবে কি নাট্য-কলাকেও বারোয়ারী শিল্প বলিব ?

এই যুক্তিকে তাহার ন্যায়সঙ্গত চরম সীমায় লইয়া গেলে মানিয়া লইতে হয় যে, সকল সৃষ্টিই যৌথ সৃষ্টি বা বারোয়ারী শিল্প। চিত্রকর যে রঙ দিয়া ছবি আঁকেন তাহা তাঁহার নিজের তৈয়ার নয়, তুলিও অন্যে যোগায়, ক্যানভাস বা কাগজের জন্য তাঁহাকে পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। লেখক সম্বন্ধেও অনুরূপ পরিস্থিতি—কাগজ কলম প্রেস কম্পোজিটার, প্রুফ-রিডার, দপ্তরী, কাহাকেও বাদ দিয়া তাঁহার শিল্পকর্ম সম্পন্ন হইতেছে না। এইরূপ সর্বত্র। ঠক বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া যাইতেছে। সকলের অবস্থাই সমান।

সৃষ্টি-ক্রিয়ার একটি অমোঘ নিয়ম আছে। জৈব-ক্ষেত্রেই হোক আর শিল্প-ক্ষেত্রেই হোক, একের দ্বারা বহুর সৃষ্টি সম্ভব, কিন্তু বহুর দ্বারা একের সৃষ্টি সম্ভব নয়। স্রষ্টা চিরদিনই একক—তাহার দোসর নাই। আমাদের দেশে বারোয়ারী উপন্যাস নামে একপ্রকার গল্প রচনার প্রথা প্রচলিত আছে। যাঁহারা এই সকল কাহিনী সমীক্ষার সহিত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, যেখানে পাঁচজন লেখক লিখিয়াছেন, সেখানে হয় পাঁচটি গল্প সৃষ্ট হইয়াছে, নয় তো একটি গল্পও সৃষ্ট হয় নাই। বারোয়ারী পন্থায় দুর্গাপূজা করা চলে, কিন্তু বারোটি শিল্পী মিলিয়া যদি জগন্মাতার একটি জীবন্ত মূর্তি রচনার চেষ্টা করেন, তবে তাহাদের ব্যর্থ হইতেই হইবে।

সৃষ্টির এই যে অমোঘ নিয়ম, সিনেমা-শিল্প তাহার বহির্ভূত নয়। চলচ্চিত্রেও স্রষ্টা এক। পূর্বে যাঁহাকে কর্ণধার বলিয়াছি তিনিই স্রষ্টা—বাকি যাহা কিছু তাহা সৃষ্টির উপাদান মাত্র। নট-নটী গল্প সংগীত সমস্তই উপাদান। একজন সৃষ্টি-অভিমানী ব্যাক্তি এই সব মালমশলা একত্র করিয়া একটা কিছু সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। ক্ষেত্র ভেদে কখনও গল্পের লেখক এই কার্যের ভার গ্রহণ করেন, কখনও চিত্রের যজমান (যিনি টাকা দিয়া ছবি তৈয়ার করাইতেছেন) ইহা নিজ হস্তে রাখেন, কখনও-বা বিজ্ঞানকুশলী কোনও ব্যক্তিকে নির্দেশক আখ্যা দিয়া তাঁহার হস্তেই সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

আমাদের ভাগ্যদোষে, ভারতবর্ষের সিনেমা-ক্ষেত্রে স্রষ্টা নির্বাচনের কার্যটি বিবেচনাপূর্বক করা হয় নাই-অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অরসিকের হস্তে রস পরিবেশনের ভার অর্পিত হইয়াছে। সিনেমা-শিল্পের একটা মহৎ দোষ—ইহাতে টাকা খরচ অনেক। পৃথিবীর অন্য কোনও শিল্পে এত খরচ নাই। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, অর্থলুব্ধ প্রতারকের দল স্রষ্টা সাজিয়া এখানে আসিয়া জুটিয়াছে। ইহারা সাহিত্য বা ললিতকলার অন্য কোনও ক্ষেত্রে গিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিবার উচ্চাশা রাখে না। কারণ অন্য কোনও শিল্পে এত পয়সা নাই। ইহারা কেবল চলচ্চিত্র শিল্পেরই স্রষ্টা হইতে চায়। এবং শঠোচিত বচন পারিপাট্যের প্রভাবে ইহারাই শেষ পর্যন্ত স্রষ্টার আসন দখল করিয়া বসে। ফল যাহা দাঁড়ায়, তাহা আমাদের দেশে কাহারও অগোচর নাই।

ইহার প্রতিকার কি ? একজন অপদার্থ ব্যক্তিকে স্রষ্টার আসনে বসাইয়া তারপর তাহার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কাহিনী, প্রতিভাবান নট-নটী জুড়িয়া দিলেই কাজ হইবে না। কারণ স্রষ্টা যেখানে অক্ষম সেখানে উপাদান যতই উৎকৃষ্ট হোক সৃষ্টি ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ভেড়ার শিঙে পড়িলে হীরার ধারও ভাঙিয়া যায়। একমাত্র উপায় স্রষ্টার আসনে প্রকৃত স্রষ্টাকে বসানো ; তবেই সৃষ্টি সফল হইতে পারে।

কিন্তু ব্যাপার অত সহজ নয়। ধরা যাক্, সাহিত্য-ক্ষেত্রে যিনি সৃষ্টি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, এমন একটি লেখককে কোনও চলচ্চিত্রের কর্ণধার করিয়া বসাইয়া দেওয়া গেল। তিনি কি করিবেন ? সিনেমার গল্প বলার একটি বিশিষ্ট টেক্‌নিক বা ভঙ্গি আছে, তাহা তিনি

জানেন না,কোনও দিন অভ্যাস করেন নাই। উপরন্তু একথাও সত্য নয় যে,যে-কোনও প্রতিভাবান শিল্পী যে-কোনও medium-এ নিজের রচনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন। G. B. S. উপন্যাস রচনায় ব্যর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের যে প্রতিভাবান লেখকটিকে কর্ণধার করিয়াছি, তিনি যে ফিল্ম রচনায় সফল হইবেন তাহার নিশ্চয়তা কি ?

নিশ্চয়তা নাই। শুধু এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, তিনি যখন শিল্পের একটি ক্ষেত্রে সৃষ্টি শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তখন অন্য ক্ষেত্রেও সে পরিচয় দিতে পারেন। এ হিসাবে, যে ব্যক্তি কোনও ক্ষেত্রেই কোনও শক্তির পরিচয় দিতে পারে নাই, তাহার অপেক্ষা তাঁহার দাবী অধিক। এবং এই দাবী যে ভিত্তিহীন নয়, তাহার অন্তত একটি প্রমাণ বাঙলা দেশে পাওয়া গিয়াছে—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। সিনেমা শিল্প নিজ স্বকীয় স্বতন্ত্র স্রষ্টা-শিল্পীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে—যাহাকে শিল্পের অন্যক্ষেত্র হইতে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন হইবে না, যে একান্তভাবে সিনেমারই স্রষ্টা-কবি হইবে।

সেরূপ কেহ এদেশে এখনও আবির্ভূত হয় নাই—ওদেশেও হয় নাই। Orson Wells প্রমুখ দু'একজনকে অগ্রদূত বলা চলে। কিন্তু তাঁহারা আসিবেন নিশ্চয়—যেমন বঙ্কিম আসিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র আসিয়াছিলেন। যতদিন তাঁহারা না আসিয়া পৌঁছান, ততদিন যেন আমরা সিনেমা শিল্পকে কতকগুলি জুয়াচোরের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারি।

অন্নচিন্তা

বুভুক্ষিত মানুষ এমন পাপ নাই যাহা করিতে পারে না ; ক্ষুধাক্ষীণ ব্যক্তিরা নিষ্করুণ হইয়া থাকে। ইহা শাস্ত্রের বচন। শাস্ত্রের বচন যদি নাও হইত, তবু বর্তমানকালে কথাটা উড়াইয়া দেওয়া চলিত না।

যাহারা অন্নাভাবে পথে পড়িয়া মরিতেছে, তাহাদের কথা বলিতেছি না। তাহারা কোনও পাপ করে নাই। আশ্চর্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু এমনই আমাদের সংস্কারের গুণ যে, যাহারা না খাইয়া মরিয়াছে, মরিবার পূর্বে তাহারা আঙুল নাড়িয়াও কাহারও শান্তি ভঙ্গ করে নাই। তাহারা দাঙ্গা করে নাই, লুঠতরাজ করে নাই-মর্মঘাতী করুণকণ্ঠে ভিক্ষা মাগিতে মাগিতে শেষে অবসন্ন দেহে ধূলায় পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে। পাপ তাহারা করে নাই।

পাপ করিয়াছে তাহারা, পেটে অন্ন থাকা সত্ত্বেও যাহারা 'বুভুক্ষিত'। নিষ্করুণ হইয়াছে তাহারা, যাহারা ক্ষুধা-ভয়ক্ষীণ। শাস্ত্র মিথ্যা নয়। 'বুভুক্ষিত' কথাটার অর্থ—যে ভোজন করিতে ইচ্ছুক। আজ আমাদের দেশে যে মহামারী মুখ্যব্যাদান করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে, আমাদের নিষ্করুণ বুভুক্ষা—আমাদের নির্মম ক্ষুধা-ভীতি। বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্।

কাল কী খাইব, এ চিন্তা শুধু দরিদ্রের নয়, ইহা সার্বজনীন। এই চিন্তাই মানুষকে ব্যাধের মত তাড়াইয়া ফিরিতেছে ; এই চিন্তার ফলেই মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সঞ্চয় করিতেছে—বড় মানুষ হইবার এত লালসা তার জন্যই। কাল কী খাইব ! বর্তমান সমাজে এই

প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—'ধনী হও, ধনধান্য সঞ্চয় কর, ধনধান্য রক্ষা করিবার মত শক্তি সঞ্চয় কর। যুদ্ধ কর, কাড়িয়া লও, নিষ্ঠুর হও।' অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আতঙ্ক মানুষকে পিশাচ করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষুধাভীত মানুষ শ্বাপদের অপেক্ষাও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে।

অন্নচিন্তা! এই অন্নচিন্তা মনুষ্য সমাজের অস্থিমজ্জায় দুষ্ট বীজাণুর ন্যায় আশ্রয় লইয়াছে। ধনী হইয়াও ভয় দূর হয় না। 'চলদ্ বিত্তং'—লক্ষ্মী চঞ্চলা। সুতরাং আরও সংগ্রহ কর, আরও সঞ্চয় কর—পরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লও। সে মরে মরুক, তোমার ভবিষ্যৎ তো কিছু পাকা হইবে।

এই ক্ষুধাতঙ্ক—এই মহাপাপ আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া মহা মন্বন্তর ডাকিয়া আনিয়াছে। আমাদের দুর্ভিক্ষ তাহারই একটা দৃশ্যমান লক্ষণ।

পৃথিবীর মানুষ যত বাড়িতেছে মানুষের ভয় তত বাড়িতেছে—অন্নের ভাগীদারদের মধ্যে তাই এই কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি উন্মত্ত তাণ্ডব। মানুষের মনের মধ্যে বিষের মত গাঁজাইয়া উঠিতেছে ঐ ক্ষুদ্র চিন্তা—কাল কী খাইব?

বর্তমান মনুষ্য-সমাজ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে নাই। রামচন্দ্রের আমলে এ প্রশ্ন ছিল, এখন আরও তীব্র বীভৎসরূপে আছে। যুগান্ত ধরিয়া এই বিষ-বীজাণু সমাজ-দেহে ক্রিয়া করিয়া এখন তাহাকে জর্জর অন্তঃশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। এ সমাজের দেহ-পতন অনিবার্য হইয়াছে।

মানুষকে আবার নূতন সমাজ-দেহ গ্রহণ করিতে হইবে। সেই নূতন সমাজে যদি, কাল কী খাইব?—এই প্রশ্নের জবাব থাকে, তবেই তাহার রক্ষা। মানুষকে ক্ষুদ্র অন্নচিন্তার ঊর্ধ্বে লইয়া গিয়া সমাজ যদি বলিতে পারে—'ভবিষ্যতের ভার আমি লইলাম। তুমি তোমার যোগ্যতানুযায়ী কাজ করিয়া যাও, তোমার ক্ষুধানুযায়ী অন্ন আমি দিব।'—তবেই করাল বুভুক্ষার শাপমুক্ত হইয়া মানুষ তাহার পরম আদর্শের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। তবেই মানুষ 'অভয়' হইতে পারিবে।

মেরুর জ্যোতিরুৎসবের মত সেই ভাস্বর আবির্ভাবের পথ চাহিয়া আছি। কবে আসিবেন তিনি? হে পূর্ণ, তুমি আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াও। মানুষের ক্ষুদ্রতার লজ্জা, ক্ষুধার দাসত্ব, অভাবের অপমান হইতে তুমি তাহাকে মুক্তি দাও।

তারাশংকর-প্রশস্তি

তোমার পঞ্চাশৎ জন্মবাসরে তোমার পূর্ণ পুরুষায়ুঃ কামনা করি। তোমার লেখনী অক্ষয় হোক। তোমার যশ অম্লান হোক।

আজকাল বিজ্ঞানের যুগে life begins at fifty। পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ—এযুগে অচল। সুতরাং তুমি জীবনের যে নতুন অধ্যায় আরম্ভ করলে, তা হবে নবযৌবনের সৃষ্টিশক্তিতে গরীয়ান, অথচ বহুদর্শিতার প্রবীণতায় দৃঢ়—এক কথায় বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা। এই জরাহীন বৃদ্ধত্ব তুমি আজীবন ভোগ কর এবং বঙ্গবাসীর চিত্তকে তোমার মনের মাধুরী দিয়ে মধুমত্তর ক'রে তোল।

জাতিস্মর

জাতিস্মর যাহারা পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে। জন্মান্তরবাদের উপর এই ধারণার ভিত্তি ; অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে ইহা ধর্মবিশ্বাসের সহিত জড়িত হইয়া আছে। জন্মান্তর স্বীকার করিলে জন্মান্তরের কথা স্মরণ করিতে পারাও সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মহাভারতে কয়েক স্থানে জাতিস্মরতার উল্লেখ পাওয়া যায়। জাতিস্মর নামে এক হ্রদ ছিল, এই হ্রদে স্নান করিলে মানুষ জাতিস্মর হইত (মহাভারত, বনপর্ব ৮১৮০ শ্লোক)। জাতিস্মরত্বলাভের অন্য উপায়ও মহাভারতে বর্ণিত আছে। সূর্যোদয়কালে সমাহিত চিত্তে যে অষ্টোত্তর শতবার সূর্যনাম পাঠ করে সে ধন-পুত্র-রত্নাদি প্রাপ্ত হয় ; স্মৃতি, মেধা ও জাতিস্মরত্ব লাভ করে (মহাভারত ঐ ৩১৬০)। ভগবদ্‌গীতায় জাতিস্মরবাদ স্বীকৃত ; শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, 'অর্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সে সকল জানি, পরন্তপ, তুমি জান না' (৪/৫)।

রামায়ণে জাতিস্মরত্বের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। হরিবংশে জাতিস্মর প্রসঙ্গ আছে, একটি উপাখ্যানও পাওয়া যায় ; কুরুক্ষেত্রের ৭ জন ব্রাহ্মণ পথে গমনকালে ক্ষুধায় কাতর হইয়া গোহত্যা করে। পরে পাপক্ষালনার্থ উহারা গোমাংস পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে অর্পণ করিয়া ভোজন করে। এই পাপ ও পুণ্যের ফলে তাহারা পরজন্মে সাত জন ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং অতিশয় ধার্মিক ও পিতৃভক্ত হয় ; বৃথা প্রাণীহত্যা হইতে বিরত থাকে। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাহারা স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করে এবং পুনরায় জাতিস্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করে (হরিবংশ, ১২০২-৩ শ্লোক)।

মনুসংহিতায় (৪/১৪৮) উক্ত হইয়াছে যে বেদপাঠ, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, তপস্যা ও সর্বভূতে অদ্রোহের দ্বারা পূর্বজন্ম স্মরণ করা যায়। যোগসূত্রে (৩/১৮) লিখিত আছে অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা পূর্বজন্মের জ্ঞান জন্মিতে পারে। ভাগবত পুরাণে (৫/৯) জড়ভরতের জাতিস্মরত্বের উপাখ্যান আছে এবং অন্যত্র (৯/১৮/১৬) সূর্যবংশীয় অসমঞ্জকে জাতিস্মর বলা হইয়াছে।

বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীগুলি বুদ্ধদেবের পূর্ব পূর্বজন্মের ঘটনারূপে জাতিস্মর-শৈলীতে লিখিত ; বুদ্ধদেব জন্মান্তরের কথা স্মরণ করিয়া কাহিনী বলিতেছেন। পরবর্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্যে (কথাসরিৎসাগরাদি) জাতিস্মর মানুষ ও পশুপক্ষীর নানা কাহিনী পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের আদি পর্বে বহু কথা-উপকথায় জাতিস্মর মানুষ ও পশুপক্ষীর প্রসঙ্গ আছে।

খ্রীস্টধর্ম জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে না। তাই পাশ্চাত্ত্য দেশে জাতিস্মরতার সংস্কার নাই। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কথাসাহিত্যে জাতিস্মরতা অবলম্বন করিয়া কাল্পনিক কাহিনী রচিত হইয়াছে। জ্যাক লণ্ডন, কোনান ডয়েল, সমার্‌সেট মম প্রভৃতি লেখকের নাম এই সূত্রে স্মরণীয়। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যেও জাতিস্মরমূলক কাহিনীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

জাতিস্মরত্বের কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

পরমাত্মা সংবাদ

যিনি বাক্য এবং মনের অগোচর সেই পরমাত্মার সঙ্গে সম্প্রতি আমার কিছু কথোপকথন হইয়াছিল। নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমি : হে পরম পুরুষ, নমস্তে। সম্প্রতি গীতা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। শুনিয়া আপনি সুখী হইলেন কি ?

পরমাত্মা সাড়াশব্দ দিলেন না।

আমি : গীতায় শ্রীভগবান গোড়তেই একটা বড় গোলমেলে কথা বলিয়াছেন। তিনি কোনও প্রমাণ না দিয়া বলিতেছেন, আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, শরীর হত হইলেও আত্মা হত হয় না। কথাটা কি সত্য ? যদি সত্য হয়, কোনও প্রমাণ আছে কি ?

পরমাত্মার উত্তরের জন্য অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিলাম, কিন্তু তিনি নীরব রহিলেন।

আমি : হে পরমাত্মন্, চুপচাপ কেন ? এই গোড়ার কথাটা না বুঝিলে গীতার অন্য কোনও কথাই যে গলাধঃকরণ করিতে পারিতেছি না। ভাবিয়া দেখুন, আমি সাধারণ বুদ্ধিযুক্ত মানুষ, বিজ্ঞানের আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছি। দেহটা বাদ দিলে আত্মা বর্তমান থাকে ইহার প্রমাণ কুত্রাপি পাই নাই। ভূতপ্রেতের অনেক গল্প শুনিয়াছি, শুনিয়া গায়ে কাঁটা দিয়াছে। কিন্তু সন্দেহ ঘোচে নাই। নিঃসংশয়ভাবে দেহাতীত আত্মার প্রমাণ আছে নাকি ?

পরমাত্মা নিশ্চল রহিলেন, উত্তর দিলেন না। মনে হইল, আমার বারম্বার একই প্রশ্ন শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইয়াছেন।

আমি : আচ্ছা, ও কথা থাক। প্রমাণ না থাকিলেই যে আত্মা থাকিবে না এমন কোনও কথা নাই। আজকাল বিজ্ঞানও বলিতেছে, বাস্তব জগৎ যে আছে, তাহার কোনও প্রমাণ নাই, অথচ বিজ্ঞান এই বাস্তব জগৎটাকে লইয়াই ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছে। দেশ-বিদেশের মুনি-ঋষিরা যখন বলিতেছেন, আত্মা আছে তখন না হয় তাহা মানিয়া লইলাম। ঋষিবাক্যও নাকি একটা বড় প্রমাণ। ঋষিরা ধ্যানযোগে এমন অনেক কথা জানিতে পারেন, যাহা আমাদের মতো গোলা লোকের বুদ্ধির অতীত।মঙ্গলগ্রহের যে চাঁদ আছে, তাহা আমরা সাদা চোখে দেখিতে পাই না ; কিন্তু যাঁহার কাছে দূরবীণ আছে তিনি দেখিতে পান। সুতরাং মানিয়া লওয়াই যাক যে আত্মা আছে, আমি মরিয়া গেলেও আমার আত্মা থাকিবে। কেমন, এবার খুশি হইলেন তো ?

পরমাত্মা একটু উস্‌খুস্ করিলেন।

আমি : গীতার কথাই বলি। শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন, তুমি কর্ম কর, কিন্তু ফলের আশা ত্যাগ কর ; মা ফলেষু। এই কথাটা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। কর্মফল আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম করিব কিরূপে ? ধরুন, আমি গল্প লেখক। আমি যখন গল্প লিখি তখন নিজেকে এবং পাঠককে কিছু আনন্দ দিবার উদ্দেশ্যেই লিখি, আবার কিছু রজত মুদ্রার আশাও থাকে। এই সব ফলাকাঙ্ক্ষা যদি ছাড়িয়া দিই, তবে গল্প লিখিব কেন ? গল্প লেখার প্রেরণাই বা আসিবে কেন ?

মনে হইল পরমাত্মা আমার কথাটা কানে তুলিলেন না ; আমি গল্প লিখি বা না লিখি তাহাতে তাঁহার কিছুই আসে যায় না।

আমি : আপনি বলিবেন, পরহিতার্থে কাজ কর, নিজের স্বার্থ ভাবিও না, তাহাতেই ফল ত্যাগের ফল হইবে। বুঝিলাম, কিন্তু আমি যদি নিজের কথা না ভাবি, আমার পেট চলিবে কিরূপে। ডালভাতের বেশি কিছু চাই না, কিন্তু নিজে চেষ্টা না করিলে তাহাও যে জুটিবে না।

পরমাত্মা গোঁ গোঁ শব্দ করিলেন। বুঝিলাম, ডালভাতের কথায় তাঁহার রাগ হইয়াছে।

আমি : প্রভো, ক্ষমা করুন। আমি জানি চেষ্টা করিলেই ডালভাত জোটে না ; কর্ম করিলেই

কর্মফল পাওয়া যায় না। অনেক সময় রাম উল্টা বোঝেন। সুতরাং কর্মফলের উপর বেশি ভরসা না রাখাই ভাল। ইংরেজিতে কথা আছে, hope for the best but be prepared for the worst—ইহাই কি গীতার মা ফলেষু কথার উদ্দেশ্য ?

পরমাত্মা একটি জৃম্ভন ত্যাগ করিলেন, তারপর অবাঙ্‌মানসগোচর হইয়া গেলেন। তদবধি তাঁহাকে আর দেখি নাই।

যোগ অভ্যাসের চেষ্টায় আছি। শ্রীভগবান এক সিধা রাস্তা বাৎলাইয়া দিয়াছেন, মনকে আত্মসংস্থ করিয়া ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ—নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিব। দেখি সুরাহা হয় কিনা।

৭ ফাল্গুন ১৩৫৫

॥ ২ ॥

বিষয়কর্মে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, দেখি পরমাত্মা আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলাম।

আমি : এ কি প্রভু ? আপনি হঠাৎ ?

পরমাত্মা একটু মুচ্‌কি হাসিলেন।

আমি : মুচ্‌কি হাসেন যে ! আমি স্পষ্ট বলিয়া দিতেছি ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করা আমার কর্ম নয়। তা ছাড়া আমি ফলাকাঙ্খা ছাড়িলে কি হইবে, ফল যে আমাকে ছাড়ে না। ভাল কাজ করিলে ফল বেশির ভাগই পাই না, কিন্তু একটু মন্দ কাজ করিয়াছি কি আর রক্ষা নাই, কর্মফলের ঠেলায় প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে।

পরমপুরুষ সপ্রশ্নভাবে মিটিমিটি চাহিলেন।

আমি : এই দেখুন না, সেদিন গোয়ালা ব্যাটা দুধে জল মিশাইয়া মুখের উপর চোটপাট করিয়াছিল বলিয়া তাহার গালে একটা চড় মারিয়াছিলাম। তাহার ফলে গোয়ালা দুধ বন্ধ করিয়াছে, উপরন্তু একটা ইয়া লম্বা ছোরা লইয়া সর্বদা পিছনে ঘুরিতেছে ; বাড়ির বাহির হইবার যো নাই।

ভৎর্সনাপূর্ণভাবে পরমাত্মা দক্ষিণে ও বামে ঘাড় নাড়িলেন।

আমি : আপনি বলিবেন চড় মারা অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু সব দোষই কি আমার ? গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, দুষ্কৃতকারীর বিনাশের জন্য তাঁহাকে বারবার আসিতে হয় ; আর আমি যদি দুষ্ট গোয়ালাকে একটি চড় মারি অমনি ঘোর অন্যায় হইবে ?

পরমাত্মা দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—হ্যাঁ, অন্যায় হইবে।

আমি : কেন অন্যায় হইবে ? আমরাও তো ভগবানের অংশ, অন্যায়ের দমন করা কি আমাদের কাজ নয় ? যদি বলেন কাজ নয়, তবে সংসার চলিবে কিরূপে, সমাজ যে দুদিনে উচ্ছন্ন যাইবে।

পরমাত্মা মাথা নাড়িয়া বুঝাইয়া দিলেন— না, উচ্ছন্ন যাইবে না। বড়ই মুশকিলে পড়িলাম।

আমি : আপনার কি তবে এই ইচ্ছা যে, কালা-বাজারের গুণ্ডাগুলা যা ইচ্ছা করুক, কেহ তাহাদের বাধা দিবে না ? গোয়ালা দুধে জল মেশাক, কম্‌রেড্‌রা ঘরে আগুন দিক, কেহ কিছু বলিতে পাইবে না ?

পরমাত্মা মাথা নাড়িয়া জানাইলেন— না, তাহাও নয়।

আমি : তবে কি করিব আপনিই বলিয়া দিন। আর তো সংসারে টেঁকা যায় না। লোটা-কম্বল লইব ?

পরমপুরুষ সবেগে মাথা নাড়িলেন— না !

আমি : লোটা-কম্বলের প্রতি আমারও বিশেষ আসক্তি নাই। কিন্তু একটা কিছু করিতে হইবে তো! কী করিব?

পরমাত্মা তর্জনী দিয়া নিজের প্রশস্ত ললাটে টোকা মারিলেন।

আমি : ওঃ বুদ্ধি! বুদ্ধি খেলাইয়া কাজ করিতে বলিতেছেন? গীতায় আছে বটে, বুদ্ধিযুক্তের সুকৃতি দুষ্কৃতি নাই, অতএব বুদ্ধির শরণ লও। আমি যে একেবারে বুদ্ধি বাদ দিয়া কাজকর্ম করি তা নয়। তবে মাঝে মাঝে দুনিয়ার হালচাল দেখিয়া রাগ হইয়া যায়, তখন আর মাথা ঠিক থাকে না—

পরমাত্মা ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে হাসিতে মাথাটি নাড়িতে লাগিলেন।

আমি : রাগ দ্বেষ ত্যাগ করিয়া কাজ করা উচিত তাহা মানি। তাহাতে কাজও ভাল হয়। গোয়ালাটাকে রাগের মাথায় চড় না মারিলেই ভাল হইত। এখন সে রাগের মাথায় কিছু না করিয়া বসে। প্রভু, আপনি গোয়ালার কাছে গিয়া কিছু সদুপদেশ দিতে পারেন না'

পরমাত্মা হাই তুলিয়া তুড়ি দিলেন, তারপর অদৃশ্য হইয়া গেলেন। গোয়ালার কাছে গেলেন কি না ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

যা হোক, কাম-ক্রোধ জয় করা বিশেষ দরকার। স্থির করিয়াছি, এবার রাগ হইলেই ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া নিজে নিজে তর্জন-গর্জন করিব, দেয়ালে ঘুষি মারিব; তারপর মাথা ঠাণ্ডা হইলে বাহিরে আসিয়া যাহার উপর রাগ হইয়াছে, তাহার সহিত বোঝাপড়া করিব। যদি বুদ্ধি বলে চড় মারাই উচিত তখন শান্ত ভাবে চড় মারিব।

এই তো গেল ক্রোধের দাবাই। আর কাম— অর্থাৎ কামনা? গীতায় আছে, কাম এষ, ক্রোধ এষ,—কামও যে ক্রোধও সেই—একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ। সুতরাং ক্রোধকে যদি কাবু করিতে পারি, কাম আপনিই ঘায়েল হইবে।

১৩ আষাঢ় ১৩৫৬

সুখের উপাদান

কে কিসে সুখী হয়?

কেহ না জানিয়া কুলিকে ঠকাইয়া বিভ্রান্ত; কেহ ইচ্ছাপূর্বক বিধবাকে সর্বস্বান্ত করিয়া আনন্দিত।

★

প্রতিভা হচ্ছে dynamo, সে বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি করে; আর জনসাধারণ হচ্ছে battery, সে সেই শক্তি ধারণ করে রাখে।

★

কথা কহিতে পারাটা নিরবচ্ছিন্ন আশীর্বাদ নয়। পশুরা কথা কহিতে পারে না, তাহারা মানুষের চেয়ে সুখে আছে। তাহারা ঝগড়া করে vital বিষয় লইয়া—যেমন, খাদ্য প্রণয়িনী। মানুষ ঝগড়া করে তুচ্ছ বিষয় লইয়া। মানুষ যদি কথা কহিয়া পরকে দুঃখ দিতে না পারিত তাহা হইলে তাহারা ঢের বেশি সুখে থাকিত। যে যত বেশি কথা কয়, সে তত বেশি দুঃখ সৃষ্টি করে। বোবার শত্রু নাই।

লেখকের আদর্শ

অখণ্ড মনোযোগ না দিলে লেখা ভাল হয় না।

ফরমাসী বা পরের মন-যোগানো লেখা ভাল হয় না।

লিখিবার সময় পাঠক খুশি হইবে কিনা একথা ভাবিবে না। নিজের যাহা ভাল বোধ হইবে তাহাই লিখিবে।

Style দেখাইবার চেষ্টা করিবে না, মনের ভাবটিকে শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দিবার চেষ্টা করিবে। তাহা হইলেই style আসিয়া পড়িবে।

অকারণে একটি শব্দও ব্যবহার করিবে না।

রসসৃষ্টিই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য, রসবর্জিত সত্যও সাহিত্য নয়। যাঁহারা কেবল সত্যউদ্‌ঘাটনে ব্যস্ত তাঁহারা ঋষি হইতে পারেন কিন্তু সাহিত্যিক নহেন।

জোর করিয়া কোনো রস—যথা হাস্য বা করুণ—ফুটাইবার চেষ্টা করিবে না। বিষয়বস্তুতে যদি সে রসের উপাদান থাকে, রস আপনি ফুটিবে। বিষয়বস্তুর মধ্যেই মনকে নিবিষ্ট রাখিবে।

Digression অতিশয় বিপজ্জনক ; মাঝে মাঝে প্রয়োজন হইলেও যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে করিবে।

প্রকৃতির বর্ণনা কোথাও দশপংক্তির বেশি করিবে না। যাহা সকলেই চোখে দেখিতে পায় তাহার দীর্ঘ বর্ণনা ক্লান্তিকর।

বর্ণনীয় বিষয়ের চিত্রটি স্পষ্টভাবে মনের পটে আঁকা না থাকিলে বর্ণনা অস্পষ্ট হইবে। প্রত্যেক দৃশ্যটি visualise করিবে।

যে চরিত্রটি আঁকিবে তাহাকে উলঙ্গ করিয়া দেখিয়া লইবে। হয়তো সে-চরিত্র সম্বন্ধে সবকথা লেখার প্রয়োজন নাই, তবু তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিয়া লওয়া চাই।

যে বিষয়ে লিখিবে সে-বিষয়টি ভাল করিয়া পড়িয়া লইবে—আন্দাজে যাহোক একটা লিখিয়া দিবে না। পাঠকের বুদ্ধি জ্ঞান ও রসবোধের উপর শ্রদ্ধা রাখিবে। অন্যথা ঠকিতে হইবে।

সাময়িক রচনা (topical) পুস্তকাকারে বাহির করিবে না।

বিরুদ্ধ সমালোচনায় অধীর হইবে না। সাহিত্যক্ষেত্রে কাহারও সহিত মতভেদ হইলে প্রতিদ্বন্দ্বীর বুদ্ধি-বিবেচনা সম্বন্ধে কখনো কটাক্ষপাত করিবে না। পারতপক্ষে উত্তর দিবে না। যদি নিতান্তই উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হয়, ধীর ও সংযতভাবে দিবে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর্শ বলিয়া জানিবে। তিনি ভিন্ন বাংলায় অন্য আদর্শ নাই।

২৮ ভাদ্র ১৩৪০

দিনলিপি : ১৯১৮ ও ১৯২০

মন-কণিকা

আত্মজীবনকথা

১৯১৮

৩-১-১৯১৮

কঠোরতা মানুষের পশুস্বভাব বলেই বোধ হয়। তার অনুষ্ঠানে একটা গূঢ় আনন্দ পাওয়া যায়। বিশেষত কর্তব্যের নামে যে কঠোরতা সেটার আত্মসমর্থনের উপায় আছে বলেই বোধ হয় তার সম্ভ্রম নিজের কাছে খুব বেশি। আমার মনে হয় এই কর্তব্যের খাতিরে কঠোরতা কেবল স্বেচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনা। তাতে কর্তব্যের অংশ খুব কমই আছে। কর্তব্যের কঠোরতাকে মোলায়েম কোমল করে নেওয়াই কর্তব্যের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

আজ রবিবাবু আমাদের হোস্টেলে এসেছিলেন। তাঁর সভাপতিত্বে ছাত্রদের একটি সভা হল। এই সভাটি ছাত্রদের পরস্পর সাহায্য করবার সভা। কয়েকটি ছাত্রের উদ্যমে এর জন্ম। এই উপলক্ষ্যে একটি ছাত্রের নাম খাতায় লিখে রাখলুম। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যৎ যে নাম সাধারণের কাছ থেকে গোপন করে রাখবে না সে নাম, রাসবিহারী দাস[১]।

বায়স্কোপে গিয়েছিলুম। Twin Kiddies দেখতে। বেশ, মন্দ নয়। ছোট্ট মেয়ে Marie Osborne এত সুন্দর অভিনয় করে, দেখলে অবাক হতে হয়।

৪-১-১৯১৮

ভাগ্যে অনিল মনে করে দিলে! আমি ত একদম ভুলে গিয়েছিলুম। বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল তাই শুয়ে পড়েছিলুম। ডায়েরি লেখার কথা মনেই ছিল না। কথায় বলে অনভ্যাসের ফোঁটা।

রবিবাবুর যে কখানা ছবি তুলেছিলুম সবকটাই খারাপ হয়ে গেছে, একটাও ওঠেনি। শুধু অনিলের একটা উঠেছে।

আজ বেলা দেড়টা থেকে টেনিস খেলছি। বড় হয়রান হয়ে যাওয়ায় ক্ষিদে পেয়েছিল—Eating House-এ গিয়ে ১॥ টাকার খেয়ে ফেলেছি। এত খাওয়া উচিত হয়নি কিন্তু ক্ষিদের মুখে খেয়ে ফেলেছি। আমার একটা মস্ত দোষ আমি ক্ষিদে সামলাতে পারি না।

আমাদের শুনছি মধুপুরে গিয়ে camp training[২] হবে। মন্দ হবে না—বাড়ি থেকে কাছে হবে। দু' একদিনের ছুটি পেলেই বাড়ি ঘুরে আসতে পারবো। ১১ই তারিখে নাকি camp যাত্রা হবে। শুভস্য শীঘ্রম্।

৫-১-১৯১৮

Parade as usual. Wandered all the noon buying things for myself, Pando, Bhola and others at Radhabazar. Bought golf-coat cloth for Khotu[৩] and visiting cards for father. I shall have to get them printed before they are sent to father. Took light tiffin at New Market and went to see 'Milestone' at Bijou[৪]. A really good film...Grey acted nicely. The film turned out better than we had expected.

Have got an invitation at Kakima's tomorrow for breakfast. Tommorow is a holiday from our parade. Invitation always makes holidays hearty.

I want to sleep tonight with vengeance. Not getting up before 7.30 in the morning. Good-night.

৬-১-১৯১৮

Every Sunday henceforth I will fix some work for me such as writing letter to Dadababu and mother.

Went to the invitation in due time but was not served before 1 o'clock. Very humiliating. No tendency to take either tiffin or dinner. Slept all the evening with Satya Sen in the bed till it was quite late. He is a very good man from all the little I know of him. Independent, spirited and frank.

The shameful business of explanation on the part of Mr Kennedy' for beef soup matter. He was quite shocked at the idea that we could think so poorly of him after three years of acquaintence.

It is really very shameful for those limited few of us who are over-sentimental.

৭-১-১৯১৮

তরল কথাবার্তার দোষ এই যে মনের সঙ্গে যে কথাবার্তার আন্তরিক কোন বিশেষ যোগ না থাকলেও অজ্ঞাতসারে মনটাকেও তরল করে ফেলে। চিত্তের যে গভীরতা শান্তির লীলানিকেতন, সেইটে অতিবিস্তার দোষে এত চঞ্চল ও অশান্ত হয়ে ওঠে যে মনের আত্মসমাহিত আনন্দটুকু নষ্ট হয়ে যায়।

আমার এখনকার কাজ নিজের সংস্কার করা। যেখানটা জীর্ণ, যেখানটা অগঠিত, যেখানটা পতনোন্মুখ, সেই সেই স্থানে আমূল সংশোধন ও নির্মাণ করতে হবে। যে বাড়ি তৈরি করছি, তার বনেদেই যদি একটা দুর্বল স্থান থেকে যায় তাহলে ভবিষ্যৎ নিরাপদ নয়। আজ থেকে ভাষার অর্গলহীন স্বাধীনতাকে সংযত করব।

আজও বায়স্কোপে গিয়েছিলুম। BrigadierGerardবেশ লাগল। আসচে শনিবার থেকে খুব একটা বড় আকর্ষণ আছে—The Iron Claw, তাতে Pearl, Lewis এবং Hale আছে। জিনিস সুন্দর হবে সন্দেহ নেই।

খতুর কাপড় পাঠানো হয়নি। চিঠির আশায় আছি। কাল আবার আমাদের picnic।

৮-১-১৯১৮

ছি ছি, আমরা এখনো এত দুর্বল, এত হীন যে যাঁরা আমাদের প্রকৃত হিতৈষী, আমাদের উন্নতিসাধনই যাঁদের একমাত্র চিন্তা, তাঁদের একটা ভুল আমরা ক্ষমা করতে পারি না ? অথচ সে ভুল এতই তুচ্ছ, এতই অবজ্ঞেয় যে সেটা আমরাই না জেনে কতবার করেছি। কেনেডি সাহেব দেবতার মত লোক। তিনি যে ইচ্ছা করে জাত মারবার উদ্দেশ্যে আমাদের কুখাদ্য খাওয়াবেন এ কথা বিশ্বাস করব না। আমাদের নিজেদের এত দোষ অথচ পরের এতটুকু দোষ আমরা সহ্য করতে পারি না এর চেয়ে লজ্জাকর আর কি আছে ?

পিকনিক হবার কথা ছিল কিন্তু হল না। সেটাকে কোনও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জিম্মায় রেখে দেওয়া গেল।

আজকাল একটা অভাব অনুভব করছি। সেটা সাহিত্যিক নিশ্চেষ্টতা। কিছুই লিখতে পারছি না। কি জানি কেন। প্রতীক্ষা করছি আবার যখন ঝোঁক আসবে তখন লিখব। এটা বোধহয় একটা ক্ষণকালীন অবসাদ মাত্র।

৯-১-১৯১৮

রবিবাবুর তরুণ বয়সের কবিতায় এমন একটা মাদকতা, একটা রোমান্স আছে যা মনকে মুগ্ধ করে ফেলে। তাঁর কাঁচা লেখার মধ্যেও একটা ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের পূর্বাভাস পাওয়া যায় যেটা আজকাল তাঁর গৌরবের দিনে আমাদের আনন্দ না দিয়ে পারে না। একটা কবিতা যেমন লিখেছেন :

কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে
আজি হতে শত বর্ষ পরে!
আজিকার কোন ফুল, বিহঙ্গের কোন গান
আজিকার কোন রক্তরাগ
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব না পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হতে শত বর্ষ পরে!

কি সুন্দর! নয় কি? কি মনোহর দূরত্ব-কল্পনা! আজিকার প্রকৃতিকে ভাষার দ্বারা শতাব্দী দূরে সঞ্চারিত করিতে পারিব না। শতাব্দী পরে কোন নবীন কবি এই কবিতা পাঠ করিয়া কি তাহার কল্পনাকে শতবর্ষ পশ্চাতে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না?

১০-১-১৯১৮

বাবা আজ চিঠিতে লিখেছেন যে ছেলেদের অর্থাৎ student-দের পণপ্রথার বিরুদ্ধে একটা অভিযান (campaign) করা উচিত। আসন্ন কন্যার বিবাহের কথা ভেবে বাবা নিশ্চয়ই এ কথা লেখেননি। কারণ কন্যার বিবাহের চেয়ে তাঁর পুত্রের বিবাহটাই বেশি আসন্ন। সে যা হোক, আমি বাবার সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করব ভাবছি। সভা-সমিতি করে পণপ্রথা বন্ধ করবার চেষ্টার চেয়ে প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের নিজের বিবাহের পণ না নেওয়াই বেশি কার্যকরী, যেহেতু Example is better than precept. আমি যদি না নিই, তাহলে সেটা কি আমার বন্ধুদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হবে না? তাছাড়া অনিচ্ছু [ক] শ্বশুরের কাছ থেকে জোর করে পণ আদায় করায় যেন একটা অযোগ্যতার ও ক্ষুদ্রতার গ্লানি আছে। সেটুকু স্বীকার করা বড় লজ্জাকর।

আজ কাপড়ের পার্শেল পাঠিয়ে দিলুম। সমস্ত দিন ক্রিকেট ম্যাচ দেখেছি। সন্ধ্যার সময় হোস্টেলে ফিরলুম। তারপর রবিবাবুর কাব্যপাঠ ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

আজ অনিলের একখানা চিঠি পড়লুম। বিবাহিত জীবনের জন্যে একটু কৌতূহল হচ্ছে।

১১-১-১৯১৮

একটা চমৎকার গল্পের প্লট[৬] পাওয়া গেছে। বেশ একটু নূতন ধরনের। একজন খবরের কাগজে বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করলে; শেষে বিয়ে করতে গিয়ে দেখে কনে তারি সম্বন্ধে একরকম বোন। প্লটটা অবশ্য আমার নিজস্ব নয়। নরেন[৭] এটা উদ্ভাবন করে। লেখার ভার পড়েছে আমার উপর। আমি যথাসাধ্য ভাল করে লেখবার চেষ্টা করছি। লেখা যদি ভাল হয় তবে কাগজে ছাপাতে দেব। খানিকটা লেখা হয়েছে। দেখি শেষ বরাবর কেমন দাঁড়ায়।

আমার একটা অভ্যাস, যে প্লট নিয়ে লিখতে আরম্ভ করি—লিখতে লিখতে সেটা বদলে যায়। চরিত্রগুলোর উপর বেশি দৃষ্টি দিলে এই হয়। কারণ, আমার মনে হয়, গল্পের ঘটনাগুলো চরিত্র হিসাবেই নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

কাল পৌনে সাতটার সময় প্যারেড-ক্ষেত্রে উপস্থিত হতে হবে। বেশি রাত্রি করে কাজ নেই। শুয়ে পড়া যাক।

১২-১-১৯১৮

বাবাকে কাল যে দীর্ঘ চিঠিখানা লিখেছি তারি কথা ভাবছি। এবার বাড়ি থেকে আসবার দিন একটা আকস্মিক সংবাদ শুনে এসেছিলুম আমার চিঠিখানা বোধহয় অজ্ঞাতসারে তারি প্রতি ইঙ্গিত করে ফেলেছে। সেদিন সংবাদটা গুরুতরভাবে আমার ওপর এসে পড়লেও আমি নিজেকেও যেন তার ব্যথাটা জানতে দিইনি। কিন্তু সংবাদটা যে আঘাত দিয়েছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। আমি IDF[৮]-এ যোগ দিইছি বলে বোধহয় তাঁরা কোনরকমে নিষ্কৃতি পেতে চান। এতে দোষের কিছুই নেই। যে দু'দিন পরে মৃত্যুকে বরণ করতে যাবে, তার সঙ্গে কে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে চায়? কিন্তু তবু তাঁদের মনোভাবের অস্পষ্ট ইঙ্গিতটা আমায় ব্যথা দিয়েছিল। কেন? বোধহয় একটা নামের সঙ্গে মনের স্নেহ বিজড়িত হয়ে গেছে। সেই নামটাকে স্নেহ থেকে পৃথক করে দিতে হবে, তাহারি বেদনায়! আচ্ছা, শুধু নাম ভালবাসা যায়? বোধহয় যায়। আমি ত নামের বেশি পরিচয় কিছুই পাইনি, তবু সেই পরিচয়ই আমার স্নেহ টেনে নিয়েছে।

১৩-১-১৯১৮

মেয়েদের সঙ্গ এমন একটা স্নেহময় জিনিস যে কিছুদিন তা না পেলে মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। গৃহের আকর্ষণ এই জন্যই। এমন একটা স্নেহের অনুভাব, আত্মীয়তার তৃপ্তি তাদের চারিদিকের বাতাসকে পর্যন্ত অভিভূত রাখে যে মানুষ সে বন্ধন এড়াতেই পারে না। এইটেই নারীজাতির গুণ। মিসেস কেনেডি আমার স্বজনও নন, আত্মীয়ও নন; কিন্তু তবু তাঁর কাছে গেলে, তাঁর সঙ্গে কথা কইলেই নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ে, এবং হোস্টেলের জীবনযাত্রাটা একরকম অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। এই জন্যই কবিরা নারীকে গার্হস্থ্য জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলে গেছেন। এইখানেই গৃহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। কি মোহময় কুহকই গৃহকে করে রেখেছে এই নারী! আমি একদিন এই আইডিয়া নিয়েই আমার একটি সনেট লিখেছিলুম:

আমার যৌবন অনুরাগে, লো বালিকে,
গড়েছে কি তোমার ও কনকমূরতি!

১৪-১-১৯১৮

আজ সকাল হবার আগে থেকেই একটা জিনিস আমার ঘুমন্ত চেতনার উপর তার নরম হাত বুলিয়ে গেছে—সেটা বসন্তের সাড়া। খর বায়ুর মধ্যে যে এত স্নেহময় স্পর্শ আছে কে জানত। আজ থেকে বসন্তের পূর্বরাগ আরম্ভ। এই সংসর্গে রবিবাবুর একটা কবিতাংশ মনে পড়ে:

কেন আন বসন্ত নিশীথে

প্রাণভরা আবেশ বিহ্বল
যদি বসন্তের শেষে, ক্লান্ত মনে ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল !

বসন্তের দখিনে হাওয়ার উদ্দেশ্যে ঠিক এই কথা বলা যায় নাকি ? এই হাওয়াই ক্রমে গ্রীষ্মের প্রখর তাপে তপ্ত হয়ে উঠবে। তখন রসিক কবির ভাষায় :

"বহিছে মলয় আকুলি বিকুলি
রাস্তায় তাই উড়ে যত ধূলি
এ সময় বল বিরহিণীগুলি কেমনে রবে জীবন্ত।"

বিরহিণী ত দূরের কথা, সে সময় বিরহ বিরহিত আমাদেরও জীবন্ত থাকা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে।

১৫-১-১৯১৮

The I.D.F. secretaries have faced us with three alternative suggestions about our camp drill and have left the decision to our vote. The alternatives are whether we should have our camp training immediately after our Calcutta drill is ended altogether, or should we have it next November at camping season for the reason that there would be no examinations then, or shall we have a spilt up among ourselves. The 1st and 3rd year students doing it now, and the 2nd and 4th year students doing it later.

To my mind the last suggestion appears to be best by all means. Let us have our training done at a stretch and let the 2nd year and 4th year people wait till they have finished their exam, no one will suffer for it. Only some will be in advance of others.

I am going to vote for it tomorrow.

১৬-১-১৯১৮

Our vote referring to the camp training was taken today by Mr Sterling. We seem to have the largest vote on our side, although nothing is known definitely yet.

Physical drill henceforth for half an hour every morning. It is quite rigorous and is sure to make every one of us hardy and long-enduring. Enjoyed the morning thoroughly.

Father has taken the hint which I gave him in my letter about dowry in marriage and is quite glad I have vented my view freely. He is such a good father. How little I have tried to appreciate him! Let me be thankful I am son to such a father. Nothing could make me more proud of myself!

১৭-১-১৯১৮

আজ দুদিন থেকে ফটো সমেত একখানা চিঠির অপেক্ষা করছি। কিন্তু এখনো পাচ্ছি না।

কাল পাবো বোধহয়।

আজ কলেজে গিয়েছিলুম। Ethics-এর lecture আজ থেকে আরম্ভ হল। Indu Sen পড়াবেন।

গল্পটা কদিন হল শেষ হয়ে গেছে। কি রকম হল বুঝতে পারছি না। কিছুদিন পড়ে থাক। তারপর পড়ে দেখলেই হবে।

Drill গুরুতরভাবে আরম্ভ হয়েছে। একটু পুষ্টিকর কিছু না খেলে আর চলছে না। আজ Pearl of Paradise দেখতে গিয়েছিলুম। Margarita Fisher-এর কি রূপ! তার কাছে আর সকলে যেন ম্লান হয়ে যায়। অভিনয় করবার কৌশলও তেমনি অসাধারণ! যেন সত্যই একটি পুরা প্রকৃতির স্বভাব বর্জিত নারী-চরিত্র। কবিতা স্মরণ হয়,

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি।—

১৮-১-১৯১৮

এমন কোন কারণ নেই অথচ আজ প্যারেড করতে যাইনি। সমস্ত দিন বসে আছি কলেজেও যাইনি। আবার আমি খামখেয়ালী হয়ে পড়ছি। বড় খারাপ। নতুন গল্পটা ভাবছি অবলা পিসিমার[৭] কাছে পাঠিয়ে দেব। তিনি পড়ে যদি ভাল লাগে ত কাগজে পাঠিয়ে দেবেন। গল্পটা fair করতে হবে।

আজ 'একটি কাটি' নামক কবিতা খাতায় তুলে রাখলুম। 'পাষাণের মুখ' বলে যে খণ্ড কাব্যটা আরম্ভ করেছিলুম সেটা শেষ করা হয়নি অথচ যে পর্যন্ত হয়েছে, মন্দ হয়নি বলে মনে হয়।

'ভূতের বাড়ি' গল্পটা অসমাপ্ত হয়ে আছে সেটা শেষ করতে হবে। 'বিশ্বনাথজী' একেবারে এলিয়ে পড়েছে। আবার নূতন উদ্যমে আরম্ভ করতে হবে।

'সৎকর্মের ফল'ও অর্ধলিখিত। শেষ করা চাই।

১৯-১-১৯১৮

ফুলের চেয়ে যেমন কুঁড়িটি বেশি সুন্দর, যুবতীর চেয়ে যেমন কিশোরী বেশি মনোমুগ্ধকর, তেমনি আজকের আধফোটা কিশোর বসন্ত ঠাণ্ডা হাওয়া ও পাতলা মেঘের আড়ালে লুকিয়ে উঁকি মারছে। এই প্রথম বসন্তের সঙ্গে চেনা-শোনার নিবিড় অথচ প্রচ্ছন্ন আনন্দটুকু মনের উপর নিদ্রায় ও জাগরণে যেন তার কোমল কর পরশ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। রবিবাবুর কবিতা :

'ওগো দখিন হাওয়া ও পথিক হাওয়া
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া
পরশখানি দাও বুলিয়ে।'

আর একটা কবিতাও মনে পড়ে নাকি?

'এমন করিয়া কেমনে কাটিবে মাধবী রাতি?
দখিনে পবন কেহ কাছে নাই সাথের সাথী।'

আজ প্রাণ কিসের পূর্ণতায় ভরপুর। তাই অনেক বাজে কথা লিখিয়া ফেলিলাম।

২০-১-১৯১৮

আজ সমস্ত দুপুর বসিয়া bioscope দেখিয়াছি। পিঠে ব্যথা ধরিয়া গিয়াছে। ভাগ্যে আজ রাত্রে prayer নাই—নহিলে মারা যাইতাম।

নরেন একটা সুসংবাদ লইয়া উপস্থিত হইল। আমার 'যৌবনের স্বপ্নভঙ্গ' সনেটটি 'মালঞ্চ' ছাপিয়াছে। ঠিক করিয়াছি নূতন গল্পটি 'মালঞ্চ'কেই দিব। ছাপিলেও ছাপিতে পারে।

সমস্ত সন্ধ্যাটা সত্যর সহিত গল্প করিলাম। বেশ সময় কাটিয়া গেল। সত্যজীবনবাবুর বাড়ির স্বাস্থ্য বড় খারাপ। দুটির টাইফয়েড। একটির শুনিতেছি বুকে সর্দি বসিয়াছে। কাকিমা বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন—কিলুর'জন্য। শীঘ্র মুঙ্গেরে ফিরিতে চান। কিন্তু কেহ লইয়া যাইবার লোক নাই। আমিও যাইতে পারিতেছি না। বাবাকে চিঠি লিখিয়াছি। দেখি তিনি কি লেখেন। সেই অনুযায়ী করিব।

২১-১-১৯১৮

হিসাবের খাতায় দেখছি খরচের তালিকাটা বড্ড বড় হয়ে পড়েছে—অথচ বিশেষ কোন কারণ নেই এক ট্রামভাড়া বাদে। খাওয়ার জন্যে কিছু বেশি খরচ হয় বটে কিন্তু উপায় নেই। আমি দেখছি, এবার অন্যায় খরচ এমন কিছুই করিনি। তবু নিজের জন্যেই পঞ্চাশ টাকার বেশি খরচ হয়ে গেছে। এবার সবসুদ্ধ বাড়ি থেকে ৮৫্ নিয়েছি—দস্তুরমত রাহাজানি যাকে বলে। কিন্তু আর না। যে করে হোক এরি মধ্যে চালাতে হবে।

র‍্যাকেটটা gut করানো হল কিন্তু খেলা হচ্ছে না। কি করেই বা হবে। সমস্ত বিকেল বেলাটাই ড্রিল করে কেটে যায়। শুধু শনিবার বিকালটা বাদ। সেদিন যদি খেলতে পারি।

আর বছরের জুতোটা একদম ছিঁড়ে গেছে। সেটা মুচিকে দিয়ে দিলুম। প্যারেড করবার জন্যে একজোড়া বুট রইল। Mark Time-এর ব্যাপার সেও বেশিদিন নয়।

২২-১-১৯১৮

আজ দুপুরবেলা বসে বসে একটা ছোট কবিতা লিখে ফেলা গেছে। ভাবটা হঠাৎ মাথায় এল, কিংবা লিখতে লিখতে এল বললেও চলে। খুব যে ভাল তা নয়। চলনসই।

আজ পৌনে পাঁচটা থেকে পৌনে ছটা পর্যন্ত ড্রিল বিকেলে হয়েছে। তারপরই Iron Claw. Hale যে laughing... সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কি চমৎকার অভিনয় যে হচ্ছে বলা যায় না। আমরা ভবিষ্যতের জন্য উৎসুক হয়ে আছি।

২৩-১-১৯১৮

আজ বাবার চিঠি পেলুম। কাল কাকাবাবু আসবেন কিলু ও কাকিমাকে নিয়ে যেতে। বাবা আমাকে টাকা সম্বন্ধে সংযত হতে বলেছেন—যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তবে 'যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি— ।'

খতু আমাদের দুখানা ফটো পাঠিয়েছে—একখানা বাবার ; অন্যখানা আমাদের "গ্রুপ", ছবি দুখানাই বেশ হয়েছে। ভূপেনবাবুকে দিয়েছি ভাল করে বাঁধিয়ে দিতে।

Psychology পড়বার চেষ্টা করছি কিন্তু বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না—কি করব জানি

না। ফেল হব নাকি ?

পড়াশুনো এবার প্রতিজ্ঞা করে আরম্ভ করতে হবে—নইলে হবে না। আমার এমনি অভ্যাস—কোনও কাজেই নিয়ম বা শৃঙ্খলা নেই। একটুতেই সমস্ত উদ্যম এলিয়ে পড়ে।

মেসোমশায়ের[১]চিঠি পেলুম শাল ফেরত যাবে না—ভালই হল।

২৪-১-১৯১৮

আজ কাকাবাবুর আসবার কথা কিন্তু তিনি এসে পৌঁছলেন না। আমি মিছিমিছি কবার ছুটোছুটি করলুম। মা চিঠি লিখেছেন কাকাবাবু কাজের জন্য আসতে পারলেন না। আমাদের 'তার' পেলে কাল বেরবেন।

ছবি দুটো কাল বাঁধাতে দিয়েছি আজও দিলে না। কাল দেবে বলেছে।

নোটিস দিয়েছে যে যারা টাকা আনেনি তারা কাল গিয়ে সেনেট হাউস থেকে নিয়ে আসবে। আমি যাব। কিছু পেলে কাজে লাগবে।

আজ সকালে ট্রামে আসছি, একটি ব্রাহ্ম মহিলা, তিনিও আসছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'অন্য সৈন্য দেখলে ভয় হয়। কিন্তু, বাবা, তোমাদের দেখলে ভয় ত হয়ই না—সাহস হয়।' আমার কাছে একথার মূল্য অনেক। এই গর্বই আমাদের জীবনকে সৈনিকের কঠিন ব্রতে নিয়োজিত করুক। নারীর উৎসাহ আমাদের 'ছায়া ভয় চকিত মূঢ়' চিত্তকে অবসাদবিমুক্ত করুক!

২৫-১-১৯১৮

শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছে। সর্দি হয়েছে, তার উপর মাথাটা ব্যথা করছে। কাল বোধহয় প্যারেডে যেতে পারব না।

আজ IDF-এর টাকা এনেছি—মোট ৪্। সর্বাধিকারী বললেন তার বেশি এখন পেতেই পারি না। তথাস্তু!

Senior Harrison Cricket খেলা ছিল—Scottish vs. Metropolitan College. প্রথম batting ছিল Scottish-এর। তারা ৮১ run করেই out হয়ে গেল। তারপর আমাদের খেলা। ৫টা wicket down হবার আগেই আমাদের 100 হয়ে গেল। তারপর খেলা declared হয়ে গেল।

কাল কাকাবাবুর আসবার কথা, আমি আজ নিজের ট্রাঙ্কটা কাকিমাকে দিয়ে তাঁর ট্রাঙ্কটা নিয়ে এসেছি। আমারখানা বড়, তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে যাবার সুবিধে হবে।

২৬-১-১৯১৮

আমার স্বভাবটাই যে ছন্নছাড়া ও উচ্ছৃঙ্খল সেকথা আমি নিজের কাছ থেকে কিছুতেই গোপন করতে পারি না। হাতে টাকা ছিল, মনে করেছিলুম একটু খরচ বাঁচিয়ে চলে কয়েকটা টাকা জমাব। কিন্তু হঠাৎ ঝোঁক চাপল bioscope যাব। No sooner said than done. ২॥টার সময় বেরুলাম, Elphinstone Picture Palace-এ গিয়ে দেখি জায়গা নেই—সব ভর্তি। সঙ্গে অনিল এবং পণ্ডো ছিল। ফিরে আসা হতেই পারে না। অতএব Imperial Restaurant-এ ঢোকা গেল। ব্যস, যখন বেরিয়ে এলুম তখন পকেটে কিছু নেই। সবই

উদরায় নমঃ।

কাকাবাবু আজ এসেছেন, সোমবার কাকিমাকে নিয়ে যাবেন।

আজ সর্দি এবং জ্বরভাব করে আছে—তাই সকালে প্যারেডে যাইনি। দুদিন উপরোউপরি ছুটি ভোগ করা যাবে। মন্দ কি ? বুড়ো আঙুলের ব্যাথাটাও বোধকরি দুদিনের বিশ্রামে ও সেবায় আরাম হয়ে যাবে।

২৭-১-১৯১৮

কাল বাবার ও আমাদের ফটো দুখানা বাঁধিয়ে এনেছি। বাঁধান বেশ হয়েছে। টেবিলে সাজিয়ে রেখেছি। মাঝখানে একটা জায়গা ফাঁক রয়েছে—মার একখানা ছবি হলেই ঠিক হয়। এবার গিয়ে নিয়ে আসব।

সকালে নেমন্তন্ন ছিল কাকিমার বাড়ি। কাকিমা এখানে থাকতে আমার সুখের অন্ত নেই। রোজই নেমন্তন্ন। এবার কিন্তু মুশকিল। কাকিমা মঙ্গলবার দিন যাবেন।

সমস্ত দিন পড়ায় ও বিশ্রামে কেটে গেছে—কোথাও যাইনি। কাল থেকে আবার সতেজে ড্রিল করব।

Merchant of Venice, Verity-র edition তত ভাল নয়। অর্থাৎ খুব বিস্তারিত নয়। অনেক দুর্বোধ স্থান বাদ দিয়ে গেছেন কোন ব্যাখ্যা করেননি। আমাকে দেখছি Percival-এর note-এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে।

২৮-১-১৯১৮

বৃহস্পতিবার শুনছি কলকাতার প্যারেড শেষ হবে। তারপর কিছুদিন ছুটি। আন্দাজ ১২-১৩ই ফেব্রুয়ারী camp যাত্রা।

মেসোমশায়ের small pox হয়েছে—নগেনবাবু বললেন। শিগগির সেখানে যেতেও মানা করলেন। কাল পরশু একবার যাব। সেখানে কেউ নেই—একলা পড়ে আছেন।

কাকাবাবু সঙ্গে যে খাবার এনেছিলেন তাই সকালবেলা চলছে। বাড়ির জিনিস যতই তুচ্ছ হোক না—ভাল লাগে। এমন কি ওই কাল মরচে-ধরা বিস্কুটের বাক্সটি পর্যন্ত। নয় কি ?

ছেলেবেলায় শ্লোক মনে পড়ে : 'দাও সন্দেশ কাকাবাবু আমরা সবাই খাই।'

২৯-১-১৯১৮

আজ আমাদের হোস্টেলে গ্রুপ ফটো তোলা হল। মেমসাহেব উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সব বারের মত এবারও দু'চারজন হোস্টেলার উপস্থিত ছিলেন না। দেখা যাক ফটো কি রকম হয়।

কাকিমারা আজ চলে গেলেন। তাঁদের হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলুম। ইচ্ছে হচ্ছিল বাড়ি চলে যাই। আচ্ছা এই ত কলকাতা শহরে আছি—কত নূতন আমোদ—নূতন উত্তেজনা দিন দিন উপভোগ করছি—তবু সেই ধূলিমলিন মুঙ্গেরের দিকে মন যায় কেন ? কবি যথার্থই বলেছেন :

Home, Sweet Home, no place like home.

যারে ফেলিয়া এসেছি, মনে করি, তারে,

ফিরে দেখে আসি শেষবার।
যেন কাঁদিছে সে বসে এলায়ে আকুল কেশভার!
যারা গৃহছায়ে বসি সজল নয়ন
মুখ মনে পড়ে সে সবার!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০-১-১৯১৮

এমনি করে,
তারও কি কাঁদে প্রাণ আমার তরে?
সেথা জোছনা রজনী ম্লান কি সজনি
এমনি তাঁহারও নয়ন লোরে।

* * *

Christian mess-এ নিমন্ত্রণ ছিল। Mr এবং Mrs Kennedy Van এবং Bobby-কে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। কাঁটা চামচের অভাব পড়েছিল। আমি পণ্ডোর চামচ এবং Chan-এর কাঁটাটি কেড়ে নিয়ে খেতে লাগলুম। তারা দুজন ভগ্নরথচক্র রথীর মত কষ্টে খাওয়া শেষ করলে। আমার বোধহয় তাদের ভালরকম পেটই ভরল না।

৩১-১-১৯১৮

এ মাসটাও কেটে গেল। ড্রিল আজ শেষ হয়ে যাবার কথা কিন্তু সেরকম গতিক কিছুই দেখছি না। কলকাতাতেই ত দুমাস পুরে গেল। এদিকে সবসুদ্ধ তিন মাস হবার কথা।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে পৃথিবীতে আমি একজন successful man হতে পারব না। Successful হতে গেলে যে যে গুণ থাকা দরকার, তার একটাও আমার নেই। দেখা যাক, ভাগ্যদেবী আমার জন্য কি রকম ভবিষ্যৎ তৈরি করে রেখেছেন। সেটা যেরকমই হোক, খুব উজ্জ্বল নয় এটা নিঃসন্দেহ।

খতুকে শুনছি বাবা Engineering পড়াবেন ঠিক করেছেন। এটা তার পক্ষে adequate কিনা বলা যায় না। কিন্তু আমার মতে বাবার practice নেওয়াই তার সব চেয়ে উচিত। কারণ, আমি law-এর উপযুক্ত নই। বাবার পসারটা খতুরই বজায় রাখা উচিত। কারণ যদি কেউ পারে ত সেই পারবে।

১-২-১৯১৮

মেজদাকে টেলিফোন করে দিয়েছি যে কাল থিয়েটারে যাব। তিনি কাল ৫॥টার সময় আসবেন বললেন।

মার চিঠি পেলুম। আমি কাকিমাদের সঙ্গে যাইনি দেখে সকলে বড় disappointed হয়েছেন। অথচ আমার যাবার কথা ছিলই না। সে যা হোক, আমি কিন্তু ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমার ধারণাই ছিল না যে কেউ আমার অভাব অনুভব করতে পারে, অথবা আমি না গেলে disappointed হতে পারে! আমি কি এত বড় একটা লোক? আমার মনে হয়, কবি মধুসূদনের অমরবাণী এইখানেই সার্থক:

'কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক।'
আমি যদিও অধম অযোগ্য তবু
'যদিও অধম পুত্র, মা কি ভোলে তারে?'

২-২-১৯১৮

Very considerate of father to send the money so early in the month. Rs 45/- ought to be enough for me for a month which has got only twentyeight days.

Mejda put in just a few minutes back. He gave me the letter which is to be our passport. I & Anil are going to Minerva Theatre. The show consists of 'বঙ্গে রাঠোর' and 'জয়দেব'। I hope they will not be bad.

We have taken our dinner of luchi & cauliflower fried. By the bye Ramu babu came this morning & gave me two cauliflowers sent from home. One of them has been already utilized, the other awaits our later discretion.

৩-২-১৯১৮

রাত্রি দুটোর সময় বাড়ি ফিরলুম থিয়েটার দেখে। শেষ পর্যন্ত দেখা হল না—বঙ্গে রাঠোর ও জয়দেবের তিনটে অঙ্ক। মন্দ নয়—একজনের অভিনয় খুব ভাল লাগল—তিনি বঙ্গে রাঠোরে নন্দলাল সেজেছিলেন। বাড়ি ফিরে ক্ষিদের জ্বালায় ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে ফেললুম। তারপরই ঘুম, বেলা নটার সময় নিদ্রাভঙ্গ।

খেয়ে দেয়ে ভবানীপুরে গেলুম, মেসোমশায় বেশ ভাল আছেন। তাঁকে শালখানা দিয়ে এলুম। দুপুরবেলা আর এক চোট নিদ্রা দেওয়া গেল। তারপর সেখান থেকে একেবারে Bijouতে। Adopted Son তেমন সুবিধের নয়। মেয়েটাত কোন কাজেরই নয়। বরং ছেলেটা ভাল।

৪-২-১৯১৮

আজ প্যারেডে যাইনি—বিরক্ত হয়ে গেছি। কলকাতায় এক মাস হবার কথা ছিল কিন্তু দুমাসের ওপর হয়ে গেল এখনো শেষ নেই। Allowance পাঁচ টাকার বেশি পাওয়া যায়নি। Uniform পাবার আশাই নেই। যেন আগাগোড়া একটা farce. উপস্থিত কিছুদিন আর যাব না ভাবছি। দেখি কি হয়। আজ একটা কড়া রকম চিঠি Corps Office-এ পাঠিয়ে দিলুম।

Merchant of Venice-এর first reading হয়ে গেছে। এবার Paradise Lost ধরেছি। দেখি কদিনে শেষ করতে পারি। তারপর Burke ধরব।

সংস্কৃত আর Philosophy কিছুই পড়া হচ্ছে না। কি করব ভাবছি। ক্ষীরোদবাবুর নোট ত প্রায় ৪০ পাতা বাকি পড়ে গেছে—কখনো লিখে উঠতে পারব এমন ত বোধ হয় না।

কাল থেকে নিজেই একটু করে physical exercise করব ভাবছি। নইলে অভ্যাস ছেড়ে যাবে।

৫-২-১৯১৮

কালকে University Corps-এর Secretary-কে যে চিঠি লিখেছিলুম সেখানা post করে দিলুম। প্যারেডে যাইনি।

আজ ঘড়িটার কাঁচ লাগিয়ে আনলুম। দুআনা নিলে। কাঁটা ভেঙে গিয়ে অবধি পকেটে ব্যবহার করতে পারছিলুম না।

কাল রাত্রে সত্যজীবনমামার বাড়ি নিমন্ত্রণ। যেতে হবে।

রাত্রে Iron Claw দেখতে গিয়েছিলুম। এ instalmentটা খুব ভাল নয়।

আজ কলেজে গিয়েছিলুম অনেক দিন পরে। এবার থেকে রোজ যাব ঠিক করেছি। যখন প্যারেডে যাচ্ছি না তখন কলেজে যাওয়া উচিত।

নেনার[১২] পৈতের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। যেতে পারব কিনা ভাবছি। কিন্তু যাওয়াই আমার কর্তব্য।

৬-২-১৯১৮

Bengaleeতে IDF নোটিস দিয়েছে যে শীঘ্রই Camp training কলকাতাতেই আরম্ভ হবে। বুটের জন্য মাপ পাঠাতে হবে এবং ৮৬ ঘণ্টা পুরিয়ে দেওয়া চাই। নইলে Camp-এ গিয়ে পুরিয়ে দিতে হবে। তাই ভাল, আমি এখন যাচ্ছি না—Camp-এ পুরিয়ে দেব।

কাল থেকে নিয়মিত কলেজে যাচ্ছি। নইলে ভারি ক্ষতি হয়। Percentageও কম পড়ে যেতে পারে।

কদিন বাড়ির কোনও খবর পাইনি। তারা কি করছে কে জানে। ভালই আছে আশা করি।

এইমাত্র সত্যমামার বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে আসছি। কাল অনিলের প্রথম বিবাহ anniversary। সে আজ খুব মৌজে আছে।

৭-২-১৯১৮

টিকে নিলুম। কলকাতায় বড্ড small pox হচ্ছে। কি জানি যদি হয়ে পড়ে।

সাড়ে দশটা থেকে স'দুটো পর্যন্ত ক্লাস ছিল। আজকাল খুব বেশি বেশি করে ক্লাস হচ্ছে। আজ basketball খেলে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম, ক্ষিদেও পেয়েছিল। তাই Eating Houseএ গিয়ে কিছু খেয়ে এলুম।

ছোট কাকিমার বাপের বাড়ি দেখা করতে গিয়েছিলুম। বুজি মামার সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা এক বোতল ঘি দিলেন। কাকাবাবু ফেলে গিয়েছিলেন।

আজ সাতদিন পরে দুখানা চিঠি পেয়েছি—বাড়ি থেকে।

সাহেবের farewell-এর জন্য দুটাকা দেব প্রতিশ্রুত হয়েছি। তার বেশি দেবার আমার সামর্থ্যও নেই, অধিকারও নেই।

৮-২-১৯১৮

সকালে দেরি করে ওঠা যে শুধু একটা কুঅভ্যাস তা নয়, তার আশু ফলও বড় ভাল নয়।

আমি দেখেছি—যখন প্যারেডে যেতুম স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। কিন্তু আজকাল যাই না, সকালে ওঠাও হয় না সেইজন্যে শরীর খারাপ হচ্ছে। কাল থেকে সকাল সকাল উঠবো।

টিকেটা বেশ আউরেছে। বোধহয় হবে।

আত্ম-বিস্মৃতিটাই কি ভাল, না আত্মজ্ঞান ভাল। বোধহয় আত্মবিস্মৃতিই ভাল। আত্মজ্ঞানে লোকে কৃত্রিম হয়ে পড়ে। সেটা কখনও হওয়া উচিত নয়। তাহলে personality জিনিসটা লঘু হয়ে যায়। আর বহির্জগতে personality-র মত অভীপ্সিত বস্তু বোধহয় আর কিছুই নেই।

৯-২-১৯১৮

সন্ধ্যাবেলা খেলার পর মেজদার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলুম। বিস্তর লেবু খাওয়া গেল। মেজদার কাছে লেবুর এতই প্রাচুর্য যে দুদশটা লেবু কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। আমিও সেইখানেই প্রায় ১০/১২টা খেয়ে ফেললুম।

বার্নার্ড শ'র Man and Superman পড়তে আরম্ভ করেছি। গোড়াটা বেশ। লেখা একটা নতুন ধরনের। আগাগোড়া একটা প্রচ্ছন্ন সংস্কারের এবং নতুন Ideaর প্রবাহ আছে।

১০-২-১৯১৮

আমি নিজের সম্বন্ধে একটা নতুন সত্য আবিষ্কার করেছি। সেটা এই যে, আমি পয়সা খরচ না করে থাকতে পারি না। কিছুক্ষণ যদি কোন জিনিস না কিনলুম, অমনি আমার হাত নিসপিস করতে থাকে। এই জন্যে, শুধু এই প্রবৃত্তির তাড়নায় অনেক সময় অনেক নিষ্প্রয়োজনে জিনিস কিনে ফেলি। অথচ মজা এই যে, পয়সা খরচ করেই অনুতাপ হয়, "আহা। মিছিমিছি বাজে খরচটা না করলেই হত।"

Man and Superman শেষ করে ফেললুম। আগাগোড়াই যে বুঝতে পেরেছি একথা বলতে পারি না। কিন্তু যেটুকু পেরেছি সেটুকু চমৎকার লেগেছে। লেখক যেন একটা নতুন জগৎ সৃষ্টি করে ফেলেছেন। সব চেয়ে Janner-এর চরিত্র খুব ভাল লাগল।

কাল প্যারেডে যাব ঠিক করেছি। দেখে আসি কি রকম হচ্ছে। বুঝে নেনার পৈতেয় যাবার ব্যবস্থা করা যাবে।

১১-২-১৯১৮

সন্ধ্যাকালে বসি চুপি চুপি প্রান্তরে মৌনভাবে
চিন্তা করচি এহেন সময়ে প্রেয়সী কোন্‌খানে ?
চিত্তে কান্তা বিহনে এমনি ধূপ দীপালি জ্বালি
এম্নিভাবে কত দিন বল থাকিব দীন প্রাণে ?
ইতি
মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দে বিরহী বিলাপ

১২-২-১৯১৮

আজ বাড়ি যাচ্ছি। নেনার পৈতা উপলক্ষে। এ ক'দিন বোধহয় আর গোলমালে ডায়েরি

লেখা হবে না। তবু সঙ্গে নিলুম।

১৪-২-১৯১৮

নেনার পৈতের দিন।

১৭-২-১৯১৮

লোক খাওয়ান। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম হয়েছে। পাল টাঙান থেকে মাছ কোটা, ময়দা ঠাসা, পরিবেশন করা পর্যন্ত। রাত্রে সুবিমল নিদ্রা।

বিকালে পরিশ্রান্ত হয়ে বাবার খাটের উপর চোখ বুজে শুয়েছিলুম। হঠাৎ চোখ খুলে দেখি—তিনি। দোরগোড়া থেকে আমাকে দেখেই পলায়ন করছেন। মনে হল, 'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু—।' আরও মনে হল, 'দেখা পেলেম ফাল্গুনে!'

১৮-২-১৯১৮

গায়ে দারুণ ব্যথা। বাড়ি থেকে দূর করে দিলেও যেতে গররাজী।

১৯-২-১৯১৮

আজ যাবার কথা ছিল। রামদাস বাবাজীর কীর্তনের জন্য যাওয়া বন্ধ।

রাত্রে কীর্তন শ্রবণ।

২০-২-১৯১৮

কলিকাতা যাত্রা।

২১-২-১৯১৮

প্রাতে কলিকাতায় উপস্থিত। I.D.F. এর সমন প্রাপ্তি। দুপুরে Camp উদ্দেশ্যে যাত্রা। মাঠের মধ্যে তাঁবু। তাঁবুতে স্থান অত্যন্ত সংক্ষেপ। খাইবার ব্যবস্থা বড় বিশ্রী। মাটিতে পাতা পাতিয়া খাইতে হয়। রাত্রে শুনিলাম দুরন্ত মশার কামড়। শীতও প্রচণ্ড।

যাব কি যাব না—বিষম ভাবনায় পড়িয়াছি। কাল সকালের মধ্যে একটা ঠিক করিয়া ফেলিতে হইবে।

২৭-৩-১৯১৮

আজ দোল পূর্ণিমা। সকলে route march-এ বেরিয়ে গেছে। আমি sick report নিয়ে চারপাইয়ের ওপর পড়ে আছি। আর ভাল লাগছে না। যে পরিশ্রমের পিছনে সহানুভূতি নেই সে পরিশ্রম যেন অসার্থক ব্যর্থ বলে মনে হয়। কবে যে বাড়ি যাব।

Military জীবন যে কি তা সৈনিক ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। এ জীবনের হীনতা এতই অতলস্পর্শ, এর শাসনবিধান এতই প্রভুতান্ত্রিক যে personal qualities এখানে একেবারেই নিষ্পেষিত হয়ে যায়। আত্মজ্ঞান অত্যন্ত লঘু হয়ে পড়ে। বস্তুত মানুষের সহজ মনুষ্যত্ব এই শাসনের নিষ্পেষণে বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

আমার বোধহয় এই কষ্টবহ জীবনটা সুখেরি পূর্বাভাষ। তা যদি হয়, আমি দুঃখবরণ করে নিলাম।

৩১-৩-১৯১৮

জন্মতিথি উপলক্ষে মাসিমার বাড়ি গেলুম। যদিও সকালে চা সহযোগে ডিম্ব ভক্ষণ হয়েছিল, তবু দুপুরে সাত্ত্বিকভাবে নিরামিষ আহার করা হল। ভবানীপুর থেকে ফেরবার সময় মার চিঠি পড়লুম। তাঁরা ১৩ই বশেখ দিন ঠিক করেছেন। যদি তার আগে ছুটি না পাই তাহলে ব্যস! দেখা যাক, ভবিষ্যতের গর্ভে কি ঘটনা সঞ্চিত আছে!

রাত্রে Shielding Shadow-র শেষ অঙ্কগুলি অভিনয় হয়ে গেল। গল্পটা আজগুবি হলেও বেশ একটা ছিরিছাঁদ আছে। বিশেষত Ralph Kellard ও Grace Darmond-এর অভিনয় বড় সুন্দর। Ralph-এর অভিনয় অতুলনীয়। Grace-ও খুবই ভাল। তাঁর অভিনয় অনেকটা Pearl White-এর মত।

রাত্রে প্রভূত মাংস ভোজনে সকালবেলার নিরামিষের প্রায়শ্চিত্ত।

১-৪-১৯১৮

Fool's Day. Bishop-কে সকলে মিলে April fool করেছে। আজ আমার প্যারেড নেই। Sick report দিয়েছি।

ক্রমে এপ্রিল মাসও এসে পড়ল। ৪ মাস হয়ে ৫ মাসে পড়ল অথচ শেষ নেই। দুঃসহ হয়ে উঠেছে—কবে যে ছুটি পাব।

আজ থেকে আমাদের কলেজে examine আরম্ভ হল। আমি ত এখানে পড়ে আছি। Percentage যাচ্ছে—Yearly দেওয়া হল না। 4th Year-এ উঠতে দেবে কিনা তাও জানি না।

ঘোরতর অনুতাপ হচ্ছে। জীবনে একটা প্রকাণ্ড ভুল হয়ে গেছে। এ ভুল কতদিনে সংশোধন হবে জানি না। হয়ত কখনই হবে না কে বলতে পারে।

৬-৪-১৯১৮

কয়েকদিন হল বেলঘরে এসেছি—target practiceএর জন্যে। Shooting আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রথম দিন আমার লক্ষ্য মন্দ হয়নি। ১৫ নম্বর পেয়েছি। আজও বিকেলে হবে। প্রথম দিন ১০০ গজ দূর থেকে ছিল, আজ ২০০ গজ। দেখি কি হয়।

বাবা লিখেছেন শ্যামলবাবুর[১৩] অসুস্থতার জন্য আমাদের বিয়ে পেছিয়েগেছে। ভালই হল। এই সৈনিক জীবনের গ্লানি মুছে ফেলতেও কিছুদিন যাবে।

২৩শে এপ্রিলের আগে ছাড়বে না শুনছি। আগে কথা ছিল ১৭ই পর্যন্ত হবে। কিন্তু হিতৈষী সর্বাধিকারী কোম্পানির কাছ থেকে আরও এক হপ্তা মঞ্জুর করে নিয়েছেন। কোনও দরকার

ছিল না। এক হপ্তা বেশি করেই আমরা একেবারে দিগ্গজ হয়ে যাব না।

৮-৪-১৯১৮

যে চিত্রকর, যে শিল্পী, সে কেবল ছবি আঁকে। চিত্র সুন্দর কি কুৎসিত সে তাহা দেখে না। কারণ সৌন্দর্যসৃষ্টি তাহার উদ্দেশ্য নয়, শিল্পইতাহারসাধনা। আমার জীবনের শিল্পী তাঁর বৃহৎ চিত্রগ্রন্থের পত্রে পত্রে আজকাল যে ছবিগুলি আঁকছেন সেগুলি মনোরম নয়। কিন্তু সেগুলি শিল্প।

যে শিল্পের উপাসক, সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই কলাচাতুর্য দেখছে। কিন্তু যে ভোগী সে এতে সুখ পাবে না। কারণ এ ত সুন্দর নয়। এর মধ্যে বর্ণের বৈচিত্র্য নেই। মরুভূমির ঊষরতাই যে শিল্পের সাধনা, সে শিল্পে ভোগীর সুখ নেই।

তাই আমার মনে হয় যে, যেখানে ভোগী হয়ে ভোগের সম্ভাবনা নেই, সেখানে জ্ঞানী হওয়াই কর্তব্য। যেখানে জীবন ভোগকে পীড়ন করতে থাকে সেখানে জ্ঞানই পথ। কারণ তাতে সুখ না থাক স্বস্তি আছে।

১৭-৪-১৯১৮

আজ গুরুগৌরবে নগদ ৬্ গ্রহণ করে I.D.F.-এর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করলুম।

বাবাকে আজ চিঠি লিখলুম। জিনিসপত্র কেনবার জন্যে ৫০্ প্রয়োজন। তাই চেয়ে পাঠালুম।

আজ প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের ছুটি পাবার কথা। শুধু মিছিমিছি এক হপ্তা বাড়িয়ে পণ্ডশ্রম করা। তা নাহলে এতক্ষণ আমরা বাড়ি যাবার জন্যে প্রস্তুত।

একটা জিনিস অপ্রত্যাশিতভাবে শিখে ফেললুম—সাঁতাব। এখানে এসে পুকুরে ক'দিন ধরে শিখছিলুম—আজ একলা পুকুর পার হয়েছি। এত কম দিনের মধ্যে যে কি করে শিখলুম তাই ভেবে আমার আশ্চর্য বোধ হচ্ছে।

১৯-৪-১৯১৮

কাল থেকে অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ। আমাদের তাঁবু প্লাবিত হয়ে গেল দেখে আমাদের রাত্রে টিন্ শেডে আশ্রয় নিতে হল। আজ তাঁবুর ভেতরে মাটি ফেলে যথাসাধ্য শুকনো করে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হল। তারপর যদ্ ভবিষ্যতি—।

বাবার কাছ থেকে চিঠি পেলুম যে দাদো[১৪], মানা এবং মাইজী[১৫] কাল মুঙ্গের থেকে পুরী যাবার জন্যে রওনা হবেন। তাঁরা রবিবার সকালে কলকাতায় এসে পৌঁছে সেইদিনই পুরী চলে যাবেন। বাবা লিখেছেন আমি ইচ্ছে করলে তাঁদের সঙ্গে যেতে পারি। কিন্তু আমার যাওয়া সম্ভব নয়। এখনো আমাদের ছুটি হতে কয়েকদিন দেরি আছে। তার আগে ত যেতে পাবি না।

২০-৪-১৯১৮

আজ আমাদের শেষ fire হয়ে গেল। প্রায় ৪০ round fire করলুম। MO-ও সব বিষয়েই অগ্রগণ্য। Individual fire-এ সত্যেন দত্ত 1st হল। Machine gun-এও

আমরাই। হাঁড়ি ভাঙ্গাতেও আমরা। আজ অন্য সব platoon-এর মুখ কাল করে দেওয়া গেছে। বেচারারা একদম চুপ মেরে গেছে।

রাত্রে আবার নাকি partol duty আছে—দেখা যাক!

২৫-৪-১৯১৮

হোস্টেলে ফিরে এলুম। খুব আমোদ হচ্ছে। কত দিন পরে!

কাল বাড়ি যাব। তার আগে একবার মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে।

আমি ভাল shooting-এর জন্যে একটা medal পেয়েছি। Tug o'war -এ একখানা আয়না পেয়েছি। আমার বড়খানা ভেঙে গিয়েছিল—একটা পাওয়া গেল।

শচীর ছেলে হয়েছে; সেই উপলক্ষে সে আমাদের খাওয়াচ্ছে। আজ বিকেলে Imperial Restaurant-এ আমাদের নিমন্ত্রণ। সেখান থেকে ফেরবার মুখে bioscope হয়ে আসবো। এক কাজ করলেও হয়। Bioscope দেখে সোজা মাসিমার বাড়ি গিয়ে সেখানে রাত কাটিয়ে সকালে ফিরে আসা। দেখি কি হয়!

২৬-৪-১৯১৮

কাল শচী খুব খাওয়ালে। Bioscope দেখলুম—Her greatest performance, featuring Ellen Terry. Plot মন্দ নয়। Ellen Terry-র acting বড় চমৎকার। তার ছেলেটা সুবিধার নয়।

৬টা বিশ মিনিটের গাড়িতে বাড়ি রওনা। অরুণ স্টেশন পর্যন্ত এসেছিল। অনিল আসবে বলেও আসতে পারলে না। ট্রেন ফেয়ার আমায় দিতে হয়নি। কোম্পানি পাশ দিয়েছে।

২৭-৪-১৯১৮

৯॥টার সময় বাড়ি পৌঁছলুম। রাত্রে গাড়িতে বিশেষ কষ্ট হয়নি। ভীড় ছিল না, বেশ একলা একলা আসা গেল।

দু' মাসের দীর্ঘ ছুটি সামনে। বিশ্রাম হবে মন্দ নয়। তবে গরমটা ভোগ করতে হবে।

২৮-৪-১৯১৮

পুরনো film-এর reel দুটো develope করলুম—কোনটাই ভাল হয়নি। সুবোধদার এবং হৃষির ছবিগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন তিনটে reel এনেছি—বাড়িসুদ্ধর ছবি তুলতে হবে। আর খতুকে ভজিইছি যদি কোনরকমে তাঁর একখানা তুলে আনতে পারে।

২৯-৪-১৯১৮

বাবা বলেছেন দিনে পাঁচ ঘণ্টা করে পড়া চাই। কিন্তু ঘণ্টাকে মিনিটে পরিণত করলে যেটুকু সময় হয় সে সময়টুকুও পড়া হচ্ছে না। এবার আরম্ভ করতে হবে। নইলে কিছুতেই চলবে না।

৩০-৪-১৯১৮

একদিনও বাড়ি থেকে বেরুন হচ্ছে না। কতকটা আলস্য কতকটা ঘরের টানে। তাছাড়া

ছোড়দির কড়া হুকুম এখন কোনমতেই বেলুনবাজার[১৬] মুখো হতে পাব না। কারণ আমার রংটা এখন ভারি কাল হয়ে গেছে। ছোড়দির কথাটাও রাখা চাই ত! নইলে—"গুরুজনের কথা না শোন কানে—"

আমার পড়বার চেষ্টা আজ ব্যর্থ হয়ে গেল। মা সরস্বতীর সঙ্গে অসম্প্রীতিটা এ ক'মাস ধরে এমনি ঘনিয়ে তুলেছি যে একদিনের খোসামদে তাঁকে তুষ্ট করা অসম্ভব। যা হোক আমি হতাশ হইনি—সবুরে মেওয়া ফলে।

১-৫-১৯১৮

আজ ছোড়দির কাছে বেলুনবাজার যাবার অনুমতি পাওয়া গেছে—কিন্তু অনুমতির সদ্ব্যবহার করা হল না। অনাথ[১৭] ও মোহিনী এসে ধরে নিয়ে গেল—পুলিশদের সঙ্গে হকি খেলতে। অহো মন্দ ভাগ্যং—মহাকবির কাব্যে কি এই অবচীনতার তিরস্কার নেই।

২২ টাকা অরুণকে পাঠিয়ে দিয়েছি। ১৭ টাকা হোস্টেলের এবং বাকি ৫ টাকা তার নিজের।

৩-৫-১৯১৮

তাঁর ফটো এসেছে—কিন্তু ভাল হল না। তবু যা হয়েছে তাই যথেষ্ট। বাবার negative খানা বড় under exposed হয়ে গেছে। ছবি ভাল উঠল না। আমার খানা মন্দ হয়নি।

১০-৫-১৯১৮

ফুটবল খেলতে গিয়ে ঠ্যাঙটি ভেঙেছি। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটি ভেঙ্গে গোদের মত ফুলে উঠেছে। বুড়ো হাড় ভাঙলে আর বড় একটা জোড়া লাগে না। ভাই ভয়।

বেলুনবাজারের দু-একজন লোক এই বলে আমাকে congratulate করেছে যে আমি নাকি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছি। দিগম্বর চাটুজ্যের ছেলে পারুলকে দেখতে এসেছিল কিন্তু তিনি দেখা দেবার সময় মুখ-চোখ এমনি লাল করে ফেলেছিলেন যে তাঁর আন্তরিক মন্তব্যটা নিজের অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে পড়েছে। দুনিয়ার বুড়ো-বুড়িগুলো এতই কঠোর যে তারাও যে এককালে ছেলেমানুষ ছিল এ কথাটা যেন স্বীকার করতে চায় না। এস্থলে তারা কি করবে বলা যায় না। আসল কথা আমাকে তাঁদের মোটেই পছন্দ নয়।

Let me wait and hope!

১১-৫-১৯১৮

আজ সকালে পাইখানায় বসে দিব্যি মনের সুখে চুরুট টানছি খবর পেলুম একজন নতুন লোক দেখা করতে এসেছে। বেরিয়ে এসে দেখি আমাদের কুমারীশবাবু। আশ্চর্য হয়ে গেলুম সন্দেহ নেই। অনেকক্ষণ আলাপ হল। বেচারা এবার M.A. fail হয়ে গেছে—সেজন্য বড় দুঃখিত।

খোঁড়া পা নিয়ে খেলতে গিয়েছিলুম। নতুন বল—খেলাও হল মন্দ নয়। কুমারীশবাবুর সঙ্গে আবার দেখা হল।

রাত্রে অসহ্য গরম- -তাই সমস্ত রাত তেতলায় রাত্রি যাপন।

১২-৫-১৯১৮

নহে তো আঘাত করো কঠোর কঠিন
কেঁদে যাই চলে।
কেড়ে লও বাহু তব, ফিরে লও আঁখি
প্রেম দাও দ'লে।
কেন এ সংশয়ডোরে বাঁধিয়া রেখেছ মোরে
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে—প্রেম নহে ফাঁকি,
প্রাণ নহে খেলা।

—সংশয়ের আবেগ, রবীন্দ্রনাথ

১৫-৫-১৯১৮

ওগো সেথা কি ফুটে না চাঁদিনী যামিনী
সেথা কি পবন বহে না
সে যে তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ,
মোর কথা তারে কহে না ?

১৬-৫-১৯১৮

বজ্যুলাল এখানকার একজন ভাল লাঠিয়াল। সকলে তাকে লাঠিয়াল বলেই জানে, কিন্তু তার বিদ্যা লাঠির আরও উপরে যায়। সে ইদানীং একটা মকদ্দমায় পড়ে ছয় মাসের জেল-বাস হুকুম পায়, বাবা তাকে রেহাই করে দিয়েছেন। তাই সে আমাদের কাছে ভারি কৃতজ্ঞ। সে নিজে যেচে আমাদের লাঠি প্রভৃতি শেখাবার ভার নিয়েছে।

আজ সকালে আমরা তার বাড়ি গিয়েছিলুম। বিদ্যেটা শিখতে হবে।

১৭-৫-১৯১৮

আমি fatalist—কপাল মানি, নির্বন্ধ অস্বীকার করি না, পুরুষকারকে অশ্রদ্ধা করি না কিন্তু পুরুষকার যে নিয়তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একথা না মেনে থাকতে পারি না। আমার এ বিশ্বাসের মূলে তর্ক যুক্তি নেই—এটা একটা instinct.

ব্যর্থ হতে আমি কাতর নই—কারণ সার্থকতা কারো হাত ধরা নয়। ব্যর্থতার ব্যথা আমি বুক পেতে নিতে পারি, শুধু এইটুকু আমার প্রার্থনা যেন আমি কখনো অযোগ্য না হই। যেন আমার ব্যর্থতার কারণ অযোগ্যতায় আরোপিত না হয়। তাহলে আমি ব্যর্থতাকেই সার্থক বলে মেনে নেব।

২২-৫-১৯১৮

সন্ধ্যেবেলা তিনুবাবু এসেছিলেন বাবার কাছে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনরকম সন্দেহ কারুর

মনে থাকা উচিত নয়। তিনি এসেছিলেন দিন স্থির করতে। যতদূর জানতে পারলুম বাবা স্থির করে কিছু বলেননি—মাইজীর আসার অপেক্ষায়। তবে যতদূর সম্ভব ১১ই আষাঢ়। শুভদিন আর দূর নয় দেখছি।

২৫-৫-১৯১৮

শরীরটা ক'দিন থেকে ভাল থাকছে না। একে এই অসহ্য গরম—তার ওপর বাবা কিছুতেই বাইরে শুতে দেন না। কি করি।

সন্ধ্যেবেলা মাস্টার মশায় পূর্ণবাবুর[১৮] সঙ্গে দেখা হল। তিনি আজকাল ভাগলপুর স্কুলে আছেন। অনেক কথাবার্তা হল। মাস্টার মশায় যা ছিলেন ঠিক যেন তাই আছেন—ব্যবহারে অনুমাত্র তফাত নেই। কি সুন্দর!

২৭-৫-১৯১৮

আজ সন্ধ্যের সময় তিনুবাবু, শ্যামলবাবু এবং উপেনবাবু এসেছিলেন বাবার কাছে। তাঁরা চান বিয়ে তাড়াতাড়ি হয়ে যাক। আমার এ বিষয়ে আপত্তি থাকবার কথা নয়, নেইও।

২৮-৫-১৯১৮

পিসিমার কাছে একটি অভিনব খবর শুনে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় প্রাণ একদম ভরে গেছে। তিনি পারুলকে জিগ্যেস করেছিলেন—বিয়ে সম্বন্ধে তার মতামত। অর্থাৎ তাকে বলেছিলেন যে, পিসিমা নাকি কলকাতায় গিয়ে একজন খুব ভাল পাত্র দেখে এসেছেন—পাত্রটি অপূর্ব সুন্দর দেখতে—রাজার মত তার সম্পত্তি। এখন পারুল তাকে বিয়ে করতে চায়, না— ? এর উত্তর পেতে খুবই কষ্ট হয়েছিল কিন্তু জবাব পাওয়া গেছে। এখানে ভাল কি সেখানে ভাল এই প্রশ্নের উত্তরে—'এখানে' বলেই তিনি 'ছুট' দিয়েছিলেন।

আমার হৃদয় আজ অহঙ্কারে পূর্ণ।

১-৬-১৯১৮

আর ঠিক এক মাস বাকি।

৩-৬-১৯১৮

ক'দিন সময় নেই অসময় নেই অনবরত বৃষ্টি পড়ছে। রাত-দুপুরে ঘুম ভেঙে দেখি বৃষ্টি পড়ছে। রবিবাবুর গানটি বারবার মনে পড়তে লাগল :

আমার নিশীথ রাতের বাদলধারা।

৬-৬-১৯১৮

বিয়ের দিন বদলে গেছে। ১৪ই আষাঢ়

৮-৬-১৯১৮

এ ক'দিন আর ওস্তাদের বাড়ি যাচ্ছি না।

১০-৬-১৯১৮

একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব হল—সে লীলা। ভারি চমৎকার স্বভাব তার। বেশ স্বচ্ছ—যেন স্রোতস্বিনীর মত।

১২-৬-১৯১৮

ঘুম ভারি বেড়ে উঠেছে। ৭॥টার আগে কোনদিন ঘুম ভাঙ্গে না। অন্যায়। পরে এরকম হলে লোকে হাসবে। অন্তত ছোড়দি[১৯] ত বটেই।

১৬-৬-১৯১৮

আজ অনাথ কলিকাতা চলে গেল। তার মাথায় মাথায় exam. বিয়ের সময় থাকতে পারলে না। আমি একদম একা হয়ে গেছি—বেড়াতে যাবার একজন সঙ্গীর পর্যন্ত অভাব।

অবিনাশবাবুর[২০] বাড়ি দুপুরে নেমন্তন্ন ছিল। বাঙ্গালদের একটা খুব ভাল certificate আছে—তারা ভারি চমৎকার রাঁধতে পারে। মাংস ইত্যাদি সহযোগে দারুণ খাওয়া হয়ে গেল। রাত্রে উপবাস।

২৪-৬-১৯১৮

আশীর্বাদ।

২৬-৬-১৯১৮

গায়ে হলুদ।

যাঁতি একটা মস্ত ঝঞ্ঝাট। কখন হারাবে এই ভয়।

ছোটমামা, বড়মামা, মেজদা ইত্যাদি আজ এসে পৌঁছলেন। বাড়ি সরগরম।

২৭-৬-১৯১৮

পণ্ডো 'তার' করেছে—আসতে পারবে না।

আমার বিয়েতে কেউ এলো না। অনিলের এক মেয়ে হয়ে মারা গেছে, সে আসবে না। মোনো একলা বলে এলো না। সেনগুপ্ত এবং গোপালদা চিঠির জবাবই দিলে না।

রাত্রে অনিদ্রা—

অপসরতি ন চক্ষুসা মৃগাক্ষী
রজনীরিয়ং ন যাতি নৈতি নিদ্রা।

২৮-৬-১৯১৮

বিবাহ[২১]—ছাঁদনাতলায় দিদিশাশুড়ির উৎপাতে ভ্যা ভ্যা করিয়া চিৎকার। দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ।
বাসরঘরে গান গাহিবার জন্য উৎপীড়ন—অসম্মত—রজকভয়াৎ। হারমোনিয়ম বাজাইয়া পরিসমাপ্তি।
পাঁচবার বৌকে কোলে করা। রাত্রি ৪॥টার সময় নিদ্রা।

২৯-৬-১৯১৮

সকালে জ্বরভাব।
সবধূ গৃহে প্রত্যাবর্তন। কুশণ্ডিকা সমাপ্ত। হোমাগ্নিতে চক্ষের দাহ অসহ্য। চক্ষু হইতে জলনির্গম। এখন হইতেই আরম্ভ নাকি?

চক্ষু পরে মৃগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে
রজনীও নাহি যায় নিদ্রাও না আসে!

৩০-৬-১৯১৮

ফুলশয্যা—মানা, ছোড়দি, বৌদি ইত্যাদির সুমুখে বৌকে চুমু খেতে হল। কেলেঙ্কারি কাণ্ড।
মেজদি খাটের তলায় ধরা পড়িলেন। পশ্চাদ্দেশে চপেটাঘাত। মেজদির পলায়ন। পুনঃপ্রবেশ—মশার তাড়নে পুনরায় পলায়ন।
রাত্রি ২॥টা পর্যন্ত জাগিয়া বধূকে কথা কহাইবার জন্য সাধ্যসাধনা। অবশেষে সফল।

১-৭-১৯১৮

কলেজ খুলিল।
কে ভেবেছিল যে কলেজ খোলবার আগে এত কাণ্ড হয়ে যাবে। শনিবারের [৬-৭-১৯১৮] আগে যাওয়া অসম্ভব।

২-৭-১৯১৮

বিকালে ফটো তোলা।
রাত্রি ৪॥টা পর্যন্ত জাগরণ।

৩-৭-১৯১৮

শ্বশুরগৃহে রাত্রিবাস। অনেকে আড়ি পাতিল।

৪-৭-১৯১৮

শ্বশুরগৃহেই অবস্থান।

৫-৭-১৯১৮

প্রত্যাবর্তন—ঘুমাইয়া রাত্রিযাপন।

৬-৭-১৯১৮

কলিকাতা যাত্রা। বধূ চুম্বন করিতে অসম্মত। তথাস্তু।

চৈতন্যকাকা[২২] রামুকাকা[২৩], বিদু ইত্যাদি সঙ্গী। পথে কোন কষ্ট হয় নাই। রাত্রে সুবিমল নিদ্রা।

৭-৭-১৯১৮

হোস্টেলে উপস্থিত। নূতন warden Ilahi Bux-এর সহিত সাক্ষাৎ।

দুপুরে ভবানীপুরে যাত্রা। সেখানে ১॥টা হইতে ৫টা পর্যন্ত নিদ্রা। সন্ধ্যার সময় হোস্টেলে প্রত্যাবর্তন।

রাত্রে অরুণের সঙ্গে দেখা।

৮-৭-১৯১৮

১০॥ হইতে ১॥ পর্যন্ত কলেজ।

কলেজ হইতে ফিরিয়া খাটে শুইয়া বই পড়িতেছি—বেলা প্রায় ৪॥টা। হঠাৎ মনে হইল যেন খাটটা দুলিতেছে। প্রথমত ততটা খেয়াল করি নাই। তারপর ক্রমশ যখন বাড়িয়াই চলিল তখন মনে করিলাম খাটের নিচে বুঝি কেহ ঢুকিয়াছে। খাটের তলা পরীক্ষা করিয়াও যখন কাহাকেও পাইলাম না, তখন সন্দেহ হইল। ঘরের বাহির হইয়া দেখি, সকলে হুড়মুড় করিয়া নিচে ছুটিয়াছে। তখন ঘরের দেয়ালগুলা রীতিমত দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। একছুটে নিচে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ভূমিকম্প আমার জীবনে এই প্রথম। জিনিসটা মারাত্মক হইলেও এর মধ্যে বেশ একটা প্রচ্ছন্ন রহস্য আছে।

৯-৭-১৯১৮

আজ অনিলের সঙ্গে দেখা হল। অনিল একটু রোগা হয়ে গেছে। বেলা ১॥টা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে খুব গল্প হল।

১॥টা থেকে ৫॥টা পর্যন্ত কলেজ ছিল। ভারি কষ্টকর। কাল ছুটি আছে।

Bidhu Gossain-এর মুদ্রারাক্ষস কিনলুম। ৩॥ টাকা।

[আজ অনিলের সঙ্গে শেষ দেখা। ৮-৮-১৮]

১০-৭-১৯১৮

সকালে মাথা ধরিয়াছে ও জ্বরভাব। সমস্তদিন অনাহার।

কলেজ ছুটি।

১১-৭-১৯১৮

অত্যন্ত দুর্বল। আনারস ইত্যাদি ভোজন। জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে—কাশি আছে।

১২-৭-১৯১৮

জমাদার মুর্গির সুরুয়া তৈয়ার করিয়া দিল। আমি, সত্য এবং অরুণ খাইলাম। বিকালে টেনিস খেলিলাম। কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল।

১৩-৭-১৯১৮

স্নান এবং মাগুর মাছের ঝোল দিয়া ভাত খাওয়া। দুপুরে সত্য বাড়ি থেকে রুটি, মশলা-দেয়া আলুভাজা আর মাগুর মাছের ঝোল নিয়ে এল। সেগুলিকে ধ্বংসপুরে পাঠালুম।

বিকেলে Eating House-এ গিয়ে tiffin খেলুম। তার আধ ঘণ্টা পরেই কম্প দিয়ে জ্বর। ভাগ্যে চৈতন্যকাকা ছিলেন—তাই রক্ষে। রাত্রে M.N. Banerjee ১৬ টাকা ভিজিট নিয়ে এলেন। তাঁর ওষুধে জ্বর কমল।

১৪-৭-১৯১৮

বিকালে জ্বর কম কিন্তু দুর্বলতা।

১৫-৭-১৯১৮

চৈতন্যকাকা না থাকলে আমার দশা কি হত বলতে পারি না। তিনি আমার জন্যে যা করেছেন, অতি নিকট বন্ধুও তা করতে পারে না।

বাড়ি যেতে চাই। কিন্তু ডাক্তার মানা করছেন।

১৬-৭-১৯১৮

আজ বাড়ি যাব ঠিক করেছিলুম কিন্তু যাওয়া হল না। জ্বর নেই কিন্তু দুর্বলতা অসহ্য।

মিঃ বক্স আমাদের warden ভারি মিশুক লোক। আমি তাঁর সঙ্গে খুব ভাব করে ফেলেছি।

১৭-৭-১৯১৮

মিঃ বক্স-এর কাছে ২০৲ ধার করে বাড়ি চললুম। তালুকদার[২৪] সঙ্গে যাচ্ছিল কিন্তু হাওড়ায় দেখি কেশবও বাড়ি যাচ্ছে। তালুকদার ফিরে গেল।

১৮-৭-১৯১৮

বাড়ি পৌঁছলুম। আহার দুধ এবং সোডা। দুপুরবেলা মানা দেখতে এলেন।

এখানে ছোড়দাও জ্বরে পড়েছেন। বৌ বাপের বাড়ি।

১৯-৭-১৯১৮

আজ আহার রুটি। Pulse beat 58 in a minute.
শ্বশুর দেখতে এলেন।

২০-৭-১৯১৮

পারুল ও বাড়িতে। আমি ত বাড়ি থেকে বেরতে পারি না।

২১-৭-১৯১৮

আজ ভাত খেয়েছি। Pulse সেইরকম।

২২-৭-১৯১৮

দিনগুলো এতই মামুলি এবং eventless ভাবে কেটে যাচ্ছে যে লেখবার কিছু নেই। আজ মানার বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলুম।

২৩-৭-১৯১৮

শ্রাবণ মাস—কিন্তু বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। যেন বশেখ মাস।

২৪-৭-১৯১৮

এখন স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল হয়েছে। দুপুরবেলা ছোড়দার ঘরে তাসের আড্ডা জমে। আমি আর ছোড়দা, ছোড়দি আর মেজদি।

২৫-৭-১৯১৮

সন্ধ্যেবেলায় শ্বশুরবাড়ি যাত্রা। সকলের পীড়াপীড়িতে শ্বশুরালয়ে রাত্রিবাস।

এই ক'দিনের ছাড়াছাড়ির পর দেখা। তবু যেন সে আরও কত আপনার হয়ে গেছে। প্রথমবার যাবার দিন যা পাইনি তা দশ গুণ আদায় করে নিয়েছি। পারুল একটু মোটা হয়েছে যেন।

ছোট কাশ্মীমার বোনের বিয়ে। আজ তাঁরা কলকাতা রওনা হলেন। মেজদি আর সেজদিও সেই সঙ্গে ফিরলেন।

২৬-৭-১৯১৮

বৌ নিয়ে বাড়ি এলুম। বাবার কাছেই প্রথমে গেলুম। বাবার মুখ দেখে ভয় হয়ে গেল।

আমার সঙ্গে কথা কইলেন না।

জানতে পারলুম, রাত্রে বাড়ি ফিরে আসিনি বলে অনেক রাত পর্যন্ত বকাঝকা করেছেন। এমন জানলে কোন—শ্বশুরবাড়িতে রাত কাটায়। এই প্রথম এবং এই শেষ। আর কখনো হবে না।

২৭-৭-১৯১৮

[আজ অনিল মরেছে।] বেলা ৪॥ সময়।

২৮-৭-১৯১৮

এই ছিল, এই নাই, কোথা গেল ?
শূন্য এ জিজ্ঞাসা
এপারের কান নাই, ওপারের
নাই বুঝি ভাষা ?

২৯-৭-১৯১৮

আজ খবর পেলুম যে অনিল মরেছে। ভোলা লিখেছে।
সমস্ত দিনটা কিছু ভাল লাগল না। তার বৌয়ের কি হবে ?

৩০-৭-১৯১৮

নীরুর[২৫] সঙ্গে দেখা—সে এতদিন জানত না যে আমি এসেছি।

৩১-৭-১৯১৮

রোজই যাবার কথা হচ্ছে কিন্তু বাবা যেতে দিচ্ছেন না। কলকাতায় বড্ড typhoid হচ্ছে।

১-৮-১৯১৮

পড়াশুনোর ভারি ক্ষতি হচ্ছে। এখানে কেবল প্রেম-চর্চা হচ্ছে।

২-৮-১৯১৮

যাদুকরী, এত যাদু শিখিলি কোথায় !

*

যাদু করি তুই এলি
অমনি দিলাম ফেলি
টীকা ভাষ, তোর ওই চক্ষুদীপিকায়

শব্দ হয় অর্থবান
ভাব হয় মূর্তিমান
রস উথলিয়া পড়ে প্রতি উপমায়।
—দেবেন্দ্রনাথ সেন

৩-৮-১৯১৮

কাল যেতেই হবে।

৪-৮-১৯১৮

হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি
দূরে গেলে এই মনে হয় ;
দুজনের মাঝখানে অন্ধকারে ঘিরি
জেগে থাকে সতত সংশয় !
—রবীন্দ্রনাথ

কলিকাতা যাত্রা।

৫-৮-১৯১৮

কলকাতা এসে দেখি আজ কলেজ বন্ধ।

৬-৮-১৯১৮

ছোট কাকিমা প্রভৃতি এখানে রয়েছেন। তাঁদের দেখতে গেলুম।

৮-৮-১৯১৮

আজ অমূল্য হঠাৎ হাজির। তার বিয়ে আসচে রবিবারে। আমায় নেমন্তন্ন করে গেল। আজ তার প্রথম চিঠি পেলুম—অমূল্যর সামনে।

৯-৮-১৯১৮

অমূল্যর বধূর জন্যে কিছু উপহার কেনা গেল। একটা সেলাইয়ের বাক্স এবং দু'খানা বই—কল্যাণী ও পরিণীতা। সবসুদ্ধ টাকা সাতেক পড়ল।

১১-৮-১৯১৮

আজ অমূল্যর বিয়ে হল। কনেটি মন্দ নয়—তবে ভারি ছোট। মানুর[২৬] চেয়েও মাথায়

খাট।

আমি ৪টার সময় বরানগর গেলুম। সেখান থেকে বাগবাজারে কনেবাড়ি। রাত্রে যখন শ্বশুর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলেন, তখন রাত্রি ১২টা।

১২-৮-১৯১৮

চিঠির জবাব দিলুম—সেই সঙ্গে অমূল্যর বিয়ের 'প্রীতি-উপহার'গুলো পাঠিয়ে দিলুম।

১৩-৮-১৯১৮

অমূল্য প্রভৃতি আজ মুঙ্গের গেল। আমি স্টেশন গিয়ে তাদের see-off করে এলুম। আজ সকালে পার্শেল করে তার উপহার পাঠিয়ে দিয়েছি।

১৭-৮-১৯১৮

চিঠি লিখেছে।

১৯-৮-১৯১৮

আজকাল সকালে রোজ আধসের করে দুধ খাচ্ছি। রামুকাকা নিজে এনে দেন—খুব ভাল দুধ।

২১-৮-১৯১৮

চিঠি পেলুম।

২২-৮-১৯১৮

আজ অরুণের M.A. পরীক্ষা শেষ হল। খুব ভালই করেছে।
Picture House-এ Whip দেখতে গেলুম—বেশ film.

২৩-৮-১৯১৮

চিঠির জবাব দিলুম।

২৪-৮-১৯১৮

এ মাসের ভারতবর্ষে 'দত্তা' শেষ হয়ে গেল। আগাগোড়া দেখতে গেলে বই চমৎকার হয়েছে। সর্বত্রই লেখকের অসামান্য প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু শেষটা কেমন যেন matter of fact গোছের হয়ে গেল। আর একটু সরস হলে ভাল হত। বিয়েটা যেন বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।

শরৎবাবুর অমর কাহিনী থেকে এবার কোন হীরকখণ্ড বেরবে তাই ভাবছি। ততঃ কিম্ ?

২৫-৮-১৯১৮

কপালকুণ্ডলা পড়ছি—পাঠ্য হিসাবে।

২৬-৮-১৯১৮

মেজ খুড়শ্বশুর ক'দিন হল কলকাতায় রয়েছেন। আজ খবর পেলুম তাঁর অসুখ করেছে, তাই সকালবেলা দেখা করতে গিয়েছিলুম। এখন ভালই আছেন।

মেজদা এসেছিলেন দেখা করতে।

Oliver Twist পড়ছি—আজ আরম্ভ করেছি।

২৭-৮-১৯১৮

Bible class ছিল। এবারকার নতুন পাঠ্য The Will of God.

২৮-৮-১৯১৮

Whiteway Laidlow-র Sale-এ গিয়ে একজোড়া মোজা কিনে আনলুম—মূল্য ১২ আনা। New Market থেকে একখানা writing pad কিনলুম—দাম ১৷৷ টাকা।

২৯-৮-১৯১৮

আজও তার চিঠি পেলুম না। কিছুই বুঝতে পারছি না। অসুখ করেছে নাকি ?

৩০-৮-১৯১৮

আজও চিঠি নেই—আশ্চর্য!

Secretariesদের সঙ্গে basketball match, 9 to 20-তে জিতলুম।

মেজদা ডিম পাঠিয়ে দিয়েছেন আর জিগ্যেস করে পাঠিয়েছেন কাল থিয়েটারে যাব কি না।

৩১-৮-১৯১৮

আজও চিঠি এলো না—কি হল আমি ত কিছু ভেবে পাচ্ছি না। যদি অসুখ করে থাকে— ?

সমস্ত রাত থিয়েটার দেখা। মনোমোহনে 'দেবলাদেবী' এবং 'মোগল-পাঠান'। দেবলাদেবী বই খুব সুলিখিত নয়। কিন্তু দানীবাবুর acting চমৎকার। হীরালালবাবুও বেশ।

১-৯-১৯১৮

থিয়েটার ভাঙতে ফর্সা হয়ে গেল। আমি এবং মেজদা সটান ভবানীপুর উপস্থিত। সেখান

থেকে বিকেলে নরেনের সঙ্গে দেখা করে প্রত্যাবর্তন।

২-৯-১৯১৮

উঃ, আজ দশ দিন পরে চিঠি। তিনি লিখেছিলেন অথচ এর আগের চিঠি আমি পাইনি। কি হয় চিঠির ?

Oliver Twist শেষ হল—বেশ বই।

৩-৯-১৯১৮

এ মাসে ৬০ টাকা পেয়েছি। কলেজ ফি ১০৲ দিতে হবে—তাছাড়া কাপড় কেনা আছে। ৩॥৵০ দিয়ে ১ খানা তাঁতের ধুতি কিনে আনলুম। দেখি কি রকম চলে।

৪-৯-১৯১৮

রামুকাকাকে ১০৲ দিয়েছি একজোড়া কাপড় কেনবার জন্যে। দেখি কি আনেন।

৫-৯-১৯১৮

৪ঠা অক্টোবর [থেকে] আমাদের কলেজের ছুটি। মাঝে ঠিক এক মাস।

আজ চিঠি পেয়েছি !

৬-৯-১৯১৮

হোস্টেল-ফি দিলুম। ১৮ টাকা।

৭-৯-১৯১৮

তার চিঠি পেয়েছি।

My sweet little loving wife! How I remember your sweet face tonight! I have a longing in my heart to fly away to you to kiss your sweet lips, to look into your dark love-lit eyes, to take your dear little body in a long long embrace. Alas, how far we are apart? Miles extend between us. But still when I close my eyes and think of you, I feel my pulse run quicker in a new rush of joy; my heart throbs as if in touch with yours.

Your loving husband wafts his love across miles of distance to your dear presence. May you feel it tonight in your heart. May you dream of his undying love for you in your blissful sleep

Adieu, Love, Adieu!

11 P.M.

৮-৯-১৯১৮

মেসোমশায়ের জন্যে এক বোতল Vibrona কিনে ভবানীপুর গেলুম। ফিরে আসবার সময় Grand Restaurant-এ খেয়ে এলুম। Hostel-এ আসতেই মনো বলল, 'শুনেছ ব্যানার্জী, কাল Grand Restaurant-এ খেয়ে খগেন ও যতীনের কি দশা হয়েছে ? তারা সমস্ত রাত হেগেছে আর বমি করেছে।' তৎক্ষণাৎ সোডা খেলুম—কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। রাত্রি এগারটা থেকে বমি এবং বাহ্যে আরম্ভ হল।

৯-৯-১৯১৮

কাল রাত্রি ১১টা থেকে আজ সকাল ৫টা পর্যন্ত ৮ বার বাহ্যে এবং তিনবার বমি হয়েছে। শরীর অবসন্ন—৫টার সময় প্রবোধবাবু ওষুধ দিয়ে আরাম করেন।

রামুকাকা ফলমূল এনে দিলেন। খেয়ে কষ্টে দিনযাপন।

পণ্ডো 'চরিত্রহীন' এনে দিলে। পড়ছি।

১০-৯-১৯১৮

রামুকাকা পুরোনো চালের ভাত রেঁধে দিলেন—তাই খেলুম।

সমস্তদিন মুসলমানদের কীর্তি দেখলুম। তারা ক্ষেপে উঠেছে—যাকে পাচ্চে মারছে। ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, দোকান লুট করছে। বীভৎস কাণ্ড বাধিয়েছে।

এ ত কিছুই নয়—এর তুলনায় এখন Russia-র অবস্থা কি ভীষণ !

১১-৯-১৯১৮

'চরিত্রহীন' আজ শেষ হয়ে গেল। অনেকে বলে বইখানা রুচিবিরুদ্ধ। যারা বলে তারা সাহিত্যিক নয়। এ বইয়ের প্রত্যেক পাতা ফুলের মত শুভ্র—অভ্রের মত নির্মল ! আমি এমন বই পড়িনি, যার সব চরিত্রগুলোই মহান, অভ্রভেদী, বৃহৎ। 'চরিত্রহীন' একটা মহাকাব্য।

দোষও আছে—কিন্তু দোষগুলো এতই তুচ্ছ—আমাদের মর্ম স্পর্শ করতে পারে না। এ যেন একটা উদার, স্বর্গীয় মহাসঙ্গীত। এর মধ্যে সমাজের সঙ্কীর্ণতা নেই—আবার বিচারের ক্ষুদ্র শুচিতা নেই—সবই যেন একটা বিরাট মহত্ত্বের স্পর্শে পবিত্র হয়ে গেছে। মনে ভাবি, এ পৃথিবীটা যদি শরৎবাবুর কল্প-জগতের মত হত।

সতীশের মত চরিত্রহীনতা যদি কারও থাকে সে ধন্য ; সাবিত্রীর মত ভ্রষ্টা যদি কেউ থাকে সে সার্থক ; কিরণময়ীর মত অপরাধিনীর অপরাধ যার সে মহান !

১২-৯-১৯১৮

Riot-এর হিড়িকে দুদিন পোস্ট অফিস থেকে চিঠি issue হচ্ছিল না—আজও তার চিঠি পাইনি। আশা করি কাল পাব। আমি আজ সকালে তাকে একটা লিখে দিয়েছি।

বিকেলে St. Paul's B-র সঙ্গে Shield match ছিল। প্রথম half-এ আমি কিছু করতে পারিনি—একটা score করেছিলুম। Second half-এ তেরটা করলুম। Match-এর

result হয়েছে—৫৬ to nil.

আজ থেকে ভাল করে পড়া আরম্ভ করেছি—মাঝে অসুখে বন্ধ হয়ে গিছ্‌ল।

Scott-এর 'Bride of Lammermoor' ক'দিন থেকে একটু একটু পড়ছি। এখনো শেষ হয়নি।

১৩-৯-১৯১৮

আজ সকালে তার চিঠি পেয়েছি। সে লিখেছে যে মানা এসে তার চিঠিগুলো সব নিয়ে গেছেন—বড় লজ্জার কথা। চিঠিতে কত কি লিখি তার ঠিক নেই—বড় লজ্জায় পড়তে হচ্ছে দেখছি। লীলা[১১] শ্বশুরবাড়ি গেছে—তার 'ফাল্গুনী' নিয়ে কি করব ভাবছি।

আজ এক টিন Three Castle কিনে আনলুম। আর পারা গেল না। দাম ভয়ানক—১৷৷৶০ আনা।

Oratory class হল না—Bux সাহেব কোথায় গেছেন। টাকা সব ফুরিয়ে গিয়েছে—কি করব তাই ভাবছি।

কাল বিকেলে চৈতন্যকাকার সঙ্গে জুতো কিনতে যেতে হবে। চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে।

১৪-৯-১৯১৮

আজ বড় দেরিতে ঘুম ভেঙেছে—৭৷৷টায়। বেলা আড়াইটার সময় রামুকাকা এসে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে তালতলায় চৈতন্যকাকার কারখানায় গিয়ে হাজির হলুম। সেখান থেকে Bentink Street-এ Athat-এর বাড়ি। একজোড়া পাম্পসু'র মাপ দিয়ে এলুম। শনিবারে দেবে। মূল্য ১২৲।

ভারি ক্ষিদে পেয়েছিল। ফেরবার পথে চৈতন্যকাকা National Hotel-এ নিয়ে গেলেন। টাকা আড়াই খেয়ে ফেলা গেল। ফেরবার সময় বৃষ্টি পড়তে লাগল। আজ আর খেলা বেশি হল না। টেনিস কোর্ট দুটো আটবার দৌড়ে প্রদক্ষিণ করলুম।

আজও তার চিঠি পেয়েছি। আমার একটি শ্যালী জন্মগ্রহণ করেছেন। সুখের বিষয়। দিনে দিনে শশীকলার মত তাঁরা বৃদ্ধিলাভ করুন—এই প্রার্থনা।

আজ রাত্রে বোধহয় বাঙ্গলা সাহিত্য সভার meeting আছে। কিছু বল্‌ব ভাবছি।

১৫-৮-১৯১৮

নিরুপম চিঠি লিখেছে—আমার 'ব্যর্থতার সুখ' কবিতা তার খুব ভাল লেগেছে ; বিশেষত শেষ ক'টা লাইন :

মুছিয়ে দিও এই বেদনা
আঁখির ধারে প্রিয়ে !

সে নিজের একটি 'পাষাণী' বলে ছোট কবিতা পাঠিয়েছে—বেশ হয়েছে। ছন্দের ভুল নেই কিন্তু ভাবটুকু পুরোনো। কালিদাসের—কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ।

১৬-৯-১৯১৮

আজ সমস্তদিন আকাশ মেঘনির্মুক্ত। প্রকৃতির আশ্চর্য খেয়াল।

In apprehension of the riot আজ আমাদের কলেজের ছুটি। কালও বোধহয় ঐ কারণেই ছুটি। ঠিক বলতে পারি না।

'আমার বিয়ে' নাম দিয়ে এক কবিতা আরম্ভ করেছি—রবিবাবুর আধুনিক ছন্দে। শেষ হয়নি। ছুটির আগে 'সৎকর্মের ফল' নতুন খাতায় তুলে ফেলতে চাই।

আজ Oratory class.

১৭-৯-১৯১৮

আজ তার চিঠি পাবার কথা কিন্তু পাইনি—কাল পাব বোধহয়।

সকালবেলা সাড়ে ছ'টার সময় College Branch Aর সঙ্গে আমাদের basketball খেলা হল। তাদের 38 to nilএ হারিয়ে দিলুম।

রাত্রে Bible class ছিল—সাহেবের সঙ্গে খুব তর্ক হল। নিজের প্রতি কর্তব্য ও পরের প্রতি কর্তব্য—কোনটা বেশি ? এই নিয়ে। এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছুই বলা যায় না—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

১৮-৯-১৯১৮

আজ চিঠি পেয়েছি। লিখেছে আমাকে প্রায়ই স্বপ্ন দেখে, যেন আমি তার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি আর সে আমাকে চুমু খাচ্ছে। চুমুগুলো বাস্তব হলে কাজে লাগত।

নরেন এসেছিল। সমস্ত দুপুর ছিল। দু'খানা ॥৹আনা সংস্করণের বই নিয়ে গেল ; সেই সঙ্গে গীতিমাল্যও।

১৯-৯-১৯১৮

আজ গোঁফ কামিয়ে ফেলেছি।

মাকে একখানা চিঠি দিলুম এই মর্মে যে আসছে মাসের টাকা তাড়াতাড়ি চাই। ৪৫ টাকার কমে কিছুতেই চলবে না। অনেক বই কিনতে হবে ইত্যাদি।

পণ্ডোর কাছে দুপুরবেলা Metaphysics পড়লুম। তার কাছে না পড়লে আমার চলবে না।

২০-৯-১৯১৮

আজ দুপুরবেলা অরুণের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় সে অনেক কথা বলে ফেলল। আমার সম্বন্ধে তার ধারণা এত উচ্চ যে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তার বিশ্বাস যে আমি একটা খুব successful man হব। আমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সে যে উজ্জ্বল ছবি আমার চোখের সামনে ধরলে—সেটা আমার পক্ষে সম্ভব কিনা সন্দেহ। যদি হয় আমার জীবন সার্থক বলে মনে করব।

তার নিজের সম্বন্ধে বললে যে সে হয়ত তার Ideal পুরো লাভ করতে পারবে না। তার কারণ তার Idealগুলো ভারি উচ্চ। কিন্তু আমার বিশ্বাস অরুণ নিজের ক্ষমতা কতখানি তা ঠিক জানে না।

২১-৯-১৯১৮

বাবা লিখেছেন যে কাল তাঁরা এলাহাবাদ যাবেন। সম্ভবত মা এবং বৌ সঙ্গে যাচ্ছে।

আজ রাত্রে English Debating Club-এর meeting হল। Subject ছিল Is European civilization beneficial to India? Mathewর ভাই হল সভাপতি। অনেকেই বললে—আমিও কিছু বললুম।

কালকের programme কি হবে ভাবছি। ভবানীপুরে যাব নাকি ? বাণীদিদিকেও দেখতে যাওয়া উচিত।

২২-৯-১৯১৮

আজ মার চিঠি পেলুম। কাকাবাবুর জ্বর—সেই জন্যে উপস্থিত যাওয়া হল না। বৌ শুক্রবারে এবাড়িতে এসেছে।

শ্রীশবাবুর স্ত্রী—বজুদাদার শাশুড়ি—মারা গেছেন, বড় দুঃখের বিষয়।

বৌয়ের চিঠি পাইনি। খতুর c/oএ দিয়েছিলুম ; হয়ত গোলমাল হয়েছে—পায়নি। দেখি যদি কাল আসে।

২৩-৯-১৯১৮

Pride & Prejudice পড়লুম। বেশ বই। Darce এবং Elizabethএর চরিত্রে নূতনত্ব আছে।

আমাদের B team-এর সঙ্গে match ছিল। 28 to 5-এ হারিয়ে দিলুম। খেলা ভাল হল না।

আজ রাত্রে ভূত ডাকবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু হল না।

২৪-৯-১৯১৮

বিকেলে ৪টার সময় IDF office-এ মাইনে আনতে গেলুম। ৭॥ টাকা পাওয়া গেল। 'পার্বণী' কিনলুম মানুর জন্য।

হোস্টেলে ফিরে এসে দেখি আমাদের সঙ্গে Boy's Branch-এর সঙ্গে খেলা হচ্ছে। তারা ভারি rough খেলছে। Second half-এ আমি নামলুম। কিন্তু কোন সুবিধে হল না। তারা মারামারি করে রাগিয়ে দিলে। খেলা শেষে মারামারিতে পর্যবসিত হল।

রাত্রে অনিলের Spirit ডাকলুম—এলো। নেপোলিয়নকে চেনে কিনা জানতে চাওয়াতে বললে 'না'।

রাত্রে আমি আর ভট্টা বারান্দায় বিছানা পেতে একসঙ্গে শুলুম। গল্প করতে করতে রাত্রি ৩॥ হয়ে গেল। তখন ঘুমলুম।

২৫-৯-১৯১৮

Bux সাহেব জলপ্লাবিত উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে এসেছেন—সেখানকার দৃশ্য অতি করুণ। বাড়িঘর ভেসে গেছে—১৫ ফুট গভীর জল হয়েছে। আহার নেই, বস্ত্র নেই। সাহায্য কিছুই এখনো পৌঁছয়নি।

২৬-৯-১৯১৮

বিকেলে কোন কাজ ছিল না তাই bioscope দেখতে গেলুম। Bijouতে 20000 Leagues under the Sea ছিল। তাই দেখতে গেলুম। তেমন সুবিধের নয়।

আজ রানির চিঠি পেয়েছি। হাত ভেঙে গিয়েছিল বলে লিখতে পারেনি খতু তার হয়ে লিখে দিয়েছে। হাতে কি হল আবার ?

২৭-৯-১৯১৮

আজ দুপুর থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। Sanskrit Collegeএর সঙ্গে খেলা ছিল—হল না।

সন্ধ্যেবেলায় ভট্টাকে আমার 'সৎকর্মের ফল' গল্পটা শুনিয়ে দিলুম। তার খুব পছন্দ হয়েছে। সে খুব প্রশংসা করতে লাগল।

কাল Philosophyর পরীক্ষা আছে। দিতে পারব না—কিছুই যে জানি না।

৩রা অক্টোবর হয়ে আমাদের কলেজ বন্ধ হবে। কবে বাড়ি যাব ?

২৮-৯-১৯১৮

আজ হঠাৎ বাবার এক চিঠি পেলুম যে আমি যেন শীঘ্র মুঙ্গেরে যাই। কারণ কলকাতায় নাকি ভারি influenza হচ্ছে। আমি আজ কিংবা কালই চলে যেতুম। কিন্তু basketballএর জন্যে আটকে গেলুম। আজ Sanskrit College-এর সঙ্গে খেলা হল। অতি কষ্টে জিতেছি ১৫-৪। ১১টা point আমিই করেছি। বোধহয় shield পাব। Boy's Branchএর সঙ্গে খেলা বাকী আছে—সম্ভবত সোমবার হবে। আমি তার আগেই পালাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু বোধহয় যেতে দেবে না। আমার ওপরই সব নির্ভর।

আজ M.A.এর result বেরুল। অরুণ ফেল হয়ে গেছে—বড় দুঃখের বিষয়। আমরা কখনো ভাবিনি যে সে ফেল হবে। তাকে দেখে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। ফেল হওয়া যে কি দুঃখ তা ছাত্রমাত্রেই বুঝতে পারে।

কাল ভবানীপুর যেতেই হবে।

২৯-৯-১৯১৮

আজ সকালে ভবানীপুর গেলুম। সেখান থেকে খেয়েদেয়ে বেলা দেড়টার সময় বেরলুম। অনেক খুঁজে চৈতন্যকাকার আস্তানা বের করলুম, কিন্তু তিনি সেখানে নেই। কিছুক্ষণ বসে New Market-এ ফিরে গেলুম। একজোড়া wollen hose কিনলুম দুটাকা দিয়ে। একটা

Blackbird fountain pen কিনলুম ৩৷৷৴ দিয়ে।

অমূল্যর ভাই ধীরেনের সঙ্গে দেখা হল। সে এক বোঁচকা দিলে, তার কাকিমাকে পৌঁছে দিতে হবে। বড়নের ফরমাস আছে কতকগুলো বই কিনতে হবে। কাল হবে।

আজও তার চিঠি আসেনি।

৩০-৯-১৯১৮

সকালবেলায় ৮টার সময় চৈতন্যকাকার মেসে গেলুম। সেখানে খাবার দুধ ইত্যাদি খেয়ে ৩০ টাকা নিয়ে এলুম।

দুপুরবেলা বাজার করতে বেরলুম—অর্ধেক কেনা হল। অর্ধেক হল না।

বিকেলে বাবার চিঠি পেলুম টাকা পাঠিয়েছেন। কাল বাড়ি রওনা হব।

রাত্রে entertainment ছিল কিন্তু যাওয়া হল না। গল্প করে কাটিয়ে দিলুম।

১-১০-১৯১৮

সমস্ত দুপুর বইয়ের দোকানে টো টো করে বেড়িয়েছি। বুড়নকে তার ফরমাসী বইগুলো পার্শেল করে পাঠিয়ে দিলুম।

বেলা ২৷৷টার সময় রামুকাকা এবং মেজদা নিজের নিজের বস্তা নিয়ে এসে হাজির হলেন। জিনিসপত্র pack করে ফেলতে বেলা ৩৷৷টে বেজে গেল। ৪টের সময় Those who have shaved off home-grown toothbrush তাদের ফটো তোলা হল।

৬-২০র ট্রেনে গৃহ-যাত্রা। 'বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটিরবাসী।'

২-১০-১৯১৮

বেলা পৌনে নটার সময় Jamalpur পৌঁছলুম। গাড়ি late ছিল। Stationএ দেখি বাবা এবং খতু দাঁড়িয়ে। ভাড়া গাড়ি করে Jamalpur থেকে বাড়ি এলুম।

সমস্ত দুপুর বধূর সঙ্গে আলাপ। খতুও মাঝে মাঝে join করলে।

বিকেলে বেড়াতে গেলুম। মোহিনীর সঙ্গে রাস্তায় দেখা। রাত্রি ৮টা পর্যন্ত তার সঙ্গে ঘরে বসে আড্ডা দিলুম।

কাল থেকে পড়া আরম্ভ করব নিশ্চয়। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া যাক।

বৌ একটুও বাড়েনি বরং ময়লা হয়ে গেছে।

৩-১০-১৯১৮

আজ প্রায় ঘণ্টা চারেক পড়া গেছে. কাল আরও বেশি পড়তে হবে।

সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে যাওয়া হয়নি। Dumbbell exercise করেছি।

রাত্রে খতুকে Lays of Ancient Rome পড়ালুম।

আজ ঘুমতে হবে।

৪-১০-১৯১৮

সকালে গঙ্গাস্নান করতে গেলুম। বেশি পড়া হল না।

দুপুরে খুব ঘুমলুম। ১২॥টা থেকে ৩॥টে পর্যন্ত।

বিকেলে নিরুর সঙ্গে দেখা হল। আজ বল্‌তে গেলে ভাল পড়াই হল না। কাল থেকে।

৫-১০-১৯১৮

আড়ি করে দিয়েছি—আজ সমস্ত দিন কথাবার্তা বন্ধ।

৬-১০-১৯১৮

Between 12-30 to 1 p.m.

কাল রাত্রে ভাব করে ফেললুম। আর কাঁহাতক কথা বন্ধ করে থাকা যায়। রাত্রি আড়াইটা পর্যন্ত জাগরণ।

দুপুরবেলা ১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ঘুম।

৭-১০-১৯১৮

সন্ধ্যাবেলায় শ্বশুরবাড়ি গেলুম। সেখান থেকে সকাল সকাল ফিরে এলুম। খাবার জন্যে জেদাজেদি—কিছু খেলুম না। ক্ষিদে ছিল না।

আজ রাত্রে খুব ঘুমিয়েছি। রাত্রি চারটে থেকে সকাল পর্যন্ত গল্প।

৮-১০-১৯১৮

এখানকার D.J. College[২৮]-এর ছেলেরা থিয়েটার করলে তাই দেখতে গিয়েছিলুম। দুর্গাদাসের কয়েকটা scene এবং বৈকুণ্ঠের খাতা। মন্দ করেনি। ভাল হয়েছে কিন্তু বৈকুণ্ঠের খাতা। দ্যাবা তিনকড়ি সেজেছিল—সেই সবচেয়ে ভাল করেছে। আকলা বৈকুণ্ঠ সেজেছিল তারও বেশ হয়েছে। পানু ঈশেন সেজেছিল।

আজ অনাথ এসেছে।

৯-১০-১৯১৮

আজ বিকেলে hockey খেললুম Policeদের সঙ্গে। খেলা মন্দ হল না কিন্তু হেরে গেলুম।

১০-১০-১৯১৮

আজ football খেললুম। অনভ্যাসের ফোঁটা—কপাল চড়চড় করে। এমনি হাঁপিয়ে গেলুম যে এক গ্লাস লেমনেড খাবার আগে তৃপ্তি হল না।

নীরুকে 'সৎকর্মের ফল' পড়তে দিয়েছিলুম ; সে তার এক সমালোচনা লিখে ফেরত দিয়েছে। সমালোচনা ঠিকই হয়েছে। কয়েকটা দোষ সে ধরে দিয়েছে।

১১-১০-১৯১৮

বিকেলে বেড়াতে গেলুম। আমি, অনাথ এবং মোহিনী। বেরিয়ে ছিলুম ঠাকুর দেখবার উদ্দেশ্যে কিন্তু শেষ বরাবর চণ্ডীস্থানে গিয়ে পৌঁছে গেলুম। সেখানে কিছুক্ষণ বসে গঙ্গার ধার দিয়ে স্টেশন পর্যন্ত গেলুম। সেখান থেকে বাড়ি ফিরলুম।

খতুর পাল্লায় পড়া গেছে। গল্প বলতে হচ্ছে। আজ রাত্রে Leather faceএর গল্পটা আরম্ভ করা গেছে। ওদের খুব ভাল লাগছে।

১২-১০-১৯১৮

অমূল্য এসেছে। বিকেলে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এলুম। শরীর তার খারাপ হয়ে গেছে—ভয়ানক ভুগছে।

নিরুর সঙ্গে আমার গল্পটা নিয়ে আলোচনা হল।

কাল থেকে পড়া হচ্ছে না। পূজার ক'দিন অনধ্যায়।

২২-১১-১৯১৮

ছোট কাকাবাবুর মৃত্যু—রাত্রি একটার সময়। তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক।

১০-১২-১৯১৮

Quo Vadis শেষ করলুম—বেশ বই।

রাণু, তুমি এই কদিন হল এখানে নেই। কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌ছে। রাত্রি প্রায় নটা—শুতে যেতে মন উঠ্‌ছে না। কেবলি মনে হচ্ছে

শূন্য মন্দির মোর—

১৯২০

এক বৎসর পরে জীবনের ছিন্নসূত্রগুলোকে আবার গ্রন্থি-বদ্ধ করতে বসেছি। এই এক বৎসরের মধ্যে কত পরিবর্তন হয়ে গেছে—জীবনের বিভ্রান্ত গতিপথের প্রান্তে হয়ত একটা লক্ষ্য এসেও দেখা দিয়েছে। তাই আজ থেকে যে পর্যায়টা আরম্ভ করবার সঙ্কল্প করেছি সেটা হয়ত পূর্বেকার মত লক্ষ্যহীন এবং উচ্ছৃঙ্খল নাও হতে পারে।

জীবনে প্রবল অনুভূতির একটা সাড়া যখন আসে তখন সে বোধহয় খুব প্রচ্ছন্ন এবং অপরিস্ফুটভাবেই আসে। তখন মনের মধ্যে এমন একটা চঞ্চলতা একটা সতৃষ্ণতা দেখা দেয়,

যেটা তাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমার মনের অবস্থাটা এখন সেই রকম। প্রবল অনুভূতির অন্তর্ভেদী সূক্ষ্ম দৃষ্টি এখনো অতি অল্প বই পাইনি। কিন্তু পুরো পাবার কি যে একটা উন্মাদনা জেগে উঠেছে তা বলতে পারি না।

…ট্রেনে আসতে আসতে 'চেনা' বলে একটি কবিতা লিখলাম। …মনের মধ্যে কদিন ধরেই…বসে ছিল। কিছুতেই তা…

চাইনে রে মন চাইনে
সুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে কথা আর যে ছলনাই
তাই নে রে মন তাই নে—

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটুকু সকৌতুক হলেও ভাল করে মনে গ্রহণ করতে পারছিলুম না। তাই সেটার বিরুদ্ধে নিজের মনের সমস্ত তর্ক যুক্তি নিঃশেষ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম।

…আমি দেখছি যে আমার মনের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস ক্রমেই বদ্ধমূল হচ্ছে। এই অবিশ্বাসকে ঠিক Atheism বলা যায় না—Agnosticism বল্লেও আমার নাস্তিকতা ঠিক বুঝান যায় না। আমার বিশ্বাস ঈশ্বর বলে কাউকে স্বীকার করে নেয়া আমার পক্ষে এবং সকলের পক্ষেই নিষ্প্রয়োজন। ঈশ্বরের এই প্রয়োজনহীনতাই আমার প্রকৃত creed. 'নিষ্প্রয়োজন' বলে একটা কবিতা লিখেছি—সেটাতে আমার আন্তরিক ধর্মের প্রধান যুক্তিগুলো সন্নিবিষ্ট করেছি…। আমার মতে এই ধর্মই সবচেয়ে…(Pragmatism)

'গুপ্ত মিলন'…যে কবিতাটা আরম্ভ করেছি সেটায়…একটু ইঙ্গিত আছে। প্রেমের মধ্যে লালসা থাকা বড় অন্যায় স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে সকাম প্রেমকে আমি একেবারে তুচ্ছ করতে পারি না। আমার বোধহয়, সুন্দর মুখে কাল টিপ যেমন মুখের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দেয় তেমনি প্রেমের তুষারশুভ্র পবিত্রতার উপর কামনার একটু ছিটাও বেশ চমৎকার মানায়! কামনা যেন প্রেমের নিমক—আস্বাদটুকু আরও সুমধুর করে তোলে। রুচি আর নীতিবাগীশদের ভয়ে বাইরে হয়ত একথা কেউ স্বীকার করবেন না। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে এই প্রেম-লালসার মিলনের অমোঘ সৌন্দর্য চোখে পড়বেই। নরনারীর এই পরস্পরের প্রতি সকাম আকর্ষণ আমার কাছে মোটেই মন্দ বলে বোধহয় না। Keats বলেছেন, A thing of beauty is a joy for ever. প্রেম যদি চুম্বন, আলিঙ্গন বর্জিত অত্যন্ত কঠোর একটা সাধনা হত তাহলে তার সঙ্গে মনুষ্যত্বের যোগ কই! মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতাগুলি তার স্বাভাবিক শক্তির মতই সুন্দর।

…কতকগুলো কবিতা সংগ্রহ করে ছাপতে দিয়েছি—সবসুদ্ধ কুড়িটা হবে। সেগুলো ছাপানর প্রধান উদ্দেশ্য এই যে বঙ্গীয় পাঠক আমার […] উপভোগ করেন কিনা তাই দেখা।…আমি এই পর্যন্ত যতগুলো কবিতা লিখেছি সবই আমার প্রাণের সঙ্গে রঙ্গ করা। কাজেই আর কোন গুণ থাক বা না থাক তারা যে ন্যাকামী নয় একথা জোর করে বলতে পারি। যে জিনিসটা ভাল লেগেছে—যেটাকে সত্য বলে মনে করেছি সেইটেই লিপিবদ্ধ করেছি।

'যৌবনস্মৃতি' বলে কবিতাটা আমি আমার সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে লিখেছিলুম। আমার বিশ্বাস আমি যত কবিতা লিখেছি তার মধ্যে সেই one of the best. তাই 'যৌবনস্মৃতি'[১১] নাম

দিয়েই কবিতাগ্রন্থটি প্রকাশ করছি। দেখি আমার শ্রেষ্ঠ রচনা সাহিত্যে স্থান এবং আদর পায় কিনা। তা যদি না পায় তাহলে বুঝবো আমার এতদিনের সাহিত্যচর্চা কেবল অনধিকারচর্চা।

বাড়িতে এসে পর্যন্ত intellectual culture একেবারে···গেছে। সেই জন্যে বাড়িতে থেকে···যেন মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে···এখানে একটা ঠিক congenial intellectual atmosphere পাচ্চি না। নীরু···কিন্তু তার সঙ্গে প্রায় দেখাই হয় না। সেদিন তাকে আমার নূতন কবিতা কটা পড়তে দিয়েছি। দেখি সেগুলো সম্বন্ধে তার মন্তব্য কি ?

অজিতকে[৩০] চিঠি লিখেছি আমার বই কতদূর হল জানতে। এখনো তার জবাব পেলুম না। জানুয়ারীর আগে বোধহয় বই পাব না। অজিত সম্ভবত বাড়ি চলে গেছে।

পণ্ডো আমাকে Christmas জানিয়েছে। আমি New Year জানাব ঠিক করেছি।

রবিবাবুর কয়েকটা কবিতা আমার এত ভাল লাগে যে সে ভাললাগার পরিমাণ আমি কিছুতেই দিতে পারব না। এবং কেন যে সেগুলো এত ভাল লাগে তাও বলা আমার পক্ষে সমান অসাধ্য। শুধু এইটুকু মনে হয় যে সেইগুলো পড়তে পড়তে যদি আমি মরে যাই তাহলে আমি যেন চিরকাল তারই সঙ্গে এক হয়ে মিশে থাকব !

দূরে বহুদূরে—
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।—

কি জানি কেন, [এই] কবিতাটার মধ্যে কি মাদকতা আছে—আমি একেবারে মেতে যাই।

জীবনের দিনগুলো কি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। আজ মনে হচ্ছে, হায়, এই যে এতগুলো দিন গেল আমি কি করলুম ! আমার এই কুড়ি বৎসরের জীবনের প্রায় সব পৃষ্ঠাগুলোই একেবারে blank, সেগুলো এতই শূন্য, এতই অর্থহীন যে তাদের দিকে ফিরে তাকাতে প্রাণ ব্যথিত হয়ে ওঠে। হায়, কবে এই জীবনের শূন্যতা কাজ দিয়ে, চিন্তা দিয়ে ভরাট করে দিতে পারব ?

জগতে কর্তব্য জিনিসটা কি কঠোর ! চারিদিক থেকে উদ্যত খড়্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—একটু দুর্বলতা দেখলেই আঘাত করবে। অতি সন্তর্পণে ভারি সতর্ক হয়ে চলতে হয়। জীবনটাকে স্বাধীন নির্ভীকভাবে নিজের মনোমত পথে ছেড়ে দেয়া যায় না। কিন্তু জীবনটা যদি এমনি হত যে যার যেমন ইচ্ছে সে তেমনিভাবে নিঃশঙ্কচিত্তে তার প্রাণের লাগাম ছেড়ে দিতে পারত তাহলে পৃথিবীটা কেমন হত কে জানে ! যদি সকলে শপথ করে বিপথব্রত···এবং পুঁথিকে সমভাবেই···এবং মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়াটাকেই জীবনের চরম সার্থকতা বলে জ্ঞান করত তাহলে জগতটা কিভাবে চলত সেটা একটা ভাববার কথা।

আমার বিশ্বাস আমার হৃদয়টা তত স্নেহ-প্রবণ নয়। কেন যে এই বিশ্বাসটা আজ হৃদয়ের মধ্যে ঘনীভূত হচ্ছে তা জানি না কিন্তু প্রবল স্নেহের অনুভূতি আমাকে কখনো অন্ধ করে দিতে পারেনি। আমি প্রায়ই দেখতে পাই যে, যে যাকে ভালবাসে তাকে যেন সর্বাঙ্গসুন্দর, দোষলেশহীন একটি দেবতার মতই মনে করে। তার সমস্ত অপূর্ণতা, সমস্ত অক্ষমতা সম্বন্ধে সে যেন অন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু আমি ত এ পর্যন্ত এমনভাবে কাকেও ভালবাসতে পারিনি যাকে

আমি ক্ষণেকের জন্যও সর্বাঙ্গসুন্দর বলে মনে করতে পারি। তার কারণ বোধহয় এই যে আমি বোধহয় পৃথিবীর যাবতীয় লোককেই একটু critically দেখি। যে critic সে admire করতে পারে কিন্তু দোষগুণ নির্বিচারে ভালবাসা তার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়।

আমি কি সত্যিই একটা হৃদয়হীন, স্নেহহীন অণুবীক্ষণ যন্ত্র...আমি জানি অনেকে আছে যারা আমায় বড়ই স্নেহ করে, ভালবাসে। আমি তাদের প্রকৃত ভালবাসা দিয়ে প্রতিদান করতে পারি না কেন। আমার এ অক্ষমতার কারণ কি ? তবে কি আমি একটা অঙ্গহীন মানুষ যে প্রকৃতির সমস্ত দান থেকে বঞ্চিত হয়েছে ?

১-১-১৯২০

আরম্ভ করাটা ভারি শক্ত ব্যাপার। একটা কাজ যতই তুচ্ছ হোক না কেন, সেটা আরম্ভ করবার সময় একটু বেগ পেতে হয়ই। তাছাড়া মনীষীরা বলেন—The beginning holds within it the end. সেই জন্যে আরম্ভটা একটু সাড়ম্বর হওয়াই প্রথা। কে বলতে পারে কালিদাস যখন তাঁর শকুন্তলম্ নিয়ে কলম ধরেছিলেন তখন মহাকবির লেখনী আবেগভরে কম্পিত হয়েছিল কিনা ! এ স্থানে মহাকবির নামোল্লেখের উদ্দেশ্য অহমিকা প্রকাশ নয়। শুভ সূচনার জন্য মহাজনের নাম স্মরণ মাত্র।

আজকে অজিতের একখানি দীর্ঘ চিঠি পেলুম। চিঠিখানা খুব সারগর্ভ। পত্রোক্ত বিষয় খুব গোপনীয় তাই সে বিষয়ে এখানে নীরব রইলুম।

দাদাবাবু প্রভৃতিকে নববর্ষ জ্ঞাপন করলুম। শশাঙ্ক New Year card পাঠিয়েছে তার সারোক্তি এই—

Old times are sweetest
Old friends are surest.

নীরু আজ রাত ১২টার গাড়িতে পাটনা যাবে। রাত্রে ডাক্তারবাবুর জামাই নরেনবাবুর সঙ্গে আলাপ হল।

২-১-১৯২০

আমি ত নিরীশ্বরবাদী। আমার এখন একটিমাত্র দেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন এই ডায়েরি। দিনের সমস্ত সঞ্চয়, সকল দুঃখদৈন্য, আশা নৈরাশ্য, জ্বালা যন্ত্রণার অঞ্জলি এই ডায়েরি দেবীর শ্রীচরণে এনে ঢেলে দিই। বোধহয় যেন এতে একটু শান্তি পাই। ইনি যেন আমার সকল মর্মকথার ভাণ্ডারী। সহানুভূতি পাই না-পাই, আমার সুখদুঃখের কথাগুলি যে তাঁর কাছে এনে হাজির করছি এতেই আমার সুখ। তার হৃদয়ের পর্দায় পর্দায় যে আমার কাহিনী লিখে রাখছি এই আমার তৃপ্তি। দেবতার কাছ থেকে কখনো কিছু প্রত্যাশা করি না বলেই পাষাণের দেবতাতেও আমাদের আপত্তি নেই। কামনা বা প্রার্থনা জিনিসটা হিন্দুর কাছে অধর্ম। অথচ সেইটেই খৃষ্টধর্মের প্রধান বস্তু। আশ্চর্য নয় কি ? কিন্তু সত্য কার দিকে ? হিন্দুর না খৃষ্টানের ?

৩-১-১৯২০

এবার কি জানি কেন আমার মনে হচ্ছে যে এই বৎসরটা আমার জীবনের মধ্যে খুব একটা eventful বৎসর। এটা আমার কল্পনামাত্র হতে পারে কিন্তু সময় সময় এক একটা কল্পনা

মানুষকে এমনভাবে আশ্রয় করে বসে যে সেটা বাস্তবের চেয়েও বেশি সত্য হয়ে ওঠে। বাস্তবিক পক্ষে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলের চক্ষুই অন্ধ—কিন্তু তবু এই পূর্বাভাসগুলো কি করে যে আসে বলা শক্ত। জীবনের ভবিষ্য পর্দার অন্তরালে লুক্কায়িত ঘটনাগুলি ছায়াবাজীর মত বর্তমানের রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়ে অতীতে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা দর্শক দেখতে পাচ্ছি শুধু রঙ্গমঞ্চের ভিতরটায় কিন্তু অনাগতের অভিসন্ধির খবর পাচ্ছি আমরা কোথা থেকে! খুব আশ্চর্য নয় কি? আমার বোধহয় বর্তমানের মধ্যেই ভবিষ্যতের একটু ইঙ্গিত আছে। সময়সূত্রের আগাটা দেখে গোড়াটা আন্দাজ করে নেয়া যায়! তবে সে আন্দাজ খুব অস্পষ্ট, দ্বিধাজড়িত।

৪-১-১৯২০

[নিরাপদদাদার ভগিনী-বিয়োগ]

মৃত্যু-দেবতার বিরাট ছায়াতলে কাল সমস্ত রাত্রি কাটিয়েছিলুম। কি অমোঘ অথচ কি কোমল, কি দৃঢ় অথচ কি মৃদু এই দেবতাটি! তাঁর অব্যর্থ সংকল্পের মধ্যে কিছুমাত্র কঠোরতা নেই। তাঁর অপরিসীম সহানুভূতির ভিতর কিছুমাত্র দ্বিধা নেই। ক্ষমাশীল, প্রবল, গরিমাময় এই মরণবীরের অবিকম্পিত শাসন-রীতি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। এত বড় সুবিচারক পৃথিবীতে বোধহয় কেউ নেই। রবিবাবুর কবিতা স্মরণ হচ্ছে—

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ হে মোর মরণ!

কাল কলিকাতা যাত্রা করতে হবে।

আমার সহপাঠী অবনীনাথ চট্টোপাধ্যায় আজ মানুকে দেখতে এসেছিলেন। পছন্দ হল কিনা বলা যায় না।

৫-১-১৯২০

আজ কলিকাতা যাওয়া হল না। কেন হল না বলা শক্ত। বোধহয় কাল কোন কাজ নেই বলেই গেলুম না। তাছাড়া গৃহিণীর যে আপত্তি ছিল বলাই বাহুল্য।

এখানে এসে আবার কেমন সাহিত্যচর্চার নেশাটা একেবারে ছুটে যাচ্ছে। আবার আমার বাণীকুঞ্জে না পৌঁছলে হচ্ছে না।

৬-১-১৯২০

সমস্ত দিন অনাবশ্যক কাজে এবং সমস্ত রাত্রি ট্রেনে কাটালুম—অতএব উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। এবার বৌ-এর মন যেন একটু বেশি খারাপ দেখলুম। অন্যবার ত আমি আসবার সময় এত কাঁদে না! এবার তবে কেন এত কাঁদলে? বোধহয় আসন্ন সম্ভাবনাটার জন্যে সে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছে। সে সময় আমি থাকলে বড় ভাল হত, তারও মনে সাহস থাকত। দেখি কি হয়!

যাবার আগে অবলা পিসিমার সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি তাঁর কবিতার খাতাখানা আমাকে পড়তে দিলেন। খাতায় অনেকগুলি কবিতা আছে, প্রায় ১০০টা হবে। তাঁর লেখবার ক্ষমতা

সম্বন্ধে আমার বেশ ভাল ধারণাই আছে। আশা করি তাঁর কবিতাগুলি আমার ধারণার সমর্থন করবে।

৭-১-১৯২০

একটার সময় কলিকাতায় উপস্থিত। কলেজ গমন। অবনীর ঘরে গমন—তার room no 110. ফিরিয়া বাবাকে ও রাণুকে পত্র দিলাম।

কেনেডি সাহেব ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁর সঙ্গে বেশি আলাপের সুবিধা হয়নি।

বিকালবেলা অজিতের সঙ্গে যাপন। নানা বিষয়ে আলোচনা। এখনো শেষ হয়নি।

আমরা স্থির করেছি এবার থেকে গম্ভীর হব। বাহিরে নয়, অন্তরে। বাহিরে যেমন আছি তেমনি থাকবো—কিন্তু অন্তরটাকে গভীর, চিন্তাশীল করে তুলতে হবে। নিছক স্রোতের উপরে ভেসে যাওয়া আর ভাল লাগছে না—এবার ডুব দেয়া চাই।

পড়া আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু কবে?

৮-১-১৯২০

আজকাল ঘুম থেকে উঠতে বড় দেরি হয়—প্রায় আটটা বাজে। এটা কিন্তু উচিত নয়। প্রথমত স্বাস্থ্য খারাপ তার ওপর সময় নষ্ট। সকালবেলা উঠতে দেরি হলে সমস্তদিন সব কাজেই যেন দেরি হয়ে যায়।

আজ আমার 'যৌবনস্মৃতি'র প্রথম ফর্মার proof পেলুম। Proof সংশোধন করে দিলাম। প্রথম ফর্মায় কিন্তু অনেক ভুল রয়ে গেছে। কি করি নিরুপায়!

অনেকদিন পরে Mr. Sarcaর সঙ্গে দেখা হল। তেমনি সরল উদ্দাম হাস্যময়। শিশুর মত প্রকৃতি। বড় ভাল লাগল।

সিগারেট খাওয়াটা আবার বেশি হয়ে পড়ছে—এবার থেকে আরও সংযত হতে হবে। কিন্তু মুশকিলের বিষয় এই যে ধূমপান না করলে "প্রাতঃকৃত্য" হয় না। হুঁকার বন্দোবস্ত করব ঠিক করেছি।

৯-১-১৯২০

আজ হইতে সিগারেট খাইব না। যদি খাই দিনে পাঁচটার বেশি নয়।

Aimless vagaryতে সমস্ত দিনটা কেটে গেল। কলেজ থেকে ভবানীপুর গেলাম। সেখানে প্রায় ২॥টা পর্যন্ত থেকে তারপর প্রায় ৪টা পর্যন্ত নিউ মার্কেটে ঘুরে বেড়ালুম। তারপর কর্নওয়ালিশ থিয়েটার-এ গেলুম। সেখানে রাস্তায় হঠাৎ অমূল্যর সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে গল্প করে বায়োস্কোপ-এ প্রবেশ। আসবার সময় প্রেস হয়ে proof নিয়ে এলুম। Proofএ এখনো ভুল আছে।

আজ এইমাত্র পঞ্চম সিগারেট শেষ করলুম। কাল আরও কম খাবার চেষ্টা করব।

ভবানীপুরে গাড়ি দেখতে কারখানায় গিয়েছিলুম। দেখলুম কিছুই হয়নি।

১০-১-১৯২০

আজ অনেক কাজ করা গেছে। সকালবেলা কলেজ যাবার আগে proof গুলো সংশোধন

করে প্রেসে দিয়ে এলুম। ফিরে এসে খতুর আর রাণুর চিঠি পেলুম। মা বলে পাঠিয়েছেন যে চৈতন্যকাকার medal সঙ্গে দিয়েছিলেন কিন্তু আমি ত খুঁজে পেলুম না। বোধহয় ভুল হয়ে থাকবে।

দুপুরবেলা এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। খুলে দেখি বাবার—See Abani Kalo[৩১] arrange approval soon. এর অর্থ যদিও খুব দুরূহ তবু আন্দাজে কতক বুঝলুম।

দুপুরবেলা 'গুপ্ত মিলন' কবিতাটা শেষ করলুম। শেষটা বোধহয় ঠিক আগেকার মত হল না।

সন্ধ্যাবেলা অবনীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলুম সে থিয়েটারে গেছে—ফিরে আসতে হল।

আজ বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছে, শুয়ে পড়লুম। রাত্রি ৭॥টা। রাত্রি বারটার সময় ঘুম ভেঙে উঠে দেখি অজিত এবং পরেশ গল্প করছে।

১১-১-১৯২০

Address to Time
আজকে রোববার!
সূর্য ডোব্‌বার
দেরি আছে অনেক—
পথিক ওহে, ক্ষণেক
দাঁড়াও না ভাই!
তোমার সঙ্গে প্রায়ই
হয় বটে দেখা;
তুমি কিন্তু একা
চলে যাও দ্রুত,
কোনও ছলছুতো
দাও নাক আমল।
আজ ওই শ্যামল
ধরণীর ভরা যৌবন!
যেন ও ভুবন-
মোহিনীর রূপ দেখে
বিশ্ব সব কাজ রেখে
দাঁড়িয়ে আছে চুপটি!
তার সেই রূপটি—
ওরে ও বেয়াড়া পান্থ!
বারেক দেখে হ' শান্ত!

বিকেলে অবনীর হোস্টেলে গেলুম কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হল না।

কালোকে এবং চৈতন্যকাকাকে শীঘ্র দেখা করবার জন্যে চিঠি লিখলুম।

১২-১-১৯২০

Went To Abani's...Law class. He said...attitude towards the...alliance

was one of...But at the same time...certain hints that it was to him by all means desirable. I have written to mother clearing everything.

Chaitannakaka came about one in the afternoon. I commissioned him to buy a bottle of Vibrona, a few other things and deposit them with mashima at Bhowanipur. I also told him about the shawl which is with him. He promised to send it back soon.

By his advice I wired to father informing him of Abani's opinion.

Read Byron's Don Juan all the evening till light out.

Went to press in the evening but the thing was not yet ready. The pressmen are all liars—without exception.

১৩-১-১৯২০

...percentage in Hindu Law upto...If Manu's marriage comes off in the next Bengali month, I fear I shall have to be absent for a few more days.

Read Byron throughout the noon & slept a bit. Today I am feeling rather unfit. Just a little headache. I hope it will be over tomorrow. Smoked heavily today.

Gave a formal reception to Mr and Mrs Kennedy from the hostel. It has been a very successful affair.

I have got today the last part of my book of poems from the press. It is much better than the first part there being very few mistakes. I do not know how people would like my poems. I almost dread the time when they will be reviewed in the papers. Ajit says they are quite decent and would pass for good.

১৪-১-১৯২০

My health...

Today I bought one phial of Bibrophosphate 5 gr pills. I want to use it for the purpose of improving my health. Let us see.

I am feeling very tired this evening. I don't know why. Perhaps because I had a bit of overexercise.

I have ordered the durwan to bring me a hookah, No more of cigaretts. Hail hookah, offspring of Heaven.

১৫-১-১৯২০

...spent the evening in playing tennis and basketball.

Tonight we had a grand feast in the Hindu mess in which the Kennedys were invited. We had a jolly good time while dining.

I am such a forgetful man that I forgot to take Bibrophosphate pills every time that I ought to take. My memory is simply incorrigible.

Paresh has been ill fot last few days. Ajit is hard at work in tending him. Such is L.

১৬-১-১৯২০

Nothing unusual...I would very much like a change of programme.

Today I have spoken in the meeting held for the reception of Mr. Kennedy. I spoke in Bengali. Without boasting I may say that I was the best speaker on the occasion. At least so people say. Ajit was also a speaker. But he could not do well as he had to speak in English.

I find that I have to increase the bulk of my book by another sixteen pages. So I have put in it three more poems, a সূচী & an erratum. I think this will make the book complete.

I have to write the H. Law tutorial tonight. I must keep up. No help.

১৭-১-১৯২০

...very much in my...to have written out...my Hindu Law tutorial.....not done. Yesterday night...but could not do it. This indeed very bad.

Ranu's letter came to hand this evening. She has made her mind strong against the coming event. I am very glad she has done so. Giving way would have been dangerous. I have written to her encouraging her in every way. How I wish the thing were safely over.

After prayer we went up to Mr. Kennedy's social. We had excellent time there. Mrs. Kennedy was very kind and entertaining. We enjoyed her society thoroughly. But I committed such foolishness there. I broke one of her tea cups. I am so sorry & so ashamed of myself. However she does not mind it. When we returned it was past eleven.

১৮-১-১৯২০

তবু চলে যায় !···
মানে না···
ওরে হতভাগা···
ওরে···
কতখানি তুই যাচ্ছিস···
আছে তার কিছু জানা ?
উঃ, ভারি কাজ !
কাজ বেশি হল, আজ
একটু বসে থাকার চেয়ে ?
শুধু চলেছেন ধেয়ে
ঘোড়-সওয়ারের মত !
কেন বাবা ? অন্তত
আজ একটু বোসো না !
ওগো, বলি ও সোনা-
মণি, রাতদিন হেঁটে—
একসঙ্গে সাতদিন হেঁটে
পোড়া পা দুটি কি ছাই
এতটুকু ব্যথা হতে নাই !

ধন্য বাবা ওই দুটি পদ !
ওই জোড়া-কোকনদ
বিধাতার সেরা সৃষ্টি !
যাও, তবে ফিরিও না দৃষ্টি
যাও চলে একভাবে মগ্ন হয়ে ভ্রমণের প্রেমে
এই অলসতা মাঝে একবারো দাঁড়িও না থেমে !

১৯-১-১৯২০

…ঘাড়ের পিছনে একটা… । সেটাতে ভারী…, ঘাড় ফেরান মুশকিল । আজ বাবার চিঠির সঙ্গে শৈলজাবাবুর হিসাব পেলুম । আমার ত মাথা ঘুরে গেছে । সবসুদ্ধ প্রায় বিশ হাজার টাকা । তার উত্তর কাল বাবাকে দেব ভাবছি !

'মন্মথ-বিজয়' বলে একটা কবিতা আরম্ভ করেছি কিন্তু কিছুতেই বেশিদূর এগোতে পারছি না । দুই stanza হয়ে পড়ে রয়েছে ।

Familiarity breeds contempt-একথাটা ক্রমশ আমার কাছে সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে ।

২০-১-১৯২০

আজকে moot……professor বলতে বল্লেন, অগত্যা যা শুনেছিলুম তাই আশ্রয় করে এক লম্বা স্পীচ ।

আজ একরকম নতুন খেলা খেললাম । প্রকাণ্ড বেলুনের মত এক বল নিয়ে খেলা । খেলার নাম জানি না ।

Bible class ছিল ।

আজ বড় এক মজার স্বপ্ন দেখেছি । রাণুর বিষয় । স্বপ্ন অবলম্বন করে এক কবিতাও লিখেছি—নাম চুম্বনস্বপ্ন ।

শৈলজাবাবুর চিঠির মর্ম সংগ্রহ করে আজ তার এক জবাব বাবাকে দিয়েছি । আগাগোড়াই আগুন ।

২১-১-১৯২০

…কবিতা মাঝে মাঝে বড়…অশ্লীল হবার কোন প্রয়োজন…আমি রুচিবিশারদ নই কিন্তু…যেটা নোংরা তার প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই । এ পর্যন্ত যা তিনি লিখেছেন কিছুই দূষণীয় নয় । সৌন্দর্য আমি দেখবো । সে বিষয়ে শ্লীলতার প্রশ্ন আসতে পারে না । কিন্তু নিছক কলুষ সাহিত্যে সহ্য করব না । Don Juan-এর 8th canto-র কয়েকটা stanza সত্যই বড় ময়লা ।

The boil on the back of my neck is causing me a good deal of trouble. I could not go to college for this reason. I do not know what to do with this devil of a boil.

The press has given me proof of the half ফর্মা । I have corrected it through but could not return it to the press. I hope to do it tomorrow.

২২-১-১৯২০

English comes so...you can't help...today also I did...the pain on the...great in the morning...time in reading Byron and Shakespeare pleasant companions both. During noon wanted to sleep but sleep would not come. So got up & wrote a post-card to Pannalal asking for Rs 10/- he had borrowed from me sometime back.

Played tennis all the evening. Took bath after that. Went to the press to return the proofs corrected.

Before going to bed wrote a long letter to Dad.

Small pox very high in Calcutta. Death rate appalling. Colleges are expected to be closed soon.

২৩-১-১৯২০

...college & cut...will remain closed on...Tuesday for the Saraswati...Spent the noon partly in talking with Pondo and partly in reading Shakespeare. The Merry Wives of Windsor is one of the poet's best comedy in the finest sense of the word. As opposed to the Mercahant of Venice it is throughout a happy comedy with never a dark shade of tragedy.

Kalo came to me in the evening with a wire from father. I think I will have to go to Monghyr with Mihir[৩১], who wants to see Manu. Most probably I start tomorrow or on Sunday.

Father wrote me that he was coming down himself. He must have changed his mind.

Mejokaka came to me during noon. Had a long chat with him.

২৪-১-১৯২০

Today I do not...suffering from ...headache ...but sleep would not...Neverthless played tennis all the more but no effect. I had a mind to go to cinema this evening but the severity of the headache prevented my going to it. However, I spent a major part of the evening in reading Shakespear's 'As You Like It.' This is perhaps the most lovely and romantic comedy the poet ever wrote. In vain should I try to fully appreciate the real poetry and wild beauty of the piece. It is brimful of lovingness.

Kalo,, came in the evening. He is accompanying Mihir's uncle to Monghyr. So I have not to go. Kalo wanted to buy a cambric shirt. I took him to Jaharlal and Pannalal where he bought a cambric shirt of the same colour as my shirt. It cost him 5/8. Slept soon after prayer.

২৫-১-১৯২০

...from bed at about 8 o'...Kaka came soon...whom I had a long chat...about 10 o'clock. Read Shakespeare upto 11. Slept during noon. It seems to me that by and by all friends are forsaking me. Is it because I am unsociable or is it because I am not worthy to be anyone's friend ?

No letter from home although I expected one from father and one from wife. Today also I have a little headache. I cannot guess what it is due to.

Went to bioscope to see the Bishop's Emeralds. It is a very nice little piece. I liked it throughout. Virginia is really an excellent actress. Besides, Sheldon Lewis is without match. They made a very excellent combination. There are some things worth-seeing in the part of Sheldon.

২৬-১-১৯২০

অঞ্জলি দিলাম না,...আমার ভাগ্যে...

শেষ ফর্মার...correct করে রেখেছি—কাল pressএ দিয়ে আসবো। আজ সরস্বতী পুজোর জন্যে press বন্ধ।

কাল আবার একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি—রাণুর বিষয়। 'কার ছেলে' নাম দিয়ে সেটাকে কবিতায় লিখে ফেলেছি।

সমস্ত দুপুরটা Taming of the Shrew পড়লাম। চমৎকার জিনিস।

'পাষাণের মুখ' নামক কবিতাটির শেষভাগ এতদিন ছেঁড়া কাগজে লেখা ছিল। সেটাকে ভাল খাতায় লিখে রাখলুম।

২৭-১-১৯২০

...কলেজ ছুটি।...এবং মিহিরের কাকা...মুঙ্গের রওনা হয়ে গেছে।

বাবার চিঠি পেলুম—গুষ্টি সুদ্ধুর ইনফ্লুয়েঞ্জা—রাণুকেও ধরেছে। তার নাকি খুব মাথাব্যথা আর জ্বর। খতু এবং মনুকেও ধরেছে। বাবাকেও ধরব ধরব করছে। আমি আজ রাণু আর বাবা দুজনকেই চিঠি লিখে দিলুম।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় শুয়ে পড়েছি এমন সময় এক telegram এসে হাজির। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে খুলে দেখি—

Parul safely delivered boy.

Father

গুরুদেবকে শত শত ধন্যবাদ। রাণু যে নির্বিঘ্নে খালাস হয়েছে এজন্য তাঁকে কোটি কোটি প্রণাম। কত কথাই মনে হচ্ছে। রাণুকে এসময় একবার দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। আহা বেচারী রাণু আমার কত কষ্টই পাচ্ছে। তার এ ঋণ কি কখনো শোধ করতে পারবো?

২৮-১-১৯২০

Yesterday has,..most moment...life. I have got...a boy. A great...has come over me. Is this how people feel when they have their first child? I do not know, but I am brimful of happiness. Whenever I recall that at my home I have a tiny little thing who is my own, my very own, I am simply lost in a great surge of joy Who knows how my dear little Ranu feels about it. It is so funny to imagine her as a little mother. Indeed, I wonder how a mere child like her would play the all-important part of

a mother.

Wrote to Ranu and father. Pando says I ought to go home to see my first born.

২৯-১-১৯২০

...কবিতা পড়তে পড়তে সেখানে...কথার সন্ধান পেয়েছি...truth, truth beauty : that is all...on earth ordered to know. ঈশ্বর মানি না, সমাজ আমাকে মুগ্ধ করতে পারে না—আমার একমাত্র ধর্ম সৌন্দর্য। এর চেয়ে বড় ধর্ম আমি যেন কখনো অভিলাষ না করি।

'ললাটিকা' বলে একটা কবিতা ধরেছি—কিন্তু সেটা execute করবার প্রেরণা পাচ্ছি না। মনের ভাবগুলো এক এক সময় সাকার মূর্তি ধারণ করতে এতই নারাজ হয়ে পড়ে যে তাদের সাধ্যসাধনা করেও মন পাওয়া যায় না।

আজ বিকেলে মেজদাদা দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প হল। যাবার সময় তিনি আমার 'যৌবনস্মৃতি'র author's copy নিয়ে গেলেন।

হোস্টেলের একটি নিতান্ত পরিচিত ছাত্র সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জানতে পেরে মন বড় খারাপ হয়ে গেল। বাস্তবিক, যৌবনটা কি ভয়ানক প্রলোভন-সঙ্কুল।

বিপিনের অসুখ হয়েছে।

৩০-১-১৯২০

আজ সন্ধ্যাবেলা...একটু বসন্তের ইঙ্গিত...মধ্যে যিনি এতকাল...শিউরে জেগে উঠচে...আজ তোমাকে কি...করবো।

৩১-১-১৯২০

...যখন ঘুম থেকে...তখন একটু মাথা ধরে আছে।...কেমন ভাল ঠেকছে না। জ্বর...হবে নাকি? বাবাকে এবং রাণুকে চিঠি লিখলুম।

হাতে টাকা নেই তাই মলাটের কাগজ কিনে দিতে পারছি না। চৈতন্যকাকা সেই যে কাগজ এনে দেব বলে উধাও হয়েছেন তাঁর আর দেখা নাই। আচ্ছা লোক!

দুপুরবেলা ঘুমলুম। তারপরই Y.M.C.A. Sports দেখতে Marcus Sq.এ গেলুম। মাথা সাংঘাতিক ধরে আছে; মনে হচ্ছে এখনই ফেটে যাবে। কি করি যে বুঝতে পারছি না।

আজও দক্ষিণা বাতাস দিচ্ছে—কিন্তু এই মাথাধরার উপর সেটা মোটেই উপভোগ করতে পারছি না। বাড়ি যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কালু আজ মিহিরের মামাকে নিয়ে মুঙ্গের গেল। আমার হ্যাট আর কলার নিয়ে গেল।

মনটা বড় খারাপ।

১-২-১৯২০

আজকের সারাদিন
হেসে খেলে বৃথা চলে গেল
মনের উষর ক্ষেত্রে

বীজ নাই, পড়ে আছে fallow.
শুধু কি বৃথাই গেল চলে ?
এই হাসি এই খেলা অলসতা সারাবেলা
এরা কি গেল না কিছু বলে ?
হাঁ, তারা বলেছে বটে—'আজিকে মনের পটে
মাখাইয়া দিনু যে শূন্যতা।
তাহারি অন্তর মাঝে, অলখে লুকায়ে আছে
দীপ্তিময় আলোকের কথা।'
তাই যদি সত্য হয়, হোক !
অলস দিবার তরে আর বৃথা করিব না শোক !

কাল রাত্রে একটা বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি। একটা দুষ্ট আত্মা যেন আমার মৃত ছোট কাকার মূর্তি ধারণ করে আমাকে অনেক রকমে প্রলুব্ধ করছে এবং ভয় দেখাচ্ছে। আমি তার কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। শেষে যেন কে একজন এসে আমাকে বল্লে, 'ঐ নালাটার ওপারে চলে যাও তাহলে ও কিছু করতে পারবে না।' আমি তাই করতে সে যেন নিষ্ফল হয়ে ফিরে গেল।

২-২-১৯২০

...গেল, বইগুলো ছুঁড়ে ফেল...ভাল ছাইপাঁশ পড়া।...দুদিন কোন চিঠি নেই।...এরা ! দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। আমিও কাল থেকে আর চিঠি দিচ্ছি না—তখন মজা টের পাবেন।

আমি এবং তালুকদার বোধহয় Law College-এর হয়ে Duke Challenge Cup-এ নাবছি। জেতবার আশা কিছুই নেই।আগে জানলে ভাল করে practice করা যেত।

বিকেলে Picture Palace-এ Mr. Wu দেখতে গেলুম। মন্দ নয়। অবমানিত কন্যার প্রতিহিংসাপরায়ণ চীনে পিতার ভূমিকায় খ্যাতনামা actor Matheson Lang চমৎকার অভিনয় করলেন।

আজ 'বসন্তের প্রথম বাতাস' বলে একটা কবিতা লিখলুম। অজিত বলতে চায় সেটা আগাগোড়াই চুরি। আমি দেখছি ক্রমশ একটা পুরাদস্তুর চোর হয়ে উঠলাম। কি করা যায় ! ঘোড়ার ডিম।

৩-২-১৯২০

আজ Tutorial class.

সকাল সকাল college গেলুম...পেয়েছি।

আজও টাকা এসে পৌঁছল না। হাতে টাকা না থাকা যে কি মুশকিল তা ত আর তাঁরা বোঝেন না।

বাড়ির চিঠি নেই। Deben এক congratulatory letter লিখেছে। তার জবাব দিলুম।

বিকেলবেলা দু সেট tennis খেললুম—তালুকদার এবং আমি partner. দুবারই জিতলুম।

সন্ধ্যাবেলা বাবার চিঠি পেলুম। তিনি অনেক কথা লিখেছেন। মানু ভাইপোর নাম রেখেছে

দিব্যেন্দু—ডাকনাম বেণু। ছেলে নাকি ফর্সা হয়েছে কিন্তু size অত্যন্ত ছোট। নাতির জন্ম উপলক্ষে বাবা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ২॥ মণ সন্দেশ বিতরণ করেছেন। আমাকেও ১০/১৫ টাকা পাঠাবেন লিখেছেন।

'ললাটিকা'র কয়েকটা stanza লিখলাম।

আজ Don Juan শেষ হল।

৪-২-১৯২০

...বৃষ্টি হয়েছিল তাই ground ...দিন এইরকম মেঘলা করে...বোধহয় আজ tennis comptn. খেলা হবে না।

সাহেব বল্লেন দুপুরে রোদ হয়ে যদি জমি শুকিয়ে যায় তাহলে খেলা হবে।

আমার এই প্রথম competition খেলা। কেমন একটা nervousness feel করছি।

আজ টাকা পেয়েছি—৫০৲। তাছাড়া পানু ৫৲ পাঠিয়েছে। কাল বন্ধুদের feast দেব ঠিক করেছি। সবসুদ্ধ সাত জন হবে। অরুণ, অজিত, ভট্টা, K.G., সত্য আর পরেশ।

খেলা হল। আমরা জিতলাম 6-2, 6-1 এ। তাদের একজন player একেবারে novice. Asoke Mittra মন্দ খেলেনি। কিন্তু তার আগের form আর নেই। তালুকদার খুব ভাল খেলেছে।

কালকের feast-এর জন্যে রাবড়ির বায়না দিয়ে এলাম। মুর্গি কেনবার ভার অরুণ নিয়েছে। রাঁধবে ভট্টা।

৫-২-১৯২০

Feast হল। সবসুদ্ধ খরচ পড়ল প্রায় ১৫৲ টাকা। Bioscope দেখলাম—Sticking Bills. Featuring Crieghton Hale and Gladys Honlette. বেশ জিনিস।

দুপুরবেলা রাধাবাজার গেলুম। মলাটের কাগজ সন্তোষকাকার কাছ থেকে কিনে এনে pressএ দিলুম। বই বোধহয় next weekএ complete হয়ে যাবে।

মঙ্গলবার moot court আছে। আমাকে বলতে হবে। Respondentএর দিক থেকে।

৬-২-১৯২০

আজ বিজন brothersএর খেলা দেখলাম। খেলার বিশেষ কোন মাহাত্ম্য নেই, তবে দুজনেই খুব steady—এরাই এবার cup পাবে।

বাবা লিখেছেন Mihirএর সঙ্গে আলাপ করতে। বড় বাধ বাধ ঠেকছে। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আলাপ করা কেমন যেন দেখায়।

কালু আজ সন্ধ্যাবেলা এসেছিল—সে বলে তারা কাল মুঙ্গের রওনা হবে। কিন্তু না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

সোমবার আমাদের semifinal খেলা—Medicalএর সঙ্গে। বোধহয় জিততে পারব না। দেখা যাক কি হয়।

৭-২-১৯২০

একখানা Keats' Poetical Works কিনে এনেছি। পড়তে হবে।

বিকেলবেলা Medical-এর সঙ্গে খেলা হল। আমরা হেরে গেলুম—অবশ্য friendly match.

Pressএ গেলুম—কিছুই হয়নি। ব্যাটারা মহা পাজি। রাত্রে প্রায় ৭।৹ টার সময় মেজদা এলেন। তিনি আমাকে এক বোতল ঘি দিয়ে গেলেন। খুব ভাল ঘি।

English Literary meetingএ preside করলুম। Subject of debate ছিল :—In social reform there should be no compromise but a strict adherence to principle. Subject খুব debatable নয়—ভাল debate হল না।

Business Meetingএ Library & Common Room Committee form হল। তার member তিনজন—আমি, রাসবিহারী এবং শশধর। আমি তার Secretary.

৮-২-১৯২০

সকালবেলা বুড়া জমাদার ২টা ডিম এনে দিলে তাই খেলাম। তারপর কিঞ্চিৎ চা এবং টোস্ট।

বারটার সময় স্নানাহার এবং তারপর কিয়ৎকাল নিদ্রা। প্রায় ৪॥টার সময় আমি এবং অজিত বেরুলাম bioscope দেখতে।

সেখানে গিয়ে পরেশ এবং বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা। খুব আনন্দে সন্ধ্যাবেলাটা কেটে গেল।

Programme ছিল Charles Chaplinএর Dog's Life. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের সঙ্গে প্রায় আধঘণ্টা কাটল মন্দ নয়। হাসির তুফানের মধ্যে দিয়ে সময়টা হুহু করে বয়ে গেল।

আমার ছেলে হওয়ার খবরটা হোস্টেলে প্রচার হয়ে গেছে। লক্ষ্মিছাড়া বাসুটার কাজ। সে একটা loathful sneaking praying spy. এরকম স্বভাবের লোকগুলো আমার কাছে মনুষ্যত্বের নিম্নতম সোপান বলে মনে হয়। ধিক্।

৯-২-১৯২০

কলেজে গেলাম কিন্তু ক্লাস হল না ; প্রফেসর আসেননি। S. N. Dutt-র বেরিবেরি হয়েছে।

দুপুরবেলাটা ঘুমিয়ে কাটালুম। বেলা তিনটের সময় উঠে দেখি এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে—ground ভিজে। আজ tennis match হল না।

সন্ধ্যেবেলা সত্য, K. G. প্রভৃতির সঙ্গে গল্পগুজবে বেশ কেটে গেল।

রাত্রে prayerএর আগে পানু এবং নিরুকে চিঠি লিখলাম।

কাল রাত্রে একটা পর্যন্ত জেগে ছিলাম—আজও কিছু জাগ্‌বো। যে গল্পটা আরম্ভ করেছি সেটা শেষ করতে হবে।

আজ বৃষ্টির জন্যে বেশ একটু শীত পড়েছে।

১০-২-১৯২০

Did not go to college on account of rain. Lost one Hindu Law p.c. more, specially in the moot court.

Proceeding slowly with a short story newly begun. The title has not yet been chosen. This story is to show what friendship between two

young men ought to be. Kept up late at night to write the story. Gathered some information about Midnapore where a part of the story is laid. Bhatta furnished me with the information.

The devils of the press are still delaying the issue of my book. It won't come out before the end of this week.

১১-২-১৯২০

Played tennis with Medical & got licked. My partner Talukdar got awfully nervous so that they had almost a walk over. 6-2, 6-1.

আজ প্রায় পনেরো দিন পরে প্রথম রাণুর চিঠি পেলুম। মনের অবস্থাটা এখন প্রকাশ করে বলা শক্ত। চিঠির জবাব প্রায় ৪/৫ পাতা হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে বাবাকেও চিঠি লিখে দিলাম। ২০ টাকা বিশেষ দরকার। না হলে একেবারেই চলবে না। এখনো কলেজের মাইনে দেয়া হয়নি।

Conan Doyleএর Brigadiar Gerard পড়ছি—নেহাৎ শিশুপাঠ্য। কিন্তু বেশ লেখা। আমোদ পাওয়া যায়।

Keatsএর Endymion আরম্ভ করেছি।

১২-২-১৯২০

Bhabatoshdada" came in the morning to me & we went together to see Mihir & arrange matters with his uncle about the marriage. The uncle does not appear to be a very candid man & seems to have some design in view. He wants to go to Monghyr to see Manu. Mihir had gone out ; so we did not meet him.

The final tennis match was played this evening but could not be finished as it became already dark before the game to an end. Shimidsu (?) the Bengal champion referred the game. It would be played over tomorrow.

In the moot court I made a short speech but could not make the facts very clear as I was not thoroughly prepared.

Went to bed early. I am again suffering from constipation.

১৩-২-১৯২০

The final match was played this evening & the Medical won. I had hoped that the City would carry the field today but it seemed that the table had turned. G. Sarma played an exceptionally good game & they deserved to win.

Bhabatoshdada came in the evening & said that everything was settled concerning the marriage & that he had wired father to start at once by the Punjab Mail so that the Ashirbad might be done tomorrow. He will reach here at 5.45 A.M. by the Mail & most probably I will have to go & receive him at the station. I will have to rise early tomorrow morning. At 5 o'clock at least. So I am hurrying to bed.

Could not sleep. Read Datta দত্তা throughout the night upto 4.30 A.M.

১৪-২-১৯২০

মানুষের মনটা এমন একটা অনিশ্চিত জিনিস যে তার আগাটা দেখে শেষটা যে কি হবে কিছুতেই বলবার জো নেই। এই আজকের দিনটাই ধরা যাক না। সকালবেলা যখন দিনটা আরম্ভ হয়েছিল তখন কত উৎসাহই না ছিল। এই উৎসাহের জ্বালায় রাত্রি ৪॥টা পর্যন্ত জেগে ছিলুম। তারপর সকালবেলা ভবতোষদাদার বাড়ি গেলুম—বাবার বদলে ছোড়দা এসেছেন। সেখান থেকে নটার সময় ফিরে এলুম ; আবার এগারটার সময় গিয়ে সেখানেই খাওয়া-দাওয়া হল। তারপর আলিপুরে মেসোমশাইকে আশীর্বাদের খবর দিতে গেলুম : সেখান থেকে যখন হোস্টেলে ফিরলুম তখন প্রায় স-তিনটে। শরীরটা যেন ক্লান্তির ভারে ভেঙে পড়ছিল। ঘুমিয়ে পড়লুম—ঘুম থেকে যখন উঠলুম তখন সমস্ত হৃদয়টা একটা অবসাদে পূর্ণ হয়ে আছে। কোন কাজেই প্রবৃত্তি নেই। এই অবসাদের ভাবটা এতই বেশি যে আশীর্বাদ উপলক্ষে যাওয়া হল না—চুপ করে বসে রইলাম। কি জ্বালা এই নীরব অবসাদের—ঠিক তুষানলের মত দগ্ধ করে মারে। জীবনটা একটা অতি দুর্বহ দুরপনেয় বোঝার মত ঘাড়ের উপর চেপে বসে থাকে।

১৫-২-১৯২০

আজ রোববার—অতএব দেরি করে ঘুম থেকে ওঠবার অধিকার সকলকারি আছে। সকালবেলা খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে শীতটাও বেশ বেড়ে উঠেছিল। কাজেই এমন দিনে এহেন হতভাগ্য কে আছে যে সাড়ে আটটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠবে।

কাব্য লিখে, পড়ে এবং গল্প করে দিনটা একরকম কেটে গেল। এই দিনগুলো এক এক পাত্র মদের মত বেশ এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলেছি। কিন্তু পাত্র যখন শেষ হয়ে আসে তখন একটু তিক্ততার স্বাদ পাই যে।

Messএর বিরাট metting আজ হয়ে গেল। Mess Committee বদল হয়ে গেছে। এবার Talukdar এবং Amiya Bhatta mess committee···নলিনকে বিদূরিত করা হয়েছে···অজিত ভারি খুশি।

১৬-২-১৯২০

আজ থেকে আরম্ভ করে এমাসের ২৮শে পর্যন্ত মানুর বিয়ের হিড়িকে ডায়েরি লেখা ঘটে ওঠেনি। বাড়ি গিয়ে গোলমালে লেখা হবে না বলে ডায়েরি আমি বাড়ি নিয়ে যাইনি। যাহোক যতদূর মনে আসে এ কদিনের ডায়েরিটা স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করে দিই। একটু এদিক ওদিক হবে অবশ্যই। কিন্তু উপায় নেই। এ তারিখে কি যে করেছি স্মরণ নেই। তবে কাল বাড়ি যাওয়া স্থির করেছি। কালুও সঙ্গে থাকবে।

১৭-২-১৯২০

আজ সন্ধ্যার গাড়িতে বাড়ি রওনা হলুম। আমি এবং কালু। মানুর বিয়ের কবিতা দুপুরবেলা প্রেসে দাঁড়িয়ে ছাপিয়ে নিতে হল। যাবার সময় ভবতোষদাদা দানের বাসন ইত্যাদি সঙ্গে দিলেন।

১৮-২-১৯২০

বাড়ি পৌঁছলুম। আজ রাণু আঁতুড় থেকে বেরুল। তাকে দেখে যে মনের মধ্যে কি রকম

একটা ভাব হতে লাগল তা কি বলব। ভাষায় ঠিক বোঝান যায় না। অনেকটা যেন হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া।

রাণু বেশ পুরোদস্তুর মা হয়ে উঠেছেন। আগেকার সে সব বুলি আর নেই। ছেলে হলে মা'র কাছে ফেলে রেখে দেব, ছোঁবও না এসব কথা যেন একেবারে স্বপ্নবৎ উড়ে গেছে। বাস্তবিক কি আশ্চর্য এই নারীপ্রকৃতি। মাতৃত্বই যেন এর চরম বিকাশ—ঐটুকুর জন্যেই যেন তার সমস্ত নারীত্ব উন্মুখ হয়ে থাকে। কি সুন্দর তাদের এই মাতৃমূর্তি। এখন বুঝতে পারি কেন জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরেরা 'মাতৃমূর্তি'কেই তাঁদের নারীত্ব কল্পনার চরম পরিপূর্ণতা বলে মনে করেছেন।

আমার ছেলে দেখতে এত ছোট হয়েছে যে ভয়ে তার দিকে তাকাইনি। রং তার এখন খুব কাল ; পরে কি হবে জানি না।

১৯-২-১৯২০

আজকের বিশেষ ঘটনা কিছুই মনে পড়ছে না। তবে হৃদয় বিদারক এক সংবাদ এই যে রাণুর সঙ্গে শুতে পাচ্চি না। শাস্ত্রে নিষেধ। পচা শাস্ত্র।

২০-২-১৯২০

আজ Allahabad থেকে ছোটমামা, মাইজী, মাসিমা এবং ভীমের আগমন। আমি জামালপুর থেকে তাঁদের নিয়ে এলুম।

২১-২-১৯২০

বর এবং বরযাত্রী আজ সকালবেলা উপস্থিত হলেন। আমি, ছোটমামা এবং কালু জামালপুর পর্যন্ত গিয়ে তাঁদের নিয়ে এলুম। তাঁদের সঙ্গে ভবদাদা ছিলেন। আজ প্রথম মিহিরকে দেখলুম।

২২-২-১৯২০

মানুর বিবাহ।

২৩-২-১৯২০

মিহিরের সঙ্গে ভাব হল। বেশ স্বভাব তার।

সন্ধ্যাবেলা বরের পার্টি মানুকে নিয়ে চলে গেল। এত দিনের বোনটি আমাদের আজ বরের ঘর করতে গেল। গাড়িতে তাকে চুমু খাবার সময় আমার মত পাষণ্ডরও চোখে জল এসে পড়েছিল।

২৪-২-১৯২০

দিনটা নিতান্তই একটা অলসতা এবং নিভৃত কুজনের মধ্যে দিয়ে চলে গেল।

২৫-২-১৯২০

কলিকাতা যাত্রা। মিছামিছি বিদায়ের সময় সকলের সঙ্গে মনোমালিন্য। আমি যে একটা অকর্মণ্য এই কথাটাই সকলে যেন ঠারে ঠোরে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অথচ তার কোন প্রয়োজনই ছিল না। সে কথাটা আমিই সবচেয়ে বেশি জানি।

২৬-২-১৯২০

Reached Calcutta. The college has closed for four days upto Saturday on account of a victory in tug-of-war. I wonder what after all the Law College is leading to!

Brought my book of poems from the press. Made the necessary presentations. They have got to be sent to the different presses for review.

২৭-২-১৯২০

Visited Manu's father-in-law's. Manu is very home-sick & wants to run home. She is simply cooped-up in that cage like house. No help. Poor girl.

Vide Rabindranath's 'বধূ'।

২৮-২-১৯২০

Father coming down to make up the difference between the two parties. I met him at 35 Ratu Sarkar Lane, which is the lodging of Bhabatoshdada.

২৯-২-১৯২০

Manu's bowbhat.

১-৩-১৯২০

Attended S. N. Dutt's class.

On account of a small pox case in the family of Mihir, they are compelled to send away Manu. I went upto Howrah to see her off. She is simply running with joy at the prospect of going home.

২-৩-১৯২০

Reading Allan Quaterman by H. Rider Haggard. Excellent book. There is a rumour that the college is going to close on the 22nd of March. O that it would come true!

৩-৩-১৯২০

Finished Allan Quaterman. The story reminds me of a similar one written by Baroness Orezy. The book is named 'By the God's Beloved' !

৪-৩-১৯২০

Made a picnic trip to Botanic Gardens. Had very good time. We were altogether about fifty including Hostel & Playground. We had great fun there. Play, tiffin & lots of other things.

Came back & found mejokaka's post card waiting. He has highly praised my poem that I indirectly addressed to him. The poem is named পুষ্প প্রেমিক। I am so glad he likes it.

By way of instructing Manu & wife to the proper...of womanhood, I have put down certain injunctions in the shape of command...which I am going to send...I hope they will stick to...instructions they would...and to be ideal types of womanhood.

৫-৩-১৯২০

I have observed that my health keeps very fit when I rise early in the morning from bed. But usually I am a late riser & that is why everything is wrong with it. I have got a pain, muscular of course, all over my body. This must be due to yesterday's picnic expedition which was not without its exertions.

These days of mine are passing away barren of any sort of production. I do not know when anything is coming off.

Went to see "Daddy Long Leg" in the Picture Palace. Mary Pickford is an excellent actress. She plyed her part excellently. Only it appears to me that her love episode is something of a failure.

Ranu has shifted to her father's place for a few days. My last letter to her was addressed to our place. So, I do not know whether she is going to get...in time.

৬-৩-১৯২০

Bought two books today ; One Arnold's Essays on Critism, two The Castle Inn (a novel) by Stanly Wayman. The first named book I am going to study.

Herombo came in the evening & I made an appointment with him to see him tomorrow at 6 P.M. at his lodging.

Played a heavy game of basketball this evening &scored a great deal. Every short...a score. Strange facility...of my hand after such...break.

৭-৩-১৯২০

I have a presentiment that if I live in this present state of health &

atmosphere for sometime more, I will have pthysis. The decay which my health is undergoing leads inevitably to that goal. How can I help it ? I can't, that is clear, unless my parents arrange for a better living for me here. I wonder how matters would stand if I die of pthysis. Of course momentarily it would be big shock to my family. But eventually they would be glad to get rid of me, I know. For a worthless man is nowhere wanted. For myself, I will have the great satisfaction of getting rid of my own worthless good-for-nothing self. but when I feel that my Ranu would be left alone without me, I would rather live than die. O the little bundle of innocence & family & love ! It would be a pang indeed to have part with her !

৮-৩-১৯২০

I had all resolved on Saturday that we should not answer to the questions put by S. N. Dutt our professor. We kept our promise & he got very wild & marked us all absent. I think there is going to be trouble about the matter.

It seems Mihir came to me this evening when I was playing in the basketball court. Bepin had called me once to come up but not answering why & not seeing that Mihir has come (for I had no spects on) I simply overlooked the matter. When I came up it struck me by the description given by Bepin that the visitor might be Mihir. If that is so Mihir must be thinking that I am a stuck up fool. I have written to him pointing out & craving pardon for my mistake.

৯-৩-১৯২০

It is raining now & then and the weather is very foul. It rained cats & dogs in the morning at about eight o'colck & I had great difficulty in picking my way to the college.

In college, I heard that S. N. Dutt had complained against us to Sir Mukherjee" & that he is going to suspend us. Neverthless, we are going to hold out till the end. At any rate we are not going to make an unconditional apology to S. N. Dutt as he wants us to do.

Abala pishima has written to me that she has been very glad to receive my booklet. I have written to her if she could by some means bring my book under the critism of Souren Babu Doctor who I know is a very good art critic.

Mejokaka has also written that the book presented to Putul Didi has reached her but the one presented to him is missing.

১০-৩-১৯২০

S. N. Dutt marked five of us absent because we could not answer to his questions, so we had nothing else to do but come away from the class.

Mihir seems to have taken the other day's affair very seriously. I have written to him explaining everything and pointing out the mistake.

Maijee of Allahabad, it seems, has sustained some injury from a fall from a boat. I have written to Dadababu enquiring about the matter.

Itu came to me during noon & I had a long chat with him. I have had no occasion to cultivate his friendship but I am going to do it now.

My health is very bad. This body no good.

১১-৩-১৯২০

Today we had class from 8-45. S. N. Dutt asked whether we were going to answer his questions. We said we were not prepared.

He marked us absent & asked me when I should be expected to prepare my lessons. I reply [?] that it was my own concern. Thus we had exchanged very hot words as heartily as possible. Our college, I fear, is not going to close on the 22nd of March as it was expected. Sir Asutosh diaspproves of the college closing so early & he is lord of his creation.

My health is failing me awfully. I do not know what to do. Most probably I will succumb to some disease or other before many days are past. So much the better. At least, I shall have some thing new. A tough fight I want. Let it be with Death then !

১২-৩-১৯২০

Kept up to two o'clock at night & wrote a little piece of poem. I do not feel that the thing has been very successful. It seems very stiff & vague. [মালা]

১৩-৩-১৯২০

I do not know what the matter is with me but I could not sleep for a minute tonight. For sometime I vainly attempted to write a poem of which only the title could be produced. My head seemed to be on a furnace & the mind took a very black turn.

১৪-৩-১৯২০

Slept for sometime during noon. Then set out on a tour of return visits. Went to Itu first but on the way came accross Sureshmama of Allahabad.

Next went to Mejdada & saw him off home by the 5.55 train.

Feeling awfully tired I want to go bed early & have a whole night's sleep.

Most probably our college is going to close on the 22nd as I heard certain rumours in favour of it.

১৫-৩-১৯২০

It is strange that wife has not written to me for the last three or four

days. I wonder what is the matter with her, not ill surely.

The matter between Mihir & myself has been duly patched up. He has seen the cause of the mistake & has readily accepted my apologies like a gentleman that he is. I wish everyone has understood me in the same way as he has done on this occasion. The world is a very obstruce place & people seem to understand each others intentions so little that sometimes it is horrible to live down here.

S. N. Dutt has cooled down a good deal & marking us present again. He is a well-meaning man but his tongue is often very different.

১৬-৩-১৯২০

By the bye, I have been in possession of a rabbit these few days. Bepin bought the poor creature in order to dissect it. But I let him do it & kept it to myself.

Mihir came down this evening on account of a letter written to him by father relating that I was ill. However, I told him that I was quite all right. On account of his presence I could not attend the Bible class this evening.

'The Old Curiosity Shop' is a very pretty book intensely pathetic. As it proceeds towards the end it is more & more touching.

১৭-৩-১৯২০

Did not go to college. The Governor is expected to visit our college today.

During noon wrote a piece of short poem named বঞ্চনা though I think it is not worth much.

I have sent to Monoranjan, who is a member of the Mess Union Enquiry Committee, my opinion about the matter in the form of a memorandum.

I have written to father & Ranu whose letters I got yesterday. Apparently they are doing well. When I wrote the letter to wife I had a fit of melancholy on me, so that the letter has become somewhat morbid. I did not mean it to be so. But ah, how often we do what we never mean to do.

It seems that our college has closed till Tuesday in honour of the visit of the Governor. I do not know what I shall do with these useless holidays. I cannot go home & cannot read. God !

১৮-৩-১৯২০

Got up from bed rather early for a holiday.

Finished 'Old Curiosity Shop'. Splendid book. The finish is excellent.

It is strange I cannot yet begin my study in earnest. I do not know when I will do it.

Mejda came in the evening. We have arranged to go the theatre on Sunday. Mejda has promised to arrange for pass.

১৯-৩-১৯২০

Amulya came during evening. I do not know what this condescension is due to.

Surenkaka came at about quarter to seven ; quite unexpectedly. We talked till it was about eight o'clock when we took leave.

A rude shock came upon us when Mr. Kennedy announced after prayer that some old members will have to leave this hostel next session in order to make room for new members. I am thinking seriously about it, most probably I will have to leave. If I do not leave willingly most probably Mr. Kennedy will make me leave it by announcing my name on a list in which those who are being given the by-by will find their names. How to make an honourable and dignified retreat ?

২০-৩-১৯২০

I went to Mr. Kennedy this noon & told him that I want to vacate my room next session in favour of new members. Mr. Kennedy gladly accepted my resignation. I wonder what my position has been so long in the field of our hostel. Has it been so insignificant that my residence in this hostel should not for a moment be regarded as necessary evil. I wonder !

Paid all my dues to the press. It is altogether about 42 rupees & odd. Not much I should say.

I have got Rs. 40/- from home for further expenses.

২১-৩-১৯২০

Reading Mark Twain's 'Adventures of Tom Sawyer', only just began.

Got a letter from Panu in which he rebukes me for being silent and indifferent towards him. I am so sorry he takes me amiss. I am really fond of him & he is never wholly out of my mind. I have written him pointing out to him his childish imaginings.

Slept all through noon. It is a dull day this Sunday. No play, no work—all silent & thoughtless. Really very bad.

২২-৩-১৯২০

Today being the last day of this short holiday I went to see Mihir. When about to start I got wife's letter enclosing a letter that Mihir had written to her. It seems that Mihir & Manu are quarreling. This letter contains some of its fire & fury.

I had a long talk with Mihir in various subjects. Most probably Mihir cannot go to Monghyr during this vacation. The hitch concerning money is not yet smooths down & Suren Babu is objecting to his going. We have planned to write to father opening everything so that the breach might be closed up.

২৩-৩-১৯২০

It seems that my percentage of attendence in Roman Law is short by two lectures. I approached S. N. Dutt who told me to file an application to the Principal through him. I am going to do so tomorrow. Most probably there will be no difficulty in getting a non-collegiate.

Went to bioscope in the evening to see the Sign Invisible. It is good.

Attended Mrs. Kennedy's social. It is all such a funny & pleasant things. Enjoyed it thoroughly.

২৪-৩-১৯২০

At about eleven o'clock I started accompained by Satta for High Court in search of S. N. Dutt in order to have my application recommended by him. We caught hold of him in the Small Causes Court where after much hesitation he recommended it.

Mejda came in the evening for a short time & promised to come tomorrow.

Most probably I am going home on Sunday. It is not yet quite settled though.

২৫-৩-১৯২০

Went to see Bhabatoshdada in the morning. He too is going to Monghyr on some important business errand.

Submitted my application for non-collegiate in the noon. The B. A. examination Pass Course has begun from today. I paid my college fees upto May altogether 21 Rupees.

Mihir came in the evening at about 5.30 P.M. He stopped upto prayer time. We had a very jolly evening together. Ranu has written to me proposing a scheme to 'April fool' Mihir. I have betrayed her to him.

২৬-৩-১৯২০

সোমবারে বাড়ি যাওয়া ঠিক ছিল—স্থির করেছি রোববারে যাব।

২৭-৩-১৯২০

চৈতন্যকাকার দেখা নাই!

২৮-৩-১৯২০

'আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন'। চিরজন্মের মত হোস্টেল ছেড়ে চল্লুম—কষ্ট হচ্ছে। দুপুরবেলা ভয়ানক বৃষ্টি কিন্তু তা সত্ত্বেও গেলাম। মেজদা হাওড়া পর্যন্ত এলেন।

অমূল্যবাবুর সঙ্গে travel করলুম।

২৯-৩-১৯২০

বাড়ি উপস্থিত।
এবারো দেখছি শোবার ব্যবস্থা বিপরীত। একসঙ্গে শোয়া নিষেধ।

৩০-৩-১৯২০

বেণু এবার দেখছি বেশ বড় হয়েছে এবং অনেকটা ফরসা হয়েছে। শেষ বরাবর তার মার মতন দাঁড়াবে, দেখতে বেশ সুশ্রী হয়েছে।

৩১-৩-১৯২০

কাল থেকে পড়া আরম্ভ করব।

১-৪-১৯২০

খতু এলাহাবাদ থেকে আজ ফিরল।

২-৪-১৯২০

'সুন্দর' নামক একটা কবিতা আরম্ভ করা ছিল সেটা শেষ করলাম।

৩-৪-১৯২০

আজকাল রোজ ছ'টার আগে ঘুম থেকে উঠছি। কাল সকালবেলা দিরায় যাব ভাবছি

৪-৫-১৯২০

আজ দিরায় যাওয়া হল না—খতের কুঁড়েমির জন্যে। কাল যাব।
সমস্ত দিন পড়াশুনো কিছুই করলাম না। কারণ আজ রোববার।
এখানে ক্রমশ বেশ গরম পড়ছে বিশেষত দুপুরবেলা।

৫-৪-১৯২০

সকালবেলা দিরায় গেলুম। বেশ ফসল হয়েছে। এণ্ডি বা এরণ্ড এত সুন্দর হয়েছে যে তার একটা ১$\frac{১}{২}$ হাত দীর্ঘ গুচ্ছ নিয়ে এলুম।
রাত্রে মিহিরকে চিঠি লিখলুম।
এই দুই সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেরুইনি।

৬-৪-১৯২০

It appears to me that the best outlook of life is that from a humorous standpoint. Life has many sorrows and tribulations. A man who has to take all this seriously & with a perpetual sense of wrong being done to him, must have a very sad existence & had indeed. I would much rather look upon life as a pleasant farce in which every apparent sorrow is to be culminated in joy. Besides, I wish to look to the humourous side of life. It is awful funny how our hearts are burdened by every little thing that happens to come in our way.

গুঁড়িয়ে সে সব উড়িয়ে ফেলে দিক
দিগ্‌বিদিকে তোদের ঝোড়ো হাওয়া
বুঝেছি ভাই সুখের মধ্যে সুখ
মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া।

১২-৪-১৯২০

The most stubborn inertia has caught hold of me. An awful distsate for everything.

১৪-৪-১৯২০

কোনও অর্দ্ধরাতে
সহসা দেখিব জাগি নির্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো ; নিদ্রিতা প্রেয়সী
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু পড়িয়াছে খসি
গ্রন্থি শরমের, মৃদু সোহাগ চুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর ; দক্ষিণ অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ ; জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে !

—রবীন্দ্রনাথ

১৭-৪-১৯২০

মিহির আজ আসিল।

১৮-৪-১৯২০

বিত্ত ও চিত্তের মধ্যে বিষম লড়াই বাধিয়া গিয়াছে—এখন কে জেতে ?

২০-২২এপ্রিল ১৯২০

মানুষ এবং মানুষের মাঝখানে ভুল বোঝার পর্দাটা এমনই অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে সে

পর্দার দুই দিক থেকে দৃষ্টি বিনিময় একেবারেই অসম্ভব। অথচ সে ভুলটা এতই অনুচিত যে ভুল করবার সময় কোন উপায়ে কেউ যদি প্রকৃত সত্যটা জানতে পারে তাহলে নিজের অমার্জনীয় ভুলের অপরাধে সে বোধহয় লজ্জাতেই মরে যায়। আমার বন্ধু হয়ত আমার দুটো সনির্বন্ধ সাগ্রহ প্রশ্নের জবাব দিলেন না—আমি সেই অবহেলার গ্লানিতে জর্জরিত হয়ে তাঁর সম্বন্ধে কত অন্যায় কথা ভাবছি। অথচ ঠিক সেই সময়টিতেই হয়ত তিনি আমাকে প্রাণভরে ভালবাসছেন।

কেন এমন হয়? মুখের ওপর এসে মনের এ চাতুরী কেন? কোন কি উপায় নেই যার দ্বারা এই ব্যবধানটা টান মেরে ফেলে দেয়া যায়? মুখের দিকে চাইলেই সমস্ত প্রাণটা বুকে এসে লাগে? তা বোধহয় হয় না—কারণ আমাদের মনের মধ্যে যে জটিলতা আছে সেটা প্রকাশ করবার মত সূক্ষ্মতা আমাদের মুখে বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নেই। তাই মন যখন নিজের সমস্ত গৌরবে শরীরে ফুটতে চায় শরীর তখন নিজের দীনতা অক্ষমতার মাঝখানে বোকার মত হাঁ করে বসে থাকে—তার মুখে একটা কথাও ফোটে না।

এই কথাটা ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম—হঠাৎ পিছন থেকে চাকার ঘর্ঘরের সঙ্গে শব্দ এল—'এই—হট্ যাও সামনে সে।' পলকের মধ্যে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো। কী আমাকে অপমান করে গাড়োয়ান।—এইখানেই ভুলটা হয়ে গেল। অপমান করবার ইচ্ছা সে বেচারীর হয়ত একেবারেই ছিল না—সে শুধু পক্ষীরাজসমেত তার টমটমটির আগমন সম্বন্ধে পথিককে সতর্ক করে দিয়েছিল।

এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে ভুল কার? আমার চোখের না তার মুখের? প্রশ্নটা খুব সহজ ঠেকছে না—ভাবা যাক—...ভুলটা দেখা যাচ্ছে দু'জনকার। কারণ মুখের যতখানি প্রকাশ করবার ক্ষমতা সে হয়ত তা করেনি এবং চোখের দৃষ্টির যতখানি দেখা উচিত সে হয়ত তা দেখেনি। তাহলে এই বোঝা যায় যে মানুষ চিরদিন পরস্পরকে ভুল বুঝতেই থাকবে—যতদিন না তাদের মুখের এবং চোখের এই দৈন্য ঘোচে। ঘোচবার বিশেষ ভরসাও ত দেখি না।

কোন সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে লুকিয়ে আছ তুমি মানুষের পূর্ণ অখণ্ড মূর্তি! একবার বেরিয়ে এসে তোমার সূক্ষ্মতা, তোমার জটিলতা, তোমার স্বচ্ছতা দিয়ে মানুষের চোখ থেকে ভুলের মোহ ঘুচিয়ে দাও। আমরা ধন্য হই—নিভে যাক নরকাগ্নি রাশি!

২৬-২৭এপ্রিল ১৯২০

Mathew Arnold-এর Essay on Count Leo Tolstoy পড়লুম। তিনি Tolstoy-এর খুব প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে Anna Kerninae হচ্ছে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তার মধ্যে জীবনের সমালোচনা আছে—যাকে Criticism of life বলে। Art-এর পথ থেকে যদিবা তিনি কখনো ভ্রষ্ট হয়ে থাকেন সেও মার্জনীয় কারণ সেখানে তিনি সত্যকে রক্ষা করেছেন—Art-এর খাতিরে সত্যকে বলি দেননি।

Realistic Literature—বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য প্রথমে France-এ সৃষ্টি হয়। Gustave Flaubert প্রভৃতি মনীষী লেখক তার জন্মদাতা; কিন্তু এই বস্তুতন্ত্রতার ধুয়া প্রথম গ্রহণ করে Russia যে কিনা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাহিত্যের অনেক পিছনে পড়ে আছে। এবং শুধু যে গ্রহণ করলে তা নয় এই বস্তুতন্ত্রতাকে অনেক উর্ধ্বে নিয়ে গেল। ফরাসী বস্তুতন্ত্রতাতে ছিল নির্মম ন্যায়নিষ্ঠা; Tolstoy তাকে করুণা সহানুভূতি দিয়ে শোধন করে নিলেন। সেইখানেই তাঁর জয়।

বিগত যুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই একটা ধারণা খুব বেশি রকম ছিল যে, সত্যকে শুধু সত্য

বলেই নিতে হবে, তার ভাল-মন্দ বিচার করবার ভার সাহিত্যের ওপর নয়। সেইজন্যে সেই যুগস্রষ্টাদের লেখায় সহানুভূতি ছিল না। Tolstoy আবার নতুন করে সাহিত্যে এই সহানুভূতির অবতারণা করলেন। পুরনো আমলের সহানুভূতি থেকে Tolstoy-এর সহানুভূতির তফাৎ এই যে, পুরনো সহানুভূতি ছিল ব্যক্তিবিশেষ বা কর্মবিশেষের উপর, পরন্তু Tolstoy-এর সহানুভূতি সর্বব্যাপী। তার ইতরবিশেষ নেই। আমার বোধহয় সেই সর্বব্যাপী সহানুভূতি থেকেই আধুনিক Socialistic Literatue-এর সৃষ্টি।

৩০ এপ্রিল-১ মে ১৯২০

ক্ষণিকা যে সময়ের লেখা সে সময় কবি তাঁর সাধনার শীর্ষে উঠেছিলেন। তাঁর পূর্ণ যৌবনের সমস্ত শক্তি ক্ষণিকার lyric-এর ভেতর দিয়ে প্রকাশ হয়েছে। কবির শক্তি ও কাব্যকে পাশাপাশি রেখে দেখলে তাঁরই একটা কবিতা মনে পড়ে—

আমি নাবব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,
ঠেক্‌ল যখন তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিনিতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়!

কবির সে সময়কার শক্তি মহাকাব্য লেখার উপযুক্ত—সেইজন্য বোধহয় তিনি লেখনীও ধরিয়েছিলেন—এমন সময়ে কাহার কাঁকন কিঙ্কিনীতে ঠেকিয়া গেল। বোধহয় মানসসুন্দরীর। অমনি ঘনীভূত কল্পনা হাজার গীতে ফাটিয়া গেল। বৃহৎ দর্পণ চূর্ণ হইয়া পায়ের কাছে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু সেই বিখণ্ডিত দর্পণের প্রতি ক্ষুদ্র অংশে কবির চিত্ত প্রতিফলিত হইল।

ইহাই ক্ষণিকার প্রকৃত স্বরূপ। একটি প্রবল দাবাগ্নি নিজেকে লক্ষ ভগ্নাংশে বিভক্ত করিয়া বিশ্বময় দীপালী জ্বালিয়াছে।

২-৫-১৯২০

বেদুর বিয়ে হবে 14th May. মেজকাকার কাছ থেকে হুকুম এসেছে যে দুটো কবিতা লিখে দিতে হবে। দেখা যাক কি হয়।

৬-৫-১৯২০

বাগান ভরে গোলাপ কুঁড়ি
ফুটে আছে কুড়িয়ে নাও
'মে' মাসের এই মিঠে হাওয়ায়

বাসনা পাল উড়িয়ে দাও।

১৪-৫-১৯২০

বেদুর বিয়ে।

১৮-৫-১৯২০

Gather ye the rosebuds
while ye May.

২৮-২৯ মে ১৯২০

"In Night & in Morning"[৫৬]
(a literal translation from R. Tagore)

Yesterday, in the moonlit-night of Spring
in the gardengrove happily
The frothing sparkling wine of youth
I held to your mouth.
You, looking in my eyes
Slowly took the goblet from my hand
And smilingly put it to your moist
Bimba lips full of kisses.
Yesterday, in the moonlit-night of Spring
In sweet inebriation.
The veil on your face
I had snatched open,
I had perforce kept on my breast
Your lotus soft hand,
Your eyes were half closed with emotion
The lips had no words.
I releasing the bond
Had undone the wealth of your hair,
Your down looking face
I had pressed on my bosom.
All these caresses you bore, dear,
With a smile budding face.
Yesterday, in the moonlit-night of Spring
In the new ardour of union.

Today, in this fine breeze and calm down
By the lovely river.
At the end of ablution white robed
You are moving slowly
Taking a flower pot in your left hand
You are plucking flowers.
And from the far temple the music of dawn
Is coming through the flute.

Today, in this pure breeze and clam dawn.
  By the lovely river
O Goddess, between thy parted hair is written
  The new vermilion of dawn.
Around thy left wrist is the bracelet of conch
  A crescent moon.
In what sweet auguring form
  You have come in the morning.
At night you have come
  Like the dearly beloved
In the morning you come
  Smiling like a goddess.
I am standing reverently away with
  My head lowered down.

১-৬-১৯২০

অনেকদিন আগে একটা ইংরেজি কবিতাব একটুখানি ভগ্নাংশ পড়েছিলুম। কবির নাম মনে নেই। কবিতাটা এই :

When beauty and beauty meet
  All naked fair to fair,
The earth is crying sweet
  And scattering bright the air
Eddying dizzying closing round
  With soft and drunken laughter
Veiling all that may befall
  After—after—

কবিতাটা একটু sensuous বেশি, কিন্তু এর মধ্যে সৌন্দর্যের একটা ঘূর্ণী আছে যাতে মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে। Venus de Milo দেখে Byron যেমন অনুভূতির পরিপূর্ণতায় একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন এও ঠিক তাই।

৫-৬-১৯২০

যতদিন দেহে প্রাণ রহিবে
তুমি আমারি আমি তোমারি।

৯-৬-১৯২০

খুব জোরে 'প্রজাপতির নির্বন্ধের' মহলা চলছে। এই শনিবার প্লে করতে হবে। Cast এইরূপ :

অক্ষয়	—	চারুদা
রসিক	—	আমি
শ্রীশ	—	ননী
বিপিন	—	দেবেন

বনমালী	—	পানু
মৃত্যুঞ্জয়	—	নিরু
দারুক	—	সুরী
শৈল	—	খিরু
পুর	—	আচলা
নৃপ	—	নলিন
নীব	—	কান্তি
ভৃত্য	—	আলোক

১১-৬-১৯২০

বেহদ্দ গরম। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত শহর বাইকে চড়ে ঘুরে বেড়ান গেল। বাবা বললেন এই চাড় যদি পড়াশুনোয় থাকত!
বাস্তবিক!

১২-৬-১৯২০

Staged the performance of "প্রজাপতির নির্বন্ধ" by Tagore. I had to play the role of রসিক। I think the play was quite successful. But the Monghyr audience is very gross. They seem to have little appreciation for the fine humour of Rabindranath. Fools.

১৪-৬-১৯২০

আমারে কি করেছিস অয়ি কুহকিনী!

—রাজা ও রানী

১৫-৬-১৯২০

Invitation at Amulya Babu's.

১৮-৬-১৯২০

এরা কাঁদে কেন?
'মোহ আনে বিদায়ের বাণী'

১৯-৬১৯২০

Reached Calcutta after spending the long vacation at home. It has been a very pleasant time for me all the time I had been at home. Perhaps I have never enjoyed the company of my wife more than I have this time.

This will be a long term that I am going to stay away from home—almost four months. But sweet is pleasure after pain.

We have put up in a private lodging the address of which is [8] Simla Street.

২৩-৬-১৯২০

ইন্দুর্দ্বিলক্ষং কমুদস্য বন্ধুঃ।

রাণু।

আজ আমার বিয়ের দু'বৎসর পূর্ণ হল।

আজ আমি কোথায় আর রাণু কতদূরে!

আজ রাণু মা হয়েছেন। আর দু'বৎসর আগে ছোট্ট একটি বিয়ের কনে ছিলেন—ভাল করে মিনতি [?] হয়নি—দুষ্টুমি কাকে বলে জানতেন না। আর এখন তিনি বেণুর মা!

২৯-৬-১৯২০

Met Naren after a long time.

৩০-৬-১৯২০

Ajit jrrives from home.

১-৭-১৯২০

Changed quarters. Present address is 5 Badurbagan Street

৪-৭-১৯২০

College Foundation Day.

৫-৭-১৯২০

The preliminary exam is to begin today. I am not

appearing—nor is Mihir.

৭-৭-১৯২০

Finished a book by Bernard Shaw—Love Among Artists. It is a bright book, but rather immature for Shaw I should say.

৯-৭-১৯২০

Finished Mark Twain's book of travel—Innocent Abroad. Good.

১০-৭-১৯২০

Prof. J. N. Mitra has given place to Prof A. C. Dutt in his lectures on Real Property.

The change is for the better of course.

১১-৭-১৯২০

আমার ঘরে আমি, অজিত, নরেশ, পরেশ প্রভৃতি মিলিয়া একটি ক্ষুদ্র রামকৃষ্ণ উৎসব করিলাম।

১২-৭-১৯২০

'তোমাকে ভিতর থেকে পেয়েছি এবার বাইরে পেতে চাই'—এই নিয়ে 'ঘরে বাইরে'র সৃষ্টি। ঘর এবং বাহিরের সমস্যা এই গ্রন্থে খুবই জটিল হয়ে উঠেছে। সন্দীপ represent করছেন বাহির। এখন কথা হচ্ছে যে সন্দীপের চরিত্র শেষের দিকে কাল করে এনে গ্রন্থকার সমস্যাটিকে অনেক সহজ করে এনেছেন। কিন্তু সন্দীপ যদি সত্যই ভাল লোক হ'ত—তাহলে ঘর এবং বাহির, সন্দীপ এবং নিখিলের দ্বন্দ্ব কি আরও equal হত না? এবং সেই সঙ্গে কবি কি জগতের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী সমস্যার গূঢ় অন্তঃস্থলে গিয়ে পৌঁছতে পারতেন না? সন্দীপকে খেলো করে কবি যেন তাঁর গ্রন্থের সবচেয়ে বড় issueটাকে নিতান্ত সাধারণ করে ফেলেছেন।

১৩-৭-১৯২০

I have been reading a book by Hall Caine, The Manxman. I have seen the thing on screen. But I want to read it too. I hope it will prove worthy of the pen of the great master.

১৫-৭-১৯২০

Sometimes I have a tendency to fly away form the Law College. I

detest it. It is against the principle of my life. My very being revolts against it. But what can I do? I have no help. I have got to drag along in this fashion. I do not know for how long.

১৬-৭-১৯২০

Bhatta has charged me with the heavy task of speaking in his place in the debating club tomorrow. The subject is: Is it proper to give India a universal franchise? I have got to speak in the affirmative.

So little do I know about political matter that I am afraid I won't be worth much in the debate. Nevertheless I will do my best. Bhatta has furnished me with some points.

১৭-৭-১৯২০

Excessive pain in the back. Played heavily last night.

Went to excuse myself from the debate to Mr Kennedy. But he won't allow. I am not at all prepared.

Went to the meeting after all & delivered myself of the little I had to say. Not altogether bad I should think.

Wrote a long letter to wife.

১৮-৭-১৯২০

It is raining all the evening. Bad weather. Our rooms are fearfully damp & I believe the cold that I caught on my back was due to sleeping in the damp.

১৯-৭-১৯২০

It rained ceaselessly for six or seven hours during the early part of the morning. The streets of this quarter are waist deep in water. It is impossible to go to college.

Ajit and myself are gradually drifting apart. No help. Every man must have his own way. He has chosen his & I have chosen mine. Our ways are heading opposite. So part we must.

I have respect for old friends & old friendships. But a time comes when only the respect remains & the friendship flies. What is to be done then?

I am sure—it is not my hand that is tearing asunder the bond that has existed between Ajit & me.

২০-৭-১৯২০

Finished The Manxman. It is splendid. Pete & Philip ! Wonderful pathos.

২১-৭-১৯২০

I have bought a book by the name of Is India Civilized. It is written

by Jusice Woodroffe. I have started reading the book and finished the foreward. It is very well written & reveals the deep erudition of the author in matters that are strictly Hindu. The book is a protest against ignorant critics asserting that Indian civilization is barbarous.

২২-৭-১৯২০

K. G. has borrowed The Manxman from me.

২৩-৭-১৯২০

I have started writing a little love story naming it 'উড়ো মেঘ'[৩৭] or the passing cloud. The main point of the story is the courage of the girl to speak out her heart at the last moment when she was giong to be wedded to the wrong man.

২৪-৭-১৯২০

Tonight I spoke in the Bengalee Literary Society meeting although I had very little preparation.

I wrote a bitter letter to father tonight. It is about my trouble with Khatu.

Letter from Ranu.

২৫-৭-১৯২০

Finished the story I have been writing. But I do not know how it has turned out. ভবানী ভ্রূকুটিভঙ্গিং ভবোবেত্তি ন ভূধরঃ।

Went to see bioscope. Kanchana Badhu. Bad. The only improvement the Indian flims have apparently made is towards the arrangement of light. But the acting is hedious.

Kalo & Khatu have left for Kurulgachi this noon. They are expected to return soon.

A letter from Ranu. Feeling indisposed to reply.

২৬-৭-১৯২০

আজ দুপুরবেলা খুব ঘুমনো গেল।

বিকেলে হেরম্ব এল—তার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা হল। নতুন বিয়ে করেছে—বেচারা একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। অনেক কথাই বল্লে। তার বৌটি বেশ শিক্ষিতা—প্রায় সেকেণ্ড ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছে—দেখতে নেহাত মন্দ নয়—বয়স বছর বার-তের। খুব বাড়ন্ত।

আজ সকালে নরেন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল। সে আমার ঘর নিয়েছে।

আজ কোনও কাজ নেই ; কি করব ভেবে পাচ্ছি না। কাল পর্যন্ত বেশ ছিলুম—লেখা নিয়ে।

রাণুকে চিঠি লিখলুম কিন্তু পয়সার অভাবে পাঠানো হল না। ঘোর দৈন্য—কালু টাকাকড়ি নিয়ে সট্‌কান দিয়েছে।

২৭-৭-১৯২০

The last few letters from wife are short & absent minded. I wonder what is wrong with her.

Spent the noon in reading magazine in the Y.M.C.A. reading room.

The college is a botheration. I had half a mind to write to father today that I am sick of the Law College & that it is pure waste of time, energy & money to continue in it. But somehow I did not.

২৯-৭-১৯২০

Kalo & Khatu returned form Kurulgachi this evening.

I have begun another story naming it 'পূজার মন্ত্র'। But it is not making good progress. The subject is difficult & the characters are meant to be জটিল।

৩০-৭-১৯২০

K.G. returned The Manxman today. He says the book is excellent, superb. In this his opinion is the same as mine.

Drifting drifting drifting but where ? Is there any aim at the end of the blind march ?

৩১-৭-১৯২০

Presided over the English Literary meeting. The subject was well discussed & finally the affirmative side got the vote. The subject was: Should compulsory free primary education be at once granted to India.

১-৮-১৯২০

Mihir came about evening & tried to conciliate us to Khatu.

Severe headache.

The story I have started writing is making slow progress.

২-৮-১৯২০

The great Tilak[৫৮] is dead. He passed away yesterday at midnight reciting from Geeta : যদা যদা হি ধর্মস্য।

No play today. Went without shoes.

৪-৮-১৯২০

I am afraid I have lost my form of basketball for good. It is bad but

no help.

৬-৮-১৯২০

Heavy rain during the day. The whole town under waist deep water. Street impassable. The hostel inundated. The rain is not likely to subside before 24 hours.

৭-৮-১৯২০

Y.M.C.A. social. Played scenes from বাবু। Satta took ফটিক Biren ষষ্ঠী Myself তিনকড়িমামা, the play was highly appreciated.

৮-৮-১৯২০

Benu Babu's First Rice ceremoney comes off on the 2nd of Bhadra.

৯-৮-১৯২০

Finished a poem begun long ago.
ভালবাসা।
Tilak Memorial Day.

১০-৮-১৯২০

I am making up my mind to begin study. Most probably I will begin next week.

১১-৮-১৯২০

Cut my toe in a game of basketball. Mihir came in the evening. Another outbreak between Kalo & Khatu.
Supper was ready at 12 o'clock.
It is a pleasure to find that I am recovering my old form in basketball.

১২-৮-১৯২০

No letter from home.
Slept heavily at noon.
I think I have found my form in basketball. It is a treat to think of it. I had almost despaired of ever recovering it.

১৩-৮-১৯২০

Bought a set of baby's bottle for Benu. The thing costs altogether 8/6/-. I am going to send if home today antedating The First Rice of my dear boy.

Letter from dad & Ranu.

Played volleyball after a long time. Came to know...secrets about Kalo.

১৪-৮-১৯২০

Ought to have submitted the tutorial paper on Transfer of Property. But did not.

It is strange that Ranu is complaining of my silence while I am writing everyday. How is it ? Strange !

১৫-৮-১৯২০

Went to play volleyball with a team at MohonBagan, Defeated them completely.

Spent the night up to 10-30 p.m. at K. G.'s in playing cards.

By the bye, Naren Sen Gupta came to me in the morning & stopped during meals. We had a long chat in which Satta joined later on.

১৬-৮-১৯২০

'থোরি দরশনে আশা না মিটল
বাঢ়ল মদন জ্বালা !'

শুধু চিঠি ! আমি কতদূরে রাণু কতদূরে ! চিঠিগুলো প্রাণের অস্থিরতা আরও বাড়িয়ে দেয় ।

রাণু রাণু রাণু !

১৭-৮-১৯২০

রাণুর চিঠি । ভয়ানক অভিমানপূর্ণ । চিঠি দিতে দেরি হয়েছে বলে । অথচ আমি বেচারা কিছুই জানি না কেন দেরি হচ্ছে । রাণুকে চিঠি লিখলুম ।

বাবার চিঠি ।

১৮-৮-১৯২০

আজ বেণুর ভাত হবার কথা ছিল কিন্তু কারণবশত পেছিয়ে গেল । ১১ই ভাদ্র হবে শুনছি ।

'পূজার মন্ত্র' গল্পটা শেষ করলুম । শেষটা একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল কিন্তু আর ধৈর্য থাকছিল না । কি রকম হয়েছে কে জানে ! বোধহয় বড্ড বেশি ধর্মমূলক হয়ে গেছে । একজন ভাল সাহিত্যিক পেলে দেখাই ।

Arun at last ! অনেকদিন পরে অরুণের দেখা। সে অনেকক্ষণ এখানে ছিল। অন্য সকলে থাকার জন্যে তার সঙ্গে নিভৃত আলাপ হল না।

১৯-৮-১৯২০

Letter from Ranu. She is glad that my delay in writing to her was not wilful. I am so pleased I have at last been able to give her satisfaction. The fault was not at all mine. The delay must have been due to the forgetfulness of Kalo or Dukhua in posting the letter.

I have begun to study at last.

Heard a rumour that Bhatta's sister was dead. Very bad news indeed if it be true.

২০-৮-১৯২০

Raining from early morning.

চিঠি নেই। রাণু খতুকে এবং কালুকে লিখেছেন কিন্তু আমাকে লিখতে পারলেন না। কপাল !

আজ দুপুরবেলা প্রায় ঘণ্টা তিনেক পড়া গেল।

Hindu Law

দুপুরে ঘুমইনি।

The result of Preliminary & Final Law exam is out today. What about Anath ? K. G ?

Has Itu stood first in the Preliminary Law ?

২২-৮-১৯২০

আজ সকালে নানু কাকার বাড়ি যাবার জন্য আমরা সকলে মিহির সমেত যাত্রা করলুম। পথে কালু কোথায় সরে পড়লেন। তারপর তাঁর আর দেখা নেই। একঘণ্টা অপেক্ষা করে শেষে ফিরে আসা গেল। মিহির রেগে বাড়ি চলে গেল। কালু যখন বাড়ি ফিরল তখন জানা গেল যে সে Arya Mission থেকে Beadon Street carriage stand পর্যন্ত আমাদের সমানে খুঁজেছে। এদিকে আমরা তাঁকে খুঁজেছি Beadon Square-এর চারিদিকে—দাঁড়াল tragedy of errors.

২৩-৮-১৯২০

কালুর জ্বর— Influenza.

২৭-৮-১৯২০

বেণুর ভাত।

২৮-৮-১৯২০

Letter from Ranu intimating the completion of the First Rice

ceremony of boy Benu. It is reported that he looked splendid in ornaments.

Motilal has found a seat in a hostel. So he is going to leave us soon.

২৯-৮-১৯২০

Went to Bhowanipur. Dadababu & Chotomamima are down with dysentry. Others doing well.

I received a cold reception there from mesomosay. Most probably he thinks I am not worthy of getting more than one word from him. So be it ?

৩০-৮-১৯২০

Letter from Ranu complaining that my letters are very short, very dry & with no words of caress. Replied to her forthwith explaining the reason of my last letter being so.

৩১-৮-১৯২০

I have been elected captain of the Law College basketball team.

১-৯-১৯২০

Khatu left for home today. We are going to leave this house consequently. Kalo is going home too, to recover his health. I must find a seat for me somewhere or other. Hardinge Hostel has no seat, so it must be in a mess. Let us see.

২-৯-১৯২০

Left the house & took abode with Rajkissore. Enjoying the comradeship of Behary students in their home life.

৩-৯-১৯২০

The Behary society is a strange admixture of healthy& unhealthy sentiments. In some respects they are much above the level of Bengali living. But in others they seem to be worlds below.

৪-৯-১৯২০

Congress begins today.

Saw Lala Lajpat Rai's arrival at Calcutta yesterday in a grand procession.

৫-৯-১৯২০

Mother is most probably coming to Calcutta to see Dadababu. Ranu is also coming. They are expected on the 6th of Aswin.

৭-৯-১৯২০

Pando came & gave us the 'Kamala Stores' tickets. He is coming again on Monday.

৮-৯-১৯২০

Saw some pictures of the Indian gallery of Arts. Some pictures are very good specially one with the inscription 'only a word'.

৯-৯-১৯২০

Played cards upto late at night.

১০-৯-১৯২০

This year the basketball league has begun as usual with the only difference that some of us are playing from the Law College. The old Playground team is broken up. Bhatta and Monoranjan are still in the old team. Taluk, Naren and myself have come out. Our Law College is represented by the above three with Satta and K.G. to make up the five. We hope to annex the shield this year although the Playground stands a good chance of doing the same. Sanskrit College is also presenting a good team.

The play is in progress. It began on the 2nd of this month and is to be played to the end of it. A good many teams have entered the competition this year.

১১-৯-১৯২০

Went to see Billwamangal in Hindi. The play was on the whole good. There are some good actors & actresses in the Alfred Theatre Company. The play lasted for about three hours & was over by twelve o'clock.

১২-৯-১৯২০

Bought a novel by Ivan Turgeniev named Virgin Soil. The book is rather didactic. That is why it loses much of its charm. Otherwise it is

excellently executed. The characters are strong, clear & lifelike.

১৩-৯-১৯২০

Foodstuff very bad. No help. Be a Roman when you are in Rome, as the proverb goes.

১৫-৯-১৯২০

Mother is soon coming to Calcutta. It is not yet settled whether Ranu will accompany her.

৬-১০-১৯২০

Won the shield at last !

Today there was an exhibition game in which I did splendid work. Did almost all the scoring alone. The result was 33-10. This is quite satisfactory. I wonder what was the matter with my form the other day when we played the Sanskrit.

৭-১০-১৯২০

Went straight to Ashu Mukherjee with the shield & prayed for a holiday. Sir Mukherjee was very pleased & granted leave for two days.

I am starting for home tomorrow. Don't know if mother is coming along with me.

৮-১০-১৯২০

Started form Calcutta for home. Taluk and Harinee accompanied me to the station. Such good souls they are.

৯-১০-১৯২০

Home again !

১০-১০-১৯২০

Benu dear is a little bit of night bird. He woke up tonight at one o'clock & simply would not go to sleep. Had to despatch him to Maijee who also failed to bring him to reason. It was a good nights' job to make him go to sleep.

১১-১০-১৯২০

O night of nights ! Where shall we have another to match it !

মধুতে মিশাব মধু
পরাণ বঁধু !
—হরিণী

১৭-১০-১৯২০

A day of toil & worry. Spent the whole day upto one in the night in going & coming back from Gidhour.

২৫-১০-১৯২০

Wrote Bejoya greetings to Mihir, Sasanka & Satta.

২৬-১০-১৯২০

Mother returns from Calcutta.

২৭-১০-১৯২০

Lunar eclipse. Glorious sight.
Letter from Ajit.

৫-১১-১৯২০

Mother-in-law passed away. She has been suffering from pthysis since the death of my father-in-law. Peace be to her soul.

২১-১১-১৯২০

Shifted to a hotel—Presidency Hotel[৫৯] —66 Harrison Road. Khatu is with me. We occupy one room on the top floor. Charges 23/8.

২৪-১১-১৯২০

Health bad. Headache. No study.

২৮-১১-১৯২০

I sometime wonder whether life in itself is a pleasure or a torture. I am sure I cannot always decide.

৩০-১১-১৯২০

No money. Starving almost.

৪-১২-১৯২০

I have struck up a sort of close acquaintance with a man from Allahabad. Ganga—whose full name is H. M..Banerjee. He seems quite a good fellow at heart.

৭-১২-১৯২০

In a fit of desperation wrote to Sisir Publishing House if they were prepared to buy a novel from me.

৯-১২-১৯২০

Sisir Publishing House replied that they cannot undertake to publish my book unless they inspect it. I am going to send them one of my writings.

১০-১২-১৯২০

Started copying the Mss. of my novel named প্রেমের প্রতিকার। I gave it a different name this time : প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত।[৪০]

২০-১২-১৯২০

Life is but an empty dream.
I am a believer in this line, as apart from the preceeding.

২২-১২-১৯২০

College closes today. But I do not intend to go home during this short vacation, although I very much want to see my Ranu & Benu Babu. I am not at all prepared for the examination. Under these circumstances, I am ashamed to go home, as people will talk a good deal of nonsense if I go.

২৪-১২-১৯২০

Christmas Eve !

২৫-১২-১৯২০

Went to Howrah expecting father to come. But he did not turn up.

২৬-১২-১৯২০

Father reaches Calcutta, stopped with him for the whole day upto eight in the evening.

২৭/২৮-১২-১৯২০

Before the final curtain falls to this finishing year, I wish to review the past twelve months & see what I have done. As I turn the earlier pages I come across a sort of mental forecast in which I believe that this will be a remarkable year for me. Now has it been really so ? I believe it has in some respects. Firstly, I have been a father. This itself might be too negligible but for the great revolutions it has brought in many spheres of my life. Then I had to leave the Y. M. C. A. Hostel in...a good seat has all been due to it. In three months I had changed places thrice: from 8 Simla Street to 5 Badurbagan & from there to 105 Harrison Road.[৪১] Next, up till now I had never shirked an examination which I have done now. Considering the above I believe that whatever else it may be, this year has in many ways moulded my future, for good or for evil. Lastly, with the failing breath of the year, it is warning me of the next that is coming fast. I wonder what treasures are in store for me in that year.

Would I could sleep such a sleep as to have defied every thing.

৩১-১২-১৯২০

Ring out the old
Ring in the new.

I wish I could ring out many things of my life.

পরিচয়

১। রাসবিহারী দাস—পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্র বিভাগের প্রধান অধ্যাপক।

২। ক্যাম্প ট্রেনিং—১৯১৭ - ১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় Calcutta University Corps-এ যোগ দিয়ে শরদিন্দুবাবু মিলিটারি শিক্ষা গ্রহণ করেন।

৩। খতু—ছোট ভাই, অমরেন্দু।

৪। বিজু—বর্তমান গ্লোব সিনেমা।

৫। মিঃ কেনেডি—কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীটের ওয়াই· এম সি· এ· হস্টেলের ওয়ার্ডেন।

৬। গল্পের প্লট—গল্পটির নাম 'বিজ্ঞাপন-বিভ্রাট'। (দ্রঃ শরদিন্দু অম্‌নিবাস, একাদশ খণ্ড, পৃঃ ২১৫-২১)

৭। নরেন—নরেন্দ্রনাথ সেন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত, একসময় বলরাম মন্দিরে কিছুদিন ছিলেন।

৮। I. D. F.—Indian Defence Force.

৯। অবলা পিসিমা—পাড়ার সম্পর্কে পিসিমা।

১০। কিলু—খড়তুতো বোন কমলা। স্বামী সতীশ মুখোপাধ্যায়।

১১। মেসোমশায়—মনমোহনবাবু, হাজরা রোডে থাকতেন।

১২। নেনা—খুড়তুতো ভাই। কমলার ভাই।

১৩। শ্যামলবাবু—শ্যামলদাস চক্রবর্তী, স্ত্রীব পিতামহ।

১৪। দাদো—সবর্ণী মুখোপাধ্যায়, প্রতিবেশী।

১৫। মাইজী—ঠাকুরমা।

১৬। বেলুনবাজার—মুঙ্গের শহরের একটি পাড়া, পারুল দেবীর বাড়ি ঐ পাড়ায়।

১৭। অনাথ—অনাথ হালদার, প্রতিবেশী ও বাল্যবন্ধু। পরে উকিল।

১৮। পূর্ণবাবু—মুঙ্গের জেলা স্কুলের শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। আসলে তিনি ছিলেন ড্রিল মাস্টার, কিন্তু অল্প কয়েকজন বাঙালী ছাত্রদের বাংলাও পড়াতেন। পূর্ণবাবুর উৎসাহেই শরদিন্দুবাবুর সাহিত্য রচনার হাতেখড়ি হয়। প্রথমে একটি কবিতা লেখেন, তখন তাঁর বয়স চোদ্দ বছর। কবিতার পরে গল্পলেখাব নেশায় তিনি মেতে ওঠেন। সাহিত্য-রচনা প্রসঙ্গে পূর্ণবাবুর কাছে ঋণের কথা শরদিন্দুবাবু সবসময়েই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন (দ্রঃ মন-কণিকা, ২৭-১২-১৯৫০, ২৯-১২-১৯৫০)।

১৯। ছোড়দি—ছোট মাসিমা, স্বামী ভবনাথ মুখোপাধ্যায়। ধামুয়া ও মুঙ্গেরে থাকতেন।

২০। অবিনাশবাবু—বাড়ির ডাক্তার, প্রতিবেশী।

২১। বিবাহ—১৩২৫ সালের ১৪ আষাঢ় শুক্রবার বিবাহ হয়। শরদিন্দু অম্‌নিবাস দ্বিতীয় খণ্ডে 'জীবনকথা' অংশে শরদিন্দুবাবুর মুখে শোনা কথার ভিত্তিতে লেখা ইংরাজি তারিখটি ভুলক্রমে ২৯ জুন উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রে দেখা যায় পাত্রীর পিতার নামের কোন উল্লেখ নেই। পত্রটি এইরূপ :

প্রজাপতয়ে নমঃ

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু··· ··· ···

সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়, আগামী ১৪ই আষাঢ় শুক্রবার আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শরদিন্দুভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায় বাবাজীবনের শুভ বিবাহ মুঙ্গের সহরস্থিত বেলুনবাজার নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু শ্যামলদাস চক্রবর্তী মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী পারুলবালা দেবীর সহিত হইবে। তদুপলক্ষে মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে উপস্থিত থাকিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করাইলে কৃতার্থ হইব। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ; ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

গাত্রহরিদ্রা — ১২ই আষাঢ় বুধবার।
বরানুগমন — ১৪ই আষাঢ় শুক্রবার।
বৌভাত — ১৬ই আষাঢ় রবিবার।

মুঙ্গের
১ লা আষাঢ়, ১৩২৫

নিবেদক—
শ্রীতারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২২। চৈতন্যকাকা—পারিবারিক বন্ধু।

২৩। রামুকাকা—চৈতন্যকাকার ছোটভাই। মুঙ্গেরের বাইরে সব জমি-জায়গা দেখাশোনা করতেন। কর্মচারী হলেও বাড়ির লোকের মত ছিলেন।

২৪। তালুকদার—কামিনী তালুকদার।

২৫। নিরুপমচন্দ্র রায়, বাল্যবন্ধু, পরে ডাক্তার। পিতা 'কতকাল পরে বল ভারত রে'—দেশাত্মবোধক কবিতাখ্যাত গোবিন্দচন্দ্র রায়।

২৬। মানু—ছোট বোন, কল্যাণী।

২৭। লীলা—খড়তুতো বোন, স্বামী শঙ্করীতোষ ঘটক।

২৮। D. J. College—Diamond Jubilee College.

২৯। যৌবনস্মৃতি—প্রথম প্রকাশিত বই, কাব্যগ্রন্থ। শরদিন্দু অম্‌নিবাস একাদশ খণ্ডে যুক্ত।

৩০। অজিত—অজিতকুমার সেন, কলেজ জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পরে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী—স্পেশাল ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশন কালেক্টর, দামোদর ভ্যালী প্রোজেক্ট।

৩১। কালু—পাড়ার গাঙ্গুলী বাড়ির ছেলে।

৩২। মিহির—মিহির মুখোপাধ্যায়, মানুর স্বামী। উকিল, পাটনা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন।

৩৩। S. N. Dutt—সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্যারিস্টার। স্মল কজেস কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন।

৩৪। ভবতোষদাদা—ভবতোষ ঘটক, ব্যবসায়ী। নিকট আত্মীয়, লীলার খুড়শ্বশুর।

৩৫। Sir Mukherjee—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

৩৬। In Night And In Morning—রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'রাত্রে ও প্রভাতে' শীর্ষক কবিতা।

৩৭। উড়ো মেঘ—'বসুমতী'তে (আষাঢ় ১৩৩৭) প্রকাশিত। (দ্রঃ শরদিন্দু অম্‌নিবাস একাদশ খণ্ড, পৃঃ ২২২-২৩)

৩৮। Tilak—লোকমান্য বাল গঙ্গাধর টিলক। ১লা আগস্ট ১৯২০ রবিবার রাত্রি ১২টা ৪০ মিনিট সময়ে টিলক পরলোকগমন করেন।

৩৯। Presidency Hotel—প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং হাউস, ৬৬ হ্যারিসন রোড (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড)।

এই আস্তানাটিকে লেখক বরাবর 'মেস' বলে উল্লেখ করতেন, এবং তাঁর মুখে শোনা কথার ভিত্তিতে এই বাড়ির ঠিকানা শরদিন্দু অম্‌নিবাস দ্বিতীয় খণ্ডে 'জীবনকথা' অংশে ভুলক্রমে ৯৩ হ্যারিসন রোড লেখা হয়েছে।

৪০। প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত—পরে এই উপন্যাসটির নাম বদল করে রাখা হয় 'দাদার কীর্তি'।

লেখকের জীবিতকালে এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। মারাঠী মাসিক পত্রিকা 'পুরুষার্থ'-এ (আত্মকথা সংখ্যা, ১৯৫৬) একটি প্রবন্ধে তিনি এই উপন্যাসটির কথা উল্লেখ করেছেন। 'দাদার কীর্তি' প্রথমে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৩৮৩ সাল) এবং পরে গ্রন্থাকারে সালে প্রকাশিত হয়।

৪১। **105 Harrison Road**—ঠিকানাটি ভুল। ইতিপূর্বে ২১ নভেম্বর তারিখে সঠিক ঠিকানা ৬৬ হ্যারিসন রোড লেখা আছে।

মন-কণিকা

১৫-৮-১৯৪৮

আজ আমাদের স্বাধীনতার এক বৎসর পূর্ণ হইল। আমরা কারাগার হইতে বাহির হইয়াছি বটে, কিন্তু কারাগারের চারিদিকে মরুভূমি। এই মরুভূমি পার হইতে হইবে। কেহ সাহায্য করিবার নাই, কেহ পথ দেখাইবার নাই। নিজের চেষ্টাতেই পার হইতে হইবে।

মানুষের ভাগ্য আজ যে পথে চলিয়াছে সে পথে যোগিনীর ত্রিশূল উদ্যত হইয়া আছে। অথচ মানুষের পিছু ফিরিবারও উপায় নাই। আজ যে সংঘাত আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহা জাতিতে জাতিতে স্বার্থসংঘাতের দ্বন্দ্ব নয়—আজ দ্বন্দ্ব জীবনের আদর্শ লইয়া। মনুষ্য জাতি বাঁচিয়া থাকিয়া এ দ্বন্দ্বের সমাধান করিতে পারিবে কি ? সন্দেহ স্থল। ধনবাদ ও গণবাদের যুদ্ধে দুই পক্ষই মরিবে—যে জিতিবে সে বিজয় সৌভাগ্য ভোগ করিতে পারিবে না। আণবিক বোমা মানুষকে অণুতে পরিণত করিয়া ছাড়িবে। বানরের হাতে ক্ষুর পড়িয়াছে, আর কি রক্ষা আছে ?

স্বাধীন ভারত নিজেকে এই মহামন্বন্তর হইতে রক্ষা করিতে পারিবে কি ? যদি বা পারে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এখনও বহুদূর।

১৭-৮-১৯৪৮

জড়বাদ মানিয়া লইলে আর কোনও হাঙ্গামা থাকে না। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ। এই জড়বাদের দ্বারা যদি মানুষের মনের সকল সংশয়ের নিরসন হইত তাহা হইলে সে আত্মা পরকাল পুনর্জন্ম লইয়া বৃথা মাথা ঘামাইত না। মুশকিল হইয়াছে এই যে, বস্তু ছাড়া জগতে আর কিছু নাই, আত্মা ঐ জড়েরই একটা বিকার মাত্র তাহা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে পারা যায় না।

বিজ্ঞান জীববাদ বা ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস আলগা করিয়া দিয়াছে বটে কিন্তু জড়বাদ সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে পারে নাই। বিজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে জড় বাস্তবিক জড় নয়—শক্তি মাত্র ; আমরা আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের বিশেষ গঠনের নিমিত্ত তাহাকে জড় বলিয়া দেখি। শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এই যে মনই অনুভব করে—যাহা অনুভব করে তাহা অনুভূতি মাত্র ; অনুভূতির বাহিরে বস্তু কিছু আছে তাহার প্রমাণ নাই।

যদি মনই মূল হয় তবে এই মন যে একদিন মরিবে তাহার প্রমাণ কি ? আমরা যে মরিতে দেখি তাহা তো কেবল মনেরই অনুভব। এই অনুভূতি যদি কোনও দিন ঘুচিয়া যায় তবে জগৎ মরিবে—মন মরিবে কেন ?

১৮-৮-১৯৪৮

একটি অতি চমৎকার বই পড়িলাম—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী। আশ্চর্য এই যে বইখানি ৪৫ বৎসর আগে বাহির হইয়াছিল কিন্তু কেহ ইহার নাম জানে না। ইহাতে প্রমাণ হয় বিদ্যার প্রতি আমাদের অনুরাগ নাই, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা নাই। জাতি হিসাবে আমরা অতি অভাজন।

এই পুস্তকে বিদ্যানিধি মহাশয় অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে খৃ পূ ২৫০০ অব্দে পাঞ্জাবের উত্তরাঞ্চলে বেদ রচিত হইয়াছিল, তখনই জ্যোতিষের সূত্রপাত। খৃ পূ ১২০০ অব্দে বেদাঙ্গ জ্যোতিষে এই জ্যোতির্বিদ্যা দানা বাঁধে। বিদেশী পণ্ডিতেরা এ বিষয় লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করেন নাই, কারণ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রমাণ খণ্ডন করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। অথচ তাহা

স্বীকার করিয়া লইলে ভারতে আর্যোদয় সম্বন্ধে তাঁহাদের সব theoryই ভণ্ডুল হইয়া যায়। তাঁহাদের মতে খৃ পূ ১২০০ অব্দ নাগাদ আর্যরা ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। তাই বিদেশী পণ্ডিতেরা যেন বিদ্যানিধি মহাশয়ের বইখানা দেখিতেই পান নাই এমনি ভাবে চুপ করিয়া আছেন। আমাদের স্বভাব বিদেশী হৈ চৈ না করিলে আমরাও চুপ করিয়া থাকি। তাই ৪৫ বৎসরে বিদ্যানিধি মহাশয়ের অমূল্য গবেষণা কেহ লক্ষ্যই করিল না।

স্বাধীন ভারতেও বিদ্যানিধি মহাশয়ের কৃতি সমাদর পাইবে এমন লক্ষণ দেখিতেছি না। মনের দাসত্ব ঘুচিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

১৯-৮-১৯৪৮

কাল শানু[১] কলিকাতা গেল। 'বিষের ধোঁয়া'র চিত্র পরিচালনা করিবে।

'বিষের ধোঁয়া' আমার শ্রেষ্ঠ কাহিনী নয়। কিন্তু যে হৃদয়াবেগ নাটকের প্রধান উপজীব্য তাহা উহাতে আছে। তাই মনে হয় ছবিখানা হয়তো জনপ্রিয় হইতে পারে।

গত দশ বৎসর যাবৎ আমি বেশির ভাগই চিত্রনাট্য লিখিয়াছি। চিত্রনাট্য এবং মঞ্চনাট্য মূলত এক পর্যায়ের শিল্প, তাই যাহার নাটক সম্বন্ধে জ্ঞান আছে তাহার পক্ষে চিত্রনাট্য লেখা কঠিন নয়। ববং আঙ্গিক একবার আয়ত্ত করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত সহজ।

মঞ্চনাট্যের প্রধান অসুবিধা, স্থান পরিবর্তন দেখানোর সুযোগ নাই। তাই দৃষ্টি রাখিতে হয়, কেমন করিয়া একই স্থানে নাটকের অনেকগুলি ঘটনা দেখানো যায়। চিত্রনাট্যে সে অসুবিধা নাই। তাই চিত্রনাট্যের ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত।

অন্যদিকে নাটক মঞ্চস্থ করা সহজ, চিত্রনাট্যে চিত্রায়িত করা তত সহজ নয়। সবচেয়ে কঠিন কাজ পরিচালকের। এখানে পরিচালক নাট্যলেখকের তুল্য শক্তিমান না হইলে চিত্র চিত্তাকর্ষক হয় না। তাই নাট্যকার যদি স্বয়ং নিপুণ পরিচালক হন তবে চিত্র ভাল হইবার অধিক সম্ভাবনা।

২১-৮-১৯৪৮

পৃথিবীতে এক জাতীয় মানুষ আছে, যাহারা কাজ করিবার অদম্য স্পৃহা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। অন্য জাতীয় লোক, অর্থাৎ যাহারা নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে কাজ করে না, তাহারা এইসব কাজের লোককে দেখিয়া অবাক হইয়া যায়।

পৃথিবীতে কাজের লোক একান্ত প্রয়োজন, তাহারাই পৃথিবীটাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তাহারা যদি আজ হাত গুটাইয়া বসে, তবে মন্বন্তর অনিবার্য। তাই এইসব কর্মবীরদের সমুচিত শ্রদ্ধা না করিয়া উপায় নাই।

কিন্তু কাজের নেশায় মত্ত হইয়া থাকার একটা অসুবিধা আছে। যেখানে কাজের প্রেরণা বড় বেশি, সেখানে কাজটা অকাজ কি সুকাজ, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর থাকে না। বস্তুত কাজের লোকের জীবনে চিন্তা করিবার আবশ্যকতা ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যায়। একটা কাজ তাহার কর্মফল সৃষ্টি করে, তখন কর্মপরম্পরার আবর্তে পড়িয়া মানুষ প্রায় অবশে কর্ম করিয়া যায়।

তাই, যে মানুষ একবার কাজের যন্ত্রে পড়িয়া গিয়াছে, তাহার আর রক্ষা নাই,কাজের momentum তাহাকে শেষ পর্যন্ত চালাইতে থাকিবে।

যাহারা কাজে ফাঁকি দিয়া চিন্তা করিবার সময় করিয়া লইয়াছে, তাহারা অন্তত স্বাধীন।

২৩-৮-১৯৪৮

বর্ষা হইতে বর্ষ (অর্থাৎ বৎসর) শব্দের উৎপত্তি। এক বর্ষা হইতে অন্য বর্ষা পর্যন্তবর্ষ। বোধহয় বহু প্রাচীন কালে বৎসবারম্ভ এইরূপেই নিরূপিত হইত। প্রথম বৃষ্টি পড়া সকলেরই

চোখে পড়ে—কিন্তু শীত গ্রীষ্ম কখন আরম্ভ হইল তাহা বুঝিবার এমন স্পষ্ট চিহ্ন নাই। মানুষের ঋতুজ্ঞান আরও সূক্ষ্ম হইবার পর উত্তরায়ণ হইতে বা বিষুবন হইতে বর্ষারম্ভেব প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে।

২৭ নক্ষত্রের একটি নক্ষত্রের নাম আর্দ্রা। সূর্য যখন এই নক্ষত্রের নিকটবর্তী হইতেন তখন পৃথিবী আর্দ্র হইত অর্থাৎ বর্ষাকাল আরম্ভ হইত। অয়ন চলনের ফলে এখন বর্ষা অনেক আগেই আরম্ভ হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা যায় খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দ পূর্বে আর্দ্রায় বর্ষার সূত্রপাত হইত।

ভারতীয় জ্যোতিষজ্ঞান যে কত পুবাতন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিদ্যানিধি মহাশয় দেখাইয়াছেন আজ হইতে অন্তত আট হাজার বছর আগে ভারতীয় ঋষিরা জ্যোতিষচর্চা করিতেন।

২৪-৮-১৯৪৮

যাঁহারা বর্তমানকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা আশ্রয় করিয়া গল্পউপন্যাসাদি লেখেন, অকস্মাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলে তাঁহাদের বড় অসুবিধা হইয়াছে। পটভূমিকা এমন বদলাইয়া গিয়াছে যে, নূতন আসরে পুরাতনের পালা আর জমিতেছে না। এ যেন রঙ্গমঞ্চে দেওয়ানী খাসের পট পড়িয়াছে, কিন্তু অভিনয় হইতেছে—রাবণ-বধ।

লেখকের মন নূতন বাতাবরণের সঙ্গে আপস করিতে কিছু সময় লইবে। এখন অনতিপূর্বকালও ইতিহাসের পর্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে, তাই বর্তমান ও সদ্য-অতীতকে যে-লেখক ঐতিহাসিকের চক্ষু দিয়া দেখিতে পারিবেন, তাঁহার রচনাই সার্থক হইবার সম্ভাবনা।

ক্রান্তিকাল বা transition periodয়ে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ক্রান্তিকালের পূর্বে জন্মিয়াছিলেন। ১৯১৪ হইতে পৃথিবীতে যে মহা -ক্রান্তিকাল আরম্ভ হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইয়া আবার Settled times ফিরিয়া আসিতে এখনও অনেক দেরি। সুতরাং এখন মহা-প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব আশা করা যায় না।

২৫-৮-১৯৪৮

বিজ্ঞান বলে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ তাপমৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। জগতে যত কিছু জড়বস্তু ও জ্যোতিঃ (radiation) আছে, তাহার শেষ পরিণাম তাপ ; জড় জ্যোতিতে পরিণত হয়, জ্যোতির অন্তিম অবস্থা তাপ। যাহা একবার তাপে পরিণত হইয়াছে, তাহা আর উচ্চতর radiationয়ে বা জড়ে রূপান্তরিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন—'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'— তাহা চরমে সত্য নয়। একটা অবস্থা আছে যাহার পর আর প্রত্যাবর্তন নাই।

সুতরাং কথাটা দাঁড়াইল এই যে, শেষ পর্যন্ত জগতের যাহা কিছু সমস্তই তাপে পরিণত হইবে, আর কিছু থাকিবে না—জগতের গড়পড়তা তাপমাত্রা একটু বাড়িবে মাত্র।

কিন্তু জগতে যদি কোনও বস্তুই না থাকে, তবে কিসের তাপ বাড়িবে ? যেখানে কিছুই নাই, সেখানে তাপ বাড়িতেও পারে না, কমিতেও পারে না। অতএব তাপও আর থাকিবে না।

দর্শন বলে, যাহা নাই তাহার সৃষ্টি হইতে পারে না, যাহা আছে তাহার বিনাশ নাই। বিজ্ঞানের যুক্তি অনুযায়ী জগৎ যদি সম্পূর্ণরূপে 'নস্যাৎ' হইয়া যায়, তবে বলিতে হইবে জগৎ কোনওকালেই ছিল না।

শেষ পর্যন্ত সেই বেদান্ত।

২৬-৮-১৯৪৮

ইতিহাসে দেখা যায়, মোগল আমলে সম্রাট আকবরের সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদজ্ঞান প্রায় মুছিয়া গিয়াছিল। আকবর জিজিয়া কর তুলিয়া দিয়াছিলেন, ধর্মগত প্রভেদ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তিনি স্বীকার করেন নাই।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, আকবরের রাজত্বকালে মোগল রাজশক্তি যে প্রচণ্ড প্রতাপ অর্জন করিয়াছিল, আকবরের পূর্বে বা পরে তাহা করিতে পারে নাই। জৈব নিয়মে হিন্দুর প্রতি মোগলের অত্যাচার করার এই উপযুক্ত সময়, কিন্তু তাহারা অত্যাচার করে নাই।

ভেদবুদ্ধি আবার দেখা দিল ঔরঙ্গজেবের সময়ে। আবার জিজিয়া কর আসিল। মোগলশক্তি এ পর্যন্ত অটুট ছিল, একজন অপরিণামদর্শী রাজার সঙ্কীর্ণতার ফলে তাহার ভিত্তিমূলে ভাঙন ধরিল। অথবা মোগল রাজশক্তি ভিতরে ভিতরে জীর্ণ হইয়াছিল, তাই ভেদবুদ্ধি আপনি ফিরিয়া আসিল, ঔরঙ্গজেব উপলক্ষ্য মাত্র। মোট কথা, ইতিহাস বলে, যেখানে দুর্বলতা সেইখানেই ভেদবুদ্ধি এবং যেখানে ভেদবুদ্ধি সেইখানেই সর্বনাশ।

২৭-৮-১৯৪৮

মুরগীদের জীবনযাত্রা অনুধাবন করিলে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে সাম্যবোধ নাই। যেখানে দশটি মুরগী আছে, সেখানে উচ্চ-নীচ বোধ আছে ; একটি মুরগী অন্য একটিকে ঠুকরাইয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করে, দ্বিতীয়টি তৃতীয় মুরগীকে ঠোকরায়—এইভাবে ধারাবাহিক পরম্পরা নামিয়া আসে। মোরগদের তো কথাই নাই, এক দলে কখনও দুটি মোরগ থাকে না, যে সর্বাপেক্ষা বলবান, সে আর সকলকে মারিয়া তাড়াইয়া দেয়।

আমার পোষা মুরগীদের মধ্যে দুটি মুরগী আছে, তারা দুই বোন। প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাদের একটি অপরটির অধীন হওয়া উচিত, কিন্তু এই দুটি বোনের মধ্যে বড় ভাব। তাহারা কখনও ঝগড়া করে না, একসঙ্গে চরিয়া বেড়ায়, একসঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিয়া থাকে। দু'জনে একসঙ্গে ডিম পাড়িলে তাহারা পালাপালি করিয়া এ উহার ডিমে তা দেয়। সম্প্রতি তাহাদের একটিমাত্র বাচ্চা ফুটিয়াছে। আশ্চর্য ব্যাপার ! দু'জনে একটি বাচ্চা লইয়া সর্বদা একসঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়, বাচ্চার মাতৃত্ব লইয়া বিবাদ করে না।

পণ্ডিতেরা বলেন, পশুপাখিরা instinctয়ের উপর কাজ করে, তাহাদের বোধশক্তি নাই।

এ কি রকম instinct ?

Robinson Crusoeর লেখক Daniel Defoe ইংরেজ ছিলেন। ইংরেজ জাতিকে তিনি একটি চমৎকার পরিচয়-পত্র দিয়া গিয়াছেন—

These are heroes who despise the Dutch and rail at newcome foreigners so much: forgetting that themselves are all derived from the most scoundrel race that ever lived, a horrid crowd of rambling thieves and drones who ransacked kingdoms and depeopled towns; the Pict and painted Briton, treacherous Scot, by hunger theft and caprice hither brought Norwegian pirates, buccaneering Danes whose red-haired offspring everywhere remains; who joined with Norman French compound breed from whence your trueborn Englishmen proceed.

Defo র অন্তর্দৃষ্টি ছিল তাই নিজের জাতিকেও তিনি এত ভাল করিয়া চিনিয়াছিলেন। বস্তুত ইংরেজ জাতটা অতি ছোটলোক, কিন্তু মাঝে মাঝে দুই-একটি ভদ্রলোক তাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের জাত বাঁচাইয়া দেয়। Defoe এই ধরনের একটি ভদ্রলোক ছিলেন।

আজকাল ইংলণ্ডে কেহ ভদ্রলোক জন্মিলে সে আমেরিকায় গিয়া বাস করে—যেমন Isherwood, Aldous Huxley, Bertrand Russel.

৩০-৮-১৯৪৮

সংস্কৃত কাব্যে মাঝে মাঝে দুই একটি শ্লোক পাওয়া যায়, যাহাতে অজ্ঞাত বা অর্ধজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা লক্ষিত হয়। কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলায় লিখিয়াছেন—'রম্যাণি বীক্ষ্য—' ইত্যাদি। কোনও সুন্দর বস্তু দেখিলে বা মধুর শব্দ শুনিলে সুখী মানুষেরও মন উন্মনা হয়, বোধহয় পূর্বজন্মের প্রণয়ের কথা তাহার অবচেতন মনে জাগরুক হয়। কালিদাস এইভাবে এই উৎকণ্ঠার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অন্য উদাহরণও আছে—'যঃ কৌমারহরঃ—' এই শ্লোকটি একজন স্ত্রী-কবির রচনা। ইহাতে কবি বসন্তকালে প্রণয়বিহার উপলক্ষে বলিতেছেন—সবই তো আগের মতই আছে, সেই প্রিয়তম, সেই বসন্ত-রজনী, সেই মলয় মারুত,'সেই রেবার তীরে বেতসীর কুঞ্জ—তবু চিত্ত সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে।

এই স্ত্রী-কবি একটি কথা লিখিয়াছেন, যাহার তুল্য মধুর বাক্য পৃথিবীর রসসাহিত্যে দুর্লভ। কবি স্ত্রীলোক তাই তাঁহার এই উক্তি রসের গভীরতায় অনির্বচনীয়। নিজের পতির উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন—যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ—। অর্থাৎ যিনি আমার কৌমার্য হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার প্রিয়তম।

১-৯-১৯৪৮

আজ সেপ্টেম্বর মাসের আরম্ভ। এই মাসেই কোনও তারিখে মীরারানী মাতৃত্বপদে অধিরূঢ়া হইবেন। উৎকণ্ঠিতভাবে শুভসংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছি।

জীবনের কয়েকটি সন্ধিক্ষণ আছে, নাতি-নাতিনীর জন্মক্ষণ তাহার একটি। এই সময় জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হইয়া নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়, বার্ধক্য যেন জীবনের পৃষ্ঠার উপর জতুদ্রব ঢালিয়া তাহার উপর শিলমোহর ছাপিয়া দেয়, official বৃদ্ধত্ব আরম্ভ হয়।

আমি কিন্তু মনের মধ্যে বার্ধক্য অনুভব করিতেছি না। জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে বটে কিন্তু চমকপ্রদ উপন্যাস যতই শেষের দিকে যায় ততই হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিতে থাকে, আমার এই তথাকথিত বার্ধক্যও অনেকটা সেইরকম। গল্প যত শেষের দিকে যাইতেছে ততই জমাট বাঁধিতেছে। এখন ইহা বেশ একটি তৃপ্তিকর পরিসমাপ্তিতে উপনীত হইলেই আর কোনও খেদ থাকে না।

যৌবনও ভ্রান্তি, বার্ধক্যও তাই। আসল বস্তু—পরিপূর্ণতা। Shakespeare বলিয়াছেন—Ripeness is all.

৩-৯-১৯৪৮

অনেকদিন পরে আবার কালিদাসের শকুন্তলা পড়িলাম। মনে আছে, কলেজের পাঠ্য হিসাবে অনিচ্ছাভরে পড়িতে আরম্ভ করিয়া শকুন্তলায় তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। কুড়ি বছর বয়সে যে অপূর্ব রস পাইয়াছিলাম আজও তাহার স্বাদ মনে লাগিয়া আছে।

ত্রিশ বছর পরে আবার পড়িলাম—এতদিনে 'পাঠকের মৃত্যু' হওয়ার কথা, কুড়ি বছরের মানুষটি এখন আর নাই—কিন্তু দেখিলাম শকুন্তলার রস ফিকা হয় নাই, বরং আরও গাঢ় হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্ক পড়িয়া চোখ দিয়া জল বাহির হইল…

ইহাকেই বলে কাব্যের অমরত্ব। আমার যৌবনকালে যে-সব লেখকের রচনা ভাল লাগিত এখন আর তাহাদের ভাল লাগে না, অথচ শকুন্তলা আমার বয়সের পরিবর্তন তুচ্ছ করিয়া তেমনিই চিত্তবিজয়িনী হইয়া আছে। কালিদাস কেন অমর কবি তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি।

এবার আর একটা বস্তু নূতন করিয়া চোখে পড়িল, তাহা কালিদাসের হাস্যরস। বর্তমানকালেও উহা পরশুরামের রসিকতার মতই উপভোগ্য। আরও আশ্চর্য, কালিদাসের লেখায় আদিরসের ছড়াছড়ি, কিন্তু রসিকতায় কামগন্ধ নাই।

৫-৯-১৯৪৮

চিন্তা করিতে ভাল লাগে, মানুষের যদি অন্নচিন্তা না থাকিত তাহা হইলে সে কী করিত? মানুষ যদি হাত বাড়াইলেই অন্ন পাইত, প্রয়োজনীয় সকল বস্তু পাইত, তবে তাহার জীবনের প্রেরণা কী হইত? কোনও উচ্চতর বৃত্তি আসিয়া ঐহিক চিন্তার স্থান অধিকার করিত কি?

দেখা গিয়াছে, যে-সব মানুষের অন্নচিন্তা নাই তাহারাও চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। অবশ্য বেশির ভাগ অকর্মা বড় মানুষই ইন্দ্রিয়সেবা ও আত্মসুখের চিন্তায় মগ্ন থাকে, কিন্তু এমনও দেখা যায়, অন্নচিন্তাহীন মানুষ নিছক পরহিতব্রতে বা স্বার্থহীন কাজে নিযুক্ত আছে। মোটকথা মানুষ নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, যখন অন্নসংগ্রহের প্রয়োজন থাকে না তখনও ভাল হোক মন্দ হোক একটা কাজ লইয়া থাকে।

অর্থই কর্মের একমাত্র প্রেরণা একথা সত্য নয়। মানুষ নাকি power ভালবাসে, power-এর জন্য সব করিতে পারে। এ কথাও আংশিক সত্য। কালিদাস অর্থ বা power-এর জন্য কাব্য লেখেন নাই, অথচ তাঁহার কাব্য দেড় হাজার বছর ধরিয়া মানুষের চিত্তে সুধাবৃষ্টি করিতেছে। Watt যখন steam power আবিষ্কার করেন তখন ঐহিক লাভের চিন্তা তাঁহার মনে ছিল না।

সমাজবিধির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্নচিন্তা যেমন কমিয়া যাইবে, নিরাসক্ত কর্মপ্রেরণাও বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশা করা অন্যায় নয়।

৬-৯-১৯৪৮

ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে অনেকের মনেই অবজ্ঞার ভাব আছে। উহা বিজ্ঞান নয়, বুজরুকি মাত্র—এইরূপ কথা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন।

বিজ্ঞরা determinism স্বীকার করে, যদিও দেখা গিয়াছে অণু পরমাণুর ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। তবেই স্বীকার করা হইল যে আজ যাহা ঘটিতেছে তাহা পূর্ব হইতেই স্থিরীকৃত হইয়া আছে। জগৎটা অনিবার্য পরম্পরার পাকা সড়ক দিয়া চলিয়াছে—এদিক ওদিক যাইবার ক্ষমতা তাহার নাই। অঙ্ক কষিয়া সূর্যচন্দ্রের গতি, অনাগত সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ আমরা পূর্ব হইতেই জানিতে পারিতেছি।

ফলিত জ্যোতিষে মনুষ্য জীবনের উপর গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব নিরূপিত হয়—নিপুণ জ্যোতিষী নির্ভুলভাবে ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে পারেন। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু সম্ভব যে হয় তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় বাতের ব্যথা কেন বাড়ে তাহা কেহ জানে না, কিন্তু বাড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিলাতী ডাক্তারি শাস্ত্রও তাহা স্বীকার করে।

বহু দর্শনের ফলে জানা গিয়াছে মানুষের উপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব আছে—এই জ্ঞান বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে। জ্যোতিষ শাস্ত্র empirical science. ডাক্তারিও empirical science. তবে কি তাহাকে science বলিব না?

৭-৯-১৯৪৮

সৈয়দ মুজতবা আলী নামক জনৈক লেখকের রচিত ভ্রমণ কাহিনী কিছুদিন হইতে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। লেখাটি পড়িয়া জানা যায় ইনি শান্তিনিকেতনের একজন অধ্যাপক। পূর্বে ইঁহার কোনও রচনা পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

লেখক পণ্ডিত এবং রসিক। বাংলা ভাষায় আজকাল যে-গুণ সবচেয়ে দুর্লভ, সেই চিত্ত-আকর্ষণীশক্তি তাঁহার লেখায় আছে। লেখকের ভাষা অতি অদ্ভুত—তাহাকে খাঁটি বাংলা ভাষা বলা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বাংলা অক্ষরে লিখিত হইলেও পুস্তু হিন্দী ইংরেজি ফরাসী প্রভৃতি ভাষার সমবায়ে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আর যাহাই হোক বঙ্কিম রবীন্দ্রের বাংলা নয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই ভাষার মাধ্যমে লেখকের যে-মনটি অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা খাঁটি বাঙালীব মন।

লেখক পণ্ডিত ব্যক্তি, ধর্ম সম্পর্কীয় কুসংস্কার তাঁহার নাই—হিন্দুর বেদ পুরাণ তাঁহার যেমন মনের অঙ্গীভূত, মুসলমানের কোরাণ হদিসও তেমনি নখদর্পণে। আবার পণ্ডিত হইলে কী হয়, চটুল ছ্যাবলামিতেও তাঁহার যথেষ্ট রুচি আছে। আফগান চিনার গাছের শোভা ও পদ্মার ইলিশের স্বাদ তাঁহার রসলিপ্সু অন্তরে সমানভাবে মিশিয়াছে।

কৃষ্টির এমন ব্যাপকতা, হৃদয়ধর্মের এত প্রসার বাংলা সাহিত্যে সহসা চোখে পড়ে না।

৮-৯-১৯৪৮

আজ বিকালে পাটনা হইতে তার পাইলাম—Grandson born to you...

তোমার হল শুরু আমার হল সারা
তোমার আমায় মিলে এমনি বহে ধারা!

১২-৯-১৯৪৮

জিন্নাব মৃত্যুসংবাদ আজ কাগজে পড়িলাম।

'The evil that men do live after them,
The good is oft interned with their bones.'

মহাত্মাব মৃত্যু ও জিন্নার মৃত্যুতে কত তফাৎ! তুলসীদাসের দোঁহা মনে পড়ে—

তুলসী যব তু জগ্‌মে আয়ো জগ্ হসে তু রোয়
ঐ সি করলি কব্ চলো কি তু হসো জগ্ রোয়।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

যাহা মরণীয় যাক মরে—
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।

১৮-৯-১৯৪৮

ভারতীয় সৈন্য পাঁচদিনের মধ্যে হায়দ্রাবাদ দখল করিল। নিজাম আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইংরেজের নষ্টামি, নিজামের চাতুরী, কাসেম রাজভীর বাহ্বাস্ফোট কিছুই ভারতের ন্যায্য দাবী ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। জাতির মনে যখন কোনও প্রবল বাসনা জাগে তখন তাহা অপূর্ণ থাকে না। তাই আমাদের বাসনার নিশ্বাসে নিজামের তাসের ঘর ভাঙিয়া পড়িল। তেমনি আমরা যদি ঐকান্তিকভাবে অবহিত চিত্তে ভারতের উন্নতি কামনা করি তবে তাহাও পূর্ণ

হইবে। কিন্তু কামনার মধ্যে যদি ফাঁকি থাকে তবে কামনা বিফল হইবে।

জার্মানী একদিন পৃথিবীর আধিপত্য কামনা করিয়াছিল—একান্তমনেই কামনা করিয়াছিল। তাহার কামনা পূর্ণ হয় নাই কেন ? জার্মানীর কামনার মধ্যে ফাঁকি ছিল। মুখে যাহাই বলুক জার্মানী মনে জানিত পৃথিবীব আধিপত্য করিবার সত্যকার দাবী তাহার নাই—নর্ডিক জাতিও যেমন মিথ্যা তাহাব শ্রেষ্ঠত্বের দাবীও তেমনি মিথ্যা।

আমরা স্বাধীনতা এত বিলম্বে পাইলাম কেন ? আমাদের স্বাধীনতা কামনার মধ্যেও ফাঁকি ছিল। ইংরেজ আমাদের প্রভু হইবার যোগ্য এই গোপন বিশ্বাস আমাদের কামনাকে একাগ্র হইতে দেয নাই। গত মহাযুদ্ধে ইংরেজের উপর আমরা শ্রদ্ধা হারাইলাম। তখন স্বাধীনতা আপনি আসিল।

২১-৯-১৯৪৮

কোনও জাতিকে নপুংসক বলাও যেমন নিরর্থক তেমনি কোনও জাতিকে অসামরিক বলাও অর্থহীন। জৈব নিয়মে সমরপ্রবৃত্তি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কেবল কৃষ্টি ও প্রয়োজনের প্রভেদ এই প্রবৃত্তির অনুশীলনে তারতম্য দেখা যায়।

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, জাতি যত ক্ষুদ্র তাহার যুদ্ধপ্রবৃত্তি তত বেশি। এই যুদ্ধপ্রিয়তা আত্মরক্ষার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইংরেজ যুদ্ধ প্রিয় তাহার কারণও ঐ। আজ যে ইউরোপ আত্মকলহে নির্বাপিতপ্রায় হইয়াছে তাহারও কাবণ ইয়োরোপে বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টি।

সভ্যতা ও মনের সংস্কৃতি জাতির যুদ্ধপ্রেরণাকে sublimate করিয়া তাহাকে প্রকৃতি-বিজয়ে প্রণোদিত করিতে পারে। ইহা বর্তমানে কিছু কিছু হইতেছে, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় এই কার্যে ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মন হইতে হিংসা তিরোহিত হয় নাই, বরং বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত তত্ত্বের সাহায্যে সে হিংসাবৃত্তিরই চরিতার্থতা সাধন করিতেছে। মানুষের স্বজাতি-হিংসা দূর হইতেছে না।

যুদ্ধবৃত্তিকে মানুষের মন হইতে উৎখাত করা বোধহয় অসম্ভব। কিন্তু sublimate করা যাইতে পারে। খেলাধুলায় রেষারেষি ইহার একটি উপায়। দ্বিতীয় উপায় capitalism-এর উৎখাত।

২২-৯-১৯৪৮

Capitalism-এর বিরুদ্ধে প্রথম এবং প্রধান আপত্তি এই যে, উহা হিংসাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়া থাকে। ধনবাদ জঙ্গলের নীতিকে মনুষ্য সমাজে টানিয়া আনিয়াছে এবং বলিতেছে, Competitionই বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র উপায়।

এই উক্তি যদি সত্য হয় তবে বুদ্ধ যীশু প্রদর্শিত মানুষের মুক্তিপথ মিথ্যা। এই সব সাধুরা হিংসাকে জয় করিবার উপদেশ দিয়াছেন ; বুদ্ধ বলিয়াছেন—হিংসায় হিংসার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়। সুতরাং হিংসার চর্চা করিলে কালক্রমে উহা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়া সমস্ত মানবজাতিকে গ্রাস করিবে।

Competition কথাটা শুনিতে নিরীহ কিন্তু কার্যকালে মারাত্মক। প্রতিযোগিতা না থাকিলে সমাজের উন্নতি হয় না, ধনবাদের এই উক্তি মিথ্যা। বর্তমান কালে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যে উন্নতি হইয়াছে একমাত্র বিজ্ঞান তাহার জন্য দায়ী। কিন্তু বিজ্ঞান প্রতিযোগিতার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া নব নব আবিষ্কার করিয়াছে একথা সত্য নয়। বৈজ্ঞানিক সাধক সত্য-পিপাসায় প্রণোদিত হইয়া প্রকৃতির গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

Eienstein যখন Theory of Relativity আবিষ্কার করেন তখন কাহারও সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আবিষ্কার করেন নাই। কিন্তু আবিষ্কার হইবার পর ধনবাদীরা তাহা হইতে আণবিক বোমা প্রস্তুত করিয়াছে।

২৩-৯-১৯৪৮

যীশু বলিয়াছেন—

It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of Heaven.

আপাতদৃষ্টিতে কথাটা যুক্তিহীন অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয়। ধনী স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না কেন ? ধনী কি সৎ হইতে পারে না ? আমরা বহু ধনী ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যাঁহারা প্রকৃত ধার্মিক এবং সজ্জন। তবে তাঁহারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অনধিকারী কেন ?

যীশুর স্বর্গরাজ্য কী তাহা বুঝিতে হইবে। এই স্বর্গরাজ্য পরলোকের কোনও কাল্পনিক রাজ্য নয়, ইহজগতেরই আদর্শ রাজ্য। যীশু বলিতে চাহিয়াছেন যে, তাঁহার আদর্শ রাজ্যে কেহ ধনী থাকিবে না। সকলের আর্থিক অবস্থা সমান হইবে। যখন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অবস্থার তারতম্য থাকিবে না তখনই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

দু'হাজার বছর আগে যীশু যে কথা বলিয়াছিলেন আজও আমরা তাহার মানে বুঝি নাই। এখনও ধনবাদীরা বলে—ধনানর্জয়ধ্বং ধনানর্জয়ধ্বম্। যে তাহার প্রতিবেশীর অপেক্ষা ধনী সেই স্বর্গলাভ করিয়াছে। পরিহাস এই যে, ধনবাদীরা অধিকাংশই যীশুর শিষ্য। ইহাদেরই বলে গুরু-মারা চেলা।

G B S একজন নাস্তিক। তিনি তাঁহার Intelligent Woman's Guide পুস্তকে যীশুর ধনসাম্যের ওকালতি করিয়াছেন। নিরীশ্বর কম্যুনিজমও অনেকটা সেই কথাই বলে।

মানুষের মতন এমন paradoxical জীব জগতে দুর্লভ।

২৪-৯-১৯৪৮

আধুনিক বিজ্ঞান এখন আর কার্যের সহিত কারণের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করে না ; Planck সাহেবের Quantum Theory গৌতম মুনির হাড় নড়বড়ে করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু causation যদি গেল, logic তবে কোথায় রহিল ? ন্যায়শাস্ত্র যদি না থাকে তবে সমস্ত চিন্তাই যে অচল হইয়া যায়। বিজ্ঞান বলে, চিন্তার কাজ চালাইবার জন্য আর একটা আইন আছে, তাহাকে বলে law of statistical averages, অর্থাৎ গড়পড়তা বেশি যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই logic-এর ভিত্তি করা যাইতে পারে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে law of causation অত্যাবশ্যক নয় ; ধূম দেখিয়া পর্বতকে বহ্নিমান মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু বহ্নি ধূমের কারণ ইহা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কার্যকারণ সম্বন্ধ অবান্তর। ইহা আমাদের মনের বিকারও হইতে পারে।

গীতার মূল কথা—মা ফলেষু। নিস্পৃহভাবে কর্ম করিয়া যাও, ফলের আশা করিও না। বিজ্ঞানের সহিত এই উক্তির কোনও বৈষম্য নাই ; কারণ কর্মের সহিত ফলের যদি নিত্যসম্বন্ধ না থাকে তবে কর্ম করিলেই যে ফল ফলিবে তাহার স্থিরতা কি ? অতএব ফল সম্বন্ধে নিরাসক্ত থাকাই ভাল।

কিন্তু মানুষের এমন স্বভাব, কাজ করিবার আগেই ফলের জন্য হাত বাড়ায়। সর্বকর্মফলত্যাগী কেহ আছে কি ?

২৭-৯-১৯৪৮

অহৈতুকী প্রীতি জগতে দুর্লভ। এবং অহৈতুকী বলিয়াই তাহা তর্কের অতীত। কিন্তু যে-প্রীতির হেতু আছে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে পারে।

অধিকাংশ মানবীয় প্রীতির ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখা যায় তাহার মধ্যে স্বার্থের গন্ধ আছে। মানুষ তাহাকেই প্রীতি করে যাহার সংস্পর্শে স্বার্থসিদ্ধির আশা আছে। ইহা যে সব সময়েই প্রবঞ্চনা তাহা নয়, আত্মপ্রবঞ্চনাও আছে। আমরা যখন যুবতী স্ত্রীর প্রতি অনুরাগী হই তখন স্বার্থটা মনের অগোচরেই লুকাইয়া রাখি। দুই সাহিত্যিকের মধ্যে যখন গাঢ় বন্ধুত্ব দেখা যায় তখন তাহার কতটা প্রীতি এবং কতটা স্বার্থবুদ্ধি তাহা পরিমাপ করা দুষ্কর ; তবে স্বার্থ যে আছে তাহা না বলিলেও চলে।

কখনও কখনও গুণের আদর প্রীতিরূপে দেখা দেয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার প্রীতি গুণের আদর ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু সংসারে বাস করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আরও অনেক লোকের সংস্পর্শে আসিতে হয়, তাহাদের সকলের গুণ সমান নয়। সুতরাং গুণের অনুপাতে প্রীতির পাত্র নির্বাচন করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র বলিয়া মনে হয়।

অথচ যে-প্রীতি সহেতুক তাহার হেতু যত জোরালো ও নিস্বার্থ হয় ততই ভাল।এইরূপ হেতু কী হইতে পারে ?

২৮-৯-১৯৪৮

শ্রদ্ধা নামক মনোভাব আজকাল বড়ই বিরল হইয়া পড়িয়াছে। শ্রদ্ধেয় মানুষের অভাববশত এরূপ হইয়াছে তাহা নয় ; নবীন সমাজে একটা ধারণা জন্মিয়াছে, কাহাকেও শ্রদ্ধা দেখাইলে নিজেকে খাটো করা হয়।

অথচ অহৈতুকী প্রীতি যখন আমাদের চেষ্টাধীন নয়, তখন এই শ্রদ্ধাকে যদি আমরা ব্যবহারিক প্রীতির হেতু করিতে পারিতাম তাহা হইলে কত ভালই না হইত ! শ্রদ্ধা স্বভাবতই গুণাপেক্ষী, যেখানে গুণ নাই সেখানে সে সহজে ন্যস্ত হইতে চায় না। এইরূপে শ্রদ্ধা ও প্রীতি যদি একই স্থানে অর্পিত হয় তাহা হইলে প্রীতি নামক মনোভাবের একটা মর্যাদা থাকে।

কুকুরকে শ্রদ্ধা করিতে বড় কাহাকেও দেখা যায় না, কিন্তু অনেকেরই কুকুরপ্রীতি আছে। শিশুকে আমরা প্রীতি করি, শ্রদ্ধা করি না। ইংরেজের বিষয়বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করি, প্রীতি করিতে পারি কৈ ? কিন্তু এত জটিলতার প্রয়োজন নাই। মোট কথা, প্রীতিকে যদি স্বার্থ হইতে মুক্ত করিয়া শ্রদ্ধার সহিত মিলাইতে পারি তবে মিলনটা বড়ই সুখের হয়।

১-১০-১৯৪৮

যাহার ভালবাসা একবার পাইয়াছি তাহাকে চিরদিনের জন্য নিজস্ব সম্পত্তি মনে করিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক। মানুষের মন কনসারভেটিভ, তাই যাহা পাইয়াছে তাহা সে চিরস্থায়ী মনে করে। ভালবাসাও যে কলসীর জলের মতো ঢালিতে ঢালিতে একদিন ফুরাইয়া যাইতে পারে একথা সহজে কেহ কল্পনা করিতে পারে না। হঠাৎ একদিন যখন চোখে পড়ে যাহার ভালবাসা স্বতঃসিদ্ধ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম সে আর ভালবাসে না তখন বিস্ময় ও মর্মপীড়ার আর অবধি থাকে না।

কিন্তু ভালবাসা চিরস্থায়ী হইবে কেন ? একদিন যে আমাকে ভালবাসিয়াছিল তাহার চোখে তখন রঙীন নেশা ছিল, যৌবনের নৈসর্গিক স্নেহ-প্রবণতাছিল ; আমিও হয়তো ভালবাসার অধিক যোগ্য ছিলাম। এখন হাওয়া বদলাইয়াছে, চোখের রঙীন নেশা কাটিয়াছে, আমিও আর সে আমি নই। তবে ভালবাসা থাকিবে কেন ?

এক মাতাল রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল হাতীর পিঠে রাজা যাইতেছেন। মাতাল হাত তুলিয়া বলিল—'দাঁড়াও, আমি হাতী কিনিব।' রাজা মাতালকে বাঁধিয়া রাখিবার হুকুম দিলেন। পরদিন মাতালের নেশা ছুটিলে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হাতী কিনিবে ?' মাতাল হাসিয়া বলিল. 'মহারাজ, হাতীর খরিদ্দার চলিয়া গিয়াছে।'

আমরাও মাতাল, কিন্তু হাতীর খরিদ্দার কখন চলিয়া যায় তাহা জানিতে পারি না।

অধিকাংশ মানুষের মন যায় বৈষয়িকতার দিকে, অর্থাৎ টাকার দিকে। দুই-চারজন ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাই সংসারে যত প্রৌঢ় লোক দেখা যায়, তাহারা অধিকাংশই নিবিড়ভাবে অর্থ-চিন্তায় নিমগ্ন, কদাচ দু-একজন পরলোকের চিন্তায় সমাহিত। ইহারা সকলেই সাধারণ মানুষ, বয়োধর্ম পালন করিতেছে মাত্র।

একটা তৃতীয় পথ আছে ; কিন্তু তাহা সকলের জন্য নয়। সে-পথ রসের পথ, যাহাকে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলা হইয়াছে, সেই কাব্য-রসের পথ। প্রৌঢ় বয়সে এ-পথে অল্প মানুষই বিচরণ করিতে পারে। যে পারে, সে ভাগ্যবান।

সাধারণত দেখা যায়, যৌবনে যাঁহাদের কাব্য-শক্তির স্ফূরণ হইয়াছিল, প্রৌঢ়ত্বে তাঁহারা কাব্যের ব্যবসা করিতেছেন। তাঁহাদের যৌবনকালীন কাব্যস্ফূর্তি রিরংসার রূপান্তর মাত্র—তাঁহারা প্রকৃত কবি নন।

৩-১০-১৯৪৮

সংসারে প্রকৃত কবি বড় বিরল, তাই কবিকে দেখিয়া মানুষ বিস্মিত হইয়া যায়। কবি বড় আশ্চর্য মানুষ। যৌবনে সে যৌনধর্মকে কেন্দ্র করিয়া লয় না, যৌবনান্তে বিষয়ধর্মে তাহার রুচি নাই, ধর্মকর্মেও সমান অরুচি। তাই সংসারী তাহাকে অকর্মা বলিয়া গালি দেয়, ধার্মিক গালি দেয় দুষ্ট বলিয়া। কবি হাসিয়া আপন মনে বাঁশি বাজায়।

সেই যে রবীন্দ্রনাথের খ্যাপা পরশ-পাথর খুঁজিয়া বেড়াইত, কবি অনেকটা তাহারই মতন। কিন্তু পরশ-পাথর খুঁজিয়া পায় নাই বলিয়া তাহার মনে দুঃখ নাই। খুঁজিয়াই তাহার আনন্দ। মাথায় জটা, পরিধানে কৌপিন, গ্রামে ছেলেরা তাহাকে দেখিয়া ঢেলা মারে—কিন্তু কিছুতেই তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে কেবল সংসারের সমুদ্রতীরে নুড়ি কুড়াইতেছে, আর দেখিতেছে, উহা পরশ-পাথর কি না।

বেশির ভাগ কবির জীবন নিষ্ফল অন্বেষণেই শেষ হয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের জীবন নিষ্ফল নয়। তাহাদের খোঁজার ইতিহাসই কাব্য।

কদাচিৎ দু-একটি কবি পরশ-পাথর খুঁজিয়া পান। ওমর খৈয়াম পাইয়াছিলেন—অন্তত Fitgerald পাইয়াছিলেন। শেক্সপীয়র পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে পাইয়াছেন তাহা বোধহয় নিজেই বুঝিতে পারেন নাই। কালিদাস শকুন্তলায় পাইয়াছিলেন।

ইঁহারা শুধু কবি নন, সত্যদ্রষ্টা ঋষিও।

৭-১০-১৯৪৮

হিংসাবৃত্তি মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে তাহার পশু পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে। সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু নিষ্ঠুরতা মানুষের নিজস্ব সৃষ্টি ; ইহার জন্য পশুর কোনও দায়িত্ব নাই।

পশুরা পরস্পর হিংসা করে জৈব প্রয়োজনের তাড়নায় ; কখনও বাঁচিয়া থাকার জন্য, কখনও উদরপূর্তির জন্য, কখনও বা নিছক হিংসাবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য। কিন্তু তাহারা হত্যাই করে, দৈহিক বা মানসিক পীড়নের দ্বারা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে না। মানুষ নিজের কুটিল বুদ্ধির

সাহায্যে এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। Cruelty মানুষের স্বকীয় কীর্তি।

Torture-এর কত যন্ত্রই না মানুষ যুগে যুগে আবিষ্কার করিয়াছে। সভ্যতা যতই অগ্রসর হইয়াছে, পীড়নের যন্ত্র ততই সূক্ষ্ম ও পৈশাচিক হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরও সূক্ষ্ম ও পৈশাচিক হইবে, এরূপ মনে করা অন্যায় হইবে না।

কোথা হইতে এই cruelty আসিল ? ইহা কি বীজরূপে মানুষের মনের মধ্যে ছিল ? তারপর বুদ্ধির সারবান ক্ষেত্র পাইয়া অঙ্কুরিত হইয়াছে ? কিংবা যৌন রোগের বীজাণুর ন্যায় ইহা সম্পূর্ণ একটা নূতন mutation ?

মানুষ যখন প্রথম সামাজিক জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার হিংসা প্রবৃত্তিকে বহু প্রকারে নিরোধ করিতে হইয়াছিল। এই নিরোধ ও নিগ্রহের ফলে হয়তো cruelty-র সৃষ্টি।

৯-১০-১৯৪৮

বৎসরকাল যাবৎ এখানে অনেক সিন্ধী আসিয়াছে। মালাডের পথে-ঘাটে অজস্র সিন্ধী দেখিতে পাই। নাকে মুক্তার নথ-পরা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক, পায়জামা-পরা পুরুষ, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অবোধ্য ভাষায় কথা বলিতেছে। ইহারা সকলেই হিন্দু, উদ্বাস্তু হইয়া অত্যাচার সহিতে না পারিয়া পালাইয়া আসিয়াছে।

ইহাদের কয়েকজনের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। একজন হোমিও ডাক্তার, জানিতে পারিলাম ইঁহার গুরু একজন বাঙালী সাধু। ইনি কিছু টাকা-পয়সা লইয়া আসিতে পারিয়াছেন, এখানে ডাক্তারখানা খুলিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। কোনওক্রমে দিন কাটিতেছে।

সিন্ধীরা কর্মঠ ব্যবসায়ী, অল্প লাভে ব্যবসা করিতে ইহারা দক্ষ। তাই ইহাদের আগমনে গুজরাতীদের ভয় হইয়াছে। তাহারা নাকি পঞ্চায়েত করিয়া স্থির করিয়াছে, সিন্ধীদের বাড়িভাড়া দিবে না, এমন কি, পণ্য বিক্রয় পর্যন্ত করিবে না। সিন্ধীরা বড় কষ্টে আছে, অনেক শিশু, বৃদ্ধ মরিতেছে, গৃহের অভাবে রোগে পড়িতেছে। কিন্তু তবু তাহারা সাহস হারায় নাই। এই বিতাড়িত সিন্ধীরাই হয়তো একদিন পার্শীদের মত বোম্বাইয়ের ব্যবসা-ক্ষেত্র দখল করিবে।

১০-১০-১৯৪৮

আজ পূজার মহাষ্টমী। আকাশের চাঁদ কেহ যেন ধারালো ছুরি দিয়া অর্ধেক কাটিয়া লইয়াছে। এদেশে দুর্গাপূজা নাই, নবরাত্রি আছে। একটি শতছিদ্র ঘটের মধ্যে প্রদীপ বসাইয়া, রাত্রিকালে এদেশের মেয়েরা পূজা করে, ঘট ঘিরিয়া গরবা নাচে। নয় দিন এই পূজা হয়, দশমীতে বিসর্জন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, ইহা আদৌ সূর্যপূজা, প্রদীপগর্ভ ঘট সূর্যের প্রতীক।

আমরা দুর্গাপূজা করি কেন ? যোগেশবাবু এ সম্বন্ধে সম্প্রতি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, দুর্গাপূজা আসলে ঋতুৎসব ; বর্ষা শেষ হইয়া শরৎ আরম্ভ হইত, তখন উৎসব হইত এবং নূতন বৎসর আরম্ভ হইত। মহাষ্টমীর সন্ধিপূজা বর্ষা ও শরতের সন্ধিক্ষণের পূজা। উত্তরায়ণ হইতে আট চান্দ্র মাস এবং আট তিথি পরে শরৎ ঋতুর আরম্ভ, তাই মহাষ্টমীর সন্ধিপূজার এত মাহাত্ম্য।

কালক্রমে এই ঋতুৎসবের সঙ্গে রুদ্রের পূজা মিশিয়াছিল ; রুদ্রের পূজা ক্রমে রুদ্রাণীর পূজায় পরিণত হইয়াছে। রুদ্র চালচিত্রে উঠিয়াছেন।

বাঙালীর বিজয়া উৎসব নব বৎসরের আনন্দ-অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন বর্ষারম্ভ বদলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমরা সেই প্রাচীনকালের স্মৃতি না জানিয়া বহন করিতেছি।

১-১১-১৯৪৮

দৈনন্দিন জীবনে আমাদিগকে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র চিন্তা ও ক্রিয়া লইয়া কারবার করিতে হয়। এই আণবিক চিন্তা ও ক্রিয়াগুলিকে সাহিত্যের ফাঁদে ধরিবার চেষ্টা করিলে দেখা যায়,

ভাষার দ্বারা উহাদের ধরা যাইতেছে না ; উহারা এত ক্ষুদ্র যে, ভাষা উহাদের ধরিতে পারে না, চালুনির ছিদ্রপথে ক্ষুদ্র বীজের ন্যায় উহারা ঝরিয়া পড়ে।

সাহিত্যে যাঁহারা বস্তুপন্থী, তাঁহাদের তাই বড় বিপদ হইয়াছে। মনুষ্যজীবনে যাহা ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর, তাহার দ্বারাই তাঁহারা জীবনবেদ গড়িতে চান, তিল তিল করিয়া তিলোত্তমা (!) রচনা করিতে চান। কিন্তু তিলগুলি এত ক্ষুদ্র যে, উপাদানরূপে তাহাদের ব্যবহার করা যায় না তাই বাধ্য হইয়া তাঁহাদের স্থূলতর উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়। ফলে যাহা সৃষ্টি হয়, তাহা তিলোত্তমা নয়, মেদ-মাংস-অস্থির স্তূপ।

কোনও সাহিত্যই জীবনের মূলীভূত protoplasmic ভ্রূণকে মুঠির মধ্যে ধরিতে পারে না. অঙ্গুলি সংকেতে তাহাকে দেখাইয়া দিতে পারে মাত্র। তাই উচ্চ কাব্যের মধ্যেই জীবনতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। কাব্য জীবনকে ধরিতে চায় না, ঠারে ঠোরে দেখাইয়া দেয় মাত্র।
৩-১১-১৯৪৮

ইংরেজরা বলিয়া থাকে ভারতবাসীকে তাহারা সভ্যতা শিখাইয়াছে, বিজ্ঞান শিখাইয়াছে. মানুষ করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের কাছে ইংরেজের কোনও ঋণ আছে একথা স্বীকার করিতে তাহার গলায় আটকাইয়া যায়।

আন্দাজ তিনশত বছর আগে ইংরেজ যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসে তখন সে কিরূপ সভ্য ছিল, তাহার নিজের ইতিহাসেই তাহা লেখা আছে। এলিজাবেথ তখন ইংলন্ডের রানী ; একদল জলদস্যুর সাহায্যে ইংলণ্ড তখন শক্তিসঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশের শতকরা নিরানব্বই জন লিখিতে পড়িতে জানে না ; দেশের আইন এমন বর্বরোচিত যে ছিঁচকে চোরেরও ফাঁসি হয় , স্বাস্থ্য ও শুচিতাজ্ঞান এমন প্রখর যে রানী হইতে রাস্তার ঝাড়ুদার পর্যন্ত কেহ স্নান করে না।

ভারতবর্ষের সংস্পর্শে আসিয়া ইংরেজ জাতি স্নান করিতে শিখিল। ভারতবর্ষের টাকা চুরি করিয়া বড়মানুষ হইল। অন্নচিন্তা যখন কমিল তখন সে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায় মন দিল। বাঙালী তাঁতীর অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া নিজের দেশে মসলিনের কল বসাইল। য়ুরোপের industrial revolution আরম্ভ হইল।

ইংরেজ ভারতকে যাহা দিয়াছে, লইয়াছে তাহার চতুর্গুণ। কিন্তু তাহার কৃতজ্ঞতা নাই, চক্ষুলজ্জাও নাই। দু'কান-কাটা গাঁয়ের মাঝখান দিয়া যায়, ইংরেজ বলে ভারতকে সে সভ্যতা শিখাইয়াছে !
১১-১১-১৯৪৮

দুনিয়ায় সাধু ব্যক্তি যদি না থাকিত, তাহা হইলে অসাধু ব্যক্তিদের বড়ই অসুবিধা হইত। বস্তুত একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, অসাধু ব্যক্তিদের বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সাধু ব্যক্তির একান্ত প্রয়োজন। কাকে কাকের মাংস খায় না ; দুনিয়ায় যদি সকলেই অসাধু হইত তাহা হইলে ঠকাইবার লোকের অভাবেই সংসার অচল হইয়া পড়িত।

কিন্তু কে সাধু, কে অসাধু, তাহার বিচার হইবে কিরূপে ? কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সংসারে প্রকৃত সাধু কেহ নাই, যে-ব্যক্তি এক বিষয়ে সাধু, সে-ই অন্য বিষয়ে অসাধু। এইভাবে আমরা সকলেই সকলকে ঠকাইয়া জীবন নির্বাহ করিতেছি। "সবাই শকুনি সবাই মড়া।"

আমার বিবেচনায় যে-ব্যক্তি সৃষ্টি করে, সে-ই সাধু এবং যে সৃষ্টি না করিয়া কেবল ভোগ করে সে অসাধু। সৃষ্টি অর্থে এখানে কাব্য সৃষ্টি হইতে খাদ্য সৃষ্টি পর্যন্ত সমস্তই সৃষ্টি। এই হিসাবে চাষা সাধু, কবিও সাধু. কিন্তু যাহারা চাষা বা সাধুর ভেক ধারণ করে, তাহারা সাধু নয়, চোর। সাধারণত আমরা যাহাদের চোর বলিয়া বুঝি, সে চোর নাও হইতে পারে। আবার যিনি

কালাবাজারের টাকায় দেবমন্দির নির্মাণ করেন, তিনি পাকা চোর। কিন্তু সমাজের নৈতিক বিধি এমন দাঁড়াইয়াছে যে, সাধু চোর এবং চোর সাধু হইয়াছে।

১২-১১-১৯৪৮

বর্তমান বৈশ্য যুগে একজাতীয় মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহারা সৃষ্টি করে না এবং সম্প্রদায় হিসাবে ভোগও করে না—তাহারা দালাল। এই দালালের জ্বালায় সমাজ জর্জরিত হইয়াছে। ইহাদের কাজ মাল পরিবেশন বা distribute করা—গোলার আড়তদার হইতে পুস্তক বিক্রেতা পর্যন্ত সকলেই দালাল। তাহারা স্রষ্টার নিকট হইতে অল্প মূল্যে মাল লইয়া ভোক্তার নিকট উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে এবং লভ্যাংশটুকু আত্মসাৎ করে। এই লাভে তাহাদের কোনও অধিকার নাই ; কিন্তু তাহারা বলে—আমরা না থাকিলে খেতের ধান খেতে পচিত, কবির কাব্য দেরাজে বন্ধ থাকিত, আমরা distribute করি বলিয়াই সংসার চালু আছে।

ইহা সর্বৈব মিথ্যা কথা। পুরাকালে দালাল ছিল না, যে স্রষ্টা ছিল, সে-ই বিক্রেতা ছিল। এখন বহুপ্রসব বা mass production-এর ফলে তাহা আর সম্ভব নয় বটে, কিন্তু রাষ্ট্র এই পরিবেশন-কর্মের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারে। রাষ্ট্রের মনে লাভের লোভ থাকিবে না, মধ্যস্থ দালাল বিদায় হইবে, স্রষ্টা ও ভোক্তা উভয়েই সন্তুষ্ট থাকিবে। দালালের শোষণ হইতে সমাজ রক্ষা পাইবে।

১৩-১১-১৯৪৮

সমাজবাদ প্রকৃতপক্ষে দালাল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান। ধনিক মূলত দুই প্রকার। এক, যাহারা শ্রমিকের সাহায্যে পণ্য প্রস্তুত করাইয়া লয় ; দুই, যাহারা ওই পণ্য ক্রয় করিয়া (কিংবা কমিশনে) বাজারে বিক্রয় করে। এইরূপে পণ্য এক দালালের হস্ত হইতে অন্য দালালের হস্তে চালান হইয়া যখন খুচরা বিক্রেতার হাতে আসিয়া পৌঁছায়, তখন তাহার মূল্য স্বভাবতই বাড়িয়া যায়, কারণ প্রত্যেক দালালই লাভ লইয়াছে। এইভাবে, যিনি পণ্যটি নিজের ব্যবহারের জন্য খরিদ করিতেছেন তিনি মূল ধনিক হইতে আরম্ভ করিয়া সকল দালালকেই পুষিতেছেন। এই ব্যবস্থার ফলে সমাজে একদল উপজীবী parasite-এর সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রশ্ন ওঠে—এই দালালেরা কি পরিশ্রম করে না ? তবে তাহারা পরিশ্রমের পুরস্কার পাইবে না কেন ? উত্তর এই যে, উহারা পরিশ্রমের অতিরিক্ত পুরস্কার লইয়া থাকে। সোস্যালিজমের শাসনে ইহারা লাভ পাইবে না, রাষ্ট্র হইতে বেতন পাইবে মাত্র। তখন আর পরের পরিশ্রমের ফল পরকে বেচিয়া লাভ করা চলিবে না, নিজের পরিশ্রমের ফলটুকুই পাওয়া যাইবে। এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল চালু থাকিলে ক্রমে সাম্য আসিবে ধনী-নির্ধনের শ্রেণীভেদ ঘুচিয়া যাইবে। ইহাই সোস্যালিজমের লক্ষ্য।

২০-১১-১৯৪৮

পৃথিবীতে দু-চারজন লোক দেখা যায়, যাহারা সংসারযাত্রাটাকে খুব seriously নেয় না। তাহারা 'হেসে খেলে' জীবনটাকে 'উড়িয়ে' দিতে চায়। তাহাদের জীবন-দর্শন—হেসে নাও দুদিন বৈ তো নয়।

গম্ভীর এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহাদের লঘুচিত্ত বলিয়া গালি দিয়া থাকেন। উত্তরে লঘুচিত্ত ব্যক্তি বলে—জীবনের উদ্দেশ্য কী তাহা যতক্ষণ না জানিতে পারিতেছি, ততক্ষণ তাহাকে শ্রদ্ধা

করি কী করিয়া ? আমি দেখিতেছি, একটা লোক রাস্তা দিয়া যাইতেছে ; কিন্তু সে মন্দিরে যাইতেছে, কি মদের দোকানে যাইতেছে তাহা কিছুই জানি না। এরূপ অবস্থায় তাহাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলে হাস্যাস্পদ হইব। তাহাকে মদ্যপ বলিয়া গালি দিতেও চাই না, কিন্তু তাহাকে লইয়া দু'দণ্ড যদি রহস্যালাপ করি তাহাতে ক্ষতি কী ? আর কিছু না হোক, অন্তত জীবন হইতে কিছু রস আহরণ করা তো হইবে।

লঘুচিত্ত ব্যক্তিদের জীবন-দর্শন যে মূলত rational তাহা অস্বীকার করা যায় না। পরলোক আছে কিনা, এ-প্রশ্নের পাকা উত্তর যতদিন না পাওয়া যাইতেছে, ততদিন সংসারকে seriously লওয়া কঠিন।

২১-১১-১৯৪৮

জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব হইতে মানুষের মনে হাস্যরসের উদ্ভব হইয়াছে। যাহারা জীবনকে কুৎসিত মনে করিয়া ঘৃণা করে, তাহারা হাসে না ; যাহারা জীবনকে 'ভয়-ভক্তি' করে, তাহারাও হাসে না। হাসে তাহারাই, যাহারা জীবনকে পুরাপুরি না বুঝিয়াও জীবন উপভোগ করিতে চায়। তাহারা বলে, জীবনটা কী, তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না। কিন্তু জীবনকে এড়াইয়া চলিবার যখন উপায় নাই, তখন তাহাকে উপভোগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই তাহারা জীবনকে লঘু করিয়া উপভোগ করিয়া পরম আনন্দে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করে।

হাস্যরসিকের সহিত বৈষ্ণবের কতকটা মিল আছে ; আবার উগ্র বৈদান্তিকের সহিত তাহার মিলও কম নয়। জগৎকে রসবস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে কিংবা অলীক মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলে আর ভাবনা কী ? জগৎ যখন নিরেট সত্য বলিয়া বোধহয় তখনই সে কষ্টদায়ক।

জীবনযাত্রাকে সহনীয় করিবার জন্য বেশ খানিকটা হাস্যরসের প্রয়োজন। কঠিন যন্ত্রকে চালু রাখিবার জন্য তরল তৈলের আবশ্যক। তৈলাভাবে যন্ত্রে যদি একবার মরিচা ধরিয়া যায়, তবে আর তাহাকে সহজে সচল করা যায় না।

২২-১১-১৯৪৮

আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে নয়টি রসের উল্লেখ আছে ; তন্মধ্যে হাস্যরস একটি। হাস্যরস একটি স্বতন্ত্র রস বটে, কিন্তু একটু অভিনিবেশ করিলেই দেখা যায় উহা সর্বদা অন্য একটি রসের সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে। হাস্যরসের কাজ অন্য রসকে লঘু এবং মোলায়েম করিয়া আনা।

আদিরসের মূলে আছে একটি জৈব প্রবৃত্তি ; এই প্রবৃত্তিকে সাজাইয়া গুছাইয়া ভদ্রভাবে উপস্থাপিত করাই আদিরসের কাজ। কিন্তু আদিরসের সঙ্গে যখন একটু হাস্যরস মিশাইয়া দেওয়া যায় তখন উহার প্রকৃতি বদলাইয়া যায়, আদিরস তখন অম্লমধুর রসে পরিণত হয়। বীররসের সহিত মিশিয়া হাস্যরস উহাকে হাল্কা করিয়া আনে, উহার নির্মম কঠিনতা অপনোদন করে।

কিন্তু সকল রসের সঙ্গে হাস্যরস সরলভাবে মিশ খায় না—যেমন tragic রস। কিন্তু যদি নিপুণভাবে মিশাইতে পারা যায়, তাহা হইলে উহা অতি উপাদেয় হইয়া ওঠে। সাহিত্যে এইরূপ মিশ্রণের উদাহরণ মাত্র দুই-চারিটি পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ King Lear-এর Fool.

২-১-১৯৪৯

ছোট ছোট পল বিপল দিয়া যেমন মহাকালের অনন্ত আয়তন পূর্ণ থাকে, ছোট কথা দিয়া তেমনি মানুষের জীবন পূর্ণ। মনে করিয়াছিলাম, এই সব টুকিটাকি কথা দিয়া এই খাতাটি

দিনের পর দিন পূর্ণ করিয়া তুলিব। কিন্তু কাজটি সহজ নয়। বড় কথা লিপিবদ্ধ করা সহজ, তাঁহার একটা আকার আছে, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আছে ; কিন্তু ছোট কথা আপন ক্ষুদ্রতার মধ্যে এমন গা-ঢাকা দিয়া থাকে যে, তাহাকে টানিয়া বাহির করা কঠিন। সমুদ্রের দীর্ঘ বর্ণনা করা যায়, কিন্তু একবিন্দু শিশিরের কেহ বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই।

আবার এমনও দেখা যায়, যে-কথাটাকে ছোট কথা মনে করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি তাহা অজ্ঞাতসারে বড় হইয়া উঠিয়াছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র যেমন ছোটকে বড় করিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়া তোলে, মনও তেমনি ছোট কথাকে বড় করিয়া প্রকাশযোগ্য করিয়া লয়। ইহাতে ছোট কথার স্বরূপ হয়তো বিকৃত হইয়া যায়, কিংবা একেবারেই ভিন্নরূপ ধারণ করে।

মানুষ মধ্যবিত্ত জীব ; অতি ক্ষুদ্র এবং অতি-বৃহৎ দুইই তাহার ধারণার বাহিরে।

১৬-১-১৯৪৯

'আমি' বলিতে কী বুঝি ?

সাধারণত আমার বুদ্ধি প্রবৃত্তি মিলাইয়া যে একটি যৌগিক সত্তা পাওয়া যায় তাহাকেই আমি বলিয়া বুঝি। স্মৃতি এই সত্তাকে ধরিয়া রাখে। স্মৃতি না থাকিলে এই সত্তার একত্ব বজায় থাকিত না, প্রতি মুহূর্তে নিজেকে নূতন সত্তা বলিয়া মনে হইত।

এই হইল 'আমি'র মানসিক রূপ। তা ছাড়া দেহ আছে। দেহটাও 'আমি'র অংশ ; দেহ অসুস্থ হইলে বলি, আমি অসুস্থ। এই আমি জরা-মৃত্যু দুঃখ-সুখ ভোগ করে। এই আমি যদি কদাচ পাগল হইয়া যায় তখন সে নিজেকে নেপোলিয়ন বা স্টালিন মনে করে। স্মৃতিভ্রংশ হইলেও এই আমির ব্যক্তিত্ব পরিবর্তিত হয়। এই আমি তবে প্রকৃতপক্ষে কে ? তাহার কোনও বিশিষ্ট অপরিবর্তনীয় সত্তা আছে কি ?

শাস্ত্রে বলে এই আমি আমি নয়, ইহা জড়ের বিকার মাত্র ; দেহ মন সবই জড়ের বিকার। আসল আমি স্বতন্ত্র, তাহাকে পুরুষ বলা হইয়াছে।

১৭-১-১৯৪৯

শাস্ত্রে যে-আমিকে জড়ের বিকার বলা হইয়াছে সে-আমির কোনও স্থিরতা নাই। সে-আমি আজ এক কথা বলে, কাল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে ; সে-আমি আজ সাধু কাল চোর। এই আমিকে প্রকৃত আমি বলিয়া ধরিলে তাহার একত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। তখন মনে করিতে হয়—এই অস্থির পরিবর্তনশীল আমিটাই সর্বস্ব ; কিংবা এই আমিটা কিছু নয়, ইহার পশ্চাতে একটি অপরিবর্তনীয় সত্তা আছে যাহাকে প্রকৃত আমি বলিতে পারি।

যদি দেহ-মন-জড়িত অস্থির সত্তাই একমাত্র আমি হয় তবে দেহের নাশ হইলে এই আমিরও সম্পূর্ণ নাশ হয়—আর কিছুই থাকে না। সুতরাং এই আমি সম্বন্ধে কিছু করিবার নাই। ইহাকে অতি যত্নে বাঁচাইয়া রাখারও কোন সার্থকতা দেখা যায় না ; যদিও এই আমির বাঁচিয়া থাকার একটা সহজাত আগ্রহ আছে তবু এই আগ্রহ সম্পূর্ণ নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন।

কিন্তু যদি দেহ-মনের অতীত কোনও আমি থাকে তবে তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

১৮-১-১৯৪৯

আত্মা যে আছে তাহার কোনও প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রমাণ নাই। শাস্ত্রে বলে আত্মা বাক্য ও মনের অগোচর ; সুতরাং আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে কেবল আপ্তবাক্যের উপর নির্ভর

করিতে হয়। আপ্তবাক্যে শ্রদ্ধা না থাকিলে অগত্যা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস হারাইতে হয়।

তাহা হইলে কী রহিল ? দেহ-মনগঠিত আমি ছাড়া আর কিছু রহিল না। এখন প্রশ্ন, এই নিতান্ত বাস্তব স্থূল আমিকে লইয়া কী করা যাইবে। দুই পথ আছে। এক চার্বাকের পথ—ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ ; ফাঁকি দিয়া যতটা পার সুখ করিয়া লও, মরিলে সব ফুরাইয়া যাইবে।

পথটা আপাতদৃষ্টিতে যতটা সুখকর মনে হয় আসলে ততটা নয়। ঋণ করিয়া সারাজীবন ঘৃত পাওয়া যায় না, চুরি-ডাকাতির পথও নিরাপদ নয়, ধরা পড়িলে ঘৃতের বদলে লাপ্‌সি ভক্ষণ করিতে হইবে। উপরন্তু মানব জীবনের যে-তিনটি প্রধান দুঃখ—রোগ জরা মৃত্যু—তাহাদের কোনই কিনারা হইতেছে না।

১৯-১-১৯৪৯

দ্বিতীয় পথ বুদ্ধ তথাগতের পথ।

বুদ্ধ বলেন, ভগবান আছেন কিনা আমি জানি না, বাস্তব জগৎ যে আছে তাহারও কোনও প্রমাণ পাই নাই। আমি যে-দুইটি বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা অহং-বিজ্ঞান এবং বস্তু-বিজ্ঞান ; অর্থাৎ আমি আছি এবং জগৎ আছে এই বিজ্ঞান বা perception আমার হইয়াছে। Perception-এর বাহিরে একটা নিরেট বাস্তব জগৎ আছে এমন কোনও প্রমাণ পাই নাই। এই perception বা বিজ্ঞানগুলিই দুঃখের কারণ ; যাহা সুখ বলিয়া মনে হয় তাহাও দুঃখ-পরিণামী, সুতরাং দুঃখই। এই দুঃখকে দূর করিতে হইলে perception-কে বিনাশ করিতে হইবে। Perception না থাকিলে অহং থাকিবে না, সুতরাং তাহার দুঃখভোগও হইবে না।

ইহাই বুদ্ধের logic, অতঃপর বৌদ্ধধর্মে যাহা আছে তাহা perception-কে বিনাশ করিবার প্রক্রিয়া।

বেদান্ত বলেন, perception-এর বিনাশ হইলেও অহং থাকে ; শিখা নষ্টে শিখী নষ্টঃ পুরুষো অনষ্টঃ। কিন্তু বুদ্ধের অহং এবং বেদান্তের অহং এক বস্তু নয়। বুদ্ধের অহং নির্বাণ পাইতে পারে ; কিন্তু বেদান্তের অহং—যদি থাকে—তবে তাহা অনির্বাণ।

২০-১-১৯৪৯

বেদান্তের অহং যখন প্রমাণসাপেক্ষ নয় তখন আপাতত তাহাকে বাদ দিতে হইবে।

বুদ্ধের অহং দেহ-মনগঠিত বাস্তব অহং, ইহার অস্তিত্ব আমরা সকলেই অনুভব করি, সুতরাং প্রমাণের প্রয়োজন নাই। অতি-আধুনিক বিজ্ঞান বুদ্ধের এই অহংকে স্বীকার করে, অন্য অহং স্বীকার করে না। বুদ্ধের logic-এর সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ নাই।

কিন্তু বুদ্ধ পুনর্জন্ম স্বীকার করিতেন। তবেই দেহের মৃত্যুর পর অহং বিদ্যমান থাকে তাহা স্বীকার করা হইল, এমন একটা অবস্থা কল্পিত হইল যাহার কোনও প্রমাণ নাই। এখানে বুদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাহিরে গেলেন। ইহা বুদ্ধের logic-এর একটা দোষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

কিন্তু এ-দোষ গুরুতর নয়। জন্মান্তর বাদ দিয়া ইহজন্মের কল্যাণের জন্যই বুদ্ধের তত্ত্ব ও প্রক্রিয়া মানিয়া লওয়া যায়। তারপর নির্বাণ লাভের সময়ে যদি দেখা যায় আত্মার নির্বাণ হইল না, আত্মা অজর অমর, তাহাতে লাভ বৈ ক্ষতি নাই। ইতিমধ্যে ত্রি-তাপের জ্বালাতো দূর হইল।

৩০-১-১৯৪৯

মহাত্মাজীর মৃত্যুর পর আজ এক বৎসর পূর্ণ হইল। জাতির মহাগুরুনিপাতের দিনে তদগতচিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি। স্মৃতিভার বহন করিবার জন্য আমরা পড়িয়া আছি,

ভারমুক্ত তিনি এখানে নাই। আজ তাঁহার দিব্য রথ কোন অজানা হইতে অজানায় ছুটিয়া চলিতেছে, কোন জ্যোতির্ময়লোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে, কে তাহার সন্ধান রাখে!

তাঁহার কর্মজীবনের কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে কেবল মানুষরূপে ভাবিবার চেষ্টা করি। কেমন ছিল তাঁহার গোপন অর্ন্তলোক? সেখানে প্রীতির ফুল কোন্ বর্ণ ধারণ করিয়া ফুটিত? তিনি বীতরাগ-ভয়-ক্রোধ হইয়াছিলেন, স্থিতধী হইয়াছিলেন; কিন্তু মানুষী রাগ-ভয় কি কখনও তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিত না?

জীবনকে তিনি সত্যের চক্ষু দিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তবু তিনি মায়ার ঊর্ধ্বে উঠিতে চান নাই, ঘোর বেদান্তীর মত সংসারকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই, বৈষ্ণবের মত এই ক্লেদ-পঙ্কিল সংসারকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। এই অপার মমতা একদিকে যেমন তাঁহাকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে আনিয়া ফেলে, অন্যদিকে তেমনি বুদ্ধ যীশুর পাশে দাঁড় করাইয়া দেয়।

হে মহাপ্রাণ মহাকারুণিক, হে নররূপী দেবতা তোমার জয় হক। মৃত্যুর মধ্যে তোমার দিব্য সাধনা জয়যুক্ত হক।

অসতো মা সদ্‌গময়—তমসো মা জ্যোতির্গময়—

১২-২-১৯৪৯

মহাত্মাজীর হত্যাকারী নাথুরাম গোডসেকে বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

হত্যার দ্বারা হত্যার প্রতিবিধান হয় না এ-কথা সত্য। কিন্তু মানুষের ন্যায়-বুদ্ধি মৃত্যুদণ্ডকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। প্রায় সব সভ্য দেশেরই আইনে অপরাধবিশেষের জন্য প্রাণদণ্ডের বিধি লিপিবদ্ধ আছে। বার্নার্ড শ মনে করেন সামাজিক জীবন রক্ষার জন্য কোনও কোনও মানুষকে হত্যা করা একান্ত আবশ্যক। মহাত্মাজী নিজে অহিংসাধর্মী ছিলেন, কিন্তু তিনি মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী ছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই।

গোডসে যে অপরাধ করিয়াছে তাহা ইতিপূর্বে কোনও হিন্দু করে নাই; এই প্রথম একজন হিন্দু ধর্মের জন্য একজন সাধু ব্যক্তিকে হত্যা করিল। মুসলমান ও খ্রীস্টানেরা এরূপ কার্য অনেক করিয়াছে; পাশ্চাত্ত্য দেশে সক্রেটিস যীশু প্রভৃতি অনেক শহীদ বা martyr আছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, সংস্কৃত ভাষায় শহীদ বা martyr শব্দের কোনও প্রতিশব্দ নাই।

২০-৩-১৯৪৯

শীত গিয়া গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িল। নতুন বর্ষ আরম্ভ হইতে আর দেরি নাই।

জীবনের পঞ্চাশটা বৎসর এই পৃথিবীতে কাটাইলাম। বহু বিচিত্র পথে বহু চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আমার জীবন চলিয়াছে। জীবনকে নিজের চেষ্টার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিয়াছি এমন কথা বলিতে পারি না। অদৃষ্ট শক্তি যখন যেদিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে তখন সেইদিকেই গিয়াছি। স্রোতের মুখে তৃণখণ্ড—

মানুষ প্রকৃতির গুণে কর্ম করে, কিন্তু মনে করে আমি কর্ম করিয়াছি—কর্তাহং ইতি মন্যতে। আমার সে অভিমান নাই। জীবনে যাহা কিছু করিয়াছি অবশে করিয়াছি, প্রকৃতি কান ধরিয়া করাইয়া লইয়াছে। ফাঁকতালে আমি কিছু আনন্দ ভোগ করিয়া লইয়াছি। আবার দুঃখও কম পাই নাই। অগ্নিসম দেবতার দান মাঝে মাঝে অন্তর পুড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু পঞ্চাশ বছরের সাল-তামামিতে তাহার জমাখরচ লিখিয়া লাভ নাই।

ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে আমরা জন্মিয়াছি। কালান্তর হইতেছে—এই সময়ে বহু

দৈবশক্তিসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব হয়। কয়েকটিকে দেখিয়াছি, আরও কিছু হয়তো দেখিব।

পঞ্চাশটা বছর একেবারে বৃথা যায় নাই।

১-৪-১৯৪৯

শরীর যখন মনের সঙ্গে তাল রাখিতে পারে না তখনই হয় মুশকিল। চুলে পাক ধরিয়াছে, দাঁত নড়িতেছে অথচ মনের মধ্যে মেনকা রম্ভার নৃত্য চলিয়াছে—এ বড় বিড়ম্বনা। বয়স যখন পঞ্চাশের কোঠায় পৌঁছায় তখন শরীর ও মনের এই বৈষম্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে।

যাঁহারা মনে করেন মন শরীরেরই একটা by product তাঁহারা এই বৈষম্য কী ভাবে ব্যাখ্যা করেন জানি না, হয়ত গ্রন্থিতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর আলোচনা শুরু করিয়া দেন। কিন্তু মন সন্তুষ্ট হয় না, সন্দেহ থাকিয়া যায় যে, শরীরের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও মন দেহের একটা বিকারমাত্র নয়, তাহার স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা আছে।

মনের যদি স্বাধীন সত্তা থাকে তাহা হইলে আস্তিক্যের পথে আর কোনও বাধা থাকে না, দেহের বিনাশে মন বা চিন্ময় সত্তার বিনাশ হয় না একথা সহজেই মানিয়া লওয়া যায়। অতঃপর প্রেতযোনি নরলোক ও পুনর্জন্ম আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, তখন ভগবানকে ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব।

সাংখ্য বলেন, মনও জড় বস্তু তবে সূক্ষ্ম জড়। মৃত্যুর পর ইহা বর্তমান থাকে এবং দেহান্তরে সঞ্চারিত হয়। এই মন অব্যয় পুরুষ হইতে ভিন্ন।

২-৪-১৯৪৯

অনেক ক্ষেত্রে মন বুড়া হইয়াছে, এমনও দেখা যায়। শরীর তাজা আছে অথচ মনটা স্থবির হইয়া পড়িয়াছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। মোট কথা, মন যে শরীরের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিবেই এমন কোনও কথা নাই।

আবার শরীরও সকল ব্যাপারে মনের তোয়াক্কা রাখে না। শরীর মনের অনুমতি না লইয়াই হৃদযন্ত্রকে সচল রাখে, অক্সিজেন গ্রহণ করে, অকস্মাৎ আওয়াজ শুনিয়া চমকিয়া ওঠে। মনের ইচ্ছা না থাকিলেও পেট কামড়ায়, কান কটকট করে, দাঁত কনকন করে। সুতরাং শরীরও স্বাধীন বলিতে হইবে।

কিন্তু সাধারণত শরীর ও মনের একটা সচেষ্ট সহযোগিতা আছে। মন যাহা চায় শরীর তাহা সমর্থন করে এবং শরীর যাহা কামনা করে মন চেষ্টা করিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া দেয়। উভয়ের মধ্যে সঙ্গতি অনেকটা গায়ক ও বাদকের ন্যায়। গায়ক যখন ত্রিতালে গান ধরিয়াছে বাদক তখন ঝাঁপতাল বাজায় না।

এই সহযোগিতার মূল কোথায়। উভয়ের উদ্দেশ্য অভিন্ন, তাই কি এই সহযোগিতা ? এই মূল উদ্দেশ্য কী ? আত্মরক্ষা ? বিজ্ঞান তাহাই বলে বটে। কিন্তু—

১০-৪-১৯৪৯

কিছুকাল পূর্বে বিখ্যাত মার্কিন লেখকের Grapes of Wrath উপন্যাসখানি পড়িয়াছি। বইখানি ভাল। লেখক ধনবাদের বিরোধী ; তিনি অতি নিপুণভাবে মার্কিন দেশের এক জাতীয় চাষাভূষার জীবনযাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা যে সর্বাংশে সত্যনিষ্ঠ তাহা বহু বিজ্ঞ সমালোচক

স্বীকার করিয়াছেন। সত্যনিষ্ঠ না হইলে বইখানি এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত না।

আমাদের কাছে, অর্থাৎ ভারতীয় পাঠকের কাছে এই পুস্তকে বর্ণিত চাষাভূষার জীবনযাত্রা অনেক দিক দিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমাদের দেশের চাষার সহিত মার্কিন দেশের চাষার আর্থিক অবস্থার আকাশ পাতাল তফাত। কিন্তু সে-তফাত ছাপাইয়া আর একটি পার্থক্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—তাহা নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য।

আমাদের দেশের চাষারাও সকলে সাধু সজ্জন নয়; তাহাদের জীবনে অনেক নোংরামি ও কদর্যতা আছে। কিন্তু মার্কিন চাষাদের তুলনায় আমাদের চাষারা যে কত সভ্য তাহা এই বইখানি পড়িলে হৃদয়ঙ্গম হয়। এমন কি আমাদের ভিল সাঁওতালদের মধ্যে যে সংস্কৃতির আদর্শ আছে তাহাও মার্কিন চাষাদের নাই। এক কথায় তাহারা বর্বর। Basic humanity ছাড়া আর কিছুই তাহাদের নাই। তাহারা শিশ্নোদরসর্বস্ব।

১৯-৪-১৯৪৯

ইতিপূর্বে জোলা ও মোপাসাঁ বর্ণিত ফরাসী চাষার যে বৃত্তান্ত পড়িয়াছি তাহাও প্রায় এই জাতীয়। হয়তো ফরাসী চাষার মনোবৃত্তি এতটা অকর্ষিত নয়, তবু তাহারা যে অতি অধম তাহা ফরাসী বস্তুতান্ত্রিক লেখকেরা জানাইতে ত্রুটি করেন নাই। ইংরেজি সাহিত্যে ইংরেজ চাষার সত্যনিষ্ঠ জীবনালেখ্য নাই। টমাস হার্ডি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য জীবনালেখ্য নয়, হার্ডির tragic প্রতিভা তাহাকে অনেকটা আদর্শায়িত করিয়াছে।

এই সব দেখিয়া মনে হয় আমাদের দেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেমন সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত সঞ্চারিত হইয়াছে পাশ্চাত্ত্য দেশে তেমন হয় নাই। ওদেশে spiritual ও cultural values এখনও সমাজের উপরিস্তরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে। যতই নীচের দিকে যাইবে ততই দেখিবে—নখদন্তায়ুধ আদিম মানুষ—একেবারে humanity in the raw.

আমাদের সংস্কৃতি প্রাচীন বলিয়া দুঃখ করিবার কিছু নাই। আমরা atom bomb আবিষ্কার করিতে পারি নাই বটে কিন্তু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ আমাদের চাষাদের মনেও বিদ্যমান আছে।

২৫-৪-১৯৪৯

গরু খাওয়া হিন্দুর নিষিদ্ধ। কেন নিষিদ্ধ তাহার কোনও সন্তোষজনক কারণ পাওয়া যায় না। পৃথিবীর সমস্ত জাতি এবং ধর্মের মানুষ গরু খায়, ইহাতে তাহার ধর্মের হানি হয় না, অথচ হিন্দু গরু খায় না। নিশ্চয় ইহার কোনও কারণ আছে।

বৈদিক যুগে গোমাংস ভক্ষণে নিষেধ ছিল না। বাড়িতে অতিথি আসিলেই গরু কাটা হইত। তারপর মহাভারতের যুগে দেখি গরু কাটা নিষিদ্ধ হইয়াছে। গোধন চিরদিনই আর্যদের মহার্ঘ সম্পত্তি; গোধন লইয়াই কুরু-পাঞ্চাল যুদ্ধের উৎপত্তি। কিন্তু গরু তখন আহার্য বস্তু নয়, গোদুগ্ধই আর্যদের পরম পানীয়।

আমার মনে হয় বৈদিক যুগ ও মহাভারতের যুগের মাঝখানে কোনও এক সময় ভারতবর্ষে দারুণ গো-মড়ক হইয়াছিল, যাহার ফলে দেশের অধিকাংশ গোধন নষ্ট হইয়া যায়। যে দুই চারিটি বাঁচিয়া ছিল তাহাদের রক্ষা করিবার জন্যই গো-মাংস অমেধ্য হইয়া থাকিবে। তারপর কালক্রমে সাময়িক নিষেধ ধর্মের অনুশাসনে পরিণত হইয়াছে।

২৬-৪-১৯৪৯

কেহ কেহ মনে করেন, ভারতবর্ষ গরম দেশ, এখানে গো-মাংস ভক্ষণ স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর, তাই গো-ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রস্তাবটা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসহ মনে হইলেও

প্রকৃতপক্ষে খুব নির্ভরযোগ্য নয়। ভারতবর্ষে কয়েক কোটি মুসলমান আছে, তাহারা গো-মাংস খায়। কিন্তু তাহাদের স্বাস্থ্য হিন্দুদের চেয়ে নিকৃষ্ট বলা চলে না। বরঞ্চ আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত ভালই বলিতে হইবে।

হিন্দুরাও গরু খায়, কিন্তু নলচে আড়াল দিয়া। গরুর দুধ যে আসলে গরুই একথা বলিলে গোঁড়া হিন্দু চটিয়া লাল হইয়া যাইবে। কিন্তু শিশু যখন মাতৃস্তন্য পান করে তখন সে যে মাতার দেহাংশই পান করে তাহা স্বীকার করিতে হিন্দুর আপত্তি নাই।

আসল কথা, মুসলমানেরা স্থূল গরুটা খায়, আমরা খাই তাহার নির্যাস—ক্ষীর ছানা নবনী। এগুলিই আমাদের শ্রেষ্ঠ ভোজ্য—পবমান্ন। গরু এগুলি আমাদের দান করে, তাই গরুর প্রতি আমাদের এত ভক্তি।

২৮-৪-১৯৪৯

'ছায়াপথিক' শেষ করিয়াছি। এক বৎসরে সাতটি গল্প শেষ করিলাম। সবগুলি মিলিয়া একটি উপন্যাসও পাওয়া গেল। বাংলা ভাষায় এরূপ গল্প জুড়িয়া উপন্যাস বোধহয় ইতিপূর্বে কেহ চেষ্টা করেন নাই।

গত এগার বৎসর সিনেমা-সমাজে বাস করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি তাহাই এই উপন্যাসের উপজীব্য। অনেক বিচিত্র চরিত্র দেখিয়াছি, তাহারাও অনেকে ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ঘটনাগুলি সর্বাংশে সত্য না হইলেও একেবারে কাল্পনিক নয়।

আমি যে সিনেমা-সমাজে থাকিয়াও এই কাহিনী লিখিতে পারিযাছি তাহার কারণ সিনেমা-ক্ষেত্র আমার আপন ঘর নয়, আমি অনাত্মীয়ের মত detached দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে পারিয়াছি। এবং শেষ পর্যন্ত আমার গল্পের নায়ক যে সিনেমা ছাড়িয়া চলিয়া গেল তাহার কারণও বোধহয় এই যে, সিনেমার সহিত আমার দীর্ঘ সংসর্গ সত্ত্বেও আমি সিনেমাকে ভালবাসিতে পারি নাই। কোনও মানুষই নিজের জীবিকাকে ভালবাসিতে পারে না যদি সেই জীবিকা তাহার স্বধর্ম না হয়। সিনেমার সহিত যদি টাকার সম্পর্ক না থাকিত তাহা হইলে হয়তো সিনেমাকে ভালবাসিতে পারিতাম।

১-৫-১৯৪৯

গীতায় মানুষের স্বধর্ম লইয়া আলোচনা আছে ; উত্তম পরধর্ম হইতে অধম স্বধর্ম ভাল একথা বলা হইয়াছে। এই স্বধর্ম কী বস্তু তাহা লইয়া নানা মুনির নানা মত।

স্বধর্ম যে হিন্দু ধর্ম মুসলমান ধর্ম জাতীয় একটা কিছু নয় তাহা বলাই বাহুল্য। এমন কি ইহা আধ্যাত্মিক কিছু নয়, ইহা নিতান্তই দেহ-মন ঘটিত ব্যাপার। ধাতুগত ব্যাপারও বলা যাইতে পারে।

অনেকদিন আগে আমি একটি ছেলেকে জানিতাম ; কেহ অসুখে পড়িয়াছে শুনিলে আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যাইত না, দিবারাত্র জাগিয়া সে রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করিত। পুরস্কারের লোভে কিংবা কর্তব্যের তাড়নায় করিত না। তাহার প্রকৃতি স্বভাবতই সেবাধর্মী ছিল বলিয়াই সে সেবা করিত।

এখানে সেবাই এ-ছেলেটির স্বধর্ম বলিতে হইবে। আবার এমন লোক অনেক দেখা যায় যুদ্ধ করাই যাহার প্রকৃতিগত ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেকগুলি স্বধর্ম মিশিয়া এক কিম্ভূতকিমাকার জীব তৈরি হইয়াছে। ইংরেজিতে এই জীবগুলিকে বলা হয়—Jack of all trades, but master of none.

২-৫-১৯৪৯

গীতায় বর্ণসঙ্করের প্রসঙ্গ বারংবার আলোচিত হইয়াছে। মনে হয় গীতাকারের মনে বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধে বেশ দুশ্চিন্তা আছে। বর্ণসাঙ্কর্য হইতে কী করিয়া মানুষকে রক্ষা করা যায় এই চিন্তা তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

বর্ণসঙ্কর কথার সাধারণ অর্থ অতি সহজ। বর্ণ চারি প্রকার—বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ। এক বর্ণের পুরুষের সহিত অন্য বর্ণের নারীর মিলনের ফলে যে সন্তান উৎপন্ন হয় সে বর্ণসঙ্কর। গীতাকার এই বর্ণসঙ্করের ঘোরতর বিরোধী।

প্রশ্ন ওঠে, গীতাকার একজন মহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি হইয়া এমন বোকার মত কথা বলিতেছেন কেন? বর্ণসঙ্কর যদি জন্মগ্রহণ করেই তাহাতে শিহরিয়া উঠিবার কী আছে? পৃথিবীর ইতিহাসে বর্ণমিশ্রণ তো সামান্য কথা, জাতিতে জাতিতে মিশ্রণ নিয়তই ঘটিতেছে। তাহার ফলে জাতির উন্নতি হইয়াছে: ইংরেজ এবং মার্কিন তাহার দৃষ্টান্ত। তবে এই সঙ্কীর্ণ মতবাদের মূল্য কী? ইহা কালধর্মের প্রভাব-জনিত অন্ধ গোঁড়ামি ছাড়া আর কী হইতে পারে?

গীতার বর্ণসঙ্কর-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে তাহার 'স্বধর্ম' বস্তুটিকে আরও ব্যাপকভাবে বোঝা দরকার।

৩-৫-১৯৪৯

শ্রীভগবান বলিতেছেন—গুণকর্ম বিভাগ দ্বারা তিনি চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের গুণ শম দম ক্ষমা ইত্যাদি, ক্ষত্রিয়ের গুণ তেজ বীর্য ইত্যাদি।

মানুষের কর্ম বা functionকে একটা broad classification দিতে গেলে দেখা যায় চারিটি ভাগ রহিয়াছে—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, ক্ষাত্র ধর্ম, বৈশ্য ধর্ম ও শূদ্র ধর্ম বা সেবাধর্ম। কোন মানুষের কোনটা 'স্বধর্ম' তাহা তাহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। Intellectual pursuits যাঁহার প্রকৃতিগত স্বভাব তিনি ব্রাহ্মণ। এইরূপ সর্বত্র। গীতা বলিতেছেন, স্বধর্মে নিধন শ্রেয় কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ। যিনি অন্তরে ব্রাহ্মণ তাঁহার পক্ষে বৈশ্যধর্ম পালন করিবার চেষ্টা ভয়াবহ—ইহার চেয়ে মরণ ভাল।

এখন কল্পনা করা যাক, একজন মানুষ আছে যাহার প্রকৃতি অর্ধেক ব্রাহ্মণ, অর্ধেক শূদ্র। প্রশ্ন: তাহার স্বধর্ম কী? সে কোন্ ধর্ম পালন করিবে?

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণসঙ্করাতঙ্কের কারণ বোধহয় এতক্ষণে পরিষ্কার হইতেছে। যেখানে একাধিক 'স্বধর্ম' লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে সেখানে অন্তর্বিবাদ অবশ্যম্ভাবী এবং এই বিবাদের ফলে মানুষের ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

৪-৫-১৯৪৯

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণসঙ্কর-সমস্যা সোজা eugenics-এর সমস্যা। আর কিছু নয়। তিনি বলিতেছেন, যদি ব্রাহ্মণ্যস্বভাববিশিষ্ট পিতার ঔরসে ক্ষত্রিয়স্বভাব মাতার গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে সে মাতা ও পিতার স্বভাব কিছু কিছু পাইবে; ফলে তাহার মনে বিরুদ্ধ ধর্মের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে তাহাতেই সে মারা যাইবে—সে কোনও কালেই একটা গোটা মানুষ হইতে পারিবে না।

আমি নিজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে আছে—আট আনা রকম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, ছয় আনা ক্ষাত্র ধর্ম, দুই আনা শূদ্র ধর্ম এবং বৈশ্য ধর্ম শূন্য। এইরূপ বিদঘুটে সংমিশ্রণ যে

শুধু আমার মধ্যেই আছে তাহা নয়, বোধকরি বর্তমান কালে সকল মানুষের মধ্যে অল্পবিস্তর অনুপাতে আছে। নির্জলা ব্রাহ্মণ বা নিভাঁজ শূদ্র অধুনা দুর্লভ। ইহার একমাত্র কারণ বর্ণসঙ্কর। বর্ণ অর্থে এখানে বংশগত বর্ণ নয়, প্রকৃতিগত বর্ণ বা স্বধর্ম বুঝিতে হইবে।

আজ যে পৃথিবী জুড়িয়া মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে বিরাট কলহ মাথা তুলিয়াছে তাহা শুধু বাহিরের কলহ নয়, মানুষ নিজের সহিত নিজে কলহ করিতেছে। তাহার স্বধর্ম হারাইয়া গিয়াছে। মানুষ আজ সত্যই ধর্মহীন হইয়াছে।

ইহার জন্য দায়ী বর্ণসাঙ্কর্য।

১৫-৫-১৯৪৯

সেদিন কোন একটা পত্রিকায় পড়িলাম, শরৎচন্দ্র কবে চন্দননগরে গিয়া কয়েকজন অনুরাগীর সহিত সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। আলোচানাটি পুরোপুরি উদ্ধৃত হইয়াছে।

লেখাটি পড়িয়া মনে হইল, সকলেই বুদ্ধিমানের মত কথা বলিয়াছেন, কেবল শরৎচন্দ্র ছাড়া। অথচ সে সভায় শরৎচন্দ্রের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি কেহই ছিল না।

কেন এমন হইল ? শরৎচন্দ্র কি সেদিন নেশা-ভাঙ করিয়াছিলেন ? আমার তা মনে হয় না। প্রতিভার সহিত বুদ্ধিবৃত্তির খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, বিশেষত সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার সহিত। স্বাস্থ্যবান সন্তান প্রজননের জন্য যেমন কুশাগ্র বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না, এও তেমনি।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি-প্রতিভা যখন আত্মস্থ ছিল, তখন তিনি ছিলেন অপরাজেয়। কিন্তু তিনি খুব বেশি বুদ্ধিমান ছিলেন না। শেষ বয়সে তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া চিন্তার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে যে কী মারাত্মক চিন্তা, যাঁহারা শেষ প্রশ্ন পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন।

১৬-৫-১৯৪৯

বাংলাদেশে যত চিন্তাশীল মনস্বী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন অগ্রগণ্য। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল, আইনে তিনি ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত ; বাঙালীর জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি নিজ মনস্বিতার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলাদেশ তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত।

কিন্তু আশুবাবু গল্প লিখিতে পারিতেন না, তিনি কখনও চেষ্টা করিয়াছিলেন এমন প্রমাণও নাই। আশুবাবু মহা-বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন বলিয়াই তিনি জানিতেন তাঁহার সৃষ্টি প্রতিভা নাই, তিনি ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট নন। শরৎবাবুর সঙ্গে তাঁহার এইখানে তফাৎ।

কদাচিৎ দুই একটি লোকোত্তর প্রতিভার জন্ম হয়, যাঁহারা সৃষ্টিশক্তিতে যেমন তেজস্বী, মননশক্তিতেও তেমনি শক্তিমান। এক কথায়, তাঁহারা যেমন সৃষ্টি করিতে পারেন, তেমনি চিন্তা করিতেও পারেন। তাঁহারা একাধারে শিল্পী এবং মনীষী।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এইরূপ লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আর শরৎচন্দ্র ছিলেন শুধুই শিল্পী।

২০-৫-১৯৪৯

আমার ছায়াপথিক বইখানি মূলত উপন্যাস, যদিও তাহা কয়েকটি গল্পের শিরোনামায় বিভক্ত। তাছাড়া দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গল্পও উহার মধ্যে আছে—'ললিত-লতা' এবং 'স্যাড

সঙ'।

পাঠকের মনে হইতে পারে, একটি ধারাবাহিক উপন্যাসের মধ্যে এরূপ অসংশ্লিষ্ট দুইটি গল্প ঢুকাইয়া দিবার মানে কি ? উপন্যাসেব কলেবর বৃদ্ধির জন্যই কি এরূপ করা হইয়াছে ?

একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, গল্প দুটি আপাতদৃষ্টিতে অবান্তর মনে হইলেও আসলে এই কাহিনীতে তাহাদের প্রয়োজন আছে। প্রথমত এই উপন্যাসে আমি সিনেমা জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছি ; সে হিসাবে গল্প দুটি অপ্রাসঙ্গিক নয়, কারণ এ দুটি গল্পও সিনেমার মানুষকে লইয়া। কিন্তু তার চেয়েও বড় একটা কারণ আছে : উপন্যাসে ব্যালান্স রক্ষার জন্য এই গল্প দুটির একান্ত প্রয়োজন। কাহিনীর হিরো সোমনাথ নানা প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও নিজ চরিত্র রক্ষা করিতে পারিয়াছিল ; ললিতলতা গল্পটি তাহাব উতোর। আবার সোমনাথ যেমন সহজে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, কুঞ্জবিহারীর ভাগ্য ঠিক তাহার বিপরীত।

আলো ও ছায়া—আলোকচিত্রের প্রাণ।

২২-৫-১৯৪৯

স্কন্দগুপ্তর সময়ের যে উপন্যাসখানা' ১৯৩৮ সালে আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহার কয়েকটি অধ্যায় লেখা হইবার পর বোম্বাই চলিয়া আসি। সেই অবধি অসম্পূর্ণ লেখাটা পড়িয়াছিল। অনেকবার লিখিব মনে করিয়া খাতা নাড়াচাড়া করিয়াছি ; কিন্তু এ ধরনের উপন্যাস আধখানা মন দিয়া লেখা যায় না, তাই উহা নূতন করিয়া ধরিতে সাহস হয় নাই। ইতিমধ্যে এই এগারো বছরে কাহিনীর অনেক সূত্র মনের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়, এগারো বছর আগে আমার মন যেরূপ ছিল, এখন যে ঠিক সেরূপই আছে, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। 'আমার সে মন গেছে বহুক্ষণ আমার এ মন ফেলে'—একেবারে পুরাপুরি না হোক, কিছুটা সত্য বটে। উপরন্তু শক্তিরও তারতম্য ঘটিয়া থাকিতে পারে। তখন আমার বয়স ছিল উনচল্লিশ, এখন পঞ্চাশ।

তবু আবার লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। গল্পের কাঠামো ভুলি নাই, তাহারই উপর নূতন করিয়া রঙ ফলাইতে আরম্ভ করিয়াছি। জানি না রোমান্সের রঙ আগের মত ফলিবে কিনা ; যদি শেষ করিতে পারি, পাঠকেরা হয়তো ধরিতে পারিবেন উপন্যাসের কোনখানে এগারো বছরের ব্যবধান।

২৪-৫-১৯৪৯

স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশী ভাষার উপর অনেক ঝুঁকি আসিযা পড়িয়াছে। পূর্বে রাজকীয় ব্যাপারে এবং কতকটা সাধারণ জীবনযাত্রার ব্যাপারেও অনেক ইংরেজি শব্দ চালু হইয়াছিল। টেবিল-চেয়ার, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের জিহ্বায় স্থায়ী আসন পাতিয়াছিল। তাহাদের এখন উৎখাত করিতে হইবে।

তাই বলিয়া ইংরেজি শব্দ সর্বৈব ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। চেষ্টা করিলেও তাহা পারা যাইবে না। গেলাস কথাটা সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব হইয়া গিয়াছে, পেন্সিল কথাটাও একেবারে ঘরোয়া—উহাদের তাড়াইবার চেষ্টা বৃথা। ম্যালেরিয়াকে যতদিন বাঙালীর হাড় হইতে বাহির করা না যাইতেছে ততদিন এই শব্দটাকেও বহিষ্কার করা যাইবে না।

কিন্তু বেশিরভাগ ইংরেজি সংজ্ঞাবাচক শব্দকে জোর করিয়া দূর করিতে হইবে। দারোগাকে আমরা দারোগাই বলিব, কোটাল বলিতেও রাজি আছি, কিন্তু কিছুতেই সাব-ইন্সপেক্টর বলিব না।

২৫-৫-১৯৪৯

বাংলাদেশে নূতন শব্দ রচনার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি বসাইয়াছেন, কাগজপত্রে লেখালেখি হইতেছে। মনে হইতেছে, সকলেই এ বিষয়ে বেশ উদ্যমশীল। অনেক শব্দ তৈয়ার হইয়াছে এবং তাহাদের চালু করিবার চেষ্টা হইতেছে। চেষ্টা কিন্তু সফল হয় নাই।

দু'একজন কিছু সমালোচনাও করিয়াছেন ; তন্মধ্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও আচার্য যোগেশচন্দ্র উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে যোগেশবাবু একটি কথা বলিয়াছেন, তাহা সর্বাগ্রে প্রণিধান করা কর্তব্য। যে সজ্ঞাসূচক নূতন শব্দগুলি তৈয়ার হইবে, সেগুলি শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতবর্ষের জন্যই তৈয়ার করিতে হইবে। বাংলাদেশের পণ্ডিতরা যেখানে প্রতীহার শব্দ চালু করিলেন, বিহারে যদি তাহা দারোগা নামে পরিচিত হয় এবং পাঞ্জাবে কোৎবাল নামে অভিহিত হয়, তাহা হইলে লোক চেনা ভার হইবে। তাই মনে হয়, শব্দ রচনা কেবলমাত্র বাঙালী সমিতির দ্বারা না হইয়া সর্বভারতীয় সমিতির দ্বারা হওয়া উচিত, দক্ষিণ ভারতকেও বাদ দেওয়া চলিবে না। সকলে মিলিয়া যাহা রচনা করিবেন, তাহা সর্বপ্রদেশে গ্রাহ্য হইবে।

বাংলাদেশের এই একক চেষ্টা বৃথা পরিশ্রম বলিয়া মনে হয়।

৩০-৫-১৯৪৯

মানুষের গল্প বলিবার অভ্যাস নূতন নয়। আমার বিশ্বাস মনুষ্যজাতি সুসংবদ্ধভাবে কথা বলিতে শেখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরকে গল্প শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। যে যত অত্যাশ্চর্য ও চমকপ্রদ গল্প বলিতে পারিত, সে তত অধিক শ্রোতা আকৃষ্ট করিত। ফলে গল্প আষাঢ়ে গল্প হইয়া দাঁড়াইল।

ইহা গল্পের আদিম অবস্থা। আমাদের পুরাণ এবং সর্বদেশের মাইথোলজি এই শ্রেণীর উপন্যাস। ক্রমে আষাঢ়ে গল্পে মানুষের অরুচি ধরিল। যাহা অবিশ্বাস্য তাহাতে দীর্ঘকাল কাহারও আসক্তি থাকে না। তখন আসিল মহাকাব্যের যুগ।

মহাকাব্যে গল্পকে যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য করিবার চেষ্টা আছে, কিন্তু কবিগণ আজগুবি গল্প বলিতে এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, দেব-দানব এবং অলৌকিক কার্যকলাপ একেবারে বাদ দিতে পারিলেন না। তবু মানুষী ভাবনা কতকটা দেখা দিল। রাজা-রাজড়া ও বীর লইয়া মহাকাব্যের কারবার, তাঁহারা মানুষ হইলেও কার্যত অতিমানুষ। মহাভারত রামায়ণ ইলিয়ড্ ওডিসি এই শৈলীর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

৩১-৫-১৯৪৯

কেবলরাজা-রাজড়ার কথা শুনিয়া সাধারণ মানুষের তৃপ্তি হয় না, সে নিজের কথাও শুনিতে চায়। তাই মহাকাব্যের পর আসিল রোমান্স। রোমান্সে সামান্য মানুষকে অসামান্য করিয়া দেখাইবার চেষ্টা আছে। মানুষ দীনহীন নয়, অকিঞ্চিৎকর নয়, তাহার জীবন অতিপ্রাকৃত না হইয়াও রূপে রসে ভরপুর—সবার উপরে মানুষ সত্য। ইহাই রোমান্সের বাণী মৃচ্ছকটিক রচনার পর হইতে আজ পর্যন্ত রোমান্সের ধারা বহিয়া চলিতেছে, এখনও তাহার স্রোতে ভাটা পড়ে নাই।

রোমান্সই গল্প-কলার চরম পরিণতি। সম্প্রতি যাঁহারা গল্প বলার ছলে বস্তুতন্ত্রের প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে গল্পকার নয়, তাহারা কেহ নীতিবাদী, কেহ প্রগতিবাদী, কেহ সত্যবাদী, কেহ নিছক মিথ্যাবাদী। গল্প বলার অছিলায় তাঁহারা নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করিতেছেন, কালিমাখা কাচখণ্ড দিয়া সূর্যকেও কালো দেখিতেছেন। মানুষ যে অতি জঘন্য ও

কুৎসিত তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর।

কিন্তু হায়, গল্প জমিতেছে না।

২৬-৮-১৯৪৯

মনুষ্য সমাজে যে সকল ঘটনা নিত্য ঘটিয়া থাকে এবং যে সকল চরিত্র অত্যন্ত সাধারণ, সেই সকল ঘটনা ও চরিত্র বাস্তবপন্থী লেখকের উপজীব্য। আর যে ঘটনা কদাচিৎ ঘটে এবং যে চরিত্র অতি-বিরল তাহাদের লইয়া রোমান্সপন্থীর কারবার। এই শর্তে রোমান্সপন্থীদের পন্থা দ্বিবিধ। এক, ঘটনা অসামান্য, কিন্তু চরিত্র সাধারণ ; অথবা ঘটনা সামান্য, চরিত্র অসামান্য। দৃষ্টান্তরূপে এইচ জি ওয়েলসকে প্রথম শ্রেণীর ও শরৎচন্দ্রকে দ্বিতীয় শ্রেণীর রোমান্সপন্থী বলা যাইতে পারে। আর এক তৃতীয় শ্রেণীর রোমান্সপন্থী আছেন, যাঁহারা ঘটনা ও চরিত্র উভয়ের মধ্যেই অসামান্যতা আনিয়া আমাদের চমৎকৃত করিয়া দেন ; তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচয়িতা। বঙ্কিমচন্দ্র টলস্টয় এই শ্রেণীর লেখক। যাহা সাধারণ, যাহা গতানুগতিক বিশেষত্ববর্জিত তাহা সৃষ্টিধর্মী রচনার পটভূমিকা হইয়া থাকিবার যোগ্য, ততোধিক মর্যাদা তাহাকে দিলে সেন্স অব ভ্যালুজ নষ্ট হইয়া যায়। বাস্তবপন্থার ইহাই প্রধান দোষ।

২৭-৮-১৯৪৯

কেহ কেহ সমাজ সংস্কারের মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া বাস্তবপন্থা অবলম্বন করেন। যেমন জোলা। মানুষ নিজের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য যে সমাজ সৃষ্টি করিয়াছে, মানুষের দোষে যখন তাহা কদর্য হইয়া ওঠে, তখন সংস্কারক কথা-সাহিত্যের সাহায্যে সেই সকল কদর্যতা লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরেন এবং সকলকে পরোক্ষভাবে এই সকল দোষ-ত্রুটির সংস্কার করিবার জন্য আহ্বান করেন।

এ বিষয়ে দুইটি কথা বলা যাইতে পারে। প্রথম কথা, কদর্যতাকে প্রকাশ করিয়া দিলেই যে তাহার নিরাকরণ হইবে, এমন কোনও কথা নাই। আমাদের সমাজে কোন কোন দোষ-ত্রুটি আছে, তাহা আমরা সকলেই জানি, সাহিত্যের মারফতে তাহা পরিবেশন করিলে আমাদের জ্ঞানের মাত্রা বাড়িবে না। উপরন্তু আমরা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া সমাজ-সংস্কারে লাগিয়া যাইব, সে সম্ভাবনাও কম। গিরিশচন্দ্র অর্ধশতাব্দী পূর্বে 'বলিদান' লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেজন্য পণ-প্রথা কমে নাই।

দ্বিতীয় কথা, সংস্কারক বলিয়া উপদেশ দিবার অধিকার থাকা চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, চাপরাশ না থাকিলে যতই বক্তৃতা দাও, কেহ শুনিবে না। আমাদের বাস্তবপন্থী সাহিত্যিকদের চাপরাশ আছে কি ? যে দেশে বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ জন্মিয়াছেন, সে দেশে পুঁচকে সাহিত্যিকের বক্তৃতা দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নয় কি ?

৫-২-১৯৫০

কালের মন্দিরা শেষ করিয়াছি। বারো বছর ধরিয়া মাছের কাঁটার মত গল্পটা আমার গলায় বিঁধিয়া ছিল, এতদিনে বাহির হইল। বেশ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছি, আবার কেমন যেন একটু ফাঁক ফাঁক ঠেকিতেছে।

১৯৩৮ সালে মুঙ্গেরে থাকাকালে গল্পটা আরম্ভ করিয়াছিলাম। ভাবিতেছি, তখন একটানাভাবে লিখিয়া যদি উহা শেষ করিতাম, তাহা হইলে কেমন হইত ? এখন যেমন

দাঁড়াইয়াছে, তাহার চেয়ে ভাল হইত কি ?

এখন যে কী দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমি জানি না। হয়তো ভাল হইয়াছে, হয়তো কিছুই হয় নাই। এইটুকু শুধু বলিতে পারি, আমি লিখিয়া আনন্দ পাইয়াছি ; রসজ্ঞ সমালোচকদের যদি ভাল না লাগে, তবে এই আনন্দটুকুই আমার পুরস্কার এবং ভাবিয়া দেখিতে গেলে এর চেয়ে বড় পুরস্কার লেখকের আর নাই।

আমার মস্তিষ্কের মধ্যে যে পরম ছিদ্রান্বেষী সদাজাগ্রত সমালোচকটি আছে, সে আমার পিঠ চাপাড়াইয়া বলিতেছে—ভয় নাই।

দেখা যাক। কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।

১০-২-১৯৫০

পূর্বে আমাদের দেশে সাহিত্য রচনার মধ্যে যে একটি intellectual আভিজাত্য ছিল ! তাহা আজকাল আর দেখা যায় না। আগে লেখকরা সাধারণের নিকট হইতে যে সম্মান ও সম্ভ্রম পাইতেন তাহা ছিল সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত। আজকালও বড় বড় লেখকদের সম্মান করিবার নীতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই বটে কিন্তু উহা যেন জোর করিয়া সম্মান দেখানো।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় শরৎচন্দ্রের পর হইতে এইরূপ ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রই প্রথম সধারণ মানুষকে সাহিত্যের উপজীব্য করিয়া পাঠকের সম্মুখে খাড়া করিয়াছেন। তাহার একটা ফল এই হইয়াছে যে সকলেই মনে করিতেছে সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কিত করা ভারি সহজ। কলম হাতে লইলেই লেখা বাহির হয়, যে-কেহ একটু সুসঙ্গত কিছু লিখিতে পারে সেই লেখক হইয়া দাঁড়ায়। ছাপিবার কাগজেরও অভাব নাই। লেখকের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে কে কাহাকে সম্মান করিবে ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ফলে সাহিত্যিক তো সম্মান হারাইতেছেনই, সাহিত্যও সম্মান হারাইতেছে।

১১-২-১৯৫০

সাহিত্য সাধারণের ক্ষেত্র নয় ; অ-সাধারণ গুণযুক্ত অল্পসংখ্যক ব্যক্তির ক্ষেত্র। Toynbee যাহাকে Creative minority বলিয়াছেন, সাহিত্যিক সেই সৃষ্টিধর্মী সংখ্যালঘুর দলে। এখানে অনধিকারীর প্রবেশ নিষেধ। কবিগুরু পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছেন,—'ল্যাজ আর কবিত্ব টেনে বার করা যায় না।' কবিত্ব সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যেরই একটা শাখা।

যাহার গানের গলা নাই সে ওস্তাদ গায়ক বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না, সেজন্য সুর সমৃদ্ধ সহজাত কণ্ঠস্বর চাই। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাই যে-কেহ গিয়া তাল ছাড়িতে পারে না। সহজাত গুণ এবং সাধনা যাহার আছে সেই আসরে স্থান পায়। কিন্তু সাহিত্যের আসরে দেখা যায়, সহজাত গুণ তো দূরের কথা, এতটুকু সাধনা পর্যন্ত যাহার নাই সেও সাহিত্যের আসরে আসন দাবী করে। শুধু কাগজের উপর কলমের আঁচড় কাটিলেই হইল।

ইহার জন্য কতকটা দায়ী journalism. সাংবাদিকের সাহিত্য প্রতিভার প্রয়োজন নাই কিন্তু সাহিত্যখ্যাতির প্রতি লোভ আছে। তাই সে সাহিত্য ও journalism এর মধ্যে গোলে-হরিবোল করিয়া সাহিত্যিক খ্যাতি দাবী করে।

১২-২-১৯৫০

Journalistও লেখে, সাহিত্যিকও লেখে ; উভয়ের লেখাই চিত্তাকর্ষক হইতে পারে;

উভয়ের লেখাই ছাপা হয়। তবেjournalist ও সাহিত্যিকে তফাৎ কোথায় ?

এই কূটতর্কের ছিদ্র পথে অনেক অ-সাহিত্যিক সাহিত্যের দুর্গে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। মুশকিল এই যে এই ছদ্মবেশীগুলাকে ধরাইয়া দেওয়া সহজ নয়। নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহারা সাহিত্যেরই চেহারা বদলাইয়া দিতে চায়। তাহারা বলে, 'কেবল রসসৃষ্টিই সাহিত্যের ধর্ম নয়, সত্য উদ্‌ঘাটনও সাহিত্যের লক্ষ্য। আমরা সত্য উদ্‌ঘাটন করিয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছি।'

এই পন্থার ভারি সুবিধা। যেখানে রসসৃষ্টির বালাই নাই, সেখানে একটা নোংরা কথা বলিতে পারিলেই তাহা সত্য হইয়া উঠিবে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত সত্য আছে যে সত্য কথা না বলা একপ্রকার অসম্ভব। যাহাই বলা যাক না কেন, কোনও না কোনও ক্ষেত্রে উহা সত্য হইবে। নোংরা কথার প্রতি তাই অসাহিত্যিকের এত টান ; নোংরা কথা শুধু সত্য নয়, মুখরোচকও বটে।

১৫-২-১৯৫০

সামন্তক মণি লইয়া পুরাণে একটি আখ্যায়িকা আছে। কৃষ্ণ এই আখ্যায়িকার নায়ক। আজগুবি ও অনৈসর্গিক ব্যাপার বাদ দিলে এই আখ্যায়িকা হইতে বেশ একটি adventure story উদ্ধার করা যায়।

প্রথম যখন বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র পড়ি তখন এই গল্পটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক করিয়া এই গল্পটির নূতন রূপ দিবার ইচ্ছাও হইয়াছিল। কিশোরদের পাঠোপযোগী গল্পের[৪] উপকরণ ইহাতে যথেষ্ট আছে। সেই সঙ্গে মানুষ কৃষ্ণের চরিত্র অঙ্কিত করিবার সুযোগও আছে। কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বানাইয়া দিয়া আমরা মনুষ্যত্বের একটি সুন্দর আদর্শ হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়াছি।

দ্বিতীয়বার কৃষ্ণচরিত্র পড়িয়া কৃষ্ণের মানুষ চরিত্র লইয়া গল্প লিখিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে। কৃষ্ণের চরিত্র সত্যই বড় সুন্দর ; সংসারে থাকিয়া সংসারের সমস্ত কার্যে যোগ দিয়াও আধ্যাত্মিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা যায় কৃষ্ণ তাহা দেখাইয়াছেন। সংসারত্যাগী সাধু অনেক আছেন ; কিন্তু কৃষ্ণ একটিই।

২১-২-১৯৫০

এক রাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছিল। রানী বনে পালাইয়া গিয়া এক কন্যা প্রসব করেন। বনে বাঘ ভাল্লুক ছিল, তাহারা রানীকে মারিয়া ফেলিল। কিন্তু নবজাত রাজকন্যাকে মারিল না।

রাজকন্যা বনের পশুদের মধ্যে বড় হইয়া উঠিলেন। বাঘ তাঁহাকে শিকার করিতে শিখাইল, ভাল্লুক ফলমূল সংগ্রহ করিতে শিখাইল। ক্রমে রাজকন্যার যৌবন উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি কাপড় পরিতে জানেন না, অন্য পশুদের মত উলঙ্গ থাকেন।

মাঝে মাঝে তাঁহার মন বড় হু হু করে। তিনি ভাবেন, বাঘের বাঘিনী আছে, ভাল্লুকের সাথী আছে ; আমার দোসর নাই কেন ? আমার মত চেহারা বনে আর নাই কেন ?

ক্রমে যৌবন কাটিয়া গেল ; রাজকন্যার দেহের চর্ম লোল হইল। বনের সকলে তাঁহাকে মান্য করে, রানী বলিয়া ডাকে ; তবু তাঁহার মনে সুখ নাই। একদিন আকাশ দিয়া পুষ্পক রথ যাইতেছিল একটি মানুষ তাহা হইতে বনে লাফাইয়া পড়িল। মানুষকে দেখিয়া রানীর বড় লজ্জা হইল ; মানুষের গায়ে কাপড় চোপড় ; তিনি নগ্ন। রানী ছুটিয়া গিয়া গুহায় লুকাইলেন।

তারপর একটা বাঘ আসিয়া মানুষটাকে মারিয়া ফেলিল।

পৃথিবীর সকল মানুষের অবস্থাই কি রানীর মত নয় ?

২২-২-১৯৫০

জগতে যত দুর্লভ বস্তু আছে, মনের মানুষ তার মধ্যে সব চয়ে দুর্লভ। তাই বিদ্যাপতি খেদ জানাইয়াছেন- প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক। চণ্ডীদাস আক্ষেপ করিয়াছেন, কোটিকে গুটিক মিলে।

অজ্ঞাতচরিত্র বিপরীতধর্মী মানুষের সঙ্গে আমাদের জীবন কাটাইতে হয়। বাঘ ভাল্লুকই বেশি; অথচ জীবনের শিক্ষাদীক্ষা ইহাদের কাছেই গ্রহণ করিতে হয়। কাজ কারবারও ইহাদের সঙ্গে। পদে পদে স্বধর্ম লঙ্ঘন করিয়া, পরের কথায় উঠিয়া বসিয়া, পরের সহিত সঙ্গতি বজায় রাখিয়া জীবন যাপন করিতেছি। মাঝে মাঝে প্রাণ হু হু করিয়া ওঠে, মনে হয় এ কোন্ ভয়ঙ্কর অরণ্যে বাস করিতেছি! এখানে আপন জন তো কেহ নাই! যাহাদের সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে বাস করিতেছি, যাহাদের নিকট স্নেহ সম্মান শ্রদ্ধা লাভ করিতেছি তাহারাও যে নিতান্ত অপরিচিত।

এই ভয়ঙ্কর একাকীত্ব সকলে বোঝেনা, হাসিয়া খেলিয়া জীবন কাটাইয়া দেয়। যিনি কবি, তিনি বোঝেন, কিন্তু কবি আশাবাদী। তাঁহার প্রাণে আশা মরিয়াও মরিতে চায় না। তাই তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন—

উৎপৎস্যতেহস্তি মমকোহপি সমানধর্মা—।

২৮-২-১৯৫০

Toynbee রচিত **A Study of History** সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পড়িলাম। অনবদ্য লিখনভঙ্গী, গভীর পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম কল্পনাশক্তি, সবই আছে; মানব জাতির ইতিহাসকে তিনি নূতন চক্ষু দিয়া দেখিয়াছেন এবং তাহার সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সূত্রগুলি জটিল, কিন্তু কোথাও জট পাকাইয়া যায় নাই।

তবু এই অপূর্ব গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে একটি কথা বারবার চোখে পড়ে—লেখকের মন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে পারে নাই; **Western Culture** এবং **Christianity** সম্বন্ধে তাঁহার মনে দুর্বলতা আছে। তাঁহার খরধার বুদ্ধি এই দুর্বলতার কাছে পরাভূত হইয়াছে।

Spiritual values সম্বন্ধেও লেখকের বুদ্ধি বেশ কাঁচা। প্রেমকেই তিনি সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক স্থান দিয়াছেন; তা দিন, আপত্তি নাই। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম নামে যে আরও দুটি পন্থা আছে তাহা তিনি জানেন বলিয়াও মনে হয় না। **Indic culture** সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা অতলস্পর্শ। গীতায় শুধু সংসার হইতে পলায়নের কথা আছে! বুদ্ধের ধর্ম বড় নির্দয়, তাহাতে করুণার স্থান নাই যীশু খৃষ্টই প্রথম প্রেমধর্ম প্রচার করেন!

১-৩-১৯৫০

Toynbeeর প্রাণে কবিত্ব আছে; মানুষের জীবনকথা তাঁহার লেখনীমুখে ছন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। আদিম মানুষ সভ্যতা জানিত না; কেমন করিয়া তাহার জীবনে ঘাতপ্রতিঘাতের দোলা লাগিল; নদীর মোহানায় জলাভূমির উপর কেমন করিয়া জীবনযুদ্ধের সংঘাতে সংঘাতে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল; মানুষ পশুপালন শিখিল, কৃষি শিখিল—এ যেন এক মহাকাব্য।

তারপর আরম্ভ হইল অন্তর্দ্বন্দ্বের যুগ—আদর্শে আদর্শে ঠোকাঠুকি। কত সভ্যতা তলাইয়া গেল, কেহ বা মরিয়াও বংশধর রাখিয়া গেল—পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের উপর এই নাট্যাভিনয় চলিতেছে।

Toynbeeর ইতিহাস-বেদ এখনও শেষ হয় নাই। অনেক কথা বলিতে বাকি আছে।

Western Civilisationকে তিনি একমাত্র জীবন্ত সভ্যতা বলিয়াছেন। এই সভ্যতা কোনপথে চলিয়াছে, জীবনপথে কতদূর চলিয়াছে—সে কথা এখনও বিশদ ভাবে আলোচিত হয় নাই। এই সভ্যতার যে অপঘাত মৃত্যু ঘটিবার সম্ভবনা ক্রমেই অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে সে সম্বন্ধে Toynbee কতখানি সচেতন তাহা জানিনা। প্রতীক্ষা করিয়া আছি।

২-৩-১৯৫০

কোনও সভ্যতাই অমব নয। কিন্তু সত্য অমব। তাই যুগে যুগে একই সভ্যতা নব কলেবর ধরিয়া দেখা দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা যদি আত্মঘাতী হয, তবু সে যে-সত্যের সন্ধান পাইযাছে তাহা লুপ্ত হইবে না। জীবনের ধন কিছুই যায়না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা, পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে। যদি মানুষ বাঁচিযা থাকে তবে সে জীবনেব ধন ধূলা হইতে তুলিয়া লইবে এবং আবার নূতন সভ্যতা গডিয়া তুলিবে। ইহাই মানুষের evolutionary process.

কিন্তু একটা কথা আছে। এই evolutionary process কি অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে ? ইহার কি শেষ নাই ? এমন সময় কি কখনও আসিবে না যখন বিবর্তনের ক্রিয়া শেষ হইবে, আর উন্নতির অবকাশ থাকিবে না ?

এই চরম পরিপূর্ণতার অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে। হয়তো উপনিষদের তত্ত্বমসি বাক্যের মধ্যেই এই অন্তিম সত্য মন্ত্রীভূত হইযা আছে। যদি তাই হয় তবে evolution-এর শেষ কথা তো আমরা জানিতে পারিয়াছি। তবে আর বাকি কী আছে ?

৩-৩-১৯৫০

বুদ্ধির দ্বাবা যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। এই জ্ঞান যখন বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া উপলব্ধির ক্ষেত্রে উপনীত হয় তখন তাহার আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, তখন তাহা সত্তার সহিত মিশিয়া একীভূত হইয়া যায়।

একটা উদাহরণ ধরা যাক। হৃদ্-যন্ত্র। আমার হৃদ্-যন্ত্র আপনা আপনি স্পন্দমান হইয়া শরীরের সর্বত্র বক্ত স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, আমার চেষ্টা বা ইচ্ছার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না; জীব নিজের চেষ্টায় প্রয়োজনের তাগিদে হৃদ্‌যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং সতর্কভাবে উহার ক্রিয়া পরিচালিত করিয়াছিল। ক্রমে এই চেষ্টা সহজ বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে, উহার ক্রিয়া দেহমনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

জ্ঞানও তেমনি যখন জীবের সত্তার সহিত অঙ্গীভূত হইয়া যায় তখনই তাহা প্রকৃত জ্ঞান। তত্ত্বমসি বাক্যও এখন আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য। যখন উহা সকল জীবের সহজাত প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়াইবে তখনই evolution-এর ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইবে।

১৪-৩-১৯৫০

আজকাল বিশ্বসাহিত্যে অশ্লীলতার জোয়ার আসিয়াছে। অক্ষম লেখকের কামকণ্ডূতি নয়, যাঁরা শক্তিমান তাঁরাও সুযোগ পাইলেই একটু মুখখিস্তি করিয়া লইতেছেন। বাঙালী সাহিত্যিক বিদেশ হইতে ভাল জিনিস বিশেষ কিছু আদায করিতে পারেন নাই ; কিন্তু অশ্লীলতার বেলায় তিনি অগ্রণী।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে অশ্লীলতার দুইটি কারণ আছে। এক,mid-Victorian নিগ্রহের

প্রতিক্রিয়া দুই, ফ্রয়েড । তাহাদের অশ্লীলতা বুঝিতে পারি । কিন্তু বাঙালীর এ রোগ কেন ? শুধুই কি মর্কট-বৃত্তি ? না, অন্য কারণও আছে ?

অন্য কারণটি, আমার মনে হয়, বাঙালীর ধাতুর মধ্যেই আছে । বাঙালী কামপ্রবণ জাতি ; তাই তাহার সাহিত্যও রতিরসে ওতপ্রোত । এমন কি বাঙালীর অধ্যাত্ম সাহিত্যও রিরংসার মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে—চণ্ডীদাস গোবিন্দ দাস প্রভৃতি সাধক কবির রচনা তাহার প্রমাণ । খেউড় তর্জা আমাদের লোক-সাহিত্য । সুতরাং একটা সুযোগ পাইলেই যে বাঙালী সাহিত্যিক রতিরঙ্গরসে মাতিয়া উঠিবেন তাহা বিচিত্র নয় ।

১৫-৩-১৯৫০

মাঝে প্রায় পঞ্চাশ বছর বাঙালীর প্রাণে কামবন্যায় ভাটা পড়িয়াছিল, বাংলা সাহিত্যের রুচি ভদ্র ও মার্জিত হইয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্রই সাহিত্যে এই শুচিতার প্রবর্তক ; কিন্তু তিনি এই ধারা পরিবর্তনের কর্তা নয় । প্রকৃত কর্তা বাঙালী শিক্ষিত সমাজের উপর ব্রাহ্মধর্ম এবং ঠাকুরগুষ্ঠির প্রভাব । ব্রাহ্ম সমাজ শালীনতার আদর্শ লাভ করিয়াছিল mid-VictorianEngland হইতে ; বঙ্কিমচন্দ্রও ঐ আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন । তারপর রবীন্দ্রনাথ অলৌকিক প্রতিভার বলে এই শুচিতার সংস্কার অনেকদিন বজায় রাখিয়াছিলেন ।

অবশেষে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় শতকে রবীন্দ্রনাথের হাত হইতে বঙ্গসাহিত্যের রাজদণ্ড খসিয়া পড়িল ; রাজা হইলেন শরৎচন্দ্র । দুর্বল রাজা, তাই তাঁর শাসনকালেই রাজ্যের মধ্যে যতপ্রকার অরাজকতা ঢুকিয়া পড়িল । পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে তখন Joyce, D. H. Lawrence-এর পূর্ণ অধিকার । বাঙালী সাহিত্যিক বিবস্ত্র হইয়া নাচিতে নাচিতে তাহাদের অনুসরণ করিল ।

১৬-৩-১৯৫০

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতা ও যৌনপ্রসঙ্গের পুনরাবির্ভাব । যেন অশ্লীলতা এতদিন তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বেদখল হইয়াছিল, এখন আবার দখল পাইল ।

চারিদিকে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল । যে সব নবীন লেখক অশ্লীলতাকে আনিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন তাঁহারা অধিকাংশই এখন জীবিত, তাঁহাদের নাম করিব না । তাঁহাদের লইয়া মুখখিস্তির হোলি খেলা আরম্ভ হইয়া গেল । তাঁহারা সাহিত্যক্রিয়ার নামে অশ্লীলতা করিলেন, আর এক দল তাঁহাদের কুরুচিকে গালি দিবার ছুতায় মুখখিস্তি করিল । আসর বেশ জমিয়া উঠিল।

এই নূতন অশ্লীলতা ভোল বদলাইয়া আসিয়াছে ; তাহার মাথায় সত্যনিষ্ঠার তাজ, পায়ে ফ্রয়েডের বুটজুতা । তাই তাহাকে সেই পুরাতন তর্জা-খেউড় বলিয়া কেহ চিনিতে পারিল না । অস্পৃশ্য ডোম যেন খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া এখন সকলের সহিত সমান আসনে বসিয়াছে এবং সমপদস্থের ন্যায় শেক্ হ্যান্ড করিতেছে ।

১৭-৩-১৯৫০

প্রশ্ন এই : যৌনপ্রসঙ্গ ও অশ্লীলতা বাদ দিয়া কি সাহিত্য রচনা করা যায় না ?

ইহার উত্তর বঙ্কিম রবীন্দ্র দিয়াছেন, দেশবিদেশের অসংখ্য শক্তিমান লেখক দিয়াছেন ।যৌন

প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু অশ্লীলতা বাদ দেওয়া যায়। মানুষকে মানুষ রূপে অঙ্কিত করিতে হইলে তাহার ক্ষুৎপিপাসার সঙ্গে যৌনবৃত্তিরও হিসাব রাখিতে হয়, নহিলে গোটা মানুষটা পাওয়া যায় না। কিন্তু যৌনবৃত্তির হিসাব রাখিতে হইলেই যে তাহাকে উলঙ্গ করিয়া দেখাইতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। ডাক্তার রোগীর পেট না চিরিয়াও পাকস্থলীর সংবাদ পাইতে পারেন। আসল কথা, কাম বস্তুটাকে **sublimate** করিয়া তাহাকে আদিরসে রূপান্তরিত করিতে হইবে। পূর্বসূরিগণ তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিকের সে চেষ্টা নাই। সুরক্ষিত কালিয়া কোর্মা অপেক্ষা গলদ্রুধির কাঁচা মাংসেই তাঁহাদের রুচি।

৩০-৩-১৯৫০

আজ জীবনের একান্নটা বছর পরিপূর্ণ হইল। ভাবিতেছি, আজ হইতে পঞ্চাশ বছর পরে আমার নাম কি কেহ স্মরণ করিয়া রাখিবে ? কিম্বা, আমার কাছে আমার পিতামহের নাম যেমন ধোঁয়াটে হইয়া গিয়াছে, আমার পৌত্র স্থানীয়দের কাছে আমার নামটাও একটা অস্পষ্ট পারিবারিক স্মৃতি হইয়া থাকিবে ? তারপর ভিজা খড়কুটা যেমন জলে ভারি হইয়া ডুবিয়া যায় তেমনি অতলে তলাইয়া যাইবে ? যাহারা আমার রক্ত নিজ শরীরে বহন করিবে তাহারাও আর আমাকে মনে রাখিবে না।

একান্ন বছর ধরিয়া যে কর্ম করিয়াছি যে চিন্তা করিয়াছি কালের তুলাদণ্ডে তাহার ওজন কতটুকু ? অতি অল্প সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু আমার প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালন প্রত্যেক পলকপাত বিশ্বজগৎকে প্রভাবিত করিয়াছে ; আমার পদধ্বনির রেশ চিরদিন পৃথিবীর বাতাসে স্পন্দিত হইবে। যাহা ক্ষুদ্র তাহা তুচ্ছ নয় ; আমি মরিলেও আমার শেষ নাই।

৩১-৩-১৯৫০

আমার **সাহিত্যকৃতির** মূল্য কী তাহার হিসাব কোনও দিন করি নাই। সে কাজ আমার নয় ; হয়তো অন্যে করিবে ; হয়তো কেহই করিবে না। তাহাতে ক্ষতি নাই। আমার নামটা বড় নয়। প্রকৃতি আমাকে দিয়া কয়েকটা কাজ করাইয়া লইতেছেন , সেজন্য **অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা** হইয়া যদি নিজেকে কর্তা মনে করি এবং নিজের নামটাকে স্মরণীয় করিবার আশা পোষণ করি তাহা হইলে লজ্জা রাখিবার আর স্থান থাকিবে না।

কিন্তু আমি যতই তুচ্ছ হই, আমার মধ্যে যে-চিন্তার ক্রিয়া হইয়াছে, যে সৌন্দর্যের স্বপ্ন রূপায়িত হইয়াছে তাহা তুচ্ছ না হইতে পারে। বাঙালীর মনে সেই চিন্তা ও স্বপ্নের ছাপ নিশ্চয় পড়িয়াছে ; কারণ বাঙালী আমার লেখা পড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়তো সব কথা বুঝিয়া পড়ে না, তবু পড়ে।

আমার চিন্তা ও স্বপ্নের বীজ যদি বাঙালীর সারবান মনের ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে, তবে আমার নাম সকলে ভুলিয়া গেলেও আমার বাঁচিয়া থাকা নিরর্থক নয়।

৫-৪-১৯৫০

আমরা যে সংস্কৃত মহাভারত পড়ি তাহা অনুমান খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতকে রচিত, পণ্ডিতগণের ইহাই মত। অথচ ভারত-যুদ্ধ হইয়াছিল খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চদশ শতকে এবং মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস তখন জীবিত ছিলেন। ব্যাপার কি ? বেদব্যাস কি ভারত যুদ্ধের পর এক হাজার বছর বাঁচিয়া ছিলেন ?

আমার মনে হয় ব্যাপার এইরূপ।—বেদব্যাস পঞ্চদশ খৃষ্ট পূর্বেই মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু বৈদিক ভাষায়। ক্রমে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে যখন বৈদিক ভাষা অচল হইয়া পড়িল তখন ভাষা সংস্কারের প্রয়োজন হইল। পাণিনি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা তৈয়ার করিলেন। কিন্তু মহাভারত লোক-সাহিত্য ; অবোধ্য বৈদিক ভাষায় থাকিলে তাহা কেহ বুঝিতে পারিবে না। তাই বেদব্যাসের আদি মহাভারত সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হইল। এই ভাষান্তরণ কার্য খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে হইয়াছিল।

পণ্ডিতদের কথা মিথ্যা নয়। চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির গান অবোধ্য বিবেচনা করিয়া উহাকে আধুনিক বাংলায় রূপান্তরিত করিলে যেমন হয়, এও কতকটা তাই।

৬-৪ ১৯৫০

বুদ্ধদেব সংস্কৃত মহাভারত রচনার প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি। রামায়ণে 'বৌদ্ধ' শব্দের উল্লেখ ও নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের প্রতি গালিগালাজ আছে। কিন্তু মহাভারতে বৌদ্ধ শব্দের উল্লেখ কুত্রাপি নাই। মনে হয়, যিনি আদি মহাভারতকে সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছিলেন তিনি বুদ্ধের কথা জানিতেন না, কিম্বা মূল কাব্যকে এতই নিষ্ঠার সহিত ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন যে সমসাময়িক কথা তাহাতে বিন্দুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই।

কিন্তু এখানে আর একটি কথা বিচার্য। আমরা বর্তমানে যে মহাভারত পাই তাহা সবটা বেদব্যাসের রচনা নয়, প্রায় বারো আনা প্রক্ষিপ্ত। অথচ আশ্চর্য এই যে এই প্রক্ষিপ্ত অংশেও কোথাও বৌদ্ধ ধর্মের ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই। ইহার কারণ কি ? তবে কি মনে করিতে হইবে মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিও বুদ্ধজন্মের পূর্বে রচিত হইয়াছিল ? যদি তাহাই হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে বর্তমানে প্রাপ্ত সমস্ত প্রক্ষেপ-পুষ্ট মহাভারত খৃঃ পূঃপঞ্চম শতকের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বিশ্বাস করা কঠিন।

১৯-৫-১৯৫০

একজন নাস্তিকের সহিত এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কথা হইতেছিল—

ধার্মিক আমি খবর পেলাম তুমি মদ ধরেছ!

নাস্তিক : কোথায় খবর পেলেন ? রেডিওতে ?

ধার্মিক : তবে কি বলতে চাও এ মিথ্যে কথা ?

নাস্তিক : আজ্ঞে না, নির্জলা সত্যি কথা।

ধার্মিক : তবে ? মদ খাও কেন ?

নাস্তিক : আপনি ভাত খান কেন ?

ধার্মিক : ভাত আর মদ সমান ?

নাস্তিক : নয় কিসে ? ভাত খেলেও নেশা হয়। যাকে 'ভাত-ঘুম' বলেন সেটা নেশা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ধার্মিক শুনেছি তোমার স্ত্রীলোকঘটিত দোষও আছে।

নাস্তিক : আপনিও তো বিবাহিত।

ধার্মিক : (সক্রোধে) তুমি নরকে যাবে।

নাস্তিক : আর আপনি ?

ধার্মিক : আমি স্বর্গে যাব। (প্রস্থানোদ্যত)

নাস্তিক : আসুন তাহলে—নমস্কার। পৌঁছে একটা 'তার' পাঠাতে ভুলবেন না।

২০-৫-১৯৫০

বুদ্ধিমান নাস্তিকের সহিত কোনও ধার্মিক ব্যক্তিই তর্ক করিয়া পারিয়া উঠিবে না। ইহার কারণ, আধ্যাত্মিক জগৎ ন্যায় শাস্ত্রের এলাকার বাহিরে।

যাহাকে আমরা ন্যায় শাস্ত্র বা Logic বলি আসলে তাহা কী ? মনুষ্য জাতির common অভিজ্ঞতাকে পুঞ্জীভূত করিয়া তাহা হইতে কতকগুলি সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। যথা, মানুষ মরে ইহা সকলেরই common অভিজ্ঞতা ; তাহা হইতে সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে—মানুষ মাত্রেই মরণশীল ; All men are mortal. ইহাই logic.. ধূম হইতে অগ্নির অনুমানও তেমনি logic.

কিন্তু কেহ যদি বলে ভূত আছে, তাহা হইলে তাহার কথা logical হইল না। কারণ ভূত দেখা মনুষ্যজাতির common experience নয়। এ অবস্থায় যুক্তিবাদী বলিতে পারে, 'প্রমাণ কর, নচেৎ তোমার কথা বিশ্বাস করিব না।' কিন্তু অন্যকে ভূত দেখানো সহজ নয় ; তাই নাস্তিককে ভূত বিশ্বাস করানো কঠিন। কারণ ন্যায় শাস্ত্র বা Logic নাস্তিকের দিকে।

২১-৫-১৯৫০

আধ্যাত্মিক অনুভূতিও ভূত দেখার মত মানুষের সার্বজনীন অভিজ্ঞতা নয়। বস্তুত ভূত যদি বা পৃথিবীর দু'চার জন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, ভগবান কেহই প্রত্যক্ষ করে নাই। যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ তাঁহারাই বলিতেছেন ব্রহ্ম প্রত্যক্ষের অতীত—অবাঙ্‌মানসগোচর। অথচ ব্রহ্মকে জানা যায়।

কথাটা দাঁড়াইল, ব্রহ্মকে জানিবার উপায় সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। তাই অবিশ্বাসী তার্কিককে শুধু এইটুকুই বলা যাইতে পারে—দ্যাখো, আগুনে সোনা যাচাই হয়, কিন্তু হীরা যাচাই হয় না—হীরার পরখ সম্পূর্ণ আলাদা। তেমনি আধ্যাত্মিক সত্য লৌকিক তর্কযুক্তি দ্বারা ধরা যায় না। তুমি যদি আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করিতে চাও তোমাকে আধ্যাত্মিক জগতের আইন-কানুন অবলম্বন করিতে হইবে। তুমি যদি সত্যান্বেষী হও, যোগ অবলম্বন কর, ধ্যান কর, ভক্তি মার্গে বিচরণ কর, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গ লও—সত্যের সাক্ষাৎ পাইবে। যদি তাহা না কর তবে আধ্যাত্মিক সত্যকে উড়াইয়া দিবার তোমার কোনও অধিকার নাই।

২৩-৫-১৯৫০

অতি-বিশ্বাস যেমন কুসংস্কারের লক্ষণ, অতি-অবিশ্বাসও তেমনি কুসংস্কারের লক্ষণ। বৈজ্ঞানিক যুগের আগে মানুষের বিশ্বাসের অন্ত ছিল না ; ভূতপ্রেত ওঝা রোজা তুক-তাক স্বর্গ নরক সমস্তই সে একবাক্যে বিশ্বাস করিত। ইহা যে ঘোরতর কুসংস্কার ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে মানুষের যুক্তি-পরিচালিত বুদ্ধির অবনতি ঘটিয়াছিল। গীতা বলিয়াছেন, বুদ্ধির শরণ লও, নচেৎ ফলভোগ করিবে। অন্ধ সংস্কারের শরণাপন্ন হইয়া আমরা যে দারুণ ফলভোগ করিয়াছি ও করিতেছি তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্তমানে ইহার উল্টা মনোবৃত্তি দেখা দিয়াছে। বিজ্ঞানের প্রভাবে আমরা এখন সবকিছুই অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কেহ যদি বলে অমাবস্যা পূর্ণিমায় শ্লেষ্মাবৃদ্ধি হয়, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবিশ্বাস করিবেন। অথচ কথাটা অবিশ্বাস্য নয়। যাঁহারা এ তথ্য পর্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন ইহা সত্য। গঙ্গার জলে রোগ নিবারণী শক্তি আছে ইহা প্রত্যক্ষীকৃত সত্য। অথচ কেহ বিশ্বাস করে না।

অবিশ্বাসও কুসংস্কার হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

২৪-৫-১৯৫০

বিখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক Mark Twain ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—

'...in certain ways the foul and derided Ganges water is the most puissant purifier in the world! This curious fact, as I have said, had just been added to the treasury of modern science. It had long been noted as a strange thing that while Benares is often afflicted with the cholera she does not spread it beyond her borders. This could not be accounted for Mr Henkin, the scientist in the employment of the government of Agra concluded to examine the water. He went to Benares and made his tests. He got water at the mouths of the sewers where they empty into the river at the bathing ghats; a cubic centimetre of it contained millions of cholera germs; at the end of six hours they were dead. He caught a floating corpse, towed it to the shore, and from beside it he dipped up water that was swarming with cholera germs; at the end of six hours they were all dead. He added swarm after swarm of cholera germs to this water; within six hours they always died, to the last sample. Repeatedly he took pure well water which was barren of animal life, and put into it a few cholera germs; they always began to propagate at once, and always within six hours they swarmed—and were numberable by millions upon millions.

'...The Hindus have been laughed at, these many generations, but the laughter will need to modify itself from now on...?'

অবিশ্বাসীর ব্যঙ্গ-হাস্য কিন্তু এখনও থামে নাই।

৫-৭-১৯৫০

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যে-কয়জন সৃষ্টিধর্মী লেখক শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের লেখা আজকাল পড়িলে মনে হয়, তাঁহাদের আগুন নিভিয়া গিয়াছে। তাই তাঁহারা ভস্ম উড়াইয়া পাঠকের চোখে ধূলা দিতেছেন, বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে ভস্ম যখন আছে তখন আগুনও আছে।

অবশ্য আগুন কোনও কালেই বেশি ছিল না। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ যেখানে প্রতিভার মশাল হাতে লইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র যেখানে প্রদীপ জ্বালিয়া সন্ধ্যারতি করিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকেরা সেখানে বিড়ি টানিতে টানিতে নামিয়াছেন। মধু'র অভাবে গুড় দিয়া কাজ চালাইতে হয়; বাঙালী সাহিত্য রসিক দৈন্যের দায়ে বিড়িকে মশাল মনে করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিড়ির আগুনটুকুও নিভিয়া গিয়াছে।

প্রশ্ন এই—কেন এমন হইল?

৬-৭-১৯৫০

ইংরেজিতে একটা কথা আছে—burning the candle at both ends. মোমবাতির এই উপমাটা আমদানি করিলে বলিতে হয়, আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিক তাঁহাদের প্রতিভার ল্যাজামুড়া দুইদিকেই আগুন ধরাইয়াছেন। একদিকে আগুন দিলে যতটুকু আলো হয় তাহাতে তাঁরা সন্তুষ্ট নয়, তাঁরা মোমবাতিকে মশালে পরিণত করিতে চান। ফল এই হইয়াছে যে মোমবাতি পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু আলো বাড়ে নাই। বাংলা সাহিত্য যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে।

আর একটা কথা, যে-বস্তু পরিমাণে অল্প তাহা যত সন্তর্পণেই ব্যবহার করা যাক, শীঘ্র ফুরাইয়া যায়। ইহা প্রকৃতির নিয়ম ; ইহার উপর মানুষের হাত নাই। আধুনিক লেখকদের রসের ভাণ্ড যে এত শীঘ্র খালি হইয়া গিয়াছে তাহার কারণ ভাঁড়ে রস বেশি ছিল না। শূন্য ভাণ্ডে জল ঢালিয়া তাঁহারা এখন যে পানীয় পরিবেশন করিতেছেন তাহাতে ভাঁড়ের গন্ধটুকুই আছে ; তাহা পান করিয়া কাহারও নেশা জাগিতেছে না।

৭-৭-১৯৫০

বিভূতি বন্দ্যো, তারাশঙ্কর, বনফুল আর মাণিক বন্দ্যো—জীবিত লেখকদের মধ্যে এই চারজনকেই এখন শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। ইহাদের মধ্যে মাণিকের লেখার সহিত আমার ভাল পরিচয় নাই। যেটুকু দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয়, সে খাঁটি সাহিত্যিক নয়, commercial artist—একটা রাজনৈতিক মতবাদের প্রচারকার্য করাই তাহার উদ্দেশ্য।

বাকি তিনজনকে খাঁটি সাহিত্যিক বলিতে পারি। তবে বনফুলের পর্যায় একটু আলাদা। তাহার সৃষ্টিপ্রেরণার সহিত বিজ্ঞানবুদ্ধি মিশিয়া এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি তৈরি হইয়াছে। যেখানে এই জগাখিচুড়ি হয় নাই সেখানে সে সত্যকার সাহিত্যিক। যেমন তাহার ব্যঙ্গ কবিতা ও ছোট গল্পগুলিতে। কিন্তু তাহার চক্ষু কেবল জীবনের একটি বস্তুই লক্ষ্য করিয়াছে, তাহা জীবনের বৈপরীত্য। মানুষ নামক ছোট গল্প এবং শালা নামক ব্যঙ্গ কবিতাটি তাহার সফল রচনার type অন্য যে-রচনাই পড়া যায় তাহাতে অন্য কথা নাই।

তাহার রচনার গণ্ডী এত সঙ্কীর্ণ বলিয়াই তাহার লেখা পাঠকের কাছে ক্রমে ক্লান্তিকর হইয়া উঠিতেছে।

৮-৭-১৯৫০

বিভূতি এবং তারাশঙ্কর বিকৃত বৌদ্ধ দুঃখবাদকে বাংলা সাহিত্যে টানিয়া আনিয়াছে। আমরা অমৃতের পুত্র—একথাটা ইহারা দুইজন কখনও শোনে নাই, কিম্বা শুনিলেও উহা তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

বিভূতির লেখা যারা পড়ে এবং ভালবাসে তাহারা জানে তাহার রচনাভঙ্গীতে একটি প্রকৃত সরলতা ও স্বচ্ছন্দতা আছে। বিষয়বস্তু যাহাই হোক পড়িতে ভাল লাগে। কলাকুশলতা তাহার লেখায় নাই। তাহার জীবনের সকল দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা তাহার লেখায় স্থান পাইয়াছে ; কিন্তু সবই অ-গোছালো ভাবে। দুঃখের একটা সূত্র তাহাকে ধরাইয়া দিলে তাহার লেখনী সেই সূত্র ধরিয়া লিখিয়া চলিবে, এবং শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়া পৌঁছিবে তাহার স্থিরতা নাই। শিল্পবুদ্ধির দ্বারা সযত্নে গঠিত নিটোল নিখুঁত একটি রচনা তাহার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে না।

'পথের পাঁচালী' ও 'আরণ্যক' তাহার শ্রেষ্ঠ রচনা। রবীন্দ্রনাথ পথের পাঁচালীর সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—'বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে।' কথাটা কতখানি নিন্দা ও কতখানি প্রশংসা তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

৯-৭-১৯৫০

তারাশঙ্করের লেখায় যে দুঃখবাদ দেখা যায় তাহা Freud-এর ভাষায় inhibition ছাড়া আর কিছুই নয়। নিগৃহীত আকাঙ্ক্ষা বিকৃত বিকলাঙ্গ রূপে দেখা দিয়াছে। বিভূতির দুঃখকে অন্তত স্বাভাবিক দুঃখ বলা যায়, কিন্তু তারাশঙ্করের দুঃখ অস্বাভাবিক দুঃখ। যাহাকে abnormal ও morbid বলে তাই।

তারাশঙ্করের সাহিত্য পরিক্রমা লাভপুর গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে—গণ্ডীর বাহিরে যাইবার শক্তি তাহার নাই। মন্বন্তর উপন্যাসে সে কলিকাতার জীবন অঙ্কনের যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা যে কিরূপ ব্যর্থ চেষ্টা তাহা অনেকেই এখন বুঝিতে পারিতেছেন না। পরে বুঝিবেন।

তারাশঙ্করের উদ্ভাবনী শক্তি বেশি নাই। যেটুকু আছে তাহাও যখন প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল এমন সময় আসিল পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মতই সে দুর্ভিক্ষকে আঁকড়াইয়া ধরিল। এখনও আঁক্‌ড়াইয়া আছে।

একবার মাত্র তারাশঙ্কর নিজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াই তাহার নিগৃহীত প্রকৃতির উর্ধ্বে উঠিয়াছিল—তাহার 'কবি' উপন্যাসে। কবি তাহার শ্রেষ্ঠ রচনা।

১০-৭-১৯৫০

কিছুদিন যাবৎ একটি বঙ্গমহিলার সহিত পরিচয় হইয়াছে, তিনি সাহিত্যিক হইবার জন্য বড় উৎসুক...বাংলা ও ইংরেজি লেখাপড়া জানেন, বেশ বুদ্ধিমতী, আর্থিক সচ্ছলতাও আছে। সুতরাং সাহিত্য সাধনার পক্ষে তাঁহার জীবন খুবই অনুকূল।

কিন্তু তিনি একটু বেশি মিশুক। ইংরেজিতে যাহাকে society woman বলে তিনি তাই। বন্ধুদের বাড়িতে নিত্য যাতায়াত, সঙ্গীত বা সাহিত্যের আসর, ক্ষুদ্র নাটিকা লিখিয়া বন্ধুবান্ধব দ্বারা জলসার অভিনয় করানো—এইসব কার্য তাঁহার দিনচর্যা। সাহিত্যিক খ্যাতির প্রতি লোভ আছে, কিন্তু সময় পান না।

আমার পরামর্শ চাহিলেন। যথাসাধ্য শিষ্টতা বজায় রাখিয়া বলিলাম, দেখুন, বন্ধুদের নিয়ে হুল্লোড় করে বেড়ালে সাহিত্য সাধনা হয় না। একটাকে ছাড়তে হবে : Ye cannot serve God and Mammon.

তিনি তর্ক আরম্ভ করিলেন।

১১-৭-১৯৫০

মহিলা : অসামাজিক না হলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না ?

আমি : অসামাজিক হবার দরকার নেই। কিন্তু মনটাকে স্থির করা দরকার ; মন চারিদিকে ছড়িয়ে থাকলে কী লিখবেন ? মন নিয়েই তো সাহিত্য।

মহিলা : শুধু মন নিয়ে সাহিত্য ? ঘরে দোর বন্ধ করে বসে থাকলে মনের মালমশ্‌লা আসবে কোত্থেকে ?

আমি : মালমশ্‌লা আপনার যথেষ্ট আছে, আর বেশি দরকার নেই। পৃথিবীতে যত মালমশ্‌লা আছে সব কি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ? যা পেয়েছেন তাই ব্যবহার করুন না। একটা কথা বুঝুন—মন নিয়ে সাহিত্য, পৃথিবী নিয়ে নয়। আপনার মনটা পৃথিবী-ছাড়া একটা নিরালম্ব বস্তু নয় ; তাব মধ্যেই বিশ্বজগৎ আছে। মনকে একান্তে নিয়ে তার সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করুন, তাকে একটু বিশ্রাম দিন। বীজকে মাটির তলায় পুঁতে রাখলে তবে চারা বেরোয়।

আমার কথা কিন্তু মহিলার মনঃপূত হইল না।

১২-৭-১৯৫০

শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারটি বড় অদ্ভুত। লেখকের মন বিষয়বস্তুতে ধ্যানাবিষ্ট হয় ; মনের মধ্যে অসংলগ্ন চিত্রাবলি ফুটিয়া উঠিতে থাকে ; ক্রমে তাহারা একটা সুসঙ্গত মূর্তি পরিগ্রহ করে।

কিন্তু এইখানে শেষ নয় ; ইহা কেবল কাঠামো মাত্র। মনের সৃষ্টি প্রক্রিয়া কি ভাবে অগ্রসর হয় তাহার সুন্দর বর্ণনা Aldous Huxley দিয়াছেন—

It is by long obedience and hard work that the artist comes to unforced spontaneity and consumate mastery. Knowing that he can never create anything on his own account, out of the toplayers, so to speak, of his

consciousness, he submits obediently to the workings of 'inspiration'; and knowing that the medium in which he works has its own self-nature, which must not be ignored or violently overridden, he makes himself its patient servant, and in the way achieves perfect freedom of expression.

***The Perennial Philosophy*, p.117.**

২৪-৭-১৯৫০

সম্প্রতি দুইখানি বাংলা বই পড়িলাম। গিরীন্দ্রশেখর বসুর পুরাণ প্রবেশ এবং নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস। শেষোক্ত বইখানি নূতন বাহির হইয়াছে ; পুরাণ প্রবেশ কয়েক বছরের পুরানো।

পুরাণ প্রবেশ পুস্তকে গিরীন্দ্রবাবু যে-চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয় কিন্তু অতীব দুরূহ। এক কথায় তিনি পুরাণকে ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহা হইতে বহু প্রাচীন কালের একটা ধারাবাহিক বৃত্তান্ত ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনু হইতে সূর্য বংশের শেষ রাজা পর্যন্ত একটা তালিকা তৈয়ার করিয়া কে কোন সময় ছিলেন তাহা নির্ধারণ করিয়াছেন। এই কার্যে তিনি বৈজ্ঞানিক পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন।

তিনি পরিশ্রম করিয়াছেন অগাধ। এবং প্রতিভার পরিচয়ও যথেষ্ট দিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টি এত জটিল এবং পুরাণের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত হইতে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করা এতই কষ্টসাধ্য যে গিবীন্দ্রবাবুর উদ্যম আধাআধি সার্থক হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

২৫-৭-১৯৫০

দশরথপুত্র রাম বা মান্ধাতা বা বৈবস্বত মনু আজ হইতে কতদিন আগে ছিলেন, পুরাণ সমুদ্র মন্থন করিয়া এই তথ্য আবিষ্কার করা সহজ কথা নয়। অথচ পুরাণ ছাড়া অন্য কোনও সূত্র হইতে এই তথ্য আবিষ্কার কবার উপায় নাই। গিবীন্দ্রবাবু যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই একমাত্র পন্থা এবং সে পথে তিনি অনেকদূরঅগ্রসরওহইযাছেন। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি যে সবই অভ্রান্ত তাহা মনে করা সম্ভব নয়!

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মহাভারত পাঠে জানা যায়, চন্দ্রবংশীয় রাজা শান্তনু ছিলেন চন্দ্রবংশীয় ভিন্ন শাখার রাজা উপরিচর বসুর জামাতা। অথচ গিরীন্দ্রবাবু চন্দ্রবংশের যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে শান্তনু ও উপরিচর বসুর মধ্যে নয় পুরুষের ব্যবধান, অর্থাৎ শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে ন্যূনাধিক ২৫০ বছবেব তফাৎ!

আমার বিশ্বাস গিরীন্দ্রবাবু যে পথ-নির্দেশ করিয়াছেন সেই পথে আরও গবেষণা করিলে সত্য সন তারিখ উদ্ধার করা যাইবে।

২৬-৭-১৯৫০

নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাসকে বাঙালীর প্রতিভার বিজয়স্তম্ভ বলিতে পারি। আর একবার প্রমাণ হইল, বাঙালী যখন যাহা করিয়াছে একাকী করিয়াছে ; পাঁচজনে মিলিয়া যখন কিছু করিতে গিযাছে তখনই কর্ম পণ্ড হইয়াছে। তাই শিক্ষা ও বিদ্যাব ক্ষেত্রে বাঙালীর শক্তি বেশি, রাজনীতির ক্ষেত্রে সে দুর্বল।

অতি আদিমকাল হইতে বাঙালী জাতি কি করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃষ্টি গড়িযা তুলিল, অশেষ অধ্যবসায় সহকারে নীহাবরঞ্জনবাবু তাহা দেখাইয়াছেন। অধ্যবসায় বা capacity for taking infinite pains প্রতিভার একটি লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণও নীহারবাবুর প্রচুর পরিমাণে আছে। অন্তর্দৃষ্টি বিচার বুদ্ধি অভিব্যক্তির শক্তি সবই এই পুস্তকে আছে। আর আছে চিত্তরঞ্জিনী শক্তি। লেখার গুণে ৯০০ নয়শত পৃষ্ঠার বিরাট বইখানি উপন্যাসেব ন্যায় সুখপাঠ্য হইয়াছে।

বাঙালীর মণীষা কালের বিড়ম্বনায় এখনও নিঃশেষ হয় নাই তাহা প্রমাণ করিয়া নীহাররঞ্জনবাবু আবার আমাদের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছেন।

২৭-৭-১৯৫০

ভাবিয়াছিলাম কালের মন্দিরার পর বড় আর কিছু লিখিব না, ইহাই বঙ্গবাণীর চরণে আমার শেষ অর্ঘ। বয়স বাড়িতেছে, জীবন জটিলতর হইয়া উঠিতেছে ; অতঃপর দীর্ঘ রচনা আর সম্ভব হইবে না। কিন্তু নীহাররঞ্জনের বাঙালীর ইতিহাস পড়িয়া আবার মাথায় একটি উপন্যাস আসিয়াছে। লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

প্রাচীন বাংলাদেশ লইয়া গল্প লিখিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে ছিল ; কিন্তু বাংলাদেশের বিশিষ্ট আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার মত মালমশ্‌লা কোথাও পাই নাই। নীহাররঞ্জনের বইখানি পড়িয়া যে অপূর্ব উপাদান পাইয়াছি তাহাই অবলম্বন করিয়া উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি। শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে যে শতাব্দীব্যাপী মাৎস্যন্যায় আরম্ভ হইয়াছিল তাহারই সূচনা আমার গল্পে আছে। বাঙালীর জীবনে ইহা এক মহা ক্রান্তিকাল। আধুনিক বাঙালীর জন্ম এই সময়।

১০-৮-১৯৫০

সাধারণ কর্ষিতচিত্ত বাঙালী পাঠকের কাছে বর্তমান কালের লেখকদের রচনা কেমন লাগে তাহা নিজের মন দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি। কারণ আমি সাধারণ মানুষ ; আমি সাহিত্যিক বলিয়া আমার রসবোধ সাধারণ শিক্ষিত পাঠক হইতে বিন্দুমাত্র পৃথক নয়।

নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি · মনোজ বসু কেমন লেখেন ?

উত্তর পাই : তাঁর লেখার হাত বেশ মিষ্টি। কিন্তু পাঠকের মনে গভীর দাগ কাটিবার শক্তি তাঁর নাই। তাঁর রচনা স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয় না।

প্রশ্ন : বুদ্ধদেব বসু ?

উত্তর : ইনি বিদেশীর মতন বাংলা লেখেন। যিনি এতদিনেও নিজের ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিলেন না, তাঁহার লেখা পড়িতে ভাল লাগে না। তবে তাঁর কবিতা মাঝে মাঝে ভাল লাগে। কবিতায় ভাষার কৃত্রিমতা তত বেশি ধরা পড়ে না।

১১-৮-১৯৫০

প্রশ্ন : অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ?

উত্তর : কল্পনা আছে, সংযম নাই ; উদ্ভাবনীশক্তি আছে, verisimilitude নাই ; একদিকে যেমন বস্তুজ্ঞান আছে, অন্যদিকে তেমনি রসজ্ঞান আছে ; কিন্তু উভয়কে সংযুক্ত করিয়া রসবস্তু সৃষ্টির শক্তি নাই। ইনি বাংলা ভাষার অসংখ্য শব্দ আয়ত্ত করিয়াছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি বিশুদ্ধ well-balanced পদ লিখিতে পারেন নাই।

অদ্ভুত বিকলাঙ্গতা ! বর্ণসঙ্করের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন : প্রেমেন্দ্র মিত্র ?

উত্তর : শক্তিমান লেখক। প্রতিভাবান লেখকের যতগুলি গুণ থাকা প্রয়োজন প্রায় সবগুলিই আছে। কল্পনাশক্তি মননশক্তি উদ্ভাবনীশক্তি ভাষার অধিকার বস্তুজ্ঞান সবকিছুই আছে, কেবল একটি বস্তুর অভাবে সবকিছু ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ধৈর্য নাই। ছোট ছোট কবিতায় বা গল্পে তাঁর প্রতিভা স্ফুরিত হইয়া ওঠে, কিন্তু দীর্ঘ কিছু লিখিতে গেলে অর্ধপথে ধৈর্য ফুরাইয়া যায়। তখন যেমন তেমন করিয়া লেখা শেষ করেন। তাঁহার প্রতিভা থাকিয়াও নাই।

১-৯-১৯৫০

অনেকের ধারণা democracy বা গণতন্ত্রের অর্থ সাধারণ মানুষ রাজ্য শাসন করিবে—

Government by the people. ইহার চেয়ে হাস্যকর ভ্রান্তি আর হইতে পারে না। মার্কিন দেশের লোকেরাGovernmentof the people by the people for the people এই বাক্যটি সৃজন করিয়া এই ভ্রান্তির পোষকতা করিয়াছে। সাধারণ মানুষের মনে করা স্বাভাবিক যে গণতান্ত্রিক দেশে সাধারণ মানুষই বুঝি রাজ্য শাসন করে ; সেখানে অসাধারণ বা প্রতিভাবান মানুষের প্রয়োজন নাই।

সাধারণ মানুষ যদি কখনও রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করে তবে তিন দিনে সে-রাজ্য রসাতলে যাইবে ; রাজ্য শাসন করা সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। আসলে গণতন্ত্রের মহিমা এই যে সে প্রত্যেক সাধারণ মানুষকে অসাধারণ হইবার সমান সুযোগ দান করে। তাহার চক্ষে উচ্চনীচ নাই, ধনীদরিদ্র নাই। এই সমদৃষ্টিই democracy র পরম দান।

২-৯-১৯৫০

বর্তমান ধনিকতন্ত্রের অধিকারে ডিমোক্রেসির যাহা মূলমন্ত্র সেই সাম্য অবহেলিত হইতেছে ; কেবল ভোট দিবার অধিকার দিয়া জনসাধারণকে ভুলাইয়া রাখা হইয়াছে। জনসাধারণ ভাবিয়া দেখে না যে ভোট ছাড়া জীবনের আর কোনও ক্ষেত্রেই সে সাম্য পায় নাই।

বস্তুত রাজ্যের শাসনতন্ত্র যে-নামেই পরিচিত হোক, যেখানে ধন-সাম্য নাই সেখানে ডিমোক্রেসি তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়। ধন-সাম্য না থাকিলে ধনীদরিদ্র থাকিবে ; ধনীর পুত্র দরিদ্রের পুত্র অপেক্ষা অধিক সুযোগ পাইবে। দরিদ্রের পুত্র যদি প্রতিভাবান হয় তবু সুযোগের অভাবে তাহার প্রতিভার স্ফুরণ হইবে না। ধনীপুত্র অপেক্ষাকৃত অধম হইলেও তাহাকে ছাড়াইয়া যাইবে।

এই অবিচার যে-সমাজের ভিত্তি তাহার ইষ্ট নাই। চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ, এই স্বভাবধর্মকে ফুটাইয়া তোলা democracyর কাজ।

৫-৯-১৯৫০

Shakespeare of London নামে মহাকবির একটি নূতন জীবনীগ্রন্থ পড়িলাম। কবির জীবন সম্বন্ধে যে দুই-চারিটি কথা নিঃসংশয়ভাবে জানা যায়, তাহাই সাজাইয়া গুছাইয়া অতি সুন্দরভাবে লেখিকা পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। তাৎকালিক জীবন চিত্র, বিশেষত লণ্ডনের নট কুশীলব কবি নাট্যকার সম্প্রদায়ের চিত্র চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শেক্‌শ্‌পীয়র শুধু নাট্যকার ছিলেন না, অভিনেতাও ছিলেন। জীবিতকালে তিনি প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু উচ্চভ্রূ সমালোচক ও সাহিত্যিকের দল তাঁহাকে আমল দেয় নাই। তিনি পণ্ডিত ছিলেন না—ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি অল্প ছিল—little Latin and less Greek. সমসাময়িক দিক্‌পাল নাট্যকারগণ তাঁহার জনপ্রিয়তায় পীড়িত হইয়া তাঁহাকে অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করিয়াছিলেন।

এই দিক্‌পালদের গুণ আজ কোথায় ? তাঁহাদের লেখা আজকাল কেহ পড়ে কি ? তাঁহাদের নামও লোকে ভুলিয়া গিয়াছে।

২৮-১০-১৯৫০

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল ১৯৩৪ সালে, বিহার ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরে। প্রথমেই দু'জনে ঠোকাঠুকি লাগিয়া যায়। আমি মুঙ্গেরে থাকি শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, মুঙ্গেরে কোন মাসিকপত্র অধিক পঠিত হয়। আমি

বলিয়াছিলাম—মাসিক বসুমতী। তাহাতে তিনি শ্লেষ করিয়া আমাকে সহানুভূতি জানাইয়া ছিলেন। অতঃপর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি কোথায় থাকেন ?' তিনি বলিলেন, কলকাতায়।' তখন আমিও তাঁহাকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করি। তিনি বিস্ময় ও অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে আমি বলি, 'বসুমতীর অফিসে চলুন। প্রবাসীর অফিসেও চলুন। দু'জায়গায় খোঁজ নিলেই জানা যাবে কলকাতায় কার বিক্রী বেশি।'

তখন তিনি আমার উক্তি মানিয়া লইলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার সহিত আমার একটি বিরলদর্শন বন্ধুত্বের সূত্রপাত হইল।

২৯-১০-১৯৫০

প্রমথবাবুর সহিত আমার সর্বসাকুল্যে ৪/৫ বারের অধিক দেখা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। একবার রবীন্দ্র জন্মদিন উপলক্ষে একসঙ্গে রেডিওতে বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনয় করিয়াছিলাম। আমি ছিলাম কেদার, তিনি তিনকড়ি। তারপর যখন কলিকাতায় যাইতাম কখনও শনি-চক্রে দেখা হইত কখনও হইত না।

১৯৩৬ সালে তিনি শনিবারের চিঠিতে চুয়াচন্দনের এক সমালোচনা লেখেন। এই প্রথম আমি সাহিত্যকৃতির জন্য সত্যকার প্রশংসা পাইলাম। আমার সাহিত্য রচনার রীতি-প্রকৃতি তিনি যেমন ধরিয়াছিলেন এমন আর কেহ পারে নাই।

বোম্বাই চলিয়া আসিবার পর তাঁহার সহিত সমস্ত যোগসূত্রই ছিন্ন হইয়াছিল। তারপর একদিন তাঁহার চিঠি পাইলাম। তদবধি মাঝে মাঝে পত্রালাপ হয়। চুয়াচন্দনের দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলাম, উত্তরে তিনি অতি মিষ্ট একটি চিঠি লেখেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে এই একটি 'ভদ্রলোক' আছেন।

৩০-১০-১৯৫০

প্রমথবাবুর সাহিত্য পরিক্রমার ক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ ; তিনি কাব্য নাট্য ব্যঙ্গকৌতুক উপন্যাস ছোট গল্প সমালোচনা সবই লিখিয়াছেন এবং সকল ক্ষেত্রেই প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। জীবিত বাঙালী সাহিত্যিকের প্রাণে যে-বস্তুর একান্ত অসদ্ভাব সেই হাস্যরস তাঁহার প্রাণে প্রচুর পরিমাণে আছে।

তবু সকল ক্ষেত্রে তাঁহার নিপুণতা সমান নয়। আমার মনে হয় তাঁহার প্রকৃত স্বধর্ম—সাহিত্য সমালোচনা। সাধারণ সৃষ্টিধর্মী লেখক যেমন জীবনরসের রসিক, প্রমথবাবু তেমনি সাহিত্য রসের রসিক। এখানে তাঁহার প্রতিভা সৃষ্টিধর্মী ; সৃষ্টির উপাদানের জন্য বাস্তব জগতে না গিয়া তিনি সাহিত্য জগতে প্রবেশ করিয়াছেন, সাধারণ লেখক হইতে তাঁহার প্রভেদ এইখানে। এবং সম্ভবত এক্ষেত্রে তিনি একেশ্বর। বর্তমানে আর যাঁহারা আছেন তাঁহারা সমালোচক বটে কিন্তু স্রষ্টা নয়।

৩১-১০-১৯৫০

বাংলা সাহিত্য একমাত্র রবীন্দ্রনাথই সাহিত্য বিচারের মাধ্যমে সৃষ্টি সাহিত্য (creative literature) রচনা করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পরেই প্রমথবাবুর স্থান। কিন্তু আশ্চর্য এই, প্রথমবাবু সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাঁহার নাটক ও রস রচনার জন্য। তাঁহার

প্রতিভার প্রকৃত স্বধর্ম কেহ চিনিতে পারে নাই।

তাঁহার রচিত কবিতাগুলি বোধহয় কেহ পড়ে না। কবিতাগুলিতে চটক নাই, কিন্তু প্রাণ আছে। অনুভূতির গাঢ়তা আছে। নাটকগুলিতে আছে প্রখর বুদ্ধির ক্রীড়া এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপের ঝণৎকার ; এক্ষেত্রে তিনি বার্নার্ড শ'র অনুগামী। কিন্তু তাঁহার নাটকগুলির একটি দোষ আছে (যাহা বার্নার্ড শ'য়ের নাটকেরও আছে)—তাঁহার চরিত্রগুলি জীবন্ত মানুষ নয়, পুতুলনাচের পুতুলের মত নাট্যকারের মুখপাত্র মাত্র। আমার মতে তাঁহার প্রতিভার অনুক্রম এইরূপ—(১) সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য সমালোচনা, (২) কবিতা, (৩) নাটক, (৪) গল্প উপন্যাস ইত্যাদি।

১-১১ -১৯৫০

প্রসঙ্গত একজন সাহিত্য ব্যবসায়ীর কথা মনে পড়িল যাহার সহিত প্রমথবাবুর একটু মিল আছে। সে ব্যক্তি সজনীকান্ত দাস। দুইজনের মধ্যে সাদৃশ্য কিন্তু সম্পূর্ণ বাহ্য। দুইজনেই রঙ্গ-ব্যঙ্গেপটু, দুইজনেই শনিবারের চিঠির যৌবনকালে তাহার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। কিন্তু চরিত্র ও সাহিত্যকৃতির পরিমাণে উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

সজনীকান্তকে অনেকে সাহিত্যের দিগ্‌দর্শক মনে করেন। সজনী কবিতা গল্প উপন্যাসও লিখিয়াছে ; ব্রজেন বন্দ্যো ও সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের অনুবর্তী হইয়া অনেক বাংলা ক্লাসিক সম্পাদন করিয়াছে , এমন কি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও লিখিয়াছে। কিন্তু তবু তাহাকে সাহিত্যিক বলিতে পারি না। আসলে সে সাহিত্য ব্যবসায়ী। মন্দিরের পূজারী যেমন কালক্রমে মোহান্ত হইয়া ওঠে, সেইরূপ সজনীও অনেকটা সাহিত্য মোহান্ত। তাহার মধ্যে সামান্য যেটুকু সাহিত্য বুদ্ধি ছিল তাহা নিছক ব্যবসায় বুদ্ধিতে পরিণত হইয়াছে।

২-১১-১৯৫০

খাঁটি বাংলা ভাষা লিখিবার সহজ শক্তি সজনীর আছে। অশ্লীল-ইঙ্গিত-ভরা ইয়ার্কি, যাহা একদিন শনিবারের চিঠির সংবাদ সাহিত্যের বিশেষত্ব ছিল, তাহা সজনীর সহজাত। কবিতায় কদাচিত রস-সৃষ্টি তাহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। তবু সে সাহিত্যিক নয়।

ইহার কারণ, তাহার discrimination নাই, সত্য-অসত্য জ্ঞান নাই, ভাল-মন্দ বোধ নাই। যিনি প্রকৃত সাহিত্যিক তাঁহার মনে একটি সদা-সক্রিয় তুলাদণ্ড কাজ করে, প্রতিটি বস্তু তৌল করে, তাহার মূল্য নির্ধারণ করে। Poets are the unacknowledged legislators of the world. এই বিচারবুদ্ধি বা বিবেক সজনীর নাই। তাই যখন সে কোনও বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে তখন হয় তাহা অন্যের মতামত কিম্বা তাহা ভুল মতামত।

কিন্তু একটি কথা স্বীকার করিতে হইবে—সে একজন অতি উচ্চ অঙ্গের reporter. এখানে বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন নাই, তাই এক্ষেত্রে সে অদ্বিতীয়। এক কথায় সে journalist.

৩-১১-১৯৫০

সজনীর প্রকৃত সাহিত্যিক স্বধর্ম কী তাহা আমিও অনেদিন বুঝিতে পারি নাই। একবার কলিকাতায় গিয়াছি, শনিবারের চিঠির অফিসে আড্ডা বসিয়াছে ; সজনী ছাড়া আর কে কে উপস্থিত ছিল এখন মনে নাই। কথায় কথায় আনন্দবাজার পত্রিকা ও অমৃতবাজার পত্রিকার রেষারেষির কথা উঠিল, দুই পক্ষে তখন খিস্তিখেউড়ের যুদ্ধ চলিয়াছে। গল্প শুনিয়া আমার বড়

বিরক্তি বোধ হইল। মনে আছে, আমি বেশ একটু উত্তপ্ত ভাবে এইসব অসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ব্যক্তিগত ঈর্ষাদ্বেষকে সংবাদপত্রের স্তম্ভে টানিয়া আনার নিন্দা করিয়াছিলাম। আমার নিন্দা প্রায় একটা লেকচার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দিন দশেক পরে শনিবারের চিঠি বাহির হইলে দেখিলাম, আমার ভাষণটি হুবহু 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' শিরোনামায় ছাপা হইয়াছে ; কিন্তু মতগুলি যে আমার তাহার উল্লেখ কোথাও নাই। উহা সম্পাদকীয় মন্তব্য রূপেই প্রকাশিত হইয়াছে।

৪-১১-১৯৫০

সজনীর গলদ কোথায় বুঝিতে পারিলাম। সাহিত্য তাহার ধর্ম নয়, সে শ্রুতিধর—reporter. তাহার আড্ডায় অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির যাতায়াত আছে ; সুনীতিবাবু, ব্রজেনবাবু, নীরদ চৌধুরী, প্রমথ বিশীকে আমি নিজেই তাহার আড্ডায় মজলিশ জমাইতে দেখিয়াছি ; তাছাড়া মোহিত মজুমদার সুশীল দে প্রভৃতিরও যাতায়াত আছে শুনিয়াছি। সজনী এই সকল পণ্ডিতব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য ব্যবসায় চালাইতেছে।

সে যে একজন উৎকৃষ্ট reporter তাহার পরিচয় আবার পাইলাম রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। শ্মশান যাত্রার যে বর্ণনা সে শনিবারের চিঠিতে লিখিয়াছিল তাহার তুলনা নাই। বহু সহস্র বর্ণনার মধ্যে ঐ বর্ণনাটি মনের মধ্যে এখনও উজ্জ্বল হইয়া আছে।

সে যে সাহিত্য বিচারক নয়, সম্প্রতি তাহার একটি নূতন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প নামক পুস্তকের প্রথম সংস্করণে সজনী ভূমিকা লিখিয়াছিল। সে ভূমিকা যাঁহারা পড়িয়াছেন তাহারাই সজনীর সাহিত্যবুদ্ধির পবিচয় পাইয়াছেন।

১৫-১১-১৯৫০

পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র পড়িলাম।

অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রে ব্রহ্মকে প্রতিপাদনের চেষ্টা আছে, পাতঞ্জল দর্শনে তাহা নাই বলিলেই হয়। তবে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের অস্তিত্ব এখানে স্বীকৃত।

পতঞ্জলির কথা অতি সোজা—যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা বৃথা ; যদি সাক্ষাৎ উপলব্ধি চাও, যোগ অবলম্বন কর ; অর্থাৎ ব্রহ্মের পরোক্ষ উপলব্ধি হয় না, কিন্তু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। পরের মুখে ঝাল খাওয়া যায় না।

পতঞ্জলি যোগের অষ্টাঙ্গ এইরূপ দিয়াছেন—

(১) যম। অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ। (২) নিয়ম। অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান। (৩) আসন। অর্থাৎ যোগের বিভিন্ন poses, যথা—নিশ্চল, সুখাবহ, শিথিল প্রযত্ন, অনন্তসমাপত্তি। (৪) প্রাণায়াম।—বাহ্য, আভ্যন্তর, স্তম্ভবৃত্তি, চতুর্থ। (৫) প্রত্যাহার।—পঞ্চেন্দ্রিয় সংযোগবর্জন। (৬) ধারণা—ষট্‌চক্র, কুণ্ডলিনী। (৭) ধ্যান—একতানতা (continuity of single thought.). (৮) সমাধি।

১৬-১১-১৯৫০

তুলা শুনিতে নরম কিন্তু ধুনিতে প্রাণান্ত।

যোগাভ্যাস দ্বারা পরমার্থ লাভের প্রথম অঙ্গ বা step দেখিতেছি—যম। অর্থাৎ মনকে

এমন অবস্থায় লইয়া যাইতে হইবে যখন সে হিংসা করিবে না, সত্যকে আত্মস্থ করিয়া মিথ্যাকে বর্জন করিবে, পরদ্রব্যে লোভ করিবে না। ইন্দ্রিয় সংযম করিবে, বিষয়ে অনাসক্ত হইবে। ইহাই যমের তালিকা। এই প্রথম সোপান অতিক্রম করিয়া যিনি দ্বিতীয় সোপানে আরোহণ করিতে চাহিবেন তাঁহাকে 'নিয়ম' পালন করিতে হইবে। নিয়মের তলিকা : দৈহিক ও মানসিক শুচিতা, সন্তোষ (যাহা পাই তাহাতেই খুশি), তপ (ক্লেশসাধ্য চেষ্টা), স্বাধ্যায় (পড়াশুনা করা), ঈশ্বর প্রণিধান। তৃতীয় সোপান—আসন।

প্রথম ও দ্বিতীয় সোপানে যে সকল মানসিক অবস্থা লাভ করিবার কথা আছে, আসন তাহা সহজে লাভ করিবার কৌশল। ইহা সম্পূর্ণ শারীরিক ব্যাপার। আসনটি নিশ্চল হওয়া চাই, আরামদায়ক হওয়া চাই, শরীর শক্ত হইয়া থাকিবে না, অনন্তে বা শূন্যে লম্বিতবৎ থাকিবে।

১৭-১১-১৯৫০

যোগের চতুর্থ অঙ্গ—প্রাণায়াম। আসনের পর প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের চারি অবস্থা ; নিশ্বাস ফেলা, নিশ্বাস টানা, নিশ্বাস রোধ করা, এবং চতুর্থ। এই চতুর্থ অবস্থায় জোর করিয়া নিশ্বাস রোধ করিতে হয় না ; নিশ্বাস আপনি শান্ত হইয়া যায়—অন্তত কিছুক্ষণের জন্য।

দেখা যাইতেছে, যোগের তৃতীয় এবং চতুর্থ অঙ্গ সম্পূর্ণ দৈহিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াগুলি যম ও নিয়ম লাভ করিবার কৌশল।

তারপর প্রত্যাহার ; বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কত্যাগ। তারপর সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ধারণা করিতে হইবে—ষট্‌চক্র ও কুণ্ডলিনীর ধারণা। এইরূপে, কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইবেন। এই জাগ্রতা কুণ্ডলিনীতে ধ্যানস্থ হইলে অবশেষে সমাধি। ইহাই চরম পুরুষার্থ। ইহার পর আর কিছু বাঞ্ছনীয় থাকিবে না।

যোগ সাধনার গোড়ার দিকে ঈশ্বর প্রণিধানের প্রয়োজন আছে, শেষের দিকে তাহাও নাই। তখন অহং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসির অবস্থা। ইহা অনুভব সাপেক্ষ, বলিয়া বোঝানো যায় না।

১৮-১১-১৯৫০

গীতায় যোগের কথা শুনিয়া অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—হে কৃষ্ণ, মন চঞ্চল, প্রমাথি এবং বলবান, তাহাকে নিগ্রহ করা বায়ুকে নিগ্রহ করার মতই দুষ্কর। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—তা বটে। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাকে বশ করা যায়।

অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম চারিটি অঙ্গ এই অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের অনুশীলন। যম ও নিয়ম এই দুই পর্যায়ে যে সকল মানসিক অবস্থার উল্লেখ আছে—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান—এইগুলি একত্র করিলে বৈরাগ্যের অবস্থা পাওয়া যায়। আসন ও প্রাণায়ামকে অভ্যাস বলা চলে। সুতরাং অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম চারিটি অঙ্গের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। মনকে একবার বশীভূত করিতে পারিলে, প্রত্যাহার—বিষয়বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিছিন্ন করা সহজ। তারপর ধ্যান ধারণা সমাধি অল্প চেষ্টাতেই লাভ করা যাইবে।

আমাদের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা অর্জুনের মত। অভ্যাস ও বৈরাগ্য কয়টা মানুষের আছে ? প্রথম চারিটি সোপান উত্তীর্ণ হওয়াই কঠিন।

২৪-১২-১৯৫০

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। অকালমৃত্যুই বলিতে হইবে। সে আরও দশ বছর

বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো আরণ্যকের মত কোনও রচনা তাহার হাত দিয়া বাহির হইতে পারিত। কিন্তু সেটা একটা অনিশ্চিত সম্ভাবনা।

পৌষ মাসের 'কথা সাহিত্যে' দেখিলাম, অনেকেই তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। এই সব লেখা হইতে জানিতে পারিলাম বিভূতির জীবনের একটা আধ্যাত্মিক দিক ছিল ; ভূত ভগবান প্রভৃতি লইয়া সে তর্ক করিতে ভালবাসিত। উপনিষদ পড়িয়াছিল। নাম জপ বিশ্বাস করিত। এই cynical যুগে ইহাও কম কথা নয়। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যিকের মনের গতি অধ্যাত্মমুখী ; মন যত পরিণত হয় ততই ধর্মের দিকে যায়। কেবল শরৎচন্দ্র ইহার ব্যতিক্রম।

বিভূতির সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পড়িলাম। দেখিতেছি, আমি তাহার সাহিত্য বুদ্ধি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার নিজের মুখের কথাই তাহা সমর্থন করিতেছে। সে conscious artist ছিল না।

একদিন নিভৃতে বিভূতি বলল—'দাদা, আমি কিছুই ভেবে লিখি না। লেখার সময় মনে যা যা আসে তাই লিখে যাই...'

কালিদাস রায়, মানুষ বিভূতিভূষণ কথা সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭

২৫-১২-১৯৫০

অগ্রহায়ণের শনিবারের চিঠি বিভূতি সংখ্যা হইয়াছে। তাহাতে বিভূতি সম্বন্ধে অনেক লেখা পড়িলাম। তাহার জন্ম হইয়াছিল ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ ! অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তাহার ৫৭ বছর বয়স পূর্ণ হইয়াছিল।

বিভূতির কোষ্ঠীর ছক তৈয়ার করিয়াছি, কিন্তু জন্ম সময়ের অভাবে লগ্ন স্থির করিতে পারিতেছি না। তাহার চেহারা ইত্যাদি হইতে মনে হয় সিংহ লগ্ন। সিংহ লগ্নের বুধ মারক। বুধ দশার আরম্ভেই মৃত্যু হইয়াছে।

কোষ্ঠী ভাল, কিন্তু লেখকযোগ খুব প্রবল নয়। ভ্রমণের বহু যোগ আছে। কর্মস্থানে গুরু শিক্ষকের কর্ম করাইয়াছে। অষ্টমস্থ রাহু ২১ বছর বয়স পর্যন্ত বহু ক্লেশ দিয়াছে। শনির দশায় প্রবাসে ভাগ্যোদয় হইয়াছে।

আমি জানিতাম বিভূতি কৃপণ ও গৃধ্নু ছিল। যাহা পড়িলাম তাহাতেও ঐ কথাই আছে ; তবে কেহ কেহ whitewash করিয়াছেন। কোষ্ঠীতে কিন্তু কার্পণ্য দোষ দেখিলাম না।(২য়ে কে)। চন্দ্রের ৪র্থে পাপগ্রহ বাহু থাকিলে পেটুক হয়—এটাও মিলিয়াছে। হয়তো কার্পণ্য দোষ তাহার সহজাত ছিল না ; অবস্থার উন্নতির সহিত তাহার মন তাল রাখিতে পারে নাই, তাই তাহাকে কৃপণ মনে হইত।

২৭-১২-১৯৫০

যখন আমার চৌদ্দ বছর বয়স তখন আমি মুঙ্গের জিলা স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হই। তার আগে ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে পড়িতাম। ট্রেনিং স্কুলের আবহাওয়া ছিল অতিশয় নোংরা ; জিলা স্কুলে যেন একটা নূতন পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

জিলা স্কুলের এক মাস্টার ছিলেন পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ; তিনি আসলে ড্রিল মাস্টার ছিলেন, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক বাঙালী ছাত্রদের বাংলাও পড়াইতেন।

পূর্ণবাবু ছিলেন চটপটে দ্রুতভাষী প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তি। আজও তাঁর চেহারা স্পষ্ট মনে আছে। মজবুৎ দোহারা শরীর, তামাটে গৌরবর্ণ ; মাথার কোঁকড়া চুল সিঁথির কাছে পাতলা হইয়া গিয়াছে। তিনি যেমন খেলাধূলায় আমাদের সর্বদা উৎসাহ দিতেন, তেমনি বাংলা সাহিত্যের প্রতিও আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করিতেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। আমার বাংলা সাহিত্য রচনার দীক্ষা পূর্ণবাবুর কাছে।

২৮-১২-১৯৫০

মনে আছে ১১/১২ বছর বয়স হইতে লুকাইয়া নভেল পড়িতে শিখিয়াছিলাম। ইংরেজি উপন্যাস পড়ায় বাবার আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার ধারণা ছিল ইংরেজি উপন্যাস পড়িলে আমি ভাল ইংরেজি শিখিব। বাংলা উপন্যাস পড়িতে হইত লুকাইয়া। বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্র ছাড়া আর কাহারও বই ভাল লাগিত না ; ইংরেজিতে যাহা পড়িতাম তাহাই ভাল লাগিত ; কারণ ইংরেজি নভেলের অধিকাংশই বুঝিতে পারিতাম না ; এবং যাহা বুঝিতাম না তাহা কল্পনা দ্বারা পূরণ করিয়া লইতাম। এইভাবে একদিকে বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্র এবং অন্যদিকে অসংখ্য ভালমন্দ ইংরেজি নভেল—এই দুইয়ের সমবায়ে আমার সাহিত্য-বুদ্ধি গড়িয়া উঠিয়াছিল। আর একটা factor ছিল—মাইকেল মধুসূদনের কাব্য গ্রন্থ। আমাদের বাড়িতে মধুসূদনের বড় আদর ছিল। আমি ঐ বয়সেই বীরাঙ্গনা ও মেঘনাদবধ প্রায় মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু আমিও যে কোনও দিন কলম ধরিয়া বাংলা লিখিব এ দুরাশা তখনও মনে জাগে নাই।

২৯-১২-১৯৫০

একদিন বাংলা ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে পূর্ণবাবু বলিলেন —'তোমরা কবিতা লেখ না কেন ? কবিতা লেখা খুব শক্ত নয় ; চেষ্টা করলেই পারবে।'

ক্লাসে গুটি চার পাঁচ ছাত্র ছিল। তার মধ্যে দুইজনের সাহিত্যের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল—আমি আর নিরুপম। নিরুপম ছিল ˇ গোবিন্দচন্দ্র রায়ের (কত কাল পরে বল ভারত রে) পুত্র। আমি আর নিরুপম স্থির করিলাম কবিতা লিখিব। কবিতার বিষয়— কষ্টহারিণীর গঙ্গাঘাট।

পরদিন স্কুলে আসিয়া দু'জনে ভয়ে ভয়ে কবিতা দুটি পূর্ণবাবুর কাছে পাঠাইয়া দিলাম, কবিতা লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইবার সাহস হইল না। পূর্ণবাবু আমার কবিতাটি পড়িয়া খুশি হইয়াছিলেন এবং উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এই প্রশংসাই আমার কাল হইল। যখন তখন কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলাম। শুধু তাই নয়, গল্প লিখিবার নেশা আমাকে চাপিয়া ধরিল।

৩০-১২-১৯৫০

গল্প লিখিতে আরম্ভ করিতাম বটে কিন্তু শেষ করিতে পারিতাম না ; একটা গল্প শেষ করিবার আগেই অন্য একটা গল্পের আইডিয়া মাথায় আসিত, তখন প্রথম গল্পটি শেষ করিবার উৎসাহ আর থাকিত না। ডিটেকটিভ গল্প, ভূতের গল্প, ঐতিহাসিক গল্প, এমনি কত অসমাপ্ত গল্প যে ডিম্বাবস্থায় পচিয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি বোধহয় এখনও মুঙ্গেরে চোথা কাগজের স্তূপের মধ্যে পড়িয়া আছে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার পর এলাহাবাদে মামার বাড়ি গিয়াছিলাম। সেখানে আমার প্রথম পরিপূর্ণ গল্প লিখিলাম—প্রেতপুরী। লেখার বহুকাল পরে গল্পটি ছাপা হইয়াছিল। ষোল বছর বয়সে যেমন লিখিয়াছিলাম হুবহু তেমনি ছাপা হইয়াছিল (বোধহয় 'পুষ্পপাত্রে')।

ম্যাট্রিক পাস করিয়া কলিকাতায় পড়িতে গেলাম। সেখানে মেছুয়াবাজারের Y. M. C. A হস্টেলে সাহিত্যচর্চার নূতন প্রেরণা জুটিল।

৩১-১২-১৯৫০

কলিকাতায় গিয়া কিছুদিনের মধ্যেই বায়স্কোপ দেখায় মাতিয়া উঠিলাম। ফুটবল হকি খেলার ঝোঁক আগে হইতেই ছিল, তার উপর জুটিল টেনিস ও বাস্কেটবল। কলিকাতায় যে-পাঁচ বছর ছিলাম তাহার মধ্যে লেখাপড়া অল্পই করিয়াছিলাম ; তবে পরীক্ষায় পাস করিয়া যাইতাম।

দ্বিতীয় বর্ষে একটি নূতন ছেলে হস্টেলে আসিল, তাহার নাম অজিত সেন। অজিত ভাল গান গাহিতে পারিত, কবিতা লিখিত এবং অফুরন্ত হাসিতে পারিত। তাহার সহিত শীঘ্রই বন্ধুত্ব গাঢ় হইল। কবিতা লেখার ঝোঁকও আবার বাড়িল। আমাদের উদ্যোগে হস্টেলে হাতে লেখা কাগজ বাহির হইতে লাগিল।

এই সময় হঠাৎ একদিন একটা কৌতুক উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম এবং অচিরাৎ শেষ করিলাম। উপন্যাসটি ২/১ টি মাসিকপত্রে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু সকলেই একবাক্যে উহা ফেরৎ দিলেন।

১৯১৮ সালের মাঝামাঝি বিবাহ হইল। তারপর আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'যৌবনস্মৃতি' নিজের খরচে ছাপিয়া বাহির করিলাম।

বইখানি কাহাকেও উপহার দিতে বাকি রাখি নাই। অনেক মাসিক পত্রিকায় সমালোচনার জন্য পাঠাইয়াছিলাম। যতদূর মনে আছে প্রবাসী ছাড়া আর কেহই বইখানির সমালোচনা করে নাই। প্রবাসী এই ক্ষুদ্র বইখানির দীর্ঘ এবং প্রশংসাপূর্ণ আলোচনা' করিয়াছিলেন। ইহাই আমার সাহিত্য জীবনের আদিকাণ্ড।

১-১-১৯৫১

আবার একটা নূতন বছর আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার জীবনে এই ৫২ বার নববর্ষ আসিল এবং গেল। আরও কয়েকটা আসিবে মনে হয়।

বোম্বাই আসার পর হইতে আমার শরীর ভাঙিতেআরম্ভ করিয়াছে। চুলও সমস্ত পাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু মনের মধ্যে এখনও জরার প্রভাব অনুভব করিতেছি না। যৌবনের অবসানে দেহমনের সৃষ্টিশক্তিও হ্রাস পায়, কিন্তু আমার কোনও তারতম্য এখনও বুঝিতেছি না। বরং পূর্বে রসানুভূতি অপেক্ষাকৃত স্থূল ছিল এখন আরও সূক্ষ্ম হইয়াছে। জগতের সহিত পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, অন্তরঙ্গতাও ততই গাঢ় হইয়াছে। বৈরাগ্য বা বিতৃষ্ণা এখনও আসে নাই।

কেবল মাঝে মাঝে মনের মধ্যে একটা ত্বরা অনুভব করি। যেন অনেক কিছু এখনও করিতে বাকি আছে কিন্তু সময় ফুরাইয়া আসিতেছে। মনের কোণে অন্ধকার ঘনায় নাই, কিন্তু কে যেন ডাকিয়া বলিতেছে—সময় নাই! সময় নাই!

২-১-১৯৫১

১৯২১ সালে আইন পড়িতে পড়িতে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া মুঙ্গেরে ফিরিয়া

আসিয়াছিলাম। তখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে ; পড়াশুনায় আর মন লাগিল না। মনে আছে প্রায় তিন বছরের জন্য বিলাতী সিগারেট খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।

অতঃপর ১৯২৫ পর্যন্ত বাড়িতে বসিয়া কাটাইলাম। তাস পাশা থিয়েটার হকি ফুটবল, এই লইয়া দিন কাটিত। বাণীমন্দির নামে একটি ক্লাবের পত্তন হইয়াছিল, তাহাতেই মশগুল হইয়া রহিলাম। বরদার গল্পে বারবার যে ক্লাবের উল্লেখ আছে তাহা আদৌ ঐ বাণীমন্দির ক্লাব। আমার এই সময়ের সাহিত্য তৎপরতা—বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্রের উপন্যাস নাটকে পরিণত করিয়া অভিনয় করা।

আমার এই অকর্মার মত জীবনযাত্রা দেখিয়া বাবা বড় দুঃখ পাইয়াছিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিতেন না। তাঁহার মুখ চাহিয়া একদিন পাটনায় আইন পড়িতে গেলাম। দুই বছরে আইন পাস করিয়া ফিরিলাম এবং বাবার জুনিয়র রূপে ওকালতি আরম্ভ করিলাম। বাবা বড়ই আহ্লাদিত হইলেন।

৩-১-১৯৫১

ওকালতি কিন্তু আমার ধাতে সহিল না। আমি স্বভাবতই মুখচোরা ; তাছাড়া ওকালতির একটা দিক আছে, যাহাতে পাটোয়ারি বুদ্ধির প্রয়োজন। আমার তাহা সহ্য হইত না। তিন বছর চেষ্টা করিয়া ওকালতি ছাড়িলাম। বাবা মর্মাহত হইলেন। কিন্তু তিনিও বুঝিয়াছিলেন, এ পথে আমি কিছু করিতে পারিব না।

১৯২৯ সাল হইতে আমার পুরাপুরি সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হইল। জানিতাম সাহিত্যে পয়সা নাই, তবু সাহিত্যের কোলে আত্মসমর্পণ করিলাম। বাবার তখন খুব পসার, অনেক উপার্জন করেন। ভাবিলাম, পিতৃ-দাক্ষিণ্যের ছায়াতলে বসিয়া বাণীর আরাধনায় শান্তভাবে জীবন কাটাইয়া দিব।

সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে আমাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। মাসিক পত্রিকার মারফতে আমার নামটা শীঘ্রই সাধারণে সুপরিচিত হইল। 'বিজয়ী' গল্পটির জন্য 'পুষ্পপাত্র' নামক পত্রিকার নিকট হইতে ৫্ টাকা পুরস্কার পাইলাম। সাহিত্য হইতে ইহাই আমার প্রথম উপার্জন।

১৯৩৩ সালে (ফাল্গুন ১৩৩৯) আমার প্রথম গল্প-পুস্তক জাতিস্মর প্রকাশিত হইল।

৪-১-১৯৫১

প্রায় দশ বছর আগে বিষকন্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৮) তারাশঙ্কর লিখিয়াছিল—'বাংলা সাহিত্যে শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ, বর্তমানে গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে যাঁহাদের নাম প্রথমেই মনে পড়ে তাঁহাদেরই একজন।'

১৯২৯ সালে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করিয়া ১৯৪১ সালে আমি এই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলাম। তারপর কী হইল ? সে ইতিহাস বলিতে হইলে আরও কয়েক বছর পিছাইয়া যাইতে হয়।

আমাদের সংসারে অশান্তি দেখা দিয়াছিল। চালের কল করিয়া শুধু লোকসান নয়, ঋণ হইয়াছিল। ১৯৩৪-এর ভূমিকম্পের পর বাবার পসার কমিতে আরম্ভ করিয়াছিল ; সংসারে অর্থাভাব দেখা দিয়াছিল। লক্ষ্মী যেখানে বিমুখ সেখানে অশান্তি অনিবার্য। এই অশান্ত তিক্ত পরিবেশের মধ্যে আমার সাহিত্য সাধনা বিষবৎ হইয়া উঠিল। পিতার স্কন্ধে ভর করিয়া আর

কতদিন কাটাইব ? তাঁহার ভার নিজস্কন্ধে তুলিয়া লইতে না পারি, নিজে সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার ভার লাঘব করিতেও কি পারিব না ?

৫-১-১৯৫১

সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি প্রতিপত্তি যতই লাভ করি অর্থের দিক দিয়া বিশেষ লাভবান হইতে পারি নাই। ১৯৩৭ সালে আমার আয় (বই মাসিকপত্র গ্রামোফোন রেকর্ড রেডিও ইত্যাদি হইতে) হইয়াছিল ১৮০০ টাকা, অর্থাৎ গড়ে মাসিক দেড় শত টাকা। আমাদের বৃহৎ পরিবারের কাছে ইহা সমুদ্রে শিশিরবিন্দু। আমার তিন পুত্র, তন্মধ্যে একটি কলেজে ও দুইটি স্কুলে পড়িতেছে।

১৯৩৮-এর মাঝামাঝি একখানি চিঠি পাইলাম ; হঠাৎ যেন স্বর্গদ্বার অনাবৃত হইল। চিঠি লিখিয়াছেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। তাঁহার শ্যালক হিমাংশু রায় তখন বম্বে টকীজ নামক চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের হর্তাকর্তা। আমি বোম্বাই গিয়া এই চিত্র প্রতিষ্ঠানে গল্পলেখক রূপে চাকরি লইব কিনা তাহাই ডঃ দাশগুপ্ত জানিতে চাহিয়াছেন।

মাস খানেকের মধ্যে কথাবার্তা সব ঠিক হইয়া গেল। ২৭ জুলাই ১৯৩৮ আমি সস্ত্রীক বোম্বাই আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

৬-১-১৯৫১

কৈশোর হইতেই আমার নাটকের প্রতি অনুরাগ। আঠারো বছর বয়স হইতে সখের থিয়েটার করিয়াছি ; তারপর নিজে নাটক লিখিয়া অভিনয় করিয়াছি ; অজস্র সিনেমা দেখিয়াছি।

দেশী সিনেমা কিন্তু ভাল লাগিত না ; যথাসম্ভব বিলাতী ছবি দেখিতাম। দেশী ছবির মধ্যে প্রথম ভাল লাগিল নীতিন বসুর ভাগ্যচক্র। তারপর দেবদাস মীরাবাঈ দিদি বিদ্যাপতি আরও কয়েকটি ছবি ভাল লাগিল বটে কিন্তু দেশী সিনেমা শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিল না। গল্প দুর্বল, অভিনয় অতৃপ্তিকর—সবকিছুই বেশ অপরিপুষ্ট। দেখিয়া ভাল লাগিত, কিন্তু মন ভরিত না। সিনেমা শিল্পের অপূর্ব সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া হাত নিশপিশ করিত।

তাই, সিনেমা শিল্পের আহ্বান যেদিন পাইলাম সেদিন আশায় মন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এইবার সুযোগ পাইয়াছি। সিনেমা শিল্পকে উন্নত করিব, সাহিত্যের পর্যায়ে টানিয়া তুলিব। ইহা শুধু আমার জীবিকা হইবে না, আমার জীবনের পরম সাধনা হইবে।

বোম্বাই আসিয়া সিনেমা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। সিনেমাকে সর্বান্তঃকরণ সমর্থন করিলাম।

৭-১-১৯৫১

বোম্বাই আসার পর প্রথম ৪/৫ বছর সিনেমাই আমার ধ্যানজ্ঞান হইল। সিনেমার গল্প ইংরেজিতে লিখিতে হয়, কারণ এদেশে বাংলা কেহ বোঝে না। বাংলা সাহিত্যের সহিত সম্পর্ক প্রায় ঘুচিয়া গেল। যেটুকু রহিল তাহাও সিনেমা সম্পর্কে ; বাংলায় চিত্রনাট্য লিখিয়া পুস্তকরূপে প্রকাশ করিলাম।

সিনেমা কর্ম যে শিল্প কর্ম নয়, বাণিজ্য কর্ম, তাহা বুঝিতে আমার পাঁচ বছর লাগিল। ইহা আমারই বুদ্ধির দোষ ; অনুরাগে অন্ধ হইয়া মানুষ এমনই কত ভুল করে। যখন বুঝিতে পারিলাম তখন বিতৃষ্ণায় মন ভরিয়া উঠিল। দেবতা ভাবিয়া অপদেবতার পূজা করিয়াছি। কিন্তু এখন আমার কী উপায় হইবে ? সাহিত্যের সাধনায় বহুদূর পিছাইয়া পড়িয়াছি ; এদিকে সিনেমা লক্ষ্মীর প্রতি মন বিমুখ। স্থির করিলাম, আর না, স্বধর্মে ফিরিয়া যাইব। পেশা হিসাবে

সিনেমা থাকে থাক, কিন্তু বঙ্গবাণীই আমার ইষ্টদেবতা, একথা যেন ভুলিয়া না যাই। আর যেন ভুলিয়া না যাই।
১১-১-১৯৫১

নিশাচরের চিত্রনাট্য বাংলায় লেখা শেষ কবিয়াছি। নাম দিয়াছি—কানামাছি। আদৌ যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাতে সামান্য অদলবদল করিয়াছি, মূল গল্পের বক্তব্য পরিবর্তিত হয় নাই। বরং আগের চেয়ে জোরালো হইযাছে। শেষের দিকে যে একটু থিয়েটারী ঢঙ্ আনিয়াছি তাহা দৃশ্যকাব্যের উপযোগী।

গল্পটার হিন্দী ছবি বম্বে টকীজ তৈয়ার করিয়াছে। Serious dramaকে comic operaয় রূপান্তরিত করিলে তাহা কিরূপ অসহ্য হইয়া উঠিতে পারে এই ছবিটি তাহার প্রমাণ। এখন মনে হইতেছে ছবি না হইলেই ভাল হইত। নিজের সন্তানকে চোখেব সামনে বিকৃত বিকলাঙ্গ semi-imbecile অবস্থায় দেখিতে হইত না।

পরিহাস এই যে গল্পটাকে অবিকৃত রাখিলে উহা শুধু উচ্চস্তরের শিল্পকর্মই হইত না, জনপ্রিয়ও হইত। কিন্তু যাহারা শিব গড়িতে গিয়া বাঁদর গড়িয়াছে তাহাদের একথা কে বুঝাইবে? নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী দেবতা গঠন করাই বোধকরি জীবের ধর্ম।
১২-১-১৯৫১

সিনেমা শিল্পের বিরুদ্ধে আমার কোনও নালিশ নাই। নালিশ তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা এই শিল্পকে নিছক অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ে পরিণত কবিয়াছে। পরিতাপ এই যে ইহারা ভাল ব্যবসাযীও নয়। অথবা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীব ব্যবসায়ী। একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক হাতে পাইযা যাহারা তাহাব রূপযৌবনের ব্যবসা করিয়া অর্থবান হইতে চায ইহাবা সেই শ্রেণীর লোক। তাই শিল্পকলাকে পণ্যদ্রব্য মনে করা ইহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু ধনিকতন্ত্রে ইহার অধিক আর কি প্রত্যাশা করা যায়। আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশেও তো এইরূপ হইতেছে। তফাৎ এই যে উহাদের শিল্পবুদ্ধি আমাদের সিনেমা ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা কিছু উন্নত।

সিনেমা শিল্প হইতে টাকার সংযোগ যতক্ষণ না পৃথক কবা যাইতেছে ততক্ষণ এ শিল্পের উন্নতি নাই। হযতো সুদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন চিত্রনির্মাণ বই ছাপাব মতন সুলভ হইবে। কিন্তু সেদিন এখনও বহু দূরে। ইতিমধ্যে আমরা ভস্মে ঘৃত ঢালিযা চলিয়াছি।
৩-২-১৯৫১

দিদি-রচয়িত্রী শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। একটিমাত্র বই লিখিযা এমন ভাবে একটি জাতিব চিত্ত জয় করিতে বোধহয় আর কেহ পারে নাই। নিরুপমা আরও কযেকটি বই লিখিয়াছেন কিন্তু তিনি স্মরণীয়া হইয়া থাকিবেন দিদির জন্য।

অনেক দিনের পুবানো কথা মনে পড়ে। তখনও কৈশোব অতিক্রম করি নাই। প্রবাসীতে দিদি বাহির হইতেছে; মাসের পব মাস প্রবাসীব পথ চাহিয়া থাকিতাম। সুরমা চারু উমা অমরনাথ—চবিত্রগুলিকে চোখের সামনে দেখিতে পাইতাম, তাহাদের সহিত মনে মনে কত মধুর সম্পর্ক পাতাইয়া ফেলিযাছিলাম। তারপব যখন কাহিনী শেষ হইল তখন পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে মন ভরিয়া উঠিল। এমন satisfying সমাপ্তি বাংলা ভাষায আর আছে কিনা সন্দেহ।

নিরুপমা দেবী যে রস প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করিয়াছেন তাহা প্রীতির রস। অনির্বচনীয় প্রীতি তাঁহার রচনায় ওতপ্রোত। এই সাক্ষাৎ প্রীতিস্বরূপিণীর উদ্দেশে প্রণাম জানাই।
১৫-২-১৯৫১

রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরামের সঙ্গে নক্ষত্রলোকের Nova জাতীয় তারার সাদৃশ্য দেখা

যায়। আকাশের অগণ্য তারকার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র তারা হঠাৎ প্রচণ্ড তেজে প্রজ্বলিত হইয়া ওঠে, আবার দুই চারিদিনের মধ্যে ক্রমশ ক্ষীয়মান হইয়া আপন পূর্বতন নগণ্যত্বে ফিরিয়া যায়।

রাজশেখরবাবু পণ্ডিত ও রসজ্ঞ। তিনি চলন্তিকা অভিধান লিখিয়াছেন, রামায়ণ মহাভারতের সারানুবাদ করিয়াছেন ; আরও অনেক কাজ করিয়াছেন যাহার জন্য বাংলা ভাষা চিরদিন তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন হাসির তুবড়ি ফুটাইয়া, রঙ্গরসের রঙমশাল জ্বালিয়া। দুঃখের বিষয় সে জ্যোতিরুৎসব বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই ; Novaর ন্যায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার দপ্ করিয়া নিভিয়া গিয়াছে।

প্রতিভা কি অদ্ভুত বস্তু ! কখন আসে কখন যায় কিছুই বোঝা যায় না। তবু, ভূষণ্ডীর মাঠে, লম্বকর্ণ, জাবালি, বিরিঞ্চি বাবা পড়িয়া বাঙালী চিরদিন হাসিবে।

২০-২-১৯৫১

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, যে জাতির ইতিহাস নাই তাহার ভবিষ্যৎ নাই। আমাদের ইতিহাস আছে, চার পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস আছে, কিন্তু আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। ইতিহাসের পরিবর্তে আমরা কিছু পৌরাণিক রূপকথা মনে করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের ইতিহাস থাকিয়াও নাই।

আমাদের যদি সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে জীবনকে আমরা একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত দেখিয়াছি এবং অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা তাহা স্থিতিশীল। প্রত্যেক সভ্যতারই একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী আছে ; কেহ বস্তু জগৎকে বড় করিয়া দেখিয়াছে, কেহ অন্তর্লোকের প্রাধান্য দিয়াছে। ভারতীয় কৃষ্টির স্বধর্ম এই যে উহা কিছুকেই অবজ্ঞা করে না ; ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ— সবগুলিই তাহার কাছে সমান আদরণীয়। কোনও বিশিষ্ট পন্থার প্রতি তাহার বিরাগ নাই ; জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। ইহাই আমাদের সংস্কৃতিব মর্মকথা। ইহাই আমাদের ইতিহাস। ঘটনার ইতিহাস নয়, ধাতু-প্রকৃতির ইতিহাস।

২১-২-১৯৫১

কিন্তু ইতিহাস বলিতে পূর্বপুরুষদের গৌরব কাহিনীও বুঝায়। আমার যদি জানা থাকে যে আমার পূর্বপুরুষ বীর ছিলেন, অসিহস্তে সিপাহী যুদ্ধে লড়াই করিয়াছিলেন। তাহা হইলে আমি ভীরুচিত কার্য করিতে লজ্জা পাইব। জাতীয় জীবনেও সেইরূপ। ভারতবর্ষে বর্তমানে রাজপুত মারাঠা ও শিখরা যোদ্ধজাতি বলিয়া পরিচিত। তাহাদের সকলেরই বীরত্বের গৌরবময় ইতিহাসে আছে, tradition আছে। রাজপুতেরা সংগ্রামসিংহ, পৃথ্বিরাজ, রাণা প্রতাপ রাজসিংহকে ভুলে নাই ; মারাঠারা শিবাজী ও পেশোয়াদের বিক্রম কাহিনী অন্তরে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে ; শিখ গুরুদের অপূর্ব শৌর্যকথা শিখেদের চিত্তফলকে খোদাই করা আছে। তাই তাহাদের ভীরু হইবার উপায় নাই। তাহাদের ইতিহাস আছে বলিয়াই ভবিষ্যৎ আছে। সে-ইতিহাস ভাল কি মন্দ তাহার বিচার এখানে অনাবশ্যক।

বাঙালীরও ইতিহাস আছে কিন্তু তাহা প্রাকমুসলমান যুগের ইতিহাস। সেই ইতিহাস বাঙালীকে শুনাইতে পারিলে বাঙালীর আত্মচৈতন্য জন্মিতে পারে।

২২-২-১৯৫১

কিন্তু কেবল পৈতৃক মূলধন আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, নূতন ধন অর্জন করিতে হইবে, নূতন tradition সৃষ্টি করিতে হইবে। এই tradition সৃষ্টি করার কার্যে প্রধান যন্ত্র সাহিত্য। সেকালে ভাট ও চারণ জাতীয় কবিরা যেমন গান গাহিয়া এবং গল্প বলিয়া জাতির ঐতিহ্য বাঁচাইয়া রাখিতেন, একালে কবি ও গল্পলেখকদের উপর সেই কর্তব্য আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই কর্তব্য বহুবার বহুভাবে করিয়াছেন ; রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র

ইহারই তপস্যায় জীবন ও লেখনী উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে একাজ আর কেহ করে না ; এখন সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকেরা মানবচিত্তের পঙ্কোদ্ধারে ব্যস্ত। মানুষের মনে কত ময়লা আছে তাহাই সকলে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতেছেন। মানুষের মনের খনিতে হীরাও আছে একথাটা যেন উল্লেখযোগ্যই নয়। আমরা অমৃতের পুত্র নয়, আমরা বানরের বংশধর এই কথাটাই এখন বড় কথা।

২৩-২-১৯৫১

ইতিহাস অবলম্বন করিয়া কাহিনী লেখা বঙ্গভাষায় প্রচলিত নয়। বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্র ইহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে। প্রাকমুসলমান যুগের ঐতিহ্য বাঙালী যেন ভুলিয়া গিয়াছে। রাখালদাস স্মরণ করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি ইতিহাসবিৎ ছিলেন, গল্পলেখক ছিলেন না ; তাই তাঁহার চেষ্টা সার্থক হয় নাই। বাঙালী জাতির হৃদয়ে 'শশাঙ্ক' 'ধর্মপাল' স্থান করিয়া লইতে পারে নাই।

আমি আমার অনেকগুলি গল্পে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। কেহ কেহ বলেন এইগুলিই আমার শ্রেষ্ঠ রচনা। শ্রেষ্ঠ হোক বা না হোক, আমি বাঙালীকে তাহার প্রাচীন tradition-এর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ চেষ্টা আর কেহ করে না কেন ? বাঙালী যতদিন না নিজের বংশগরিমার কথা জানিতে পারিবে ততদিন তাহার চরিত্র গঠিত হইবে না ; ততদিন তাহার কোনও আশা নাই। যে জাতির ইতিহাস নাই তাহার ভবিষ্যৎ নাই।

১৫-৮-১৯৫১

গত তিন মাসের মধ্যে পর-পর দুইবার কলিকাতা যাইতে হইল। সেখানে জগদীশ মনোজ বসু আরও অনেক সাহিত্য বন্ধুর সহিত দেখা হইল।

বেঙ্গল পাবলিশার্সের অফিসে বসিয়া একদিন গল্প হইতেছিল, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় আসিলেন। মিষ্টভাষী মিশুকে লোক। কথাপ্রসঙ্গে জ্যোতিষের কথা উঠিল। সুনীতিবাবু তাঁহার জন্ম সময় আমাকে দিলেন।

বম্বে ফিরিয়া কোষ্ঠি তৈরি করিলাম। অসাধারণ কোষ্ঠি। ফলনির্দেশ করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলাম। কয়েকদিন পরে তাঁহার চিঠি পাইলাম ; খুব আনন্দিত হইয়া চিঠি দিয়াছেন। আমি কয়েকটি প্রাচীন শব্দ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহারও বিস্তারিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ উত্তর দিয়াছেন। সেকালে সমুদ্রগামী জাহাজকে বহিত্ত বলিত, মাস্তুলকে গুণবৃক্ষ বলিত আমি জানিতাম না ; নাণক হইতে আনা শব্দের উদ্ভব তাহাও অজ্ঞাত ছিল। শব্দগুলি 'মৌরী নদীর তীরে'[১] লিখিবার সময় কাজে লাগিবে।

১৬-৮-১৯৫১

দ্বিতীয়বার যখন কলিকাতা যাইবার প্রয়োজন হইল তখন স্থির করিলাম সুনীতিবাবুর সহিত দেখা করিয়া আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করিব। রওনা হইবার দুই দিন আগে তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া দিলাম, কলিকাতায় আমার ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিলাম।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া শুনিলাম তিনি ফোন করিয়াছিলেন। তিনি কবে কবে বাড়িতে থাকিবেন এবং কখন গেলে দেখা করিবার সুবিধা হইবে তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ হইবে ভাবিয়া উৎফুল্ল হইলাম।

একদিন সকালবেলা দেখা করিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম, সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি ; সে সুমিষ্ট

মিশুক ভাব আর নাই। কেমন যেন ব্যাজার ভাব। অসময়ে বিরক্তিদায়ক উমেদার উপস্থিত হইলে বড়মানুষের যেমন মুখের ভাব হয় অনেকটা সেইরূপ। মনে হইল, আমি কোনও অনুচিত প্রস্তাব করিব এই আশঙ্কায় পূর্ব হইতেই তিনি বিরূপ হইয়া আছেন। লজ্জিত ও অপদস্থ হইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

১৭-৮-১৯৫১

সুনীতিবাবুর সহিত দেখা করিতে যাইবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা জগদীশ ভট্টাচার্যের বাসায় গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম সেখানে সাহিত্যিকদের আসর বসিয়াছে, শ্রীমনোজ বসুকে সম্বর্ধনা করা হইল। সেখানে সজনী দাসের সহিত দেখা হইল।

সজনীর বোলচাল হইতে মনে হইল সে আমাকে দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছে। বারবার শনিবারের চিঠিতে লিখিবার জন্য নির্বন্ধ করিল। শেষে বলিল, 'চল, কাল সকালে আমার বাড়িতে যেতে হবে। আমি এসে গাড়িতে করে তোমাকে নিয়ে যাব।'

আমি বলিলাম, 'কাল যেতে পারব না ভাই, কাল সকালে একবার সুনীতিবাবুর বাড়ি যেতে হবে।'

সজনী অত্যন্ত উৎসুক হইয়া বলিল, 'কেন ? কেন ? সুনীতিবাবুর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ের চেষ্টা করছ নাকি ?'

আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, 'সে কি ! আমি যাচ্ছি তাঁর কাছে কিছু জ্ঞান আহরণ করতে।'

কিন্তু সজনী বোধহয় বিশ্বাস করিল না।

১৮-৮-১৯৫১

সুনীতিবাবুর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিবার সঙ্কল্প দূরের কথা, তাঁহার যে বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে তাহাই আমার জানা ছিল না। তাছাড়া ছেলের বিবাহের জন্য মেয়ের বাপের দ্বারস্থ হইবার মত মনোবৃত্তি আমার নয়। কিন্তু সুনীতিবাবু তাহা জানেন না ; আমার সহিত তাঁহার পরিচয় নিতান্তই ভাসা-ভাসা।

আমি জানি, সজনী তাহার সাহিত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সুনীতিবাবুর মুখাপেক্ষী। সুনীতিবাবুকে পাকড়াইয়া, পুস্তক সম্পাদন কার্যে সাকরেদি করিয়া সে বেশ গুছাইয়া লইয়াছে। তাই আমি সুনীতিবাবুর সহিত দেখা করিতে যাইব শুনিয়া তাহার বোধহয় ভয় হইয়াছিল। সজনীর বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় আমার অজানা নাই। আমি সুনীতিবাবুর কুটুম্ব হইয়া বসিলে সে আর কল্‌কে পাইবে না। তাই সে সুনীতিবাবুকে আমার সম্বন্ধে এমন কিছু বলিয়াছিল (দু'জনেরই টেলিফোন আছে) যাহার ফলে তাঁহার মন আমার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। এছাড়া তাঁহার ব্যবহারের আর কোনও নির্ভরযোগ্য কৈফিয়ৎ নাই।

২০-৮-১৯৫১

এবার কলিকাতায় গিয়া আর একটি ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছে, তিনি রাজশেখর বসু। পত্র যোগে পূর্বেই আলাপ হইয়াছিল, তাই তাঁহার বাড়িতে গিয়া দেখা করিয়াছিলাম।

রাজশেখরবাবুর বয়স এখন সত্তরের উপর কিন্তু তাঁহার মনটি যুবকের ন্যায় সরস ও সতেজ। তাঁহার চিন্তা ও কথার সহিত হাস্যরস ওতপ্রোত হইয়া আছে। একদিকে যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে তেমনি বালকসুলভ সরলতা। সামাজিকতা ও শিষ্টতার প্রশান্ত প্রতিমূর্তি। আমাকে স্বার্থান্বেষী উমেদার মনে করিয়া ভ্রূকুটি করিলেন না ; ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রলোক যেরূপ ব্যবহার করে তেমনি সমাদরপূর্ণ ব্যবহার করিলেন। ক্ষণকালের জন্যও 'সজ্জন সঙ্গতি' ঘটিয়াছে মনে করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলাম।

প্রতিভা মানুষের জীবনে দৈবাৎ দেখা দেয় ; কখনও দেখা দিয়াই অন্তর্হিত হয়। কিন্তু মনুষ্যত্ব তাহার জন্মগত সহজাত বৃত্তি। 'এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে।'

২৫-১২-১৯৫৩

পনেরো বছর পরে আবার বোমকেশের গল্প' লিখিলাম। গল্পটা আকারে খুব বড় হইয়াছে, গল্প এবং উপন্যাসের মাঝামাঝি। এবার বোমকেশ এবং অজিত ছাড়া আর একটি স্থায়ী চরিত্র জুটিয়াছে—সত্যবতী।

গত ১৫ বছরে মাঝে মাঝে ডিটেকটিভ গল্পের আইডিয়া মাথায় আসিয়াছে কিন্তু সেগুলিকে মন হইতে সরাইয়া দিয়াছি। ডিটেকটিভ গল্পের ছাঁচ একই প্রকার, তাই দশটা ঐ ধরনের গল্প লিখিবার পর আর উৎসাহ ছিল না। কিন্তু এবার কলিকাতায় গিয়া দেখিলাম বোমকেশের অনুরাগী পাঠক অনেক আছে। বিশেষত পরিমলের' ছেলেমেয়েরা আমাকে বারম্বার অনুরোধ করিল।

ফিরিয়া আসিয়া নূতন গল্পটা লিখিয়াছি। লিখিয়া আনন্দও পাইয়াছি। পূর্বের ধারা বজায় আছে কিনা জানি না। মনে হইতেছে আরও কয়েকটা লিখিতে হইবে।

১-১-১৯৫২

নূতন ইংরেজি বর্ষ আরম্ভ হইল। গত বছরের সালতামামীর সময় উপস্থিত।

গত বছর 'মৌরী নদীর তীরে'র অনেকগুলি পরিচ্ছেদ লিখিয়াছি। ছোট গল্প বেশি লিখিতে পারি নাই, মাত্র ৪টি। তন্মধ্যে 'চিত্রচোর' আকারে বড়।

অর্থের দিক দিয়া বছরটি মন্দ নয়। ঝিন্দের বন্দীর চিত্রস্বত্ব বিক্রয় করিয়াছি। টুনুর' চাকরি হইয়াছে। এখন আমার তিন পুত্রই উপার্জনক্ষম ; আমার পুত্রদায় উদ্ধার হইয়াছে।

গত বৎসর দুইটি সজ্জন ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইয়াছে—ডাক্তার জে এম রায় এবং শ্রীরাজশেখর বসু। দুইজনেই কীর্তিমান কিন্তু দুইজনেই সজ্জন!

সারা বছরটা শরীর খারাপ গিয়াছে। কেবল যে-কয়দিন কলিকাতায় ছিলাম শরীর ভাল ছিল। ডিসেম্বর মাসে পুণায় গিয়া হাওয়া বদলাইয়া আসিব ইচ্ছা ছিল কিন্তু পুণায় এখন দারুণ শীত, যাওয়া ঘটিয়া ওঠে নাই।

৩-১-১৯৫২

কালের মন্দিরা বই ছাপা হইবার পর তিনজন রসজ্ঞ ব্যক্তিকে বই পাঠাইয়াছিলাম—জগদীশ, রাজশেখর বাবু এবং প্রমথনাথ বিশী। আশা করিয়াছিলাম, তাঁহারা বই পড়িয়া মতামত জানাইবেন। অর্থাৎ মনে মনে আশা ছিল যে প্রশংসা পাইব। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁহারা কেহই উচ্চবাচ্য করেন নাই।

ইহার একটা কারণ এই হইতে পারে যে বইখানি তাঁহাদের ভাল লাগে নাই, তাই অপ্রিয় সত্য না বলিয়া নীরব থাকাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছেন। বন্ধুর মনে আঘাত দিতে সকলেই সঙ্কুচিত হয়। অথবা এমনও হইতে পারে যে বইখানি ভাল কি মন্দ তাহা তাঁহারা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কালের মন্দিরার স্বাদ সম্পূর্ণ নূতন ; আমার পূর্বতন ঐতিহাসিক গল্পগুলির সহিত তাহার স্বাদের যথেষ্ট প্রভেদ আছে। নূতন স্বাদের ভালমন্দ নির্ধারণ করিতে সময় লাগে ; তাই হয়তো তাঁহারা মনস্থির করিতে পারিতেছেন না।

৪-১-১৯৫২

আমার সাহিত্য-জীবনে একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা বোধহয় সকল সাহিত্যিকের জীবনে ঘটে না। আমার লেখার একটা immediate appeal আছে, যাহাকে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার কৌতুকচ্ছলে 'ত্বরিতানন্দ' বলিয়াছেন ; তাছাড়া একটি delayed action আবেদন

আছে যাহা অনুভূত হইতে সময় লাগে। যেগুলি আমার সত্যকার ভাল রচনা সেগুলি গুণিসমাজে আদর পাইয়াছে রচিত হইবার ১০/১২ বছর পরে।

আমি যত্ন করিয়া লিখি, লেখাকে চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করি। তাই প্রথম পাঠে বোধহয় লেখার বাহ্য চাকচিক্যটাই চোখে পড়ে, চাকচিক্য ছাড়া তাহাতে যে আর কিছু আছে তাহা কেহ লক্ষ্য করেন না। অনেক পরে আবার লেখাটি পড়িলে তাহার অন্তর্নিহিত বস্তুটি চোখে পড়ে। একই কালে রস ও পল্লব গ্রহণ করিতে বড় কাহাকেও দেখা যায় না।

পরিচয়

১ শানু—মেজ ছেলে, অতনু।

২ মীরারানী—পুত্রবধূ, বড় ছেলে দিব্যেন্দুর স্ত্রী।

২ক ভ্রমণ কাহিনীটির নাম 'দেশে বিদেশে'।

৩ উপন্যাসটির নাম 'কালের মন্দিরা'।

৪ 'স্যমন্তক' নামে কিশোরদের জন্য একটি গল্প পরে লেখেন (১৯ আষাঢ় ১৩৫৮)। (দ্রঃ ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ; শরদিন্দু অম্‌নিবাস, চতুর্থ খণ্ড)

৫ প্রবাসীতে (অগ্রহায়ণ ১৩২৮) সমালোচনা করেন শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। (দ্রঃ জীবনকথা, শরদিন্দু অম্‌নিবাস, দ্বিতীয় খণ্ড ; গ্রন্থ-পরিচয়, শরদিন্দু অম্‌নিবাস, একাদশ খণ্ড)

৬ মৌরী নদীর তীরে—কয়েক পরিচ্ছেদ লেখার পর উপন্যাসটির নাম বদল করে রাখা হয় গৌড়মল্লার।

৭ ব্যোমকেশের গল্প—গল্পটির নাম 'চিত্রচোর' (৮ পৌষ ১৩৫৮)।

৮ পরিমল—পরিমল গোস্বামী।

৯ টুনু—ছোট ছেলে, শান্তনু।

আমার লেখক জীবনের আদিপর্ব

শৈশবকাল হইতে লক্ষ্য কবিয়াছি আমাদের বাড়িতে বই পড়ার একটি বাতাবরণ আছে। আমার বাবা উকিল ছিলেন, তিনি তো সব সময়েই মোটা মোটা বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেন। মা বাংলা গল্প উপন্যাস মাসিক পত্রিকা পড়িতেন। ঠাকুরমা পড়িতেন রামায়ণ মহাভারত। তিন-চারিটা আলমারিতে বই ভরা থাকিত।

দশ এগারো বছর বযস হইতে আমি বাংলা ইংরেজি উপন্যাস পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। বই সম্বন্ধে মনে একটা অদ্ভুত মোহ ছিল। কিন্তু নিজে কোনওদিন বই লিখিব এ কথাটা তখন মনের ত্রি-সীমায় ছিল না।

আমার যখন চৌদ্দ বছর বয়স তখন আমি মুঙ্গের জিলা স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্তমান class X পড়ি। স্কুলের ড্রিল মাস্টার ছিলেন শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি বাংলাও পড়াইতেন। খেলাধূলা ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর অসীম অনুরাগ ছিল। যখন বাংলা ক্লাস লইতেন তখন আমাদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতেন। আমরা বিশেষ কিছু বুঝিতাম না, কিন্তু তাঁহার সোৎসাহ আলোচনা আমার ভাল লাগিত।

আমাদের ক্লাসে চার-পাঁচটি বাঙালী ছাত্র ছিল। যখন বাংলা ক্লাস হইত তখন আমরা ৪/৫ জনই থাকিতাম। আমার প্রতি পূর্ণবাবুর স্নেহ ছিল, কারণ আমি ভাল ফুটবল খেলিতে পারিতাম। স্কুলের টীমে খেলিতাম। একদিন ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে পূর্ণবাবু হঠাৎ বলিলেন,—'শরদিন্দু, তুমি কবিতা লেখ না কেন?'

আমি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। কবিতা কি ইচ্ছা করিলেই লেখা যায়। পূর্ণবাবু আমার হতভম্ব ভাব দেখিয়া বলিলেন,—'কাল তুমি একটি কবিতা লিখে আনবে।' নিরুপম নামে আমার একটি সহপাঠী ছিল, তাহাকে বলিলেন,—'তুমিও কবিতা লিখে আনবে। যার কবিতা ভাল হবে তাকে প্রাইজ দেব।'

এই আমার সাহিত্য সেবার আরম্ভ। কবিতা কেমন লিখিয়াছিলাম এখন আর মনে নাই, কিন্তু পূর্ণবাবু সেই যে নেশা ধরাইয়া দিয়াছিলেন সে নেশায় আজও বুঁদ হইয়া আছি।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার পর আমি মাসখানেকের জন্য এলাহাবাদে গিয়াছিলাম। এলাহাবাদ আমার মামার বাড়ি। বাড়িতে আমার সমবয়স্ক কেহ নাই। একলা একলা দিন কাটে না। কবিতা তখন ইচ্ছা করিলেই লিখিতে পারি, তাই সেদিকে তেমন চাড় নাই। একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম।

এই আমার প্রথম গল্প লেখার চেষ্টা। চেষ্টা কিন্তু তখন সফল হয় নাই, গল্পটি শেষ করিতে পারি নাই। বহু বৎসর পরে গল্পটি শেষ করিয়াছিলাম, 'প্রেতপুরী' নামে কোনও একটি মাসিক পত্রিকায় ছাপাও হইয়াছিল; কিন্তু আমার কোনও পুস্তকে ছাপা হয় নাই। প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য ছাড়া গল্পটির অন্য কোনও মূল্য বোধহয় নাই।

একবার গল্প লেখা আরম্ভ করিবার পর গল্প লেখার নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। কত গল্পের প্লট যে মাথায় আসিত তাহার ঠিকানা নাই। একটা গল্প শেষ করিবার আগেই অন্য একটি প্লট আসিয়া মাথায় ভর করিত। তখন অর্ধ-লিখিত গল্পটি ছাড়িয়া নূতন গল্প আরম্ভ করিতাম। সেটি সমাপ্ত হইবার পূর্বে আর একটি প্লট আসিয়া হাজির হইত। এইভাবে কত অসমাপ্ত গল্পের ভগ্নাংশ যে ভাসিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কেবল একটি হাস্যরসাত্মক উপন্যাস কেমন করিয়া জানি না শেষ করিয়াছিলাম। উপন্যাসটির নাম ছিল—'দাদার কীর্তি'।

১৯১৫ সালে ম্যাট্রিক পাস করিয়া কলিকাতায় পড়িতে গেলাম। মেছুয়াবাজারের Y.M.C.A হস্টেলে স্থান মিলিল। এখানে আমারই মতন একজন ছাত্র আসিয়া জুটিয়াছিল, তাহার নাম অজিত সেন। তাহারও কবিতা লেখার ঝোঁক ছিল ; সুতরাং তাহার সহিত খুব ভাব হইয়া গেল। আমি তখন কবিতা লেখায় বেশ হাত পাকাইয়াছি ; যেকোনও ছন্দে কবিতা লিখিতে পারি, সনেট লিখিতে পারি। মোটা একটা কবিতার খাতা দিনে দিনে ভরিয়া উঠিতেছে। গল্প লেখার অভ্যাসে ভাটা পড়িয়াছে, কারণ এ পর্যন্ত একটিও গল্প শেষ করিতে পারি নাই।

আশ্চর্যের কথা, এত কবিতা লিখিয়াছিলাম কিন্তু কবিতা ছাপাইবার কল্পনা তখনও মাথায় আসে নাই। রচনা খাতার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল ; কাহাকেও পড়িয়া শুনাইবার সাহসও ছিল না। আমি চিরদিন মুখ-চোরা ; কবিতা শুনিয়া কেহ হাসিবে এই ভয়ে ওপথে যাইতাম না।

আমি চিরদিন খেলাধূলা ভালবাসি, Y.M.C.A'র হস্টেলে নানা খেলায় মাতিয়া উঠিলাম। সেইসঙ্গে আর একটি উপসর্গ জুটিল—বায়স্কোপ। তখন সিনেমার মৌনাবস্থা, হপ্তায় অন্তত দুই দিন সিনেমা দেখিতে যাইতাম। অপূর্ব লাগিত। আমার জীবন-দেবতা যে পরোক্ষভাবে আমার মনে গল্প রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন তাহা তখন জানিতাম না।

১৯১৮ সালে আমার বিবাহ হইল। তখনও আমি Y.M.C.A হস্টেলে থাকি। বিবাহের পর জীবনে এক নূতন রোমান্সের বান ডাকিল ; নিজের খরচে এক কবিতার পুস্তিকা ছাপিয়া ফেলিলাম। পুস্তিকার নাম—যৌবনস্মৃতি। পুস্তিকাটি বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে উপহার দিলাম, মাসিক পত্রিকাতে সমালোচনার জন্য পাঠাইলাম। আর কেহ আমার এই প্রথম সাহিত্য-উদ্যম লক্ষ্য করিল না, কিন্তু 'প্রবাসী' দীর্ঘ সপ্রশংস সমালোচনা করিল। ইহা ১৯১৯ সালের কথা।

বি এ পাস করার পর কলিকাতায় বেশিদিন আর মন টিকিল না। ১৯২১ সালে আইন পড়িতে পড়িতে হঠাৎ পড়া ছাড়িয়া দিয়া বাড়িতে আসিয়া বসিলাম।

অতঃপর তিন বৎসর বাড়িতে নিষ্কর্মার মত জীবন কাটিল। বাড়িতে সবাই বিরক্ত ; আমি নভেল পড়ি, ফুটবল খেলি, তাস-পাশা খেলি। বাণী-মন্দির নামে একটি ক্লাব আছে তাহার সভ্য হইয়াছি। সন্ধ্যাবেলা সেখানে আড্ডা দিই। বাণী-মন্দির ছোট্ট ক্লাব, মাত্র দশ-পনেরো জন সভ্য ; সভ্যদের গান-বাজনার সখ আছে। ক্লাবে প্রত্যহ সেতাব এসরাজ বেহালা হারমোনিযম সহযোগে ঐকতান কন্‌সার্ট বাজে ; বছরে একবার সরস্বতী পূজার সময় নাট্যাভিনয় হয়। আমি এই দলে ভিড়িয়া গেলাম। হারমোনিয়ম ও বেহালা বাজাইতে শিখিলাম। একটা সেলো ক্ল্যারিওনেটও কিনিযাছিলাম, কিন্তু বেশিদিন বাজাইতে পারি নাই।

এই বাণীমন্দিরের রঙ্গমঞ্চে ধীরে ধীরে আমার সাহিত্য জীবনের পটভূমিকা রচিত হইল। বাণীমন্দিরে যে নাট্যাভিনয় হইত তাহা তাৎক্ষণিক জনপ্রিয় নাটক লইয়াই হইত, ডি এল রায়ের 'মেবার মতন' 'নূরজাহান' এইসব। তারপর একদিন আমি নিজেদের অভিনয়ের জন্য নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। মৌলিক নাটক নয়, বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্য-রূপ দিতে লাগিলাম। প্রথমে 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', তারপর 'দুর্গেশনন্দিনী'। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'ও আমি নাটকে পরিণত করিয়া অভিনয় করিয়াছিলাম। এইভাবে কাহিনী সাজাইয়া লিখিবার অভ্যাস হইয়াছিল।

কিন্তু কেবল পরের কাহিনী নাটকায়িত করিয়া আমার প্রাণের তৃষ্ণা মিটিত না। মাঝে মাঝে মৌলিক গল্প নাটক লিখিতে বসিতাম। কিন্তু শেষ করিতে পারিতাম না। কেন শেষ করিতাম না তাহা এখন বুঝিতে পারি। সমস্ত গল্পটা মনের মধ্যে দানা বাঁধিবার আগেই লিখিতে শুরু করিয়া দিতাম। গল্প শুরু করিবার আগে গল্পের অন্তিম পরিণতি final climax যে মনের মধ্যে থাকা দরকার সে জ্ঞান তখনও হয় নাই।

তিন বছর এইভাবে কাটিবার পর হঠাৎ পট-পরিবর্তন হইল। পিতার আদেশে পাটনায় আবার আইন পড়িতে গেলাম। বাবার ইচ্ছা আমি উকিল হইয়া বংশের ধারা বজায় রাখি। দুই বৎসর পাটনায় আইন পড়িয়া পাস করিয়া গৃহে ফিরিলাম এবং পিতার অধীনে ওকালতি আরম্ভ করিলাম।

ওকালতি আরম্ভ করিলাম বটে কিন্তু ওকালতিতে মন বসাইতে পারিলাম না। সাহিত্য-চর্চা মাঝে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, আবার আরম্ভ করিলাম। এবার একটি গল্প লিখিয়া শেষ করিলাম। এই আমার প্রথম পরিপূর্ণ গল্প, নাম—উড়ো মেঘ। গল্প শেষ করার আনন্দে উহা 'বসুমতী' নামক মাসিক পত্রিকায় পাঠাইয়া দিলাম। কয়েকমাস পরে গল্পটি 'বসুমতী'তে ছাপা হইল। আনন্দ ও উত্তেজনায় একেবারে দিশাহারা হইয়া গেলাম।

গল্পের জন্য দক্ষিণা পাইলাম না, কিন্তু সেজন্য তিলমাত্র মনোভঙ্গ হইল না, চতুর্গুণ উৎসাহে গল্প লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

তারপর ক্রমে ক্রমে 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকাগুলিতে আমার লেখা বাহির হইতে লাগিল। উদীয়মান লেখকরূপে আমার প্রতিষ্ঠা হইল। 'পুষ্পপাত্র নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা ছিল, তাহাতে গল্প প্রতিযোগিতা হইল। আমি একটি গল্প পাঠাইয়া দিলাম এবং পুরস্কার পাইলাম—পাঁচ টাকা। সাহিত্য হইতে এই আমার প্রথম উপার্জন। ১৯২৯ সালে আমি ওকালতি ছাড়িয়া দিলাম ; উপলব্ধি করিলাম, সাহিত্যই আমার জীবন, সাহিত্যই আমার মরণ ; অন্য কোনও কাজ করিবার যোগ্যতা আমার নাই। এ পথে যদি বিত্তলাভ নাও ঘটে তবু এই আমার পথ।

সেইদিন হইতে আজ পঁচিশ বছর এই পথেই চলিয়াছি। নাটক লিখিয়াছি, উপন্যাস লিখিয়াছি। অবশেষে ১৯৩৮ সালে সিনেমার গল্প-লেখক রূপে চাকরি লইয়া বোম্বাই আসিয়াছি। আমার অনেকগুলি কাহিনী হিন্দি চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'ভাবী' 'পুনর্মিলন' জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। আমার বহু গল্প ও গল্পের নাট্যরূপ রেডিওতে অভিনীত হইয়াছে। এখনও হইতেছে। আমার গল্প হিন্দি ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। দুই-একটি গল্প ইংরেজিতেও তর্জমা হইয়াছে।

আজ পর্যন্ত আমি ত্রিশখানির অধিক বই লিখিয়াছি, কিন্তু কখনও কাহাকেও উপদেশ দিবার প্রবৃত্তি আমার হয় নাই। আমি সমাজ-সংস্কারক নই ; ধর্ম-প্রচারক নই। কাহাকেও উপদেশ দিবার স্পর্ধা আমার নাই। সাহিত্যের মাধ্যমে আমি রসসৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছি, পাঠকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিয়াছি। আমি ক্ষুদ্র লেখক, আমার ক্ষুদ্র চেষ্টা যদি সফল হইয়া থাকে তবেই আমার সাহিত্য জীবন সার্থক।

হৃৎকম্প

গত নভেম্বর মাসে মহামন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন দেশবাসীকে বললেন, দেশে অন্নাভাব, আপনারা হপ্তায় এক বেলা চাল-গম খাওয়া বন্ধ করুন, তখন আমি ভাবলাম—ছেষট্টি বছর বয়স হল, দেশের কাজ তো কিছুই করলাম না, এখন অন্তত কম খেয়ে দেশের উপকার করি।

গিন্নী আমার সাধু সংকল্প সমর্থন করলেন ; শুধু হপ্তায় এক বেলা নয়, আমরা দু'জনে হপ্তায় দু'বেলা—মঙ্গলবার এবং শুক্রবার রাত্রে— ভাত-রুটি-লুচি খাব না। মনে মনে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে লাগলাম।

পুণার বাড়িতে আমরা দু'জনেই থাকি, আর কেউ থাকে না। দুই ছেলে বোম্বায়ে থাকে, তারা মাসের মধ্যে বার দুই আমাদের কাছে week end যাপন করে যায়। আমরা দু'জনে যথারীতি কৃচ্ছ্রসাধন শুরু করে দিলাম। ব্যবস্থা হল, মঙ্গলবার এবং শুক্রবার রাত্রে আমরা খাব—মাছ কিম্বা মাংস, শাকসব্জি সিদ্ধ, আলু গাজর টোমাটো ইত্যাদির তরকারি। রসনার দিক দিয়ে নূতনত্বটা মন্দ হবে না, এরকম মুখ-বদল ভালই লাগে।

প্রথম দিন চাল-গম বর্জিত খাবার খেয়ে কিন্তু অপ্রস্তুত হতে হল। বেশ পেট ভরেই খেয়েছিলাম কিন্তু রাত তিনটের সময় ক্ষিদের চোটে ঘুম ভেঙে গেল। শাকসব্জি এবং মাংস বেবাক হজম হয়ে গেছে। গিন্নী পাশের ঘরে শোন, তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে এত রাত্রে নতুন করে পেট ভরাতে হল। খালি পেটে ঘুম হয় না।

তারপর থেকে মঙ্গলবার এবং শুক্রবার রাত্রে একটু চেপে খাই, রাত্রে ক্ষিদে পায় না। এইভাবে দু'হপ্তা কাটল।

১৯ নভেম্বর শুক্রবার শরীর বেশ ভালই ছিল, রাত্রে যথারীতি মাংস আর শাকসব্জি খেয়ে শুলাম।

পরদিন সকালবেলা বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে দেখি, পেট গুলোচ্ছে, মাথা ঘুরছে। এত বেশি মাথা ঘুরছে যে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। আবার বিছানা নিলাম এবং ডাক্তারকে ডেকে পাঠালাম।

ডাক্তার ভিড়ে আমার বাড়ির ডাক্তার ; কাছেই থাকেন, দু' মিনিটের রাস্তা। অত্যন্ত সাদাসিধে শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তিনি এলে তাঁকে রোগের কথা বললাম, মঙ্গলবার শুক্রবারের কথাও বয়ান করলাম। শুনে তিনি বললেন, 'বুড়ো বয়সে এ কী বদ্‌খেয়ালী ! আপনার প্রবল বদহজম হয়েছে। ওষুধ দিচ্ছি। আজ স্রেফ দই-ভাত খাবেন। ওসব বেয়াড়া খাবার বন্ধ করুন।'

দেশের জন্যে কৃচ্ছ্রসাধন আমার সহ্য হল না। মনটা খারাপ হল, কিন্তু উপায় কি ? মঙ্গলবার শুক্রবারের পালা শেষ করতে হবে।

ওষুধ এবং দই-ভাতের গুণে বিকেলবেলা নাগাদ শরীর বেশ স্বাভাবিক হল।

রাত্রি ন'টার সময় লঘু আহার করে শুলাম। আমার অভ্যাস রাত্রে বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ বই পড়ি, তারপর আলো নিভিয়ে ঘুমোই।

রাত্রি আন্দাজ দশটার সময় বই রেখে আলো নেভালাম। কিন্তু ঘুম এল না। শরীরে কোন অস্বস্তি নেই, তবু ঘুম আসছে না।

এপাশ ওপাশ করে আধ ঘণ্টা কেটে যাবার পরও যখন ঘুম এল না তখন ভাবলাম উঠে দু'টান সিগারেট টানি তাহলে হয়তো ঘুম আসবে।

বিছানায় উঠে বসে আলো জ্বেলেছি, হঠাৎ বুকটা দুর্ দুর্ করে উঠল।

এই আরম্ভ।

আমার শরীরে অনেক রোগ আছে, কিন্তু হৃদয়যন্ত্রটা নীরোগ বলেই জানতাম। এখন হৃদ্‌যন্ত্রটা থর থর করে কাঁপতে আরম্ভ করল। মনে হল যেন বুকের মধ্যে নিঃশব্দে একটা ডঙ্কা বাজছে ; তার ছন্দ এত দ্রুত যে হৃদয়ের স্বাভাবিক ছন্দ তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। সমস্ত শরীর এই ছন্দের তালে তালে দুলতে লাগল। বুকে ব্যথা বা যন্ত্রণা নেই, কেবল হৃদয় দ্রুত তালে নেচে চলেছে। হৃদয় আমার নাচেরে।

শরীরে যেমন যন্ত্রণা নেই, মনে তেমনি ভয়ও নেই। ভাবছি হৃদয়ের এই সাময়িক উল্লাস এখনি প্রশমিত হবে। দশ মিনিট কাটল, কুড়ি মিনিট কাটল, আধ ঘণ্টা কেটে গেল, তবু হৃদযন্ত্র সমান তালে নেচে চলেছে।

মনে চিন্তা এল— কী করা যায় ? এত রাত্রে গৃহিণী পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাইরের বারান্দায় আমার ঝি সরস্বতীর বাপ-মা শোয়, তারাও নিশ্চয় ঘুমিয়েছে। এগারোটা বেজে গেছে, এখন ডাক্তারকে ডাকতে পাঠালে তিনি কি আসবেন ? এদেশে রাত্রে ডাক্তারেরা আসতে চায় না।

মনে হল হৃৎকম্পের বেগ যেন বাড়ছে। আর দেরি করলে হয়তো এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাবে। উঠে পাশের ঘরে গেলাম। গৃহিণীকে জাগিয়ে পরিস্থিতি বললাম। জানালাম ডাক্তার ডাকা দরকার।

একটা ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তাকে দুঃসংবাদ শোনালে তার কী রকম প্রতিক্রিয়া হবে কিছুই বলা যায় না। আমার গৃহিণী ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং পাঁচ মিনিট পরে ডাক্তার ভিড়েকে নিয়ে ফিরে এলেন।

আমি তখন বিছানায় শুয়ে বাঁ হাতে ডান হাতের নাড়ী দেখছি অবস্থা কেমন। নাড়ী চলছে যেন ট্রেনের ইঞ্জিনের মত, এত দ্রুত যে গোনা যায় না। ভাবছি যে-কোনো মুহূর্তে ইঞ্জিন থেমে যেতে পারে। মৃত্যুর এত কাছাকাছি কখনো আসিনি।

ডাক্তার আমার নাড়ী দেখলেন, তারপর ক্ষিপ্রহস্তে ইন্‌জেকশন তৈরি করে আমার বাহুতে ছুঁচ ফোটালেন। আমি প্রশ্ন করলাম, 'কি ব্যাপার ?'

ডাক্তার বললেন, 'পেটে গ্যাস হয়েছে। গ্যাস হৃদ্‌যন্ত্রকে ঠেলা মারছে, তাই এই বিপত্তি। কিন্তু ভয় নেই, এখন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তারপর প্রতীক্ষা। হৃদয়ের মৃদঙ্গ চৌদুনে বেজে চলেছে। দশ মিনিট। পনরো মিনিট। উপশমের কোনো লক্ষণ নেই। ডাক্তারের মুখে শঙ্কার ছায়া পড়ল। আমি ভাবছি—অদ্যই আমার শেষ রজনী।

কুড়ি মিনিট পরে বুকের স্পন্দন কমতে লাগল। পঁচিশ মিনিট পরে বুক একেবারে স্বাভাবিক। কোনো কালে যে আমার দারুণ হৃৎকম্প হয়েছিল তা বোঝাই যায় না। বললাম, 'ডাক্তার, একেবারে সেরে গেছি।'

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, 'উঁহু, আজ ঘুমিয়ে পড়ুন, কাল সকালে কার্ডিওলজিস্ট নিয়ে আসব।'

রাত বারোটা বেজে গেছে, ডাক্তার চলে গেলেন। গিন্নী খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন দেখলাম, কিন্তু আমার মনে হল সামান্য উপলক্ষ্য নিয়ে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে।

যাহোক, ডাক্তারের হুকুম অমান্য করার সাহস নেই। পরদিন হৃদয়-বিশেষজ্ঞ এলেন, যন্ত্রের সাহায্যে হৃদয়যন্ত্র পরীক্ষা করলেন। জানা গেল, হৃৎপিণ্ড সামান্য রকম জখম হয়েছে ; সুতরাং ডজনখানেক ওষুধ নিয়মিত খেতে হবে এবং সিগারেট ছেড়ে দিতে হবে। সাত দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। সাত দিন পরে আবার E.C.G. পরীক্ষা।

বিছানায় শুয়ে থাকতে আমার কোনোই আপত্তি নেই, বস্তুত ও কাজটা আমার ভালই লাগে। কিন্তু জোর করে বিছানায় শুইয়ে রাখলে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাই, লাইব্রেরিতে গিয়ে বই নিয়ে আসি। শুয়ে থাকাটা সময়ের অপব্যয় বলে মনে হয়।

কিন্তু গৃহিণীর তীক্ষ্ণ শাসনে বেশি নড়াচড়া সম্ভব হল না। বড় জোর লেখার টেবিলে গিয়ে বসি, আবার শুয়ে পড়ি। বোম্বায়ে ছেলেদের একটা চিঠি লিখে দিলাম ; যথাসম্ভব লঘু করে লিখলাম। নইলে তারা উদ্বিগ্ন হবে।

পরের হপ্তায় E.C.G. ডাক্তার এসে আবার পরীক্ষা করলেন। বললেন, অবস্থার উন্নতি হয়েছে কিন্তু আরো দু'হপ্তা ঔষধ সেবন এবং শয়নে পদ্মনাভঞ্চ চলবে। তখন জানতাম না যে এটা ডাক্তারদের একটা প্যাঁচ। প্রথমেই যদি বলেন তিন মাস শুয়ে থাকতে হবে তাহলে রুগী ভড়কে যাবে, তাই সইয়ে সইয়ে কুকুরের ল্যাজ কাটেন।

ইতিমধ্যে আমার বড় ছেলে বম্বে থেকে এসেছে। সে ফিরে যাবার পর মেজ ছেলে এল। এইভাবে পালা করে তারা আমার ওপর নজর রেখেছে।

তাছাড়া মেজর অম্বরনাথ চ্যাটার্জী, ক্যাপ্টেন পিণাকী ব্যানার্জী প্রমুখ কয়েকজন মিলিটারি ডাক্তার আছেন ; এঁরাও আমার ওপর কড়া নজর রেখেছেন।

পুণায় মিলিটারি হাসপাতাল ও কলেজ আছে ; সেখানে যে-কয়জন বাঙালী অফিসার আছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এই বৃদ্ধের প্রতি প্রীতিবান। মেজর অম্বরনাথ এবং ক্যাপ্টেন পিণাকী তাঁদের অন্যতম।

সকলেই আমাকে সারিয়ে তোলবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সব শেয়ালের এক রা : সিগারেট ছেড়ে দাও, ওষুধ খাও আর শুয়ে থাকো।

ওষুধ খাওয়া এবং শুয়ে থাকা বরং সম্ভব, কিন্তু সিগারেট ছাড়া অসম্ভব। ১৯১৭ সাল থেকে সিগারেট খাচ্ছি, ৪৯ বছরের নেশা। এক কথায় ছেড়ে দেওয়া যায় না। তবু কমিয়ে সাত-আটটায় দাঁড় করলাম। কিন্তু ডাক্তারেরা তাতে সন্তুষ্ট নয়। একেবারে ছেড়ে দেওয়া চাই।

পুণায় আমার ক্রমে অসুবিধা হতে লাগল। সর্বদা দেখাশোনা করবার লোকের অভাব। বড় বৌমা এখানে এসে আছেন বটে, তিনি নিজের সংসার ছেড়ে কতদিন এখানে থাকতে পারেন ? পারিবারিক পরামর্শে স্থির হল আমি গিয়ে বোম্বায়ে ছেলেদের কাছে থাকব। তাহলেই সব হাঙ্গামা চুকে যাবে।

পুণায় ডাক্তারেরা সাগ্রহে এই প্রস্তাবে সায় দিলেন। ২৬শে ডিসেম্বর আমি বোম্বাই গেলাম।

বোম্বায়ের উপকণ্ঠে আন্ধেরী নামক স্থানে আমার বড় এবং মেজ ছেলে থাকে। তাদের কাছে পরম নিশ্চিন্ত মনে দু'মাস থাকলাম। শরীর প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। তখন আবার পুণার দিকে মন টানতে লাগল।

২৬শে ফেব্রুয়ারী পুণায় ফিরে এসেছি। এই রোগের ফলে আমার জীবনে একটা বড় রকম অবস্থান্তর হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ধূমপান ত্যাগ করতে হল। প্রথমটা খুবই কষ্ট হয়েছিল কিন্তু এখন সিগারেটেব বিরহ-ব্যথা অনেকটা সামলে উঠেছি। মাসে গোটা পঞ্চাশ টাকা বেঁচে যাচ্ছে। এটাও কম লাভ নয়।

সামলে উঠেছি বটে, কিন্তু যতই সামলে উঠি একটা কথা বুঝেছি। মহাকাল হচ্ছেন বাড়িওয়ালা ; তিনি নোটিশ দিলেন শীঘ্রই বাসা ছাড়তে হবে।

আমার যে আত্মজীবনী কোনো দিন লেখা হবে না, এই বিবরণীই তারই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ।

সংযোজন

কবিতা
গল্প

বুল্‌বুল-মাছি-ব্যাং পদ্ধতি

ময়ূর মরাল শ্বেত পারাবত উড়ে গেছে বিল্‌কুল
বঙ্গবাণীর মালঞ্চে করে বুল্‌বুল চুলবুল !
ইরাণ দেশের বুল্‌বুল এরা নয়,
তাতারের সাথে নাহি কভু পরিচয় ;
(তবু) বাঁশ-ঝাড়ে বসে দ্রাক্ষাবনের সঙ্গীতে মশ্‌গুল !

গুলাবের লাল পেয়ালায় ভরা পরিমল যারা খায়,
শেফালির বুকে শয্যা পাতিয়া আরামে নিদ্রা যায় ;—
এরা নয় সেই অলি মধু-মার্মিক
নর্দামা ভরা নোংরায় এরা—ধিক্ !
(পচা) আস্তাকুড়ের ভন্‌ভনে মাছি কলুষের গান গায় !

পানা-পুকুরের পচা-পঙ্কিল মারীভয় ভরা নীরে
কালো কট্‌কটে কোলাব্যাং যারা গরল ছড়ায়ে ফিরে,
মানস সরসে বাণীর চরণতলে
চিরফুটন্ত পূত শ্বেত শতদলে
(আজ) সেই কোলাব্যাং উঠেছে বসিয়া ডাকিতেছে গলা চিরে ।

বাগ্‌বাদিনীর ভাঙ্গা মন্দিরে কোথা চন্দন ফুল ?
কোথায় পূজারী শুচি শুভাচারী কোথা ধূপ গুগ্‌গুল ?
চটকের গীত, মাছির ভন্‌ভনানি
ভেক-মকমকি শুনিছেন বীণাপাণি
(পায়ে) পুঁজ-রক্তের অঞ্জলি ভরি দিতেছে ভক্তকুল ।

প্র আশ্বিন ১৩৩৬

দিক-করী

ওগো আমার দিক্‌-করী,
কোন শাস্তি দেব তোমায়
কেমন করে ঠিক করি !
আমি যখন লিখ্‌ছি বসে গল্প,
তুমি এসে হাস্‌বে কেন অল্প
একটু খানি ঠোঁটের ফাঁকে ফিক্ করি ?
একেবারে বিগ্‌ড়ে বসে মনটা
কিচ্ছুই আর হয় না লেখা ঘণ্টা !

ওলো আমার দিক্‌-করী,
হাস্‌লে তোমার দাঁতগুলি সব
ওঠে যে ঝিক-মিক্‌ করি !
রাগের চোটে হই যে হতভম্ব
ইচ্ছে করে—যদিও নয় সম্ভব—
নিজেই নিজের নিতম্বেতে Kick করি
হতাশ হয়ে, রোষ-জর্জর-গাত্রে
চুমুক দি ঐ অধর-সুধা পাত্রে ।

আশ্বিন ১৩৪১

ফাগুন

তুন্দ্রায় তুষারের ভাঙ্‌ল কি ঘুম রে !
বরফের চাপ ভেঙে পড়ে দুম্‌ দুম্‌ রে !
হঠাৎ নদীর জল হেসে ওঠে খল্‌খল্‌
সাদা শীল তড়পায় পাকা গোঁফ চুম্‌রে ।
তাক্‌ ডুমা ডুম্‌রে !

ওদিকে দখিন মেরু হিম-নিঃঝুম রে
বাতাস হতাশসুরে কেঁদে মরে গুমরে ।
নেই রবি নেই আলো, আকাশ নিকষ কালো
নাচে না পেঙ্গুইন থুম থুমা থুমরে ।
তাক্‌ ডুমা ডুম্‌রে ।

এদিকে মোদের দেশে ফুল-মরশুম রে
সূর্য ছড়ায় যেন রাঙা কুম্‌কুম্‌ রে
টুপি মোজা আলোয়ান, খুলে ফেল পালোয়ান
গায়েতে লেগেছে আজ ফাগুনের চুম রে ।
তাক্‌ ডুমা ডুম্‌রে ।

৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪১

বিশ্ব-দরদ

জানো না কি বন্ধু মন কেন আনচান ?
পলকে পলকে কেন ফুঁকিতেছ বিড়ি ?

সাত পেয়ালা চা করিয়া চুকেছি পান
তবুও অঙ্গে জ্বালা যে রয়েছে ঘিরি ।
তুমি ভাবিতেছ আবিসিনিয়ার শোকে
অন্তর মোর করে বুঝি লাফালাফি,
বর্ধমানের বন্যায় যেথা লোকে
ছাদের উপর করিতেছে দাপাদাপি—
তাদের দুঃখ ভেবে আমি উন্মনা ?
তা নয়, তা নয় । কেন মরি বিড়ি ফুঁকে ?
মর্মে আমার গভীর উন্মাদনা
বিশ্ব-দরদ পুঞ্জিত মোর বুকে ।
শুনিবে বন্ধু কেন এ বিষম শোক ?
ও পাড়ার বিনি মেরে দিয়ে গেছে চোখ !

ভাদ্র ১৩৪২

বোম্বাই চিঠি

সহ্যাদ্রির পরপারে আরব-সাগর-উপকূলে
আসিয়া পড়েছি বন্ধু, মনে হয় বুঝি পথ ভুলে ।
পশ্চিম-ঘাটের ধারে তরণী ভিড়েছে থরে থর ;
পশ্চিম সে কতদূর ? এক লাফে এডেন বন্দর,
তারপর পোর্টসেড ; তারপরই—হুররে—মার্সেল !
ফ্রান্সের রসে ভরা মাটি—পীচ আঙুর আপেল
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা একসাথে যেথা ফ'লে আছে !
কিন্তু ফেরা যাক দেশে—মানে—এই বোম্বায়ের কাছে,
কলিকাতা হতে মোট তেরশো মাইলটাক দূরে
যেখানে বেঁধেছি বাসা ।

মনে হয় কোন্ স্বপ্নপুরে
লভেছি নূতন জন্ম—সেই আমি আছি বটে, তবু
যেন সেই আমি নই—পূর্বস্মৃতি দড়ি ধ'রে কভু
মারে টান, বলে বটে, ওরে তুই সেই পুরাতন
অকর্মণ্য মনুষ্যটা, ঘরে ব'সে একাকী আপন
লিখিত যে কল্পনারে ইনায়ে বিনায়ে অবিরত
গাঁজার ধোঁয়ায় ভরা আষাঢ়ে গল্পের পুঁথি যত ।
হয় না বিশ্বাস ; তবু এখানে মানুষগুলা সব

নিতান্তই স্বদেশী চেহারা,—কিন্তু তারা অসম্ভব
দ্রুত-তালে কথা বলে, আরম্ভিলে কদাচিৎ থামে,
'হ্যাঁ' বলিতে বারবার মুণ্ড নাড়ে ডান হতে বামে,
হাসে কাসে গান গায়—ইয়ার্কিও ক'রে সম্ভবত !
কিছুই বুঝি না কিন্তু, চেয়ে থাকি বেকুবের মত ।
কখনো আমিও উঠে সতেজে আরম্ভ করি কথা—
বুঝাইতে চাহি মোর অবরুদ্ধ মর্মের বারতা,
হাত নাড়ি, চোখ মারি, হাস্য করি খিঁচাইয়া দাঁত,
ভাষার খিচুড়ি রাঁধি মিশাইয়া উর্দূ বাংলা বাত !
কিন্তু হায় সকলি বিফল ; রাজভাষা রাষ্ট্রভাষা
কোনও কাজে নাহি লাগে—চাতকের মিটে না পিয়াসা ।
কিন্তু তবু সুখে আছি । বহু মাঝে রয়েছি একাকী ;
সঙ্গী আছে চারিদিকে, তবু আমি সাথীহীন পাখি
গান গাহি আপনার মনে । আর, দেখি চেয়ে চেয়ে
মারাঠী গুজ্রাটি পার্সী এ দেশের পুরুষ ও মেয়ে
যাদের বুঝি না কথা তবু যারা একান্ত আপন,
কেমনে স্বচ্ছন্দে করে দুঃখে সুখে জীবন যাপন ।
পথে মেলা নীল লাল সবুজের । এ দেশের নারী
বেশি কাছা দিয়ে বিচিত্র সুন্দর পরে শাড়ি,
বুকে আঁটে নিটোল কাঁচুলি—এলোখোঁপা-বাঁধা চুলে
কবরী ঘিরিয়া পরে বাঁকা মালা গাঁথা ফুলে ফুলে
মদন-ধনুর মত । কালো মেয়ে আছে, কাঞ্চনবরণা—
তাও আছে রাশি রাশি, সকলেই আলোর ঝরণা ।
শঙ্কা নাই, লজ্জা নাই—মুক্তি আছে, নাই চপলতা,
গুণ্ঠনবর্জিত মুখে কুণ্ঠাহীন-নম্র শালীনতা ।

দিনের কাজের শেষে ফিরে আসি আপনার ঘরে ;
ঈজি-চেয়ারেতে শুয়ে চেয়ে থাকি আকাশের 'পরে ।
ছেঁড়া মেঘ ভেসে চলে । উড়ে যায় অসংখ্য বাদুড়
মেলিয়া ত্রিকোণ পাখা—পূর্বমুখে—যাবে কত দূর ?
টান পড়ে মনের খোঁটায় ! স্নেহ-প্রণয়ের দড়ি
ঢিলা থাকে নিকটে থাকিলে ; যত দূরে যাই সরি
রজ্জু দৃঢ় হয় তত ।

কিন্তু এই ভাল—এই ভাল ।
প্রিয়জনে মধুময় ক'রে তোলে সুদূরের আলো ।
এবার বিদায় বন্ধু, খাসা আছি, নাই খিটিমিটি,
দূর হতে ছুঁড়ে মারি—বোমা নয়—বোম্বায়ের চিঠি ।

প্র· আশ্বিন ১৩৪৫

করুণাময়ী

সাতখানা গ্রামের মধ্যে একমাত্র বিচক্ষণ ডাক্তার বিধুশেখরবাবু সন্ধ্যাবেলা তাঁহার ডাক্তারখানার পাকা বারান্দায় তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া বিমর্ষভাবে তামাক টানিতেছিলেন। তাঁহার ক্ষীণকায় কম্পাউণ্ডারটি দোরগোড়ায় বসিয়াছিল।

ডাক্তারখানার ক্ষুদ্র ঘর ও তৎসংলগ্ন বারান্দাটি পাকা হইলেও ডাক্তারবাবুর বসতবাটী এখনও মাটকোটা ও কুশের চালই রহিয়া গিয়াছিল। পঁচিশ বৎসর অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে প্র্যাক্‌টিস্ করিয়াও তিনি এমন অর্থসঞ্চয় করিতে পারেন নাই, যাহার দ্বারা নিজের মাথার উপর খড়ের পরিবর্তে ইট-কাঠের ছাদ তুলিতে পারেন। শুধু ঔষধ-পত্র নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া বহু কষ্টে ত্রিশ হাজার ইটের একখানা পাঁজা পুড়াইয়া এই ডাক্তারখানাটি পাকা করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতেও গাঁয়ের লোকের চোখ টাটাইয়াছিল এবং বিধু ডাক্তার যে কেবলমাত্র গরীব ঠকাইয়া নিজে দুটি কোটা তুলিয়াছে, এই প্রসঙ্গটা সন্ধ্যাসমাগমে অনেক চণ্ডীমণ্ডপেই গ্রামের বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের মধ্যে আলোচিত হইত। বিধুবাবু সে সব ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। আজীবন এখনও সংস্থানহীন ও ততোধিক কৃপণ চাষাভুষার নাড়ী টিপিয়াও তাঁহার প্রাণটা কাঁচাই রহিয়া গিয়াছিল ; তাই পাকা বাড়িতে বাস করিবার সম্ভাবনাটাও তাঁহার দূর হইতে আরও সুদূর হইয়া পড়িয়াছিল।

ততদূর বয়োবৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়াই বোধ হয় আমি বিধুবাবুকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতাম এবং প্রায়ই চাটুয্যে মহাশয়ের আসরে না গিয়া ডাক্তারবাবুর দাওয়ায় সন্ধ্যাটা কাটাইয়া আসিতাম। অনেক রকম আলোচনা হইত, তাহার মধ্যে গ্রামের ভদ্রলোকদের কৃতঘ্নতা ও ঈর্ষাপ্রবণতার কথা তুলিতেই তিনি জোর করিয়া চাপা দিয়া বলিতেন—'ওটা পাড়াগাঁয়ের স্বভাব। ওরা নিজের ইষ্ট নিজে বোঝে না। সৎশিক্ষা না থাকলে মানুষের ভাল প্রবৃত্তিগুলো পর্যন্ত বিকৃত হয়ে দাঁড়ায়। আমি তো জানি, কাউকে ঠকাচ্ছি নে, তা হলেই হ'ল।'

সেদিন গিয়া মাদুরের উপর বসিয়াই বলিলাম—'ছেলেটাকে বাঁচাতে পারলেন না, ডাক্তারবাবু ?'

ডাক্তারবাবু ক্ষণেকের জন্য তামাক টানায় বিরাম দিয়া বলিলেন—'না, বাঁচল না, পেল্লাদ হ'লে হয়তো বাঁচতে পারত।'

এই ছেলেটাকে বাঁচাইতে না পারার জন্য আমার মনের মধ্যেও যেন ডাক্তারের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ খাড়া হইয়াছিল। তাই আমি একটু ঘুরাইয়া বলিলাম—'গাঁয়ের লোকে কত কথাই না বলছে।'

তামাক বন্ধ করিয়া বিধুবাবু বলিলেন—'কি বলছে গাঁয়ের লোক ?'

আমি হাসিবার মত ভাব করিয়া বলিলাম—'আরে মশায়, জানেন তো গাঁয়ের লোকের ব্যাপার, রোগ হ'লে আপনার কাছেই ছুটে আসবে, আবার আড়ালে আপনার কুচ্ছো করতেও ছাড়বে না।'

'তবু কি বলছে, শুনি না।'

'বল্‌বে আর কি ; বলছে, আপনিই গোপালদীঘির ঘোষালগুষ্ঠীকে নির্বংশ করলেন !'

অন্ধকারে ডাক্তারবাবুর মুখখানা ভাল দেখা গেল না, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর কড়া এবং রুক্ষ হইয়া উঠিল। বলিলেন—'কে বল্‌ছে এ কথা শুনি।'

আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম—'দোহাই ডাক্তারবাবু, ঐটি আপনার জেনে কাজ নেই। শেষে কি আমি মারা যাব ? এমনিতেই তো গোয়েন্দা ব'লে আমার দুর্নাম আছে।'

বিধুবাবু কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—'হুঁ, আজকাল হারু চাটুয্যের দাওয়ায় মজলিস বসছে—না ?'

তাড়াতাড়ি বলিলাম—'আমি জানিনে মশাই, কিন্তু নিস্তারিণী পিসির কি কপাল বলুন তো ? বংশে বাতি দিতে কেউ রইল না ? ঐ একটা ছ' বছরের নাতি টিম্‌টিম্ করছিল তাও গেল ! এই পথে আসতে দেখলুম, সদর-দোরে ঠেস দিয়ে ব'সে ব'সে কাঁদছে। দূর থেকেই পালিয়ে এলুম, বুড়ির কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। কত দিনে যে ভগবান্ ওকে টেনে নেবেন।"

ডাক্তারবাবু হঠাৎ একটা চাপা গর্জন করিয়া বলিলেন—'নিস্তারিণী পিসি ! ঐ বুড়িকে জ্যান্ত পোড়ালে তবে আমার রাগ যায়।'

অবাক হইয়া কহিলাম—'কি বল্‌ছেন আপনি ?'

বিধুবাবু বলিলেন—'ঠিক বলছি। সেকালে বিলেতে বুড়িদের ডাইনী ব'লে পোড়াত শুনেছি,—আমাদের দেশেও তুষানলের ব্যবস্থা ছিল। তেমনই ক'রে তোমাব ঐ নিস্তারিণী পিসিকে দগ্ধে দগ্ধে মারা উচিত।'

সহসা বৃদ্ধা শোকাতুরা নিস্তারিণী পিসির উপর এতটা রাগের কি কারণ, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বিধুবাবু পুনশ্চ কহিলেন—'ঘোষালগুষ্ঠীকে নির্বংশ আমি কবিনি হে, ঘোষালগুষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখা শিবের অসাধ্য হয়ে উঠেছিল। পঁচিশ বছর ধ'রে এই ব্যাপার দেখছি। যতদিন ঘোষালদের একটা বংশধরও বেঁচে ছিল, ততদিন যেন আমারও প্রাণে স্বস্তি ছিল না। আজ বিলকুল সাফ হয়ে গেছে, আমিও নিশ্চিন্তি। আর তোমার নিস্তারিণী পিসিব তো কথাই নেই, যাকে বলে একদম ঝাড়া হাত-পা—তাই।'

'ব্যাপার কি, ডাক্তারবাবু ?'

গড়গড়ার নলে দ্রুত কয়েকটা টান দিয়া তিনি বলিলেন—'তবে তোমাকেই বলি শোন। অ্যাদ্দিন বলিনি, হাজার হোক্ একদিন নিবারণদা'ই আমাকে এখানে এনে বসিয়েছিলেন।' তাব পর তাঁহার অতি শীর্ণকায় কম্পাউণ্ডারটিকে ডাকিয়া বলিলেন,—'গুপী, যাও, একবার দেখে এস, নিমাই হাজরার মেয়েটা কেমন আছে। ক্ষেন্তীর মা যদি আসতে পারে, সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস, তার মুখে শুনে ওষুধ দেব। আর এক ছিলিম তামাক সেজে রেখে যেও।

'পঁচিশ বছর আগে যখন আমি মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়ে এই গোপালদীঘিতে প্র্যাক্‌টিস করতে বসলুম, তখন নিবারণ ঘোষাল মশায় এখানকার সবচেয়ে বড় জমিদার এবং গ্রামের মাথা ছিলেন। তাঁর পরিবারের মধ্যে ছিলেন তাঁর মা, দুই ছেলে আর তাঁর সহধর্মিণী—তোমাদের ঐ নিস্তারিণী পিসি। ওকে আমি গোড়া থেকেই বৌঠান ব'লে এসেছি।

শুনেছি, নিবারণদা'র মা বৌ-কাঁটকী ছিলেন। কথাটা খুব সত্যি বলেই আমি মনে করি, কারণ, তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন নিস্তার বৌঠান মাথা তুলতে পারেননি। আজকালকার নব্য বধূদের ভাল লাগ্‌বে কি না, বল্‌তে পারি না, কিন্তু নিবারণদা'র মা দজ্জাল বৌ-কাঁটকী ছিলেন বলেই বোধ হয় ঘোষালবংশটা সে পর্যন্ত টিকে ছিল।

নিস্তার বৌঠান সেকেলে ধরনের বৌ ছিলেন। সধবাবস্থায় কোনদিন আমার সামনেও ঘোমটা না দিয়ে বার হননি। শিক্ষা-দীক্ষাও তাঁর সেকেলে ধরনের ছিল, লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু বধূ অবস্থাতেও তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। লোককে খাওয়াতে তিনি বড় ভালবাস্‌তেন।

'খাওয়াতে ভালবাসতেন'—কথাটা শুনতে কেমন লাগল ? বেশ নয় ? যেন সাক্ষাৎ ভগবতী—অন্নপূর্ণার প্রতিমূর্তি—কেমন ? হুঁ—তাই বটে—

যাক্। আমি প্র্যাকটিস আরম্ভ করবার বছরখানেক পরে নিবারণদা'র মা অসুখে পড়লেন। বয়স অনেক হয়েছিল, তার ওপর জরাতিসার, খুব সাবধানে চিকিৎসা করতে লাগলুম। বলতে

গেলে নিবারণদা'র মা'ই আমার প্রথম বড় কেস, নিজের সুনামের জন্যে প্রাণপণে তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। দু'বেলা দেখতে যেতুম,—ফি নিতুম না, ঘোষালবাড়ি থেকে আজ পর্যন্ত এক পয়সা ফি বা ওষুধের দাম নিইনি—রুগীর পথ্য সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি আরম্ভ করলুম, যে ক'রে হোক বুড়িকে বাঁচাতেই হবে।

উৎপীড়িত বৌ অত্যাচারী শাশুড়ির কি অক্লান্ত সেবা করতে পারে, তা নিস্তার বৌঠানকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। রুগী ক্রমশ অল্পে-অল্পে আরোগ্যের পথে এগুতে লাগলেন।

যম তখন তাঁর কালো মোষের ওপর ব'সে লাসো-(Lasso)টি বাগিয়ে নিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন।

যে দিন বেশ নিশ্চিন্তি হয়ে ভাবছি, আর কোনও ভয় নেই, সেইদিনই নিবারণদা'র একটা চাকর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিলে যে, গিন্নীমা যাব যাব করছেন, এতক্ষণ বোধ হয় শেষ হয়ে গেলেন, ডাক্তারবাবু, শীগ্‌গির চলুন।

শীগ্‌গিরই গেলুম। গিয়ে দেখি, ভয়ানক অবস্থা। হাতে পায়ে খিল ধরছে এবং আর আর কথা শুনে কাজ নেই। বুঝতে বাকী রইল না যে, এ যাত্রা ইনি সত্যিই চললেন।

জিজ্ঞেস করলুম—'এঁকে কোনও কুপথ্য খাওয়ানো হয়েছিল ?'

নিবারণদা ঘাড় নেড়ে বললেন—'আমার জান্‌তে নয়। ইনি যদি খাইয়ে থাকেন, বলতে পারি না।'

নিস্তার বৌঠান মুখে আঁচল দিয়ে ব'সে কাঁদছিলেন, ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ ক'রে বললেন—'ওগো, কিছু খাওয়াই নি, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি। বুড়ো মানুষ কিছু কি খেতে পারেন ? কাল রাত্তিরে ওষুধ খাবার পর মুখ বদলাবার জন্যে একটু কাসুন্দি চাইলেন। কিচ্ছুটি খেতে পান না, তার ওপর ঐ তেতো ওষুধ, তাই—'

নিবারণদা বললেন—'কাসুন্দি খাইয়েছ ? ও ! তবে আর কেন, বিধু, তুমি বাড়ি যাও। মিছে কতকগুলো ওষুধ আর পরিশ্রম তোমার অপব্যয় হ'ল।' ব'লে বাইরে গিয়ে বসলেন।

সেই রাত্রিতে পুরোনো কাসুন্দিতেই শেষ পাথেয় ক'রে নিয়ে নিবারণদা'র মা পরলোকের দীর্ঘ পথে রওনা হয়ে পড়লেন।

তিনি যাবার পর নিস্তার বৌঠান বাড়ির গিন্নী হলেন। বাস। আর কি ? যমের রাজ্যে দুন্দুভি বেজে উঠ্‌ল।

এবার নিবারণদা'র পালা। মা মারা যাবার পর পুরো তিনটি বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। অসাধারণ তাঁর জীবনীশক্তি ছিল।

নিবারণদা'র কাল পূর্ণ হ'লে তাঁর ফিসচুলা হ'ল—যাকে আমাদের শাস্ত্রে বলে Fistula in Ano। কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এসে ফিসচুলা অস্ত্র করলেন। তার পর নিবারণদাকে দুইপা জোড়া ক'রে বেঁধে বিছানায় শুইয়ে রাখা হ'ল। যতদিন না ঘা শুকোয়, ততদিন পা খোলা হবে না।

কলকাতার ডাক্তার অস্ত্র করেই ফিরে গিছ্‌লেন, রুগীর দেখাশোনা আমিই করতুম। এ রোগে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে ভারী সাবধান থাকতে হয়। এত অল্পপরিমাণে এমন জিনিস খেতে দিতে হয়—যাতে পুষ্টি হয় অথচ দেহের মধ্যে অনাবশ্যক আবর্জনা তৈরি হ'তে না পারে।

এমনিভাবে পা-বাঁধা অবস্থায় বিছানায় শুয়ে নিবারণদা'র ষোল দিন কাটল। প্রত্যহ দু'ছটাক ক'রে লেবুর রস কিম্বা আঙ্গুরের রস খেয়ে ষোল দিন কাটালে মানুষের মনের অবস্থা কি রকম হয়, বুঝতেই পারছ। নিবারণদা খাই-খাই করতে আরম্ভ করলেন। এটা খাব ওটা খাব ক'রে ফরমাস করতে লাগলেন। আমি বৌঠানকে গিয়ে খুব কড়াভাবে সতর্ক ক'রে দিলুম, যেন কোন করকম খাবার অত্যাচার না হয়। তিনিও ঘোমটার আড়াল থেকে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

কিন্তু মমতাময়ীর মমতাকে আটকে রাখবে কে ? একুশ দিনের দিন একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল। তার পর কলকাতা থেকে ডাক্তার এলেন, অনেক চেষ্টাচরিত্র করা গেল, কিন্তু নিবারণদা'কে বাঁচানো গেল না।

যাক, নিবারণদা'তো গেলেন, তখন তাঁর বড় ছেলে বিনোদ কলেজ ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে এসে বসল।

অশৌচ উত্তীর্ণ হবার পর নিস্তার বৌঠান ছেলের বিয়ে দিলেন।

বিনোদের সবসুদ্ধ তিনটি ছেলে হয়েছিল ; কিন্তু তিন বছরের বেশি কেউ বাঁচল না। এই অল্পকালের মধ্যে ঠকুরমার অজস্র আদর এবং নানাবিধ কুখাদ্য পেটে পুরে নিয়ে পেটটিকে পিলে লিভারে বোঝাই ক'রে তারা একে একে অমৃত-লোকে চ'লে গেল। এখনও বোধ হয় তারা অমৃত-সরোবরের তীরে ব'সে সেই অমৃতের সাহায্যে ঠাকুরমার দেওয়া অতি দুষ্পাচ্য সুরসাল খাদ্য হজম করছে।

তার পর বিনোদের বৌ। বেচারী কিছু দুর্বলপ্রকৃতির ছিল। সে প্রথমে গেল। কলেরা হয়েছিল,—এমন কিছু সাংঘাতিক নয়, সারিয়েও প্রায় তুলেছিলাম—কিন্তু কলেরার ওপর ফুটি-তরমুজ বেচারী সহ্য করতে পারলে না।

বৌকে চিতেয় তুলে দিয়ে এসে বিনোদ পড়ল। প্রথমটা ঘুষঘুষে জ্বর, তার পর টাইফয়েড দেখা দিলে। টাইফয়েড রোগে ওষুধ-বিষুধ বড় কিছু নেই—water in, water out সেই চিকিৎসাই হ'তে লাগল, খাবার ব্যবস্থা শুধু ছানার জল।

বিনোদ ভারী দুর্বল হয়ে পড়ল। মা'র প্রাণে এ দুঃখ কত দিন সয় ? শরীরে বল না পেলে ছেলে রোগের সঙ্গে যুঝবে কি ক'রে ? সুতরাং আমাকে লুকিয়ে ছানার জলের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে খাওয়ানো চল্‌তে লাগল।

গল্পটা ক্রমেই একঘেয়ে হয়ে পড়ছে—না ? আচ্ছা, সংক্ষেপে বলছি। বিনোদ যাবার পর তার ছোট ভাই বিভূতির পালা পড়ল। ইতিমধ্যে তার বিয়ে-থা হয়েছিল। ক্রমশ তারও ছেলেপুলে হ'তে লাগল—এবং যেতে লাগল। শেষে একটিমাত্র ছেলে, তারাও স্বামীস্ত্রীতে ভবসমুদ্রে পাড়ি দিলে।

রয়ে গেলেন শুধু তোমার নিস্তারিণী পিসি আর ঘোষালবংশের ঐ শেষ পিদ্দিমটি।

এ ছেলেটা একেবারে প্রহ্লাদ না হোক, দৈত্যকুলের সঙ্গে নিশ্চয় ওর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নৈলে ছ'বছর বয়স পর্যন্ত সে বেঁচে রইল কি ক'রে ? কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে যেতেই হ'ল। আজ সকালবেলা ঘোষালবংশের এই পঁচিশ বছরব্যাপী ট্র্যাজেডির ওপর যবনিকা প'ড়ে গেছে।

শুনলে তো গল্প ? এখন এর পরও যদি বল, আমিই ঘোষালগুষ্ঠীকে নির্বংশ করেছি, তাহলে আমার আর কিছু বলবার নেই।'

রাত্রিতে বাড়ি ফিরিবার পথে ঘোষালদের বাড়ির পাশ দিয়া গেলাম। বাড়িখানা অন্ধকারে খাঁ খাঁ করিতেছে, এবং তাহারই ভিতর হইতে বিনাইয়া বিনাইয়া কান্নার শব্দ আসিতেছে। ওরে আমার আঁধার ঘরের মাণিক, শিবরাত্রির সল্‌তে—এই কয়টা কথা কানে গেল।

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না। কিন্তু রাগ এবং অশ্রদ্ধা এই সর্বনাশিনী স্ত্রীলোকটার উপর যতই বাড়িতে থাকুক, এ কথাও কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না যে, নিজের কুশিক্ষা ও অসংযত স্নেহের জন্য কি নিদারুণ দণ্ডভোগই না সে করিয়াছে।

প্র·পৌষ ১৩৩৮

কুবের ও কন্দর্প

নিউ ইয়র্কের বুড়া অ্যান্টনী রক্‌ওয়াল 'ইউরেকা' সাবান তৈয়ার করিয়া ক্রোড়পতি হইয়াছিলেন। উপস্থিত বিষয়কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউ-এ প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া বাস করিতেছেন।

তাঁহার দক্ষিণ দিকের প্রতিবেশী বনেদী বড় মানুষ জি ভ্যান্ স্যুইলাইট সাফ্‌ক- জোন্স মোটর হইতে অবতরণ করিয়া 'সাবান সম্রাটের'র প্রাচীন ইতালীয় প্রথায় তৈয়ারি জবড়জং গৃহতোরণের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া নাক সিঁটকাইয়া ঘৃণাভরে নিজের গৃহে প্রবেশ করিল। বুড়া রক্‌ওয়াল নিজের লাইব্রেরি ঘরের জানালা হইতে তাহা দেখিয়া দাঁত খিঁচাইয়া হাসিলেন।

'অপদার্থ অহঙ্কেরে বুড়ো বেকুফ কোথাকার! আসছে বছর আমার বাড়ি আমি লাল-নীল-সবুজ রঙ করাবো, দেখি বুড়ো নচ্ছারের ভোঁতা নাক আরো সিকেয় ওঠে কিনা।'

ঘণ্টা বাজাইয়া চাকর ডাকা অ্যান্টনী রক্‌ওয়াল পছন্দ করিতেন না। তিনি ষাঁড়ের মত গর্জন করিয়া ডাকিলেন—'মাইক!'

চাকর আসিলে তাহাকে বলিলেন—'আমার ছেলেকে বল, বেরুবার আগে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।'

ছেলে আসিলে বৃদ্ধ খবরের কাগজখানা নামাইয়া রাখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। নিজের মাথার চুলগুলো একহাতে এলোমেলো করিতে করিতে এবং অন্য হাতে পকেটের চাবির গুচ্ছ নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন—'রিচার্ড, কত দাম দিয়ে তুমি তোমার ব্যবহারের সাবান কেনো?'

রিচার্ড মাত্র ছয়মাস কলেজের পড়া শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিয়াছে, সে একটু ঘাবড়াইয়া গেল। ঘোর আকস্মিকতাপূর্ণ বিচিত্রস্বভাব এই বাবাটিকে সে এখনো ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। বলিল—'ছ' ডলার করে ডজন বোধ হয়।'

'আর তোমার কাপড়-চোপড়?'

'আন্দাজ ষাট ডলার।'

অ্যান্টনী নিঃসংশয় হইয়া বলিলেন—'তুমি সত্যিকার ভদ্রলোক হয়েছ। আমি শুনেছি আজকাল ছোকরারা চব্বিশ ডলার করে সাবান কেনে, একটা পোশাকের জন্যে একশ' ডলারের ওপর খরচ করে। নবাবী করে ওড়াবার মত পয়সা তাদের চেয়ে তোমার কিছু কম নেই কিন্তু তুমি ভদ্রতা ও মিতাচারের নিয়ম মেনে চলে থাকো—এ থেকে বোঝা যাচ্ছে তুমি ভদ্রলোক হয়েছ। আমি অবশ্য 'ইউরেকা' মাখি; নিজের তৈরি বলে নয়—অমন সাবান পৃথিবীতে আর নেই। মোটকথা, দশ সেন্টের বেশি একখানা সাবানের পিছনে যে খরচ করে সে রঙকরা কাগজের বাক্স আর এসেন্সের দুর্গন্ধ কেনে।—যাক্, তুমি ভদ্রলোক। লোকে বলে তিনপুরুষের কমে ভদ্রলোক হয় না। বিলকুল মিথ্যে কথা, টাকা থাকলেঁ একপুরুষে ভদ্রলোক হওয়া যায়—যথা তুমি। এক এক সময় সন্দেহ হয় আমিও বা ভদ্রলোক হয়ে উঠেছি। কারণ আমার পাশের প্রতিবেশীদের মত—যাঁরা, আমি তাঁদের মাঝখানে বাড়ি কিনেছি বলে, রাত্তিরে ঘুমতে পারেন না— আমারও মাঝে মাঝে বদমেজাজ দেখিয়ে অভদ্রভাবে মুখ খারাপ করতে ইচ্ছে করে।'

রিচার্ড উদাসভাবে বলিল—'পৃথিবীতে টাকার অসাধ্য কাজও অনেক আছে বাবা।'

বৃদ্ধ রক্‌ওয়াল মর্মাহত হইয়া বলিলেন—'না না ও কথা বলো না। যদি বাজী রাখতে বল, আমি প্রত্যেকবার টাকার ওপর বাজী রাখতে রাজী আছি। বিশ্বকোষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত

পড়ে দেখেছি, এমন জিনিস একটাও নেই যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। আসছে হপ্তায় পরিশিষ্টটুকু পড়ে দেখতে হবে তাতে কিছু পাওয়া যায় কিনা। —আসল কথা, টাকার মত নিরেট খাঁটি জিনিস আর কিছু নেই। দেখাও আমাকে এমন একটা কিছু যা টাকায় কেনা যায় না।'

রিচার্ড বলিল— 'এই ধর, টাকার সাহায্যে বিশিষ্ট ভদ্র সমাজে ঢোকা যায় না।'

'অর্থমনর্থম'-এর পৃষ্ঠপোষক সগর্জনে কহিলেন—'যায় না ? কোথায় থাকতো তোমার বিশিষ্ট ভদ্রসমাজ যদি তাদের প্রথম পূর্বপুরুষদের জাহাজে চড়ে আমেরিকায় আসবার টাকা না থাকতো ?'

রিচার্ড নিশ্বাস ফেলিল।

বৃদ্ধ রক্‌ওয়াল গলার আওয়াজ কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া কহিলেন—'এই কথাই আলোচনা করতে চাই, সেই জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি। দু'হপ্তা থেকে লক্ষ্য করছি তোমার মনের মধ্যে কিছু একটা গোলমাল চলছে। ব্যাপারখানা কি খুলে বল। দরকার হলে স্থাবর সম্পত্তি ছাড়া নগদ টাকা যা আমার আছে তা থেকে এক কোটি দশ লক্ষ ডলার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বার করতে পারি। কিংবা যদি তোমার লিভারের দোষ হয়ে থাকে আমার কূর্তি জাহাজ ঘাটে তৈরি আছে, দু'দিন বাহামার দিকে বেড়িয়ে এসো গে।'

রিচার্ড বলিল—'লিভার নয় বাবা, তবে কাছাকাছি আন্দাজ করেছ।'

তীক্ষ্ণচক্ষে চাহিয়া অ্যান্টনী রক্‌ওয়াল বলিলেন—'হুঁ। নাম কি মেয়েটির ?'

রিচার্ড ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার অপরিমার্জিত বাবাটি আস্তে আস্তে তাহার প্রাণের সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইলেন। শেষে বলিলেন—'কিন্তু তুমি প্রস্তাব করছ না কেন ? তোমাকে বিয়ে করবার নামে যে কোনো মেয়ে লাফিয়ে উঠবে। তোমার টাকা আছে, চেহারা আছে, চরিত্রও ভাল। মেহনত করে তোমার হাতে কড়া পড়েনি, অন্তত 'ইউরেকা' সাবানের দাগ তাতে নেই। দোষের মধ্যে কলেজে পড়ছ—তা সেটা নাহয় সে মাফ্ করে নেবে।'

ছেলে বলিল—'আমি যে একটাও সুঁযোগ পেলাম না।'

বাবা বলিলেন—'সুযোগ তৈরি করে নাও। তাকে নিয়ে পার্কে বেড়িয়ে এসো, নাহয় মোটরে চড়ে ঘুরে এসো। চার্চ থেকে ফেরবার পথে তার সঙ্গ নাও। সুযোগ—হুঁ।'

'সমাজের সব ব্যাপার তুমি জাননা বাবা। তার প্রত্যেক মিনিটের কাজটি আগে থাকতে ঠিক হয়ে আছে। এক চুল নড়চড় হবার যো নেই। তাকে আমার চাইই চাই, না পেলে সমস্ত নিউইয়র্ক শহরটা আলকাতরার মত কালো হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুতেই নাগাল পাচ্ছি না। কি যে করি ! চিঠি লিখে তো আর প্রস্তাব করতে পারি না, সে যে বড় বিশ্রী হবে।'

অ্যান্টনী কহিলেন—'তুমি বলতে চাও এত টাকা থাকা সত্ত্বেও এই মেয়েটিকে তুমি এক ঘণ্টার জন্য নিরিবিলি পেতে পার না ?'

'আমি ইতস্তত করে দেরি করে ফেলেছি। পরশু দুপুরবেলা সে দু'বছরের জন্যে য়ুরোপ বেড়াতে চলে যাবে। কাল সন্ধ্যেবেলা মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে তার সঙ্গে একলা দেখা হবে। সে এখন লার্চমেণ্টে তার মাসির কাছে আছে, সেখানে তো আর যেতে পারি না। কিন্তু ইস্টিশানে রাত্রি সাড়ে আটটার সময় গাড়ি নিয়ে থাকবার হুকুম জোগাড় করেছি। ইস্টিশান থেকে তাকে গাড়িতে করে ব্রডওয়েতে 'ওয়ালক' থিয়েটারে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে তার মা এবং আরও অনেকে থাকবেন। মধ্যে এই ছ'সাত মিনিট সময় আমি তাকে গাড়ির মধ্যে একলা পাব। ঐটুকু সময়ের মধ্যে কি বিয়ের প্রস্তাব করা যায় ? তা হয় না। আর পরেই বা কখন সুযোগ পাব ? না বাবা, টাকা দিয়ে এ জট ছাড়ানো যাবে না। নগদ মূল্য দিয়েও এক মিনিট

সময় কেনা যায় না, তা যদি যেত তাহলে বড় মানুষেরা বেশি দিন বাঁচত। মিস ল্যানট্রী জাহাজে চড়বার আগে তাঁর সঙ্গে আড়ালে কথা কইবার কোনও আশাই নেই।'

অ্যান্টনী কিছুমাত্র দমিলেন না, প্রফুল্লস্বরে বলিলেন— 'আচ্ছা তুমি ভেবো না ডিক্, এখন তোমার ক্লাবে যাও। তোমার যে লিভার খারাপ হয়নি এটা সুসংবাদ। আর দেখ, মাঝে মাঝে 'অর্থ-পীরের' দরগায় একটু আধটু ধূপ ধূনো জ্বালিও। টাকা দিয়ে সময় কেনা যায় না? —হাঁ—মুদির দোকানে কাগজের মোড়কে বাঁধা অনন্তকাল বিক্রি হয় না বটে। কিন্তু তোমার 'কাল' মহাশয়কে আমি সোনার খনির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে অনেকবার ন্যাংচাতে দেখেছি।'

সেই রাত্রে রিচার্ডের পিসি এলেন ভ্রাতার ঘরে প্রবেশ করিলেন। শান্ত শীর্ণ ভালমানুষ, টাকার ভারে অবনত এলেন পিসি নব প্রণয়ীদের দুঃখ দুরাশার কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া অ্যান্টনী বলিলেন—'ডিক্ আমাকে বলেছে। আমি বললাম ব্যাঙ্কে আমার যত টাকা আছে, সব নাও। শুনে সে টাকার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলে। টাকায় কিছু হবে না,—দশটা কোটিপতির সাধ্য নেই সামাজিক বিধি বাঁধন একচুল নড়ায়।'

পুনরায় নিশ্বাস ফেলিয়া এলেন বলিলেন—'দোহাই অ্যান্টনী, তুমি বাতদিন টাকার কথা ভেবো না। অকপট ভালবাসার কাছে ঐশ্বর্য কিছুই নয়। প্রেম সর্বশক্তিমান।—আর দু'দিন আগে যদি ডিক্ মেয়েটির কাছে প্রস্তাব করত সে কিছুতেই না বলতে পারত না। কিন্তু আর বুঝি সময় নেই। তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য তোমার ছেলেকে সুখী করতে পারবে না।'

পরদিন সন্ধ্যা আটটার সময় এলেন পিসি একটি কীটদষ্ট কৌটা হইতে একটি পুরানো সেকেলে গড়নের সোনার আংটি বাহির করিয়া রিচার্ডকে দিলেন—'বাছা, আজ রাত্রে এটি আঙুলে পরো। তোমার মা এটি আমাকে দিয়েছিলেন আর বলে দিয়েছিলেন যখন তুমি কোনও মেয়েকে ভালবাসবে তখন তোমাকে এটি দিতে। এ আংটি ভালবাসায় সুখ দেয়, সৌভাগ্য আনে।'

রিচার্ড ভক্তিভরে আংটি হাতে লইয়া নিজের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে পরিবার চেষ্টা করিল। আংটি আঙ্গুলের অর্দ্ধেক দূর পর্যন্ত গিয়া আর উঠিল না। সে তখন আংটি খুলিয়া লইয়া সাবধানে নিজের ওয়েস্ট কোটের পকেটে রাখিয়া দিল। তারপর গাড়ির জন্য ফোন করিল।

স্টেশনে আটটা বত্রিশ মিনিটে সে মিস ল্যানট্রীকে ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির করিল।

মিস ল্যানট্রী বলিলেন—'আর দেরি নয়, মা অপেক্ষা করছেন।'

কর্তব্যনিষ্ঠ রিচার্ড নিশ্বাস ফেলিয়া গাড়ির চালককে বলিল—'ওয়ালক থিয়েটার যত শীঘ্র যেতে পারো।'

গাড়ি ব্রডওয়ের দিকে ছুটিয়া চলিল।

চৌত্রিশ রাস্তায় পৌঁছিয়া রিচার্ড হঠাৎ গলা বাড়াইয়া গাড়ি থামাইতে বলিল।

গাড়ি হইতে নামিয়া ক্ষমা চাহিয়া রিচার্ড বলিল—'একটা আংটি পড়ে গেছে। আমার মা'র আংটি, হারিয়ে গেলে বড় অন্যায় হবে। কোথায় পড়েছে আমি দেখেছি। এখনি খুঁজে আনছি, এক মিনিটও দেরি হবে না।'

এক মিনিটের মধ্যেই রিচার্ড আংটি খুঁজিয়া লইয়া গাড়িতে ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু এই এক মিনিটের মধ্যে একখানা 'বাস' তাহার গাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কোচম্যান বাঁ দিক দিয়া গাড়ি বাহির করিয়া লইতে গেল কিন্তু একটা ভারি মাল-বোঝাই ট্রাক তাহার পথের মাঝখানে আগড় হইয়া আটকাইয়া রহিল। সে গাড়ির মুখ ফিরাইয়া ডান দিক দিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল কিন্তু সে দিকে কোথা হইতে একটা আসবাব-ভরা প্রকাণ্ড লরী আসিয়া পথরোধ করিয়া দিল। পিছু হটিতে গিয়া কোচম্যান হাতের রাশ ফেলিয়া দিয়া গালাগালি শুরু করিল। চারিদিক হইতে অসংখ্য গাড়িঘোড়া আসিয়া তাহাকে রীতিমত অবরুদ্ধ

করিয়া ফেলিয়াছে।

বড় বড় শহরের রাজপথে মাঝে মাঝে গাড়ি-ঘোড়া এই রকম তাল পাকাইয়া গিয়া যানবাহনের চলাচল একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়।

মিস ল্যান্‌ট্রী অধীর হইয়া বলিলেন—'গাড়ি চলছে না কেন? দেরি হয়ে যাবে যে।'

গাড়ির মধ্যে উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া রিচার্ড দেখিল ব্রডওয়ের সিক্সথ্ অ্যাভিনিউ এবং চৌত্রিশ রাস্তার চৌমাথাটা সংখ্যাতীত গাড়ি বাস লরী ও আরও অন্যান্য নানা প্রকার গাড়িতে একেবারে ঠাসিয়া গিয়াছে। এবং আরও অগণ্য গাড়ি চারিদিকের রাস্তা গলি প্রভৃতি হইতে জনস্রোতের মত বাহির হইয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িতেছে। গাড়ির চাকায় চাকায় আটকাইয়া ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ির মধ্যে গাড়োয়ানদের চেঁচামেচি ও গালাগালিতে যেন এক ভীষণ কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। নিউইয়র্কের সমস্ত চক্রযান যেন একযোগে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া সাড়ে বত্রিশ ভাজার মত মিশিয়া গিয়াছে। ফুটপাথে দাঁড়াইয়া হাজার হাজার লোক এই দৃশ্য দেখিতেছে—এত বড় স্ট্রীট ব্লকেড্ তাহারা আর কখনো দেখে নাই।

রিচার্ড ফিরিয়া বসিয়া বলিল—'ভারী অন্যায় হল। ঘণ্টাখানেকের আগে এ জট ছাড়ানো যাবে বলে মনে হয় না। আমারি দোষ আংটিটা যদি পড়ে না যেতো—'

মিস ল্যান্‌ট্রী বলিলেন—'দেখি কেমন আংটি। বেরুবার যখন উপায় নেই তখন এই ভাল। আর সত্যি বলতে কি, থিয়েটার দেখাটা নিছক বোকামি।'

সেদিন রাত্রি এগারটার সময় অ্যাণ্টনী রক্‌ওয়াল লাল রঙের ড্রেসিং গাউন পরিয়া এক বোম্বেটে সংক্রান্ত ভীষণ লোমহর্ষণ উপন্যাস পড়িতে ছিলেন, এমন সময় কে তাঁহার দরজায় টোকা মারিল।

রক্‌ওয়াল হুঙ্কার ছাড়িলেন—'ভেতরে এস।'

এলেন পিসি ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা প্রাচীনা স্বর্গলোকবাসিনীকে ভুল করিয়া কে পৃথিবীতে ফেলিয়া গিয়াছে।

মৃদুকণ্ঠে এলেন কহিলেন—'অ্যাণ্টনী, ওরা বাগদত্ত হয়েছে; মেয়েটি আমাদের রিচার্ডকে বিয়ে করতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। থিয়েটারে যেতে যেতে পথে স্ট্রীট ব্লকেড হয়েছিল তাই দু'ঘণ্টার আগে ছাড়া পায়নি।

'অ্যাণ্টনী ভাই, আর কখনো টাকার গর্ব করো না। অকপট প্রেমের একটি চিহ্ন ওর মা'র দেওয়া একটি আংটির জন্যে আমাদের রিচার্ড আজ ভালবাসায় জয়লাভ করলে। আংটিটা পড়ে গিয়েছিল তাই কুড়িয়ে নেবার জন্যে রিচার্ড গাড়ি থেকে নামে। সে ফিরে আসতে না আসতে পথঘাট সব বন্ধ হয়ে যায়। তখন নিজের ভালবাসার কথা মেয়েটিকে বলে রিচার্ড তাকে লাভ করেছে। অ্যাণ্টনী, দেখছ প্রেমের কাছে ঐশ্চর্য তুচ্ছ হয়ে যায়।'

অ্যাণ্টনী বলিলেন—'বেশ কথা। ছোঁড়া যা চাইছিল তা যে পেয়েছে এটা খুব সুখের বিষয়। আমি তখনি বলেছিলাম যত টাকা লাগে আমি দেব—'

'কিন্তু অ্যাণ্টনী ভাই, তোমার টাকা এখানে কি করতে পারত?'

অ্যাণ্টনী রক্‌ওয়াল বলিলেন—'ভগিনী, আমার বোম্বেটে উপস্থিত বড়ই বিপদে পড়েছে। তার জাহাজ ডুবতে আরম্ভ করেছে কিন্তু সে বড় কড়া পিত্তির বোম্বেটে, সহজে অত টাকার মাল লোকসান হতে দেবে না। তুমি এবার আমাকে এই পরিচ্ছেদটা শেষ করতে দাও।'

গল্প এইখানেই শেষ হওয়া উচিত। পাঠকের মত আমারও তাহাই ইচ্ছা। কিন্তু সত্যের সন্ধানে কূপের তলদেশ পর্যন্ত আমাদের নামিতেই হইবে—উপায় নাই।

পরদিন কেলী নামক একজন লোক রক্তবর্ণ এক জোড়া হাত এবং নীলবর্ণ কন্ধকাটা নেকটাইয়ের বাহার দিয়া অ্যাণ্টনী রক্‌ওয়ালের বাড়িতে উপস্থিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার

লাইব্রেরিতে ডাক পড়িল।

অ্যাণ্টনী হাত বাড়াইয়া চেক্‌বইখানা লইয়া বলিলেন—'বহুত আচ্ছা—খাসা কাজ হয়েছে। তোমাকে কত দিয়েছি— হাঁ—পাঁচ হাজার ডলার।'

কেলী বলিল—'আরও তিনশ' ডলার আমি নিজের পকেট থেকে দিয়েছি। খরচা হিসেবের চেয়ে কিছু বেশি পড়ে গেছে। প্রায় সব বগী গাড়িওয়ালা আর মালগাড়িগুলোকে পাঁচ ডলার করে দিতে হল। ট্রাক্ আর জুড়ীগাড়িগুলো দশ ডলারের কমে ছাড়লে না। মোটরগুলো দশ ডলার করে নিলে আর মালবোঝাই জুড়ী ঘোড়ার ট্রাকগুলো কুড়ি ডলার করে আদায় করলে। সবচেয়ে ঘা দিয়েছে পুলিশে, পঞ্চাশ ডলার করে দু'জনকে দিতে হল আর দু'জনকে পঁচিশ আর কুড়ি। কিন্তু কি চমৎকার হয়েছিল বলুন দেখি। ভাগ্যে উইলিয়াম এ ব্রাডি সেখানে হাজির ছিল না, নইলে হিংসেতেই বুক ফেটে বেচারা মারা যেত। তবু একবারও মহলা দেয়া হয়নি। বলব কি, দু'ঘণ্টার মধ্যে একটা পিঁপড়ে সেখান থেকে বেরুতে পারেনি।'

চেক কাটিয়া অ্যাণ্টনী বলিলেন—'তেরশ'—এই নাও কেলী। তোমার হাজার আর তিনশ' যা তুমি খরচ করেছ। কেলী, তুমি টাকাকে ঘেন্না কর না তো?'

কেলী বলিল—'আমি? যে লোক দারিদ্র্যের আবিষ্কার করেছে আমি তাকে জুতোপেটা করতে পারি।'

কেলী দরজা পর্যন্ত যাইলে রকুওয়াল তাহাকে ডাকিলেন—'আচ্ছা কেলী, সে সময় একটা নাদুসনুদুস গোছের ন্যাংটো ছেলেকে ধনুক নিয়ে তীর ছুঁড়তে দেখেছিলে কি?'

কেলী মাথা চুলকাইয়া বলিল—'কই না উঁহুঁ। ন্যাংটো? তবে বোধ হয় আমি পৌঁছবার আগেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল।'

হাস্য করিয়া অ্যাণ্টনী বলিলেন—'আমি জানতাম সে ছোঁড়া সেদিকে ঘেঁষবে না। আচ্ছা—গুড বাই কেলী।'

প্র· মাঘ ১৩৪০

O. Henry-র গল্পের অনুবাদ

ন্যুডিস্‌ম-এর গোড়ার কথা

আদিম কাল হইতে ক্রমাগত সৃষ্টিকার্য করিয়া করিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ক্রমে অথর্ব হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দাঁত সমস্ত পড়িয়া গেল ; চোখেও ছানি পড়িল।

কিন্তু সৃষ্টির নেশা সহজে ছাড়া যায় না ; স্থবির বয়সে ব্রহ্মা হঠাৎ মানুষ সৃষ্টি করিয়া বসিলেন।

নারদ বীণ বাজাইয়া ব্রহ্মলোকের পথে যাইতেছিলেন, ব্রহ্মা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, নারদ, একটা নূতন জীব সৃষ্টি করিয়াছি। দেখ তো কেমন হইল।

ব্রহ্মার নবতম সৃষ্টি উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া নারদ বিমর্ষভাবে বলিলেন, পিতামহ, কাজটা ভাল হয় নাই।

ব্রহ্মা বলিলেন, কেন, দোষটা কি হইয়াছে ?

নারদ কহিলেন, নিজের চক্ষেই দেখুন না ! এ যে বীভৎস ব্যাপার ! আপনার অনেক সৃষ্টিই তো দেখিয়াছি, কিন্তু এমন বিকট চেহারা আর কখনও দেখি নাই।

তাই নাকি ! ব্রহ্মা শঙ্কিত হইলেন। নারদ, তোমার পরকলাটা একবার দাও তো—স্বচক্ষে দেখি।

নারদের পরকলা চোখে লাগাইয়া ব্রহ্মা দেখিলেন। স্বচক্ষে নিজের সৃষ্টি দেখিয়া ব্রহ্মার প্লীহা চমকাইয়া গেল। একি ! এমন কদাকার অশ্লীল মূর্তি জীবজগতে কুত্রাপি দেখা যায় নাই। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, করিয়াছি কি ! ইহাদের দেখিয়া আমার নিজেরই যে গা-ঘিনঘিন করিতেছে।

পরকলা খুলিয়া বলিলেন, হুঁ। নারদ, এখন কি করা যায় বল তো ?

নারদ বলিলেন, যদি ভাল চান, এই দণ্ডে ওগুলাকে সংহারকর্তা শিবের কাছে পাঠাইয়া দিন ; উহাদের পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিলে আর রক্ষা থাকিবে না। ওই কদর্য চেহারা দেখিয়া সমস্ত জীবের মাথায় খুন চড়িয়া যাইবে, উহারা নিজেরাও পরস্পরের মূর্তি দেখিয়া ক্ষেপিয়া যাইবে। ফলে আপনার সৃষ্টি আর বাঁচিবে না।

তবু নিজের সৃষ্টি যতই কুৎসিত হউক, তাহার প্রতি স্রষ্টার একটা সহজ মায়া থাকে। ব্রহ্মা ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, তা বটে। কিন্তু এখনই ইহাদের শিবের কাছে পাঠাইলে আমাকে বড়ই হাস্যাস্পদ হইতে হইবে যে ! তা ছাড়া, চিত্রগুপ্তের খাতায় ইহাদের নাম চড়িয়া গিয়াছে, হিসাবে গণ্ডগোল হইবে। নারদ, কোনও উপায়ে ইহাদের বাঁচানো যায় না ?

নারদ দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, আপনার সমস্ত সৃষ্টিই নগ্ন, নগ্নতাই তাহাদের সৌন্দর্য। কিন্তু এই মানুষগুলা ঠিক তাহার বিপরীত। অতএব এক কাজ করুন, উহাদের ওই কুদর্শন দেহ কোনও আবরণ দিয়া ঢাকিয়া দিন। চেহারা ঢাকা পড়িলে হয়তো উহারা রক্ষা পাইতে পারে।

ব্রহ্মা সহর্ষে বলিলেন, ঠিক বলিয়াছ। দাঁড়াও, আমি বস্ত্র সৃজন করিতেছি।

* * * *

অতঃপর সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগ কাটিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মা আরও অথর্ব হইয়াছেন ; তাঁহার সৃষ্টিশক্তি একেবারে লোপ পাইয়াছে। বলা বাহুল্য, মানুষের পর তিনি আর জীব সৃষ্টি করেন নাই।

মানুষ কিন্তু ধীরে ধীরে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া বসিয়াছে। নানাবিধ বস্ত্রের আবরণে দেহের কদর্যতা ঢাকিয়া তাহারা যতই নিজেকে সুন্দর প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, ততই তাহাদের

মনের কদর্যতা একেবারে উলঙ্গ মূর্তি ধরিয়া দেখা দিতেছে। লোভ দম্ভ ও কামুকতার এমন উচ্চ স্তরে তাহারা আরোহণ করিয়াছে যেখানে শৃগাল কুক্কুরাদি ইতর প্রাণীর প্রবেশ অসাধ্য। উপরন্তু এরূপ অসম্ভব বংশবৃদ্ধি করিয়াছে যে পৃথিবীপৃষ্ঠে অন্য জীবের স্থান সঙ্কুলান দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে।

একদিন তিক্ত-বিরক্ত হইয়া পালনকর্তা বিষ্ণু কৈলাসে উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন, শিব নিজের কণ্ঠ হইতে কিঞ্চিৎ হলাহল বাহির করিয়া এক প্রকার নূতন বিষ-বাষ্প তৈয়ারে নিযুক্ত আছেন। বিষ্ণু বলিলেন, শিব, আর তো পারি না। এই মানুষ জাতটাকে পালন করিতে করিতে আমার হাড় কালি হইল। কি করি বল তো ?

শিব কহিলেন, উপবেশন কর এই ঢিবিটার উপর। পালন করাই যখন তোমার কর্তব্য তখন তুমি পালন করিবে না কেন ? এই দেখ, আমি নিজের কাজে লাগিয়া আছি, কেবল ধ্বংস করিতেছি। শীঘ্রই একটা নূতন গ্যাস বাহির করিতে পারিব আশা হইতেছে।

বিষ্ণু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি যদি মন দিয়া নিজ কর্তব্য করিতে তাহা হইলে কি ঐ পাজি নচ্ছার চোর লম্পট দাগাবাজ মনুষ্য জাতিটা বাঁচিয়া থাকিত ! উহাদের দেখিলেই আমার পিত্ত জ্বলিয়া যায় ; এতবড় শয়তান আর ত্রিভুবনে নাই।

শিব সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, সে কথা সত্য। কিন্তু কি করিব ভাই বিষ্ণু, আমি তো চেষ্টার ত্রুটি করিতেছি না। প্লেগ দুর্ভিক্ষ মহাযুদ্ধ ভূমিকম্প—সব দিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, বেটারা মরিয়াও মরে না। অতিকায় হস্তী, ডিনসার, টেরোডাক্টিল, কত বড় বড় জন্তু সাবাড় করিয়া দিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু এই মানুষ জাতটাকে পারিয়া উঠিলাম না। আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, বুড়া বয়সে প্রজাপতির ভীমরতি হইয়াছিল, হয়তো মানুষগুলাকে অমরত্ব বর দিয়া বসিয়া আছেন। জান তো, বুড়া বয়সের সন্তানের প্রতি মমতা বেশি হয়।

বিষ্ণু বলিয়া উঠিলেন, আঁ ! বল কি ? তবে তো আমি গেলাম ! অনন্ত কাল ধরিয়া যদি এই মহা পাপিষ্ঠগুলাকে পালন করিতে হয়, তবে আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি ? তার চেয়ে, শিব, তোমার ত্রিশূলটা বাহির কর। আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।

এই সময় নারদের বীণাধ্বনি শুনা গেল ; তিনি মিহি সুরে একটি গজলাঙ্গ ভাটিয়ালি গাহিতে গাহিতে এই দিকেই আসিতেছেন।

শিব তাঁহাকে ডাকিলেন, নারদ, বড়ই বিপদ। বিষ্ণু আত্মহত্যা করিতে চায়।

নারদ যথাবিধি উভয়ের স্তুতি করিয়া বলিলেন, সে কি কথা ! লক্ষ্মী দেবীর সহিত ঝগড়া হইয়াছে নাকি ?

বিষ্ণু বলিলেন, না। নারদ, তুমি তো ব্রহ্মা-বুড়ার মহা ভক্ত, সর্বদা তাঁর কাছেই ঘুরঘুর কর। বলিতে পার, মানুষকে তিনি অমরত্ব বর দিয়াছেন কিনা ?

নারদ বলিলেন, কই, না, তেমন কিছু তো শুনি নাই। তবে, পাছে উহারা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি কামড়াকামড়ি করিয়া মরে, তাই বস্ত্র সৃজন করিয়াছিলেন।

বিষ্ণু উৎসুকভাবে বলিলেন, কি রকম ? কি রকম ?

নারদ তখন পুরাতন ইতিহাস প্রকাশ করিয়া বলিলেন, শুনিয়া দুই দেবতা উত্তেজিতভাবে পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিতে লাগিলেন। নারদ সেই অবকাশে বীণ বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান করিলেন।

অবশেষে বিষ্ণু বলিলেন, শিব, তোমার ও বিষ-ফিষ রাখ, উহাতে কিছু হইবে না। এস, একটা নূতন চক্রান্ত কর।

নীলকণ্ঠ বিষটুকু পুনরায় মুখে ফেলিয়া বলিলেন, বেশ।

* * *

খ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে য়ুরোপ অঞ্চলে গুটিকয় ন্যুডিস্ট দেখা দিল। ক্রমে এই উলঙ্গ-সঙ্ঘ সংখ্যায় বাড়িতেছে।

শুনিতেছি, ভারতবর্ষেও নাকি দুই-একটি ন্যুডিস্ট-আখড়া খুলিবার ব্যবস্থা চলিতেছে; ডেহরি-অন-শোনের গুজবটা সত্য কিনা বিষ্ণু জানেন। মোট কথা, দেবতাদের চক্রান্ত অগ্রসর হইতেছে।

কিন্তু আর কত দেরি?

প্র· কার্তিক ১৩৪৪

তা তা থৈ থৈ

ভোম্বলদা'র সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নাই। তিনি আমাকে ভালোবাসেন, কিন্তু পছন্দ করেন না। অপছন্দর কারণ, তিনি সঙ্গীতবিদ্যার উপর হাড়ে চটা এবং আমি সুরধুনী গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানীর প্রচারসচিব। সুরধুনীর নাম অবশ্য আপনারা সকলেই জানেন।

ভোম্বলদা'র বয়স চল্লিশ, সুবিপুল দেহ। ছেলেবেলা হইতে মোটা বলিয়া তিনি লজ্জায় বিবাহ করেন নাই। গ্রামোফোন এবং রেডিওর ভয়ে তিনি শহর ছাড়িয়া এমন একটি রাস্তার উপর বাড়ি করিয়াছেন যেখানে দু'মাইলের মধ্যে লোকালয় নাই। কিন্তু ভোম্বলদা খাইতে এবং খাওয়াইতে ভালবাসেন। তাই মাঝে মাঝে তাঁহার জন্য আমার মন কেমন করে।

শনিবার বিকালবেলা আমার পাঁচ ঘোড়ার গাড়িতে (ফিয়াট ৫) চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম, ইচ্ছা ছিল হপ্তান্ত কাটাইয়া একেবারে সোমবার সকালে কলিকাতায় ফিরিব।

নির্জন রাস্তার ধারে পাঁচিল-ঘেরা জমির মাঝখানে ছোটখাটো দোতলা বাড়ি। ফটকের সামনে ছিরু অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে। ছিরু একাধারে ভোম্বলদা'র ভৃত্য পাচক গৃহিণী সচিব। আমাকে দেখিয়া ছিরুর শ্রীহীন মুখ একটু উজ্জ্বল হইল, সে তাড়াতাড়ি ফটক খুলিয়া দিতে দিতে বলিল, 'বাবু এসেছেন— বাঁচলাম।'

'কি খবর ছিরু?'

'আজ্ঞে খবর ভাল নয়।'

গাড়ি থামাইয়া বাহির হইলাম, 'ভাল না। দাদার কি শরীর খারাপ নাকি? জ্বরজ্বারি?'

ছিরু বল্‌লে, 'আজ্ঞে জ্বরজ্বারি নয়। বাবু নাচ্‌ছেন!'

চমকিয়া গেলাম। ভোম্বলদা নচিতেছেন! চল্লিশ বছর বয়সে ওই জলহস্তীর ন্যায় শরীর লইয়া নাচিতেছেন! কিন্তু কেন?

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'নাচছেন কেন? কোনও সুখবর পেয়েছেন নাকি?'

ছিরু বলিল, 'সুখের কোথায় বাবু? পরশু সন্ধ্যাবেলা পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, ফিরে এসে নাচ্‌তে শুরু করেছেন। এখনও চলছে।'

'বল কি! এ তো ভাল কথা নয়।'

হঠাৎ মনে হইল, বুড়া বয়সে ভোম্বলদা প্রেমে পড়েন নাই তো! প্রেমে পড়িলে নাকি নানা প্রকার স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। দাদা পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন, কোনও আধুনিকা তরুণীকে দেখিয়া ফেলা বিচিত্র নয়। কিন্তু দাদার মত নর-পুঙ্গবকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে এমন তরুণী বাংলাদেশে আছে কি? দাদার দেহে যে ওজনের মেদ-মাংস আছে তাহাতে স্বচ্ছন্দে দু'টা মানুষ হয়, সুতরাং দাদাকে বিবাহ করিলে দ্বিচারিণী হওয়ার আশঙ্কা। এইরূপ কলঙ্ক কোনও বাঙ্গালীর মেয়ে বরণ করিয়া লইবে না! তবে দাদার এত নাচ কিসের জন্য?

যাহোক চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করা প্রয়োজন। দোতলায় উঠিয়া দাদার ঘরে প্রবেশ করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহার জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখা সত্ত্বেও তাক্ লাগিয়া গেল।

দাদা নাচিতেছেন। দাপাদাপি লাফালাফি নাই, থুপ্ থুপ্ করিয়া কুমড়ো পটাশের মত নাচিতেছেন। নৃত্যের তালে তালে চিবুক হইতে নিতম্ব পর্যন্ত মেদ-তরঙ্গ হিল্লোলিত হইতেছে; হাতদুটি ভঙ্গিমাভরে একটু লীলায়িত হইতেছে—

কিন্তু দাদার মুখে আনন্দ নাই। নিতান্তই যেন অনিচ্ছাভরে নাচিতেছেন, না নাচিয়া উপায় নাই তাই নাচিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহার মুখের গাম্ভীর্য গাঢ় হইল। তিনি আমার দিকে

পিছন ফিরিয়া নাচিতে লাগিলেন।

ভাবনার কথা। দুশ্চিন্তার কথা। ইহা নিশ্চয়ই কোনও প্রকার রোগ। কিন্তু প্রেম-রোগ নয়; প্রেম-রোগ হইলে মুখে হাসি থাকিত, চোখে চটুল কটাক্ষ থাকিত। কিন্তু রোগটা কী?

আমি সতর্কভাবে দুই চারিটা প্রশ্ন করিলাম, দাদা কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। নাচিয়া চলিলেন। লক্ষ্য করিলাম, তিনি তালে নাচিতেছেন। তাললয়ের সহিত তাঁহার সুবাদ ছিল না, অথচ অবলীলাক্রমে খেম্‌টা তালে কী করিয়া নাচিতেছেন বুঝিতে পারিলাম না। ভূত-প্রেত স্কন্ধে ভর করে নাই তো!

এই সময় ছিরু আমাদের জন্য চা-জলখাবার লইয়া প্রবেশ কবিল। দেখিলাম দাদা নৃত্যে বিরাম না দিয়া কচুরি-সিঙ্গাড়া উদরসাৎ করিলেন, এক চুমুকে চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। আর যাহাই হোক, ক্ষুধার কোনও অপ্রতুল নাই। এটা ভাল লক্ষণ বলিতে হইবে।

আমি আরও কয়েকবার তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার চেষ্টা করিলাম; তিনি উত্তর তো দিলেনই না, শেষে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাকে দরজা দেখাইয়া দিলেন।

নীচে নামিয়া আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিলাম, কী কবা যায়! একটা লোক অকারণে ক্রমাগত নাচিয়া চলিয়াছে, চোখে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকা যায না। পক্ষাঘাতের পূর্বলক্ষণ কি না কে বলিতে পারে? স্থির করিলাম ডাক্তার ডাকিয়া আনিব।

কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া এক ডাক্তার বন্ধুকে ধবিয়া আনিলাম। ডাক্তার দেখিযা ভোম্বলদা আরও বিরক্ত হইলেন কিন্তু নাচ থামাইলেন না। ডাক্তার সেই অবস্থাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিল, নাড়ী দেখা ও বুকে স্টেথস্কোপ লাগাইবার সময় ডাক্তাবকেও দাদার সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে হইল।

পরীক্ষা শেষ করিয়া গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায় ডাক্তার বাহিরে আসিয়া বলিল, 'রোগ তো কিছু দেখলাম না। নার্ভাস ব্রেকডাউন নয়। নাড়ী চমৎকার চলছে। হৃদযন্ত্র ইঞ্জিনের মত মজবুত।'

'তবে নাচছেন কেন?'

'ভগবান জানেন। তুমি বরং মনোবিৎ ডাক্তার এনে দেখাও, ওরা হযতো হদিস দিতে পারবে।'

রাত্রি হইয়া গিয়াছিল, ডাক্তার বন্ধুকে লইয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। পরদিন সকালে একজন মনোবিৎ ডাক্তার লইয়া আসিলাম। ভোম্বলদা অনেক মুর্গী মটন খাওযাইয়াছেন, তাঁহার জন্য এটুকু না করিলে মনুষ্যত্ব থাকে না।

মনোবিৎ দাদার ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর ঘণ্টাখানেক আর তাঁহাদের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আমি নীচে বসিয়া ছিরুর তৈরি গবম গরম নিমকি ও পান্তুয়া খাইয়া সময় কাটাইলাম।

মনোবিৎ যখন নামিয়া আসিলেন তখন তাঁহার মুখ গম্ভীর। বলিলেন, 'মনের অসুখই বটে। গভীর একটা কম্‌প্লেক্স্ তৈরি হয়েছে। সারাতে সময় লাগবে।'

'তাই নাকি? কি রকম কম্‌প্লেক্স?'

'একেবারে আদিম কম্‌প্লেক্স। অনেক কষ্টে ওঁর মুখ থেকে একটি কথা বার করেছি। তা থেকে মনে হয়—'

'কী কথা বার করেছেন?'

'ঠমকি ঠমকি নাচে রাই।'

'ঠমকি ঠমকি নাচে রাই।'

'হ্যাঁ। যে প্রশ্নই করি, একমাত্র উত্তর— 'ঠমকি ঠমকি নাচে রাই।'

আমার মাথায় বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। ডাক্তার বলিয়া চলিলেন, 'আসল কথা উনি নিজেকে

স্ত্রীলোক মনে করছেন। মগ্নচৈতন্যে অবরুদ্ধ বাসনা যখন গভীরভাবে আলোড়িত হয়—'

বলিলাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর বলতে হবে না।—আচ্ছা, মনে করুন, কেউ গান-বাজনা পছন্দ করে না ; সে যদি হঠাৎ এমন একটা গান শোনে যা তার কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে—সে তখন কী করবে ?'

মনোবিৎ বলিলেন, 'নিজের মনকে নিগৃহীত করবার চেষ্টা করবে।'

'এবং— ?'

'এবং তার ফলে গুরুতর স্নায়বিক রোগ হতে পারে।'

'ব্যস্—বুঝেছি। চলুন এবার আপনার চিকিৎসার দরকাব নেই, আমিই দাদার রোগ সাবাব।'

মনঃক্ষুণ্ণ মনোবিৎকে ফিরাইয়া লইয়া গেলাম। তারপর একটি গ্রামোফোন ও একটি রেকর্ড লইয়া দাদার কাছে ফিরিযা আসিলাম।

দাদার ঘরের বন্ধ দরজায় কান পাতিয়া শুনিলাম ভিতরে থুপ থুপ শব্দ হইতেছে। তখন দরজার বাহিরে গ্রামোফোন রাখিয়া দম দিয়া রেকর্ড বাজাইয়া দিলাম। নৃত্য-লীলায়িত সুর বাজিয়া উঠিল—

ঠমকি ঠমকি নাচে রাই—

কিছুক্ষণ পরে দরজা একটু ফাঁক করিয়া দাদা উঁকি মারিলেন। তাঁহাব মুখে বিস্ময়াহত উত্তেজনা ; নাচ থামিযাছে। বেকর্ড শেষ হইল, তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, 'আবার বাজাও।'

আবাব বাজাইলাম। দাদা গ্রামোফোনের কাছে চ্যাপ্‌টালি খাইয়া বসিযা দু'হাতে তাল দিতে লাগিলেন। মুখে তন্ময় ভাব।

আবও তিন চারিবার রেকর্ড শুনিবাব পর দাদা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন ; আমাকে জাপটাইযা ধরিয়া বলিলেন, 'ভাইবে, তুই আমায় রক্ষে কবেছিস।'

আলিঙ্গনেব নিগড হইতে মুক্ত হইয়া বলিলাম, 'কী হযেছিল দাদা ?'

দাদা বলিলেন, 'সেক্সপীয়ার ঠিকই বলেছেন, যে-লোক গান ভালবাসে না সে মহাপাষণ্ড। আমার এবার আক্কেল হযেছে।'

'কিন্তু কি কবে আক্কেল হল ?'

দাদা তখন আক্কেল হওয়ার কাহিনী বলিলেন। সেদিন হজম বাড়াইবার জন্য দাদা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি স্টেশনের কাছে উপস্থিত হন। হঠাৎ একটা রেস্তোরাঁ হইতে রেকর্ডের গান তাঁহার কর্ণপটাহ বিদ্ধ করিল। গান-বাজনায তাঁহার দারুণ অরুচি, তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়িব দিকে ফিরিলেন।

কিন্তু সুরটা তাঁহার কানে লাগিয়া বহিল—ঠমকি ঠমকি নাচে রাই। তিনি উত্যক্ত হইযা উঠিলেন এবং জোর করিয়া সুবটাকে মন হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

বাড়ি ফিরিবার পর তাঁহার মাথার মধ্যে কি যেন একটা ঘটিয়া গেল। অদম্য নৃত্যস্পৃহা তাঁহার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইল। তিনি নাচিতে লাগিলেন, কিন্তু কেন যে নাচিতেছেন তাহা বুঝিতে পাবিলেন না।

তাবপর এখন রেকর্ড শুনিয়া সব বহস্য তাঁহার কাছে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। গানের তুল্য জিনিস নাই, ফ্রেঞ্চ ফাউল কাটলেট্ ইহার কাছে তুচ্ছ।

কাহিনী শেষ করিয়া ভোম্বলদা আবেগভরে বলিলেন, 'ভাইরে, এতদিন যে পাপ করেছি এবার তার প্রায়শ্চিত্ত করব। এমন রেকর্ড যে তৈরি হয় আমি জানতাম না। তোর গ্রামোফোন আর রেকর্ড রেখে যা। আমি বাজাব।'

উপরের কাহিনী কেহ যদি বিশ্বাস না করেন তাঁহাকে একখানি 'ঠমকি ঠমকি রেকর্ড' কিনিয়া শুনিতে অনুরোধ করি। গানের নম্বর— পি ০০০১৫, বলা বাহুল্য ইহা স্বনামধন্য সুরধুনী রেকর্ড কোম্পানীর নবতম অবদান। যদি এ গান শুনিয়া নেশা না হয়, নেশায় মাতোয়ারা হইয়া নাচিতে ইচ্ছা না করে, তবে যা লিখিলাম সব মিথ্যা।

প্র· ১৩৬০

চিঠিপত্র

যোগেশচন্দ্র রায়

Bankura
19.5.47
(Bengal)

সবিনয় নিবেদন,

৬ই তারিখে আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনার পত্রে তারিখ দেন নাই, কবে লিখিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। নানা কারণে উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, এখানে এখন এত গ্রীষ্ম যে চিঠি লিখিতেও আলস্য আসে।

আমি জানিতাম আপনার নামে এক গল্পলেখক আছেন ; কিন্তু জানিতাম না তিনি মুম্বই প্রবাসী এবং তিনি জ্যোতিষ চর্চা ও আর্যকৃষ্টির প্রাচীনতা অনুসন্ধান করেন। আমাদের শিক্ষিত সমাজের অল্প কয়েকজন আর্যকৃষ্টির কাল অনুসন্ধান করেন। আপনাকে একজন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

"অশ্বিনীর আদিবিন্দু" নামে প্রবাসীতে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম অনেকদিন পূর্বে, পৃথক ছাপা হয় নাই—"First point of Aswini" নামক পুস্তিকা প্রবাসী প্রেসে ছাপা হইয়াছিল ; সেখানে পাওয়া যায়। এই দুয়েরই উদ্দেশ্য এক। দেখাইয়াছি ৩১৯ খ্রিষ্টাব্দে যে বিন্দুতে বসন্ত বিষুব সংক্রামণ হইয়াছিল, অশ্বিনী নক্ষত্রভাগের আরম্ভ সেই বিন্দুতে।

গত বৎসরের প্রবাসীর আষাঢ়, শ্রাবণ আশ্বিন সংখ্যায় বিষ্ণুর চারি দিব্য অবতাব ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম, তদনন্তর কার্তিক হইতে চৈত্র পর্যন্ত ছয় মাস—দুর্গোৎসব তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছি। এই নয় মাসের প্রবাসী আপনি পড়িবেন, আপনার অনুসন্ধানেব সাহায্য হইবে ; এবং কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরও পাইবেন।

খ্রি-পূর্ব ২৫০০ অব্দে যজুর্বেদের কালে কৃত্তিকাদি নক্ষত্র গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। কৃত্তিকার সেই আদি চলিতে থাকিলে খ্রি-পূর্ব ৪০০ অব্দে সে গণনার সমাপ্ত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই—৩১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। ইহার কারণ এই—খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫০ অব্দে জ্যোতিষীরা দৃশ্যনক্ষত্র স্থানে অদৃশ্য নক্ষত্রভাগ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আমি First point of Aswini-তে দেখাইয়াছি—খ্রিষ্ট-পূর্ব ১৮৪১ অব্দে নক্ষত্রভাগ আরম্ভ হইয়া অদ্যাবধি সেই ভাগ চলিতেছে।

আমি ফলিত জ্যোতিষ শিক্ষা করি নাই—কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তর সোজা। কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্র গণনা হইয়াছে ইহা সত্য, তেমনি সত্য ৩১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই গণনা ছিল। অতএব বলিতে পারি না খ্রি-পূ ১৮৪১ অব্দে নাক্ষত্রিকী দশা গণনা আরম্ভ হইয়াছে। ২১০০ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময় হইতে পারিত। অতএব কৃত্তিকা দ্বারা ফলিত জ্যোতিষের প্রাচীনতা প্রমাণ হইতে পারে না।

নক্ষত্রচক্র ভারতীয়। আমার মতে যখন রোহিণী তারায় বসন্ত বিষুব হইত তখন রবিপথের কতকগুলি নক্ষত্র নিরূপিত হইয়াছিল। খ্রি-পূ ৩২৫৬ অব্দের কথা। সেই সময় কিম্বা কিছু পরে অভিজিৎ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরিত্যাগের কারণ এই। অভিজিৎ ও শ্রবণার right ascension-এ অন্তর অল্প হইয়াছিল, যাম্যোত্তর বৃত্তে ২০ মিনিটের মধ্যে একের পর অন্য আসিত। অভিজিৎ দূরে অবস্থিত, এই হেতু অভিজিৎ গেল, শ্রবণা রহিল।

বৎসর বার ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। মধু মাধব আদি বার নামে বার ভাগ জ্ঞাপিত হইত। কিন্তু মেষ বৃষাদি রাশি নাম বিদেশী—ব্যাবিলোনিয়া হইতে আগত। ক্রিয়, তাব্বুরি (?) নাম ইহার সাক্ষী। বরাহমিহিরের পূর্বে এদেশে রাশিচক্র আসিয়াছে। যদি ফলিত জ্যোতিষ বলিতে জাতক গণনা ধরি তাহা হইলে, যখন মেষ আদি এবং মেষাদি ও অশ্বিন্যাদি এক, তখন জাতক

গণনা প্রাচীন হইতে পারে না।

প্রথমে গ্রহের রাশি সঞ্চার গণনা ছিল। তৎপূর্বে কোন্ গ্রহ কোন্ নক্ষত্রে এইরূপ গণনা ছিল। জ্যোতিষ সংহিতা নামে এক বৃহৎ শাস্ত্র ছিল। বরাহের বৃহৎ সংহিতায় তার কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়।

আমি বহুদিন পূর্বে 'ভারতবর্ষে' ভারতযুদ্ধ কাল নির্ণয় করিয়াছি। যুগ গণনা দ্বিবিধ—দৈব যুগ ও মানুষ যুগ। লোকে মানুষ যুগ ভুলিয়া গিয়াছে। মানুষ দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধি সময়ে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। গত বৎসরের ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে সংক্ষেপে লিখিয়াছি। আষাঢ় মাসের প্রবাসীতেও মানুষ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির আরম্ভ নির্দেশ করিয়াছি।

যদি আপনার আর কোনও জিজ্ঞাস্য থাকে আপনি স্বচ্ছন্দে লিখিবেন। যেটুকু জানি উত্তরে পাইবেন।

ইতি
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

২

Bankura (Bengal)
14.7.47

সবিনয় নিবেদন,

আমার পোষ্টকার্ড পাইয়া থাকিবেন। আমার লেখক পদত্যাগ করিয়াছেন, পূজার এদিকে নূতন কাহাকেও পাইবার আশা নাই।

আমি আপনার "জাতিস্মর" মনোযোগ করিয়া পড়িয়াছি। আপনাকে অনেক বই পড়িতে হইয়াছিল। আপনি কি বহুকাল বঙ্গের বাহিরে, যেমন বিহারে কাটাইয়াছেন ? দুর্গ তৈয়ার, পিষ্টক তৈয়ার, নূতন শোনাইতেছে। হিন্দী ও মারাঠীতে তৈয়ার যত আছে বাংলায় তত নাই, হিন্দুদের মধ্যে কদাচিৎ আছে। "কাঠের পরাতের উপরে ময়দা" (৭৪ পৃ)। উপরে হইতে পারে না, 'পরাতে' হইবে। পরাত হিন্দী শব্দ, পিতলের বড় থালা। কাঠের বলিতে পারি না। বোধহয়, বারকোশ অভিপ্রেত ছিল। "পাথরে পাথরে" ঠোকাঠুকি করিলে আগুন বাহির হইবে না, একটা কঠিন পাথর অপর একটা কঠিনতর পাথর দিয়া ঠুকিলে আগুন বাহির হয়। সং টিক ধাতু হইতে বাং টেকা (টেঁকা নয়), সং প্রতিষ্ঠা হইতে বাং পইঠা (পঁইঠা, পৈঁঠা নয়)।

"পিষ্টক পুরোডাশ"—পুরোডাশ পিষ্টক বিশেষ, যজ্ঞীয় পিষ্টক, পিষ্টক ও পুরোডাস বলিতে পারি না। 'শানিয়া' হিং সান্না, বাঁকুড়ায় শুনি, অন্যত্র প্রচলিত আছে কি না সন্দেহ। স্নায়ু দ্বারা ধনুর গুণ হইত। কিন্তু সে স্নায়ু আর উত্তেজিত স্নায়ু এক নয়। ধূমকেতু কৃষ্ণ বর্ণ ! তাহার পুচ্ছ উড়িতে থাকে ? এক দ্রোণ আসব—আমাদের পাঁচ ছয় সের। 'হিঙ্গুল রঞ্জিত' বিশ্বাস হয়না, হিঙ্গুল বর্ণ হইতে পারে। লোধ্র পুষ্প গন্ধহীন। লোধ্র বল্কল ও চিত্রকের মূল অগ্নিদীপন, ঔষধার্থে আসবে দেওয়া যাইতে পারে। স্থপতি architect দুই এক পাওয়া যাইতে পারে। সূত্রগ্রাহী বা সূত্রধব engineer শত শত হইতে পারে না। ভাস্কর নূতন নাম, সে কালে ছিল না।

জাতিস্মরের প্রশংসা হইয়াছে। সমালোচকেরা গল্প বা কাহিনী মুখ্য মনে করিয়াছেন, আপনার পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে। তত্তৎ কাল মুখ্য না হইলে আরবোপন্যাস ছিল। প্রাচীন কাল জানাইবার জন্য নায়ক নায়িকার নাম ধাম কর্ম প্রাচীন রাখিয়াছেন। ভাষার শব্দ সংস্কৃত কিম্বা

সংস্কৃতমূলক, ঠিক হইয়াছে। এরূপ শব্দের মাঝে যাবনিক শব্দ পরিবর্জনীয়। 'মুণ্ড সর্ত' 'যুদ্ধের হাঙ্গামা', 'তামাশা', 'মালমশ্‌লা', 'তৈয়ার' ইত্যাদি আধুনিকত্ব ঘটাইয়াছে। আশা করি আমার মন্তব্য আপনার কাজে আসিবে।

ইতি
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

৩

Bankura, Bengal
27. 7. 47

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ১৯শে জুলাই তারিখের পত্র পাইয়াছি। দৈবাৎ এক লেখিকা পাইলাম, তাহাকে দিয়া এই উত্তর লিখাইতেছি।

আমি "জাতিস্মর" মুদ্রিত সমালোচনাগুলি পড়িয়াছি, প্রীত হইয়াছি। এই কারণে আমি নূতন করিয়া প্রশংসা করি নাই। কিন্তু মনে হইয়াছে 'প্রবাসীর' সমালোচক আপনার কৃতিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। আপনি পুরাতনকে পুরোবর্তী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া কাহিনী রচিয়াছেন।

আমি সেকেলে মানুষ, একটু খুঁত্‌-খুঁত্যে। পুরাতনের সহিত নূতনের সংযোগ ঘটিলেই পুরাতনের মায়া ছিন্ন হয়। এই কারণে প্রথমে ভাষা, তারপর তথ্য বিচার করিয়াছি, সমুদায় লিখিতে পারি নাই। আপনি দক্ষ লেখক, আপনার শব্দসম্ভার অন্যের রচনায় অল্পই দেখিতে পাই, একটু সাবধান হইলে সমগুরু শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিতেন। বাংলা ভাষায় বহু যাবনিক শব্দ প্রচলিত আছে, কিন্তু হিন্দুর রচনায় অতি অল্প দেখিতে পাই। "জাতিস্মরে" যাবনিক শব্দের প্রবেশ কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

আপনার পত্রে কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিতেছি। আপনি কোন্ অভিধান এবং কাহার অভিধান দেখিয়াছেন ? পরাত বাংলা শব্দ নয়। হিন্দী অভিধান দেখিলাম, পিতলের বড় থালা, কলিকাতায় বিক্রয় হয়।

আপনার অভিজ্ঞতা স্বীকার করি, কিন্তু দুইটা পাথর লইয়া ঠোকাঠুকি করিয়াছিলেন কি ? 'ঠোকাঠুকি', যেমন মারামারি। একটা পাথর দ্বিতীয়টাকে ঠুকিবে, দ্বিতীয়টা প্রথমকে ঠুকিবে।

'পুরোডাশ' শব্দ হইতে পরোটা আসিয়াছে ? পরোটা শব্দ বাংলায় নূতন। আমার মনে হয় পরতে পরতে 'রোটি' থাকে বলিয়া নাম পরোটা হইয়াছে। এই অনুমান ঠিক হউক আর না হউক বহুকাল হইতে পুরোডাশ অজ্ঞাত হইয়া আছে। বৈদিক পুরোডাশ কিম্বা তৎতুল্য কোন পিষ্টক 'ভাব প্রকাশ' নামক আয়ুর্বেদ গ্রন্থে (16th Century) পাই নাই। কয়েকখানি খোলা গায়ে গায়ে রাখিয়া পুরোডাশ পাক করা হইত। ব্রীহির পুরোডাশ হইত। ঘিয়ে ডুবাইয়া রাখিতে হইত। এক একখানা এত বড় হইত যে দুই তিন জনে খাইত। কোন বেদজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট পুরোডাশ পাকের বিধি শুনি নাই। আমি মনে করি, আমাদের আশুকা পিঠা (আশ্‌কে পিঠে) 'পুরোডাশ'। ব্রীহি আশু ধান্য। আশুকা পিঠা করিতে দেখিয়া থাকিবেন।

'জাতিস্মরে' প্রাচীনকালের বৃত্তান্ত আছে। 'স্থপতি' শব্দ পুরাতন ভাবিতে হইবে। শিল্প-শাস্ত্রে, স্থপতি architect, বহুগুণান্বিত। সূত্রগ্রাহী, তক্ষক ও বর্দ্ধকী, এই তিন শিল্পী স্থপতির আজ্ঞাধীন থাকিত।

দ্রোণের পরিমাণ নানাবিধ ছিল। কৌটিল্যের দ্রোণ আমাদের ৫/৬ সের। চারি আঢ়কে এক দ্রোণ। আমি বহুকাল পূর্বে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' পড়িয়াছিলাম। ভুলিয়াও গিয়াছিলাম। এখন কৌটিল্যে দেখিতেছি সামান্য আসব করিতে হইলে ফাণিত (ঝোলা-গুড়) ও মধু আবশ্যক হইত। আসবে কিণ্ব আবশ্যক হয় না। স্বাদের নিমিত্ত 'কপিত্থ' দেওয়া হইত। আসবকে সুস্বাদু, সুগন্ধ ও শরীরের হিতকর করিতে হইলে, তাহাতে নানাবিধ সম্ভার (উপকরণ, 'ভাবপ্রকাশে' নামে বীজদ্রব্য) প্রক্ষিপ্ত হইত। কৌটিল্য কয়েকটির নাম করিয়াছেন, যথা—দারুচিনি, চিত্রক, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, গুবাক, মধুক (মউল), মুথা এবং লোধ্র। এই সকল সম্ভারের মধ্যে আপনি দুইটি লইয়াছেন। আপনি লোধ্র বল্কলের পবিবর্তে লোধ্র পুষ্পরেণু মনে করিয়াছেন। লোধ ছাল ও চিতামূল ধারক, চিতামূল অগ্নিদীপন। দুই এর গন্ধ নাই, বিশেষ স্বাদও নাই। 'হিঙ্গুল' ও চীনাসিন্দূব একই দ্রব্য। জলে দ্রব হয় না। খাইলে বিষক্রিয়া হয়। মধুকযোগে 'আসব' ঈষৎ রক্তবর্ণ হইবে। ফাণিত ও মধু সন্ধিত (fermented) হইলে আরক্তবর্ণ আসব উৎপন্ন হয়।

আবও অনেক কথা আছে। হর্ষাতিশয্যে স্নায়ু (বাতনাড়ী) ছিন্ন ও ক্ষুণ্ণ হইবে না। মস্তিষ্কের শিরা ছিন্ন হইতে পাবে। 'সোমলতার তুল্য উজ্জ্বল কেশজাল'। 'সোমলতা' কোন্ লতা? আয়ুর্বেদের সোমলতা পত্রহীন, আপীত, পরজীবী। এই সোমলতা উজ্জ্বল হইতে দেখি নাই। বর্বরদিগের 'বিহি' শব্দ সংস্কৃত ব্রীহি শব্দ হইযাছে মনে করেন কি? আমি পড়িযাছিলাম এক বাঙ্গালী গবেষক এই ব্যুৎপত্তি কবিয়াছেন। আমি মানি না।

কয়েকটি বৃত্ত কালবিরোধী হইয়াছে। বৌদ্ধজাতকে দেখিয়া থাকিবেন তৎকালে নক্ষত্রসূচকেরা নক্ষত্র দেখিযা শুভাশুভ ফল গণনা করিত। তৎকালে রশিচক্র ছিল না। মনুসংহিতায় ঈক্ষণিকেরা করতলাদির বেখা দেখিয়া ভাগ্য গণনা করিত। সমুদ্র নামে এক বিখ্যাত ঈক্ষণিক ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে সামুদ্রিক শাস্ত্র হইয়াছে।

ষোল শত বৎসর পূর্বে বেহাগ রাগিণীতে মধ্যরাত্রি জ্ঞাপিত হইত আমি কোথাও পড়ি নাই। বাঁশীতে মালকোষাদি রাগিণী আলাপ করিযা সঙ্কেত প্রচারও শুনি নাই। পারাবত দ্বারা দূরে বার্তা প্রেবণ, দীপসঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেতকরণ, রাজমহিষীর আহতসেবা, দাসী সঙ্গে না লইয়া একাকিনী মহিষীর বহির্গমন ইত্যাদি পড়িলে পাঠক মনে করিবেন তৎকালে এসব ছিল। বিনা প্রমাণে লিখিয়াছেন কিনা বুঝিতে পারিলাম না। বাৎস্যায়ন কিম্বা আর্যাচ্ছন্দ হইতে 'জঘনচপলা' শব্দ লইয়া থাকিবেন, কিন্তু কোন নারী এই নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিত কি? 'চপলা' নামই যথেষ্ট।

আমি এই পত্রে যে যে তর্ক তুলিয়াছি, সহস্র পাঠকের মধ্যে একজনেরও মনে উঠিবে কিনা সন্দেহ। তাহারা শব্দ বুঝিয়া গল্প পড়ে না, 'তাবপর কি' খুজিতে থাকে (সংস্কৃত খুজ ধাতু হইতে বাংলা খুজ ধাতু আসিয়াছে, আনুনাসিক নাই)। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া। তরুণ তরুণীরা পড়িয়া কিছু শিখিবে কিনা সন্দেহ, তথাপি গল্পচ্ছলে যদি কিছু শিখাইতে পারেন এই আশায় তর্ক তুলিয়াছি। কতকগুলি পুরাতন শব্দের অর্থ দিয়াছেন কিন্তু যথেষ্ট হয় নাই। 'স্থানীয়' কয়জন বুঝিবে। 'বিট' 'পীঠমর্দ' প্রচলিত শব্দ নয় ('বিট'কে দুর্গদ্বার রক্ষার ভার দেওয়া হইয়াছিল বিশ্বাস হয না)। 'ইন্দ্রকীলক' কপাটের খিল। 'পরিখ' দ্বারের হুড়কা। 'ইন্দ্রকোশ' আশ্রয়গৃহ। 'নবপত্রিকা' লিখিয়াছেন প্রস্তরশিল্প, আমি জানিতাম না।

আপনি 'বিষকন্যা' আমার পাঠের নিমিত্ত পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি বইখানি ছোট হয় পাঠাইবেন। নাম হইতে বুঝিতেছি 'বিষকন্যা' সেকালের 'বিষকন্যা'। তর্কের কথা থাকিবার সম্ভাবনা।—খুঁত্-খুঁত্যে মানুষের দোষই এই, অল্পে তুষ্ট হয় না। বয়োধর্মে আমি ক্ষীণশক্তি, ক্ষীণদৃষ্টি ও ক্ষীণস্মৃতি হইয়া পড়িয়াছি। আমার নূতন পুস্তক পাঠের অবসর অতি অল্প। তথাপি চেষ্টা করিয়া দেখিব। আমি অতি অল্প উপন্যাস পড়িয়াছি। ৪/৫টি গল্পের অধিক মনে নাই।

আমার কাছে 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ' আসে, পাতা উল্টাইয়া দেখি লেখক ও পাঠক কি চান। বর্তমানে বঙ্গ বিভাগে আমাদের চিত্ত পরিণাম-চিন্তায় পূর্ণ রহিয়াছে। আপনি দূরে আছেন, বঙ্গের অবস্থায় বিচলিত হইবার উত্তেজনা পান নাই। আপনি মুঙ্গেরে ছিলেন। সেখানকার শ্রীঅবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়কে চিনিতে পারেন। সম্প্রতি তিনি এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট্। তিনিও সাহিত্যপ্রিয় আর অতিশয় বিনীত। দেখিতেছি মুদ্‌গগিরির গুণ আছে।

ইতি
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

৪

Bankura Bengal
13.8.47

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র ও বিষকন্যা পুস্তক পাইয়াছি। আপনি এবারও পত্রের তারিখ লিখেন নাই। বিষকন্যা পড়িতে পারিত কিনা বলিতে পারি না। আমার অবসর অতি অল্প। তিন ঘণ্টার অধিক নয়। দৈনিক সংবাদপত্র পড়িতেই কাটিয়া যায়। পড়িতে সময় লাগে।

আশুতোষ দেবের অভিধান ও চলন্তিকা বাঙ্গালা অভিধান, আশুতোষ দেবের অভিধানের নূতন সংস্করণ বৃহৎ। আমি শব্দের অর্থ বিচার করিয়া দেখি নাই। সংস্কৃত শব্দের পুরাতন অর্থ বাঙ্গালা অভিধানে প্রায় থাকে না। আপনি জাতিস্মরে সংস্কৃত শব্দ পুরাতন সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সে অর্থ সংস্কৃত কোষে পাওয়া যাইবে। আমি শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত বাঙ্গালা অভিধানের একখণ্ড দেখিয়াছিলাম। মনে পড়িতেছে তাহাতে সংস্কৃত শব্দের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অর্থ আছে। পৃথক লেখা আছে কিনা স্মরণ হইতেছে না। আমার কাছে দুইখানি সংস্কৃত অভিধান থাকে। (১) গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কৃত শব্দসার, (২) মারাঠী বামন শিবরাম আপ্টে কৃত Sanskrit-English Dictionary, অল্পের মধ্যে শব্দসার ভাল। আপ্টের Dictionaryতে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শামশাস্ত্রী কৌটিল্যের দ্রব্য নির্ণয়ে অনেক ভুল করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান, বিষয়জ্ঞান, ও দ্রব্যজ্ঞান এই ত্রিবিধ জ্ঞানযোগ না হইলে কৌটিল্যের সকল প্রকরণের সম্যক শুদ্ধ জ্ঞান হইতে পারে না।

বাঙ্গালা ভাষায় যাবনিক শব্দ আছে। স্থান বিশেষে ও বিষয় বিশেষে ব্যবহার করিতেই হইবে। কিন্তু জাতিস্মরে নয়। কারণ পুরাতন 'আবহাওয়া' রাখিতে হইবে। আপনার সোমলতা ঠিক। আমি এই সোমলতার উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু সোমলতা দোড়ীর মত স্থূল, তেমন উজ্জ্বল নয়। ইহার বাং নাম আলখলতা। যেহেতু ভূমিতে অলগ্ন। সোমলতা যেহেতু চন্দ্রবৎ আপীত বর্ণ ইহার অপর নাম সোমা। অতি অল্প লোক এই দুই নাম শুনিয়াছে। আঢক লেখাই উদ্দেশ্য ছিল। আশুকিয়া শব্দ হইতে আশ্‌কে (পিঠা) আসিয়াছে। আশুকা লেখা ভুল হইয়াছিল।

ছত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি। তখন প্রকৃতিবাদ অভিধান সমাদৃত হইত। এই অভিধানে ২৭০০০ শব্দ ছিল। তন্মধ্যে প্রায় ৮০০ শব্দ দেশজ নামে অভিধানে লিখিত হইয়াছে। দীনেশচন্দ্র সেন গণনা করিয়াছিলেন। তখন আমার বাং শব্দকোষ রচিত হয় নাই। আমার বাং ভাষা গ্রন্থে প্রথম ভাগে ব্যাকরণ। ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছিলাম

এই সকল দেশজ শব্দে(র) পনর আনা সংস্কৃত মূলক। এক পাই কি দুই পাই যাবনিক, এবং এক পাই কি দুই পাই দেশজ। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশের অভিধান দেখিয়া বলিয়াছিলেন, (ঠিক মনে পড়িতেছে না) শতকে সংস্কৃত সম শব্দ ৭৫, সংস্কৃত ভব শব্দ ২০, অবশিষ্ট ৫ যাবনিক পোর্তুগীজ ইংরেজি ইত্যাদি। আমার বাং ব্যাকরণ ও শব্দকোষ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বহুকাল অপ্রাপ্য হইয়া রহিয়াছে। শব্দকোষ প্রথম বাং কোষ। খাঁটি বাংলা শব্দ ধরিয়াছি। অনেক ভুলও করিয়াছি।

ইতি
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

৫

Bankura, Bengal
17.10.47

সবিনয় নিবেদন,

আপনার বিষকন্যা বইখানি পড়িয়াছি। মনে হইতেছে অসাধ্যসাধন করিয়াছি। এত গুরুপাঠ বই আমার চোখে পড়ে নাই। এত সংস্কৃত শব্দ পুঞ্জীভূত হইয়াছে, এত সমাসবদ্ধ নূতন নূতন শব্দ রচিত হইয়াছে যে আমি ভাষায় আপনার অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। দ্রব্যজ্ঞানের পরিচয় প্রচুর পাইতেছি। কত বই পড়িয়াছেন বুঝিয়াছেন, আয়ত্ত করিয়াছেন ভাবিতে পারিতেছে না। টীকা ব্যতীত এই বই পড়িবার পাঠক আছে কিনা সন্দেহ। আর যদি টীকার সাহায্যে গল্প বুঝিতে হয়, অধিকাংশ পাঠক সে আয়াস করিবেন না। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন আপনি পাঠকের বিদ্যাপরীক্ষায় বসিয়াছেন। এমন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা সাধারণ শব্দকোষে পাওয়া যায় না। কোন্ পাঠক বিশেষ বিশেষ বই হাতড়াইয়া শব্দের অর্থ আবিষ্কার করিবেন? আমি জানিতাম যখন কবি প্রস্তুত বিষয় বর্ণনা করিতে পারিতেছেন না, ভাষায় কুলাইতেছে না, তখন তিনি সুবোধ্য সুপরিচিত উপমা ও দৃষ্টান্তর দ্বারা অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু আপনার উপমা নূতন ও অপরিচিত ও অজ্ঞাত। 'প্রাগ্-জ্যোতিষ' নামক গল্পটিতে বুদ্ধির তাৎপর্য থাকিতে পারে, কিন্তু অন্য গল্পগুলির সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য নয়। চন্দনমূর্তি, সেতু, মরু ও সঙ্ঘ ও বিষকন্যা, পাঁচটি গল্পের চারিটিতে ভয়ানক রস। একবার কৌতুক করিয়া ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, পাঠক বই কিনিতেই কাঁদিয়াছেন, যদি সে বই পড়িয়া কাঁদিতে হয়, সে বইয়ের নামও করিবেন না। ভয়ানক পরিণাম স্মরণ দ্বারা মস্তিষ্ক পীড়িত হয়। শুধু গল্প নয়, প্রাচীনকালের সামাজিক ইতিহাস শুনাইবার অভিপ্রায় থাকিলে পাঠক টীকার দ্বারা সত্যমিথ্যা প্রভেদ করিতে পারিবেন না।

কয়েকটা উদাহরণ দিতেছি। গোশীর্ষ চন্দনকাষ্ঠ। যেখানে স্তম্ভ ছিল সেখানে নেপালী থাকিতে পারে, ভুটিয়া পথপ্রদর্শক হইতে পারে না। ভুটানী কে? বুদ্ধদেব শূকর মাংসও খেয়েছিলেন (৩ পৃ), ইহাতে আশ্চর্য কি আছে? ভিক্ষুর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছিল, কেন কে বুঝিবে? টুটেনখামেনের শিলামূর্তি (৪ পৃ) কেন থাকিবে না? একটি দীর্ঘনিশ্বাস (৪ পৃ), টল্‌মল্ (২৪ পৃ) টল্‌টল্ হইবে। এই গল্প রচনায় যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে। সত্য মিথ্যা পৃথক করিতে পারিলে পাঠক কিছু শিখিবেন। (এই গল্পে অনেক বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে)। দ্বিতীয় গল্প সেতু, এটি জন্মান্তরের কথা? ভগ্নমেরু, মুমূর্ষু সর্পের চক্ষু (২৯ পৃ), রসায়ন মিশ্র জল, কেয়ূরের

ঝণৎকার, একটি আনন্দের কণিকা (৪৫ পৃ)। এই গল্পের ভাল মন্দ বুঝিতে পারিলাম না।

মেরু ও সঙ্ঘ,—মধ্য-এশিয়ার মরুভূমি কোথায় ? আপনি নির্দেশ করেন নাই, আমিও জানি না। গোবি কি ? পুরাতন সভ্যতার অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমি বৃত্তান্ত পড়ি নাই। যেখানেই হোক আপনি লিখিয়াছেন মধ্য এশিয়া, সেখানে খেজুর গাছ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। শর্করাকন্দ পাইবারও সম্ভাবনা নাই। কেবল খেজুর খাইয়া লোকে বাঁচিতে পারে কি ? সেখানে উষ্ট্র চরিত কি ? সঙ্ঘ শব্দের অর্থে সঙ্ঘারাম বুঝায় কি ? খর্জুর বৃক্ষের কুঞ্জ হইতে পারে না, কারণ শাখা নাই। 'ফাঁসীর দড়ি ধীরে ধীরে কণ্ঠ চাপিয়া প্রাণবায়ু রোধ করে' (৪৮ পৃ) ভয়ানক উপমা।

অষ্টম সর্গ—এই গল্পের ভূমিকা পাইলে পাঠক মূল ধরিতে পারিতেন। শিপ্রার ঘাটের নিম্নতর সোপানে কালিদাস বসিয়াছিলেন কেন ? তরুণীরা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবে ? আর সেই উত্তর তিনি মানিয়া লইবেন ? লোলার সহিত কথা কহিবার কি প্রয়োজন ছিল ? সমাপানক কি আজ কালের বিলাতী at home ? আমি জানি না। কালিদাস বরাহমিহির অমরসিংহ আমাদের পূজার্হ। তাঁহারা গণিকার গৃহে মদ্যপান ও মাতলামি করিতেছেন এ চিত্র ভাল লাগিল না। তাঁহাদের চরিত সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। নবরত্ন সভা পরবর্তী কালের। প্রচলিত প্রবাদ ধরিলেও গণিকা গৃহে মদ্যপান করিতে গিয়াছিলেন একথা কোথাও আছে কি ? যদি না থাকে তাঁহাদিগকে লইয়া ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। (আপনি "ঝলসিয়া" শব্দ তিন চারি স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন। বোধহয় শব্দটির আপনি ভুল অর্থ করিয়াছেন। অগ্নিতাপে কোমল সরস দ্রব্য আদগ্ধ, আপোড়া দেখাইলেই বলি ঝলসিয়া গিয়াছে। যেমন প্রখর গ্রীষ্মে গাছের পাতা ঝলসিয়া যায়। মূল রূপ, জ্বলিত সদৃশ)। 'বিষকন্যা' গল্পটি নিষ্ঠুর কাহিনী, ভয়ানক কাহিনী। প্রেমের কাহিনী আছে বটে কিন্তু সেটা আকস্মিক ও উৎঘট (?) মনে হয়। লিচ্ছবিদের রাজা ছিল না। দেশটা republic-তাহারা কি বলিত জানিতে ইচ্ছা হয়, আপনি বলিতে পারেন। গণতন্ত্র কদাপি নয়। তাহারা এক ষোড়শী কন্যাকে মগধের রাজসভায় দূত করিয়া পাঠাইল বিশ্বাসযোগ্য নয়। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী দূত হইয়া মস্কোতে গিয়াছেন, কিন্তু এদিন সেদিন নয়। শ্রীমতী যুবতীও নহেন। সেই কন্যা বর্মাবৃত দেহে, পার্শ্বে অসি ও কটিতটে ছুরিকা বাঁধিয়া রাজসভায় গিয়া বসিত। ইতিহাসে ঘুণাক্ষরেও আছে কি ? আপনিই লিখিয়াছেন, জাতিস্মর আপনার জন্মান্তরের স্মৃতি, অর্থাৎ মিথ্যা কথা। বিষকন্যায় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বুদ্ধির ক্ষিপ্রতা ও ব্যগ্রতা আছে, শুদ্ধ ভাষায় সংস্কৃত শব্দের গাঁথুনি আছে, তথাপি ইহা গল্প, কল্পিত রচনা। ইহা মনে হইলেই সৃষ্টকুহক অন্তর্হিত হয়। দেখিতেছি উদ্ভট ভয়ানক স্বপ্নদর্শন ও জন্মান্তরের আত্মগ্লানির স্মৃতি আপনার দুইখানা বইএতেই আছে।

আপনার যেরূপ সংগ্রহ আছে, আপনি অনায়াসে সেকালের চিত্র লিখিতে পারিতেন। সে চিত্র অম্লান হইয়া থাকিত। আশা করি আপনি কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন।

(উল্কা রাজদূত, রাজ প্রতিনিধি নয়, রাজ প্রতিভূ। কক্ষে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল ! এক ঝলক বিদ্যুৎ কেমন ? "শৃগালরা" (১১৪ পৃ) আপনার লিপিতে অনবধানতা আর দেখি নাই। এক স্থানে আছে, 'সূচিবিদ্ধ প্রজাপতি', বুঝিতে পারিলাম না। প্রাগ্‌জ্যোতিষ গল্পে পেটারি শব্দ আছে, হইবে পেটরা)।

আমি এখনও অনুলেখক পাই নাই, এখানকার কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী এই পত্র লিখিয়া দিয়াছে। ভুল করিয়াছে কিনা আমি দেখি নাই।

ইতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

ওঁ

Bankura, Bengal
11.12.47

'জল্পক' মহাশয় সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,—যথাসময়ে আপনার পত্র ও 'চুয়াচন্দন' পাইয়াছি আর আশ্চর্য হইয়াছি আপনার বইএর অপ্রীতিকর সমালোচনা পড়িয়াও 'চুয়াচন্দন' পাঠাইয়াছেন। আমি সাহিত্যিক নই, ঐতিহাসিক নই, সমালোচক নই, গল্প পাঠকও নই ; আমার অভিমতের মূল্য এক কপর্দ্দকও নয়। অনেকদিন হইল আপনার 'চুয়াচন্দনের' তিনটি গল্প পড়িয়াছি, আর তিনটি পড়িতে পারিলাম না। যে তিনটি পড়িয়াছি তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিতেছি।

১। (বাঘের বাচ্ছা) ? বাচ্চা। বাঘের বাচ্চা যে কে, তাহা আপনি লিখেন নাই। আপনি মনে করিয়াছেন যে গল্প-পাঠকেরা ভারতের বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাস পড়িয়া গল্প পড়ে। শিবাজীর নাম করিলে কিছুমাত্র ক্ষতি হইত না। এটি গল্প না ইতিহাস বুঝিতে পারা যায় না। 'গল্প' কাহাকে বলে—গল্পের লক্ষণ কি—আমি অবগত নই। দুই একটা শব্দের প্রয়োগ ইংরেজি হইয়াছে। একটা 'বিভ্রম' (২ পৃ) একটা 'যবনিকা' (৫ পৃ)। শুধু বাংলা ভাষায় একটা ভয় বলিলাম। তাজা দুধ (৯ পৃ) fresh milk বাঙ্গালায় অচল, আমরা বলি 'টাট্‌কা দুধ'। ক্ষুব্ধ লজ্জা (১০ পৃ) ক্ষুব্ধ প্রশ্ন ইত্যাদি—আমি ক্ষুব্ধ শব্দের অর্থ ধরিতে পারি নাই। প্রশ্ন ক্ষুব্ধ হইতে পারে, লজ্জা ক্ষুব্ধ হইতে পারে,—কল্পনাও করিতে পারি না। 'বসন্ত রাগের এক তান মারিলেন' (১৭ পৃ) হইবে বসন্তরাগের তান ধরিলেন। মৃদং হইবে 'মৃদঙ্গ'। 'একটা দীর্ঘনিশ্বাস' (১৮ পৃ) একটা দীর্ঘনিশ্বাসের জ্বালায় এক বিখ্যাত উপন্যাস পড়িতে পারি নাই। জন প্রাণীরও জান্‌তে বাকী রইল না (২১ পৃ)।

২। কর্তার কীর্তি। এইটিকে গল্প মনে করি। গল্পটিও ভাল হইয়াছে। কিন্তু এত ক্রোধন কর্তা, যিনি মাসে দুই গ্রোস কাচের গেলাস ভাঙ্গিয়া শান্ত হইতেন,—আছে কি ? বদ্‌রাগী, বদ্‌মেজাজী মানুষ আছে। এখন দুই একটা শব্দ ধরি। "ভিনীসিয় আয়না" (৪০ পৃ) কেহ বুঝিবে না। "দেয়ালে মারিয়া" (৪১ পৃ)—দেওয়ালে ছুঁড়িয়া। "শিশির গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল" (৪৩ পৃ)—গোঁজমুখ করিয়া। "ফিয়াট্‌ গাড়ি" (৪৫ পৃ)—বুঝিলাম না। "একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস"—একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস (৪৭ পৃ), 'বুক ঢিব ঢিব করিয়া উঠিল' (৪৮ পৃ) বোধহয় বুক দুর্‌ দুর্‌ করিয়া উঠিল' ঠিক হইত। কারণ ভয় অনাগত। 'ঢিব ঢিব' হইত ঢিপ্‌ ঢিপ্‌। "মাথায় আঁচল টানিয়া দিতেই" (৪৮ পৃ) ঠিক হয় নাই। 'ঢিব্‌ করিয়া একটা গড় করিয়া' (৫২ পৃ)—'ঢিপ্‌' করিয়া গড় করিয়া—যদিও গড় করিবার সময় ঢিপ্‌ শব্দ হয় না। 'ত্যজ্য পুত্র' হইবে ত্যাজ্য পুত্র'।

৩। চুয়াচন্দন। আপনি চৈতন্যদেব লইয়া এই উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। আমার আশঙ্কা হইতেছে, গৌড়ীর বৈষ্ণবেরা প্রীত হইবেন না। তাঁহারা চৈতন্যদেবকে ভগবান জ্ঞান করেন। পূর্বকালের কবিরা চৈতন্যচরিতে যাহা লিখেন নাই, তাহা কল্পনাপূর্বক লিখিলে বিরক্ত হইয়া থাকেন। গল্পটি মন্দ নয়। কিন্তু বিশ্বাস হইতেছে না। 'মৃত বৌদ্ধ ধর্মের শব নির্গলিত তন্ত্রবাদ' (১০৮ পৃ) এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমি তন্ত্রের প্রাচীনতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি, বোধহয় দুই-এক মাসের মধ্যে 'প্রবাসীতে' প্রকাশের নিমিত্ত পাঠাইব ।। কি হইতে কি হইয়াছে তাহার নিরূপণ অতিশয় কঠিন। 'নাকে বেসর, কানে দুল' (১১৬ পৃ) চৈতন্যদেবের সময়ে বেসর আসিয়াছিল কি ? 'ষোল-শতের' (১১৭ পৃ)—হইবে 'ষোল-শতর'। লঙ্কা (১১৮ পৃ)—চৈতন্যদেবের সময় লঙ্কা আসে নাই—বোধহয় মাত্র দুই শত বৎসর আসিয়াছে। তখন

"চই" (সং—চাবিকা) প্রচলিত ছিল। এখনও নাকি যশোরে আছে। 'খোয়ার' (১১৯ পৃঃ)—বুঝিতে পারিলাম না। 'আয়ি' হইবে "আয়ী"। রেকাবীর উপর (১২৪ পৃ) হইবে 'রেকাবীতে'। তোমার গল্প (১২৫ পৃ) চুয়ার কাহিনী (১২৬ পৃ)— সত্যঘটনাকে 'গল্প' বা 'কাহিনী' বলিতে পারি না। এখানে 'কথা' শব্দ প্রযোজ্য। 'নৌকাডুবি' ও 'ভরাডুবি' (১২৬ পৃ) দুই-ই এক, ভরা অর্থে নৌকা। 'ভদ্রাসনটি বাঁচিয়াছিল' (১২৭ পৃ)—বাঁচিয়াছিল কেমনে বলা যায় ? একটা আর্ত চীৎকার (১৩০ পৃ)—একটা ? বাগ্‌দীদের চারি থাক আছে, তন্মধ্যে 'তেঁতুলে বাগ্‌দী' এক থাক ; নবদ্বীপে এই বাগদী আছে কিনা আমি জানি না। তেঁতুলে বাগ্‌দী রাঢ়ে আছে। ঝাঁ ঝাঁ দ্বিপ্রহর (১৩৭ পৃ)—রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে। 'মুক্তা চুনিতে লাগিল' (১৫৪ পৃ —হিন্দীতে 'চুন' ধাতু ;—বাঙ্গালাতে 'কুড়াইতে লাগিল'।

'চুয়াচন্দন' গল্পটি বেশ রোমাঞ্চকর। দেখিতেছি, আপনি দুঃসাহসিক কাজ ভালবাসেন। জাতিস্মর ও বিষকন্যা পড়িয়া আমার মনে হইয়াছিল আপনি সাধারণ প্রকৃতির যুবা নহেন। 'চুয়াচন্দন' পুস্তকের মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় যে প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইয়াছে তাহার সহিত আমার কল্পিত মূর্তির কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। বিষকন্যার দুইটি শব্দ ধরিতে ভুলিয়াছিলাম। 'ফুঁশিছে'—হইতে পারে না, যদিও রবীন্দ্রনাথ পদ্যে লিখিয়াছেন,—হইবে 'ফুঁশাইতেছে'। 'কটাক্ষ হানিয়া' 'দৃষ্টি হানিয়া' ইত্যাদি আপনি পুনঃপুনঃ লিখিয়াছেন। হানিয়া= 'নিক্ষেপ করিয়া' বটে। কিন্তু ইয়ার্‌কির ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

দেশকালপাত্র ধরিয়া গল্প লিখিবার সময় বিশেষ সাবধান হইতে হয়। কোনটির অসঙ্গত হইলে রসভঙ্গ হয়। গল্প পড়িয়া লেখকের প্রতি ক্রোধ জন্মে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। হুগলী জেলায় আরামবাগের উত্তরে তিরোল নামে এক গ্রাম আছে। সেখানে এক কালী প্রতিমা আছে। তাঁহার কৃপায় পাগলামী সারে। পূজকেরা পাগলের হাতে লোহার বেড়ী পরাইয়া দেয়। ভদ্র ঘরের এক যুবতী পাগল হইয়াছিল। তাহার যুবা ভাই বয়সে কিছু বড়, পাগলীকে লইয়া তিরোল যাইতেছিল। গ্রীষ্মকাল, কলিকাতা হইতে দামোদর পর্যন্ত রেল আছে। তাহার পর দামোদর পার হইতে হয়। কবি লিখিয়াছেন, 'পাগলী নৌকার বাড়ে বসিয়া জলে পা ডুবাইয়া দিল' (গ্রীষ্মকালে দামোদর শুষ্কপ্রায়—এক নম্বর আশ্চর্য—তখন দামোদরে নৌকা চলিতেছে)। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দামোদরের অপর পারে—কবি লিখিতেছেন—পাটের ক্ষেত—গাছ বড় (দুই নম্বর আশ্চর্য, সেখানে পাট জন্মে না—আর গ্রীষ্মকালে তো কথাই নাই) সেখান হইতে তিরোল অনেক দূর। এক গরুর গাড়ি মিলিল। ভাই বোন কিছুদূর গিয়া রাত্রিযাপনের নিমিত্ত এক গৃহস্থের বাড়িতে উঠিল। সেখানে আহার করিবার পর গৃহস্থ ভাইবানকে এক ঘরে শুইতে দিল। (তিন নম্বর আশ্চর্য,—যুবা ভাই, যুবতী বোন কদাপি এক ঘরে শোয় না)। পাগলী কখন একটা বঁটি লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ভাইকে কাটিয়া পাটের ক্ষেতে লুকাইয়াছিল···ইত্যাদি। গল্পটি প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। কবি বিখ্যাত, দেশ আমার জানা। মনে পড়িতেছে আমি কবিকে পত্র লিখিয়াছিলাম, এরূপ অসম্ভব কাহিনী লিখিয়া তিনি তাঁহার খ্যাতি ক্ষুণ্ণ করিতেছেন। (চার নম্বর আশ্চর্য ভুলিয়াছি—মাঠে 'কষাড়' গাছ জন্মিয়াছে, অদ্যাপি আমি এই নাম শুনি নাই, সে দেশের লোকও শোনে নাই)। এই গল্প পড়ার পর বুঝিয়াছি, কোন কবির একটা গল্প ভাল হইতে পারে—সব গল্পই ভাল হয় না।

নূতন অনুলেখক পাইয়াছি। সে এই পত্র লিখিয়াছে। ভুল করিয়াছে কিনা জানি না। আমি পড়িয়া দেখিতে পারিলাম না।

আপনার ঠিকানা মালাড্—বম্বের কোন বিখ্যাত স্থান হইবে, সেখানে আপনি বিখ্যাত। 'মালাড' লিখিলেই পত্র আপনার নিকট যায়। যদি বাধা না থাকে, লিখিবেন—কি কাজে নিযুক্ত

আছেন। গল্প লেখার জন্য বিদেশে বাস করিতেছেন না।

ইতি
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

৭

Bankura (Bengal)
16.1.48

নমস্কার, গল্পলেখক মহাশয়,

মৌখিক ভাষায় লেখাচ্ছি।

আপনি আমার সম্বর্ধনায় আনন্দিত হয়েছিলেন। আপনার স্বভাবই তাই। এতদিন উত্তর দেওয়া হয় নাই। 'চুয়াচন্দনের' তিনটি গল্প পড়েছিলাম, আর তিনটি পারি নাই। আপনি বারম্বার লিখেছেন আমার সমালোচনা দ্বারা আপনার উপকার হচ্ছে। আপনার বিনীত ও অকৃত্রিম ব্যবহারে আমি প্রীত হয়ে আর তিনটি গল্প পড়েছি। গল্পের নাম পড়েই বুঝেছিলাম রক্তারক্তির ব্যাপার। আপনি কি সিনেমার জন্য এইরূপ গল্প লেখেন ? জানি না। আমি অদ্যাবধি সিনেমা দেখি নাই। একবার কলিকাতায় এক সিনেমায় চণ্ডীদাস দেখাচ্ছিল। আমার দেখার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু এক চিত্রশিল্পী নিষেধ ক'রলেন। বললেন, "সিনেমা আপনাদের মত লোকের জন্য নয় ; সেখানে গেলে নিরাশ হয়ে ফিরে আসবেন।" কে জানে কি দেখায় ! আপনার প্রতিকৃতি দেখে মনে হয়েছে আপনার প্রকৃতি রক্তারক্তি চায় না। বোধহয় লোকে দুঃসাহসের কাজ ও রক্তারক্তি দেখতে ভালবাসে ; সেহেতু আপনাকে লিখতে হচ্ছে।

আপনি বারম্বার লিখেছেন আপনার পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই। অভিমান থাকা ভালও নয়। কিন্তু আপনি পণ্ডিত। আমি যে গল্প পড়েছি, কোনটাতে আপনার তুল্য শব্দজ্ঞান ও দ্রব্যজ্ঞান দেখি নাই। আপনার গল্প বানাবার ও রচনা করবার অসামান্য নৈপুণ্য আছে। আপনি যাদের সিনেমার জন্য গল্প লিখছেন, তারা যোগ্য লোকই পেয়েছে। এখন 'চুয়াচন্দনের' রক্তসন্ধ্যা, রক্তখদ্যোত ও মরণভোমরা গল্পে কি কি শব্দ ঠেকেছে, আপনাকে লিখছি। চীন হইতে লাক্ষা, বঙ্গ হইতে ক্ষৌম পট্টবস্ত্র, মলমল, মগধ হইতে চারুকেশড়ার পুষ্পবীজ, দাক্ষিণাত্য হইতে অগুরু, (৬২ পৃ)। বঙ্গের ক্ষৌম পট্টবস্ত্র নয় ; ক্ষৌম অতসীর অংশজাত (অংশুজাত) বস্ত্র (linen) ; একথা বহু বহু পণ্ডিত জানেন না। আপনি বঙ্গের 'মসলিন' লেখেন নাই, বহু ধন্যবাদ ! বঙ্গের ঐতিহাসিকেরা 'ঢাকাই মসলিন' লেখেন, মলমল জানেন না। চারুকেশড়া কি গাছ জানি না। চীনে লাক্ষা জন্মে, দাক্ষিণাত্যে অগুরু পাওয়া যায়, জানি না। জোয়ারভাটা (৬৩ পৃ)—ভাটা, ভাঁটা নয়। জাহাজে আড়কাঠি (৮২ পৃ), এ শব্দ শুনি নাই। কুলীর আড়কাঠি জানি। রমণীদের দিবে না (৮৮ পৃ) কর্মে ষষ্ঠী কেউ কেউ লেখেন বটে, আমি ভুল মনে করি। কালকূটের মত হাসিল (৮৯ পৃ) ; বিষের মত হাসি ? কি রকম ! কানা মাছির মত টাউরি খেতে খেতে (১০৩ পৃ) ; মনে হচ্ছে শব্দটা শুনেছি, কিন্তু ঠিক জানি না। বাঙ্গলা শব্দ কি না তাও বুঝতে পারছি না।

আপনি 'রক্তখাদ্যোত' ও 'মরণ ভোমরা'য় মৌখিক ভাষা লিখেছেন। কিন্তু বানান শুদ্ধ হয় নাই। আমি জানি অনেক লেখক মৌখিক ভাষা লিখছেন,কিন্তুএ ভাষার ক্রিয়াপদের বানানের দিকে লক্ষ্য রাখছেন না। সে বলে চলে গেল ; সে বলিয়া চলিয়া গেল, কিম্বা সে বলে (বলপূর্বক) ? 'বলিয়া', পূর্বরূপ বল্যা , বর্তমানে দক্ষিণ রাঢ়ে 'বল্যে' ; পূর্ববঙ্গে 'বইল্যা' ; সুতরাং 'বল্যে' শব্দের য-ফলা লুপ্ত বা গ্রস্ত বুঝাবার জন্য ঊর্ধ্বকমা চিহ্ন দেওয়া আবশ্যক।

বলিয়াছি, 'বলে'ছি' । বলিব, ব'লব, এখানে 'ই' গ্রস্ত । সে ব'ললে । একই চিহ্ন কোথাও 'ই' কোথাও য-ফলা বুঝাতে লেখা অবৈজ্ঞানিক । 'ই' গ্রস্ত হ'লে আমি আর একটা চিহ্ন দিতাম, প্রেসে সে টাইপ নাই বলে' 'ই' অক্ষরের শৃঙ্গ কেটে নিতে হয় বলে' ঊর্ধ্বকমাই চলছে । ছেলেমানুষি ; আমি ছেলেমানুষি লিখি ; কর্মে ই, বিশেষণে ঈ । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শব্দের বানান বেঁধে দিয়েছেন । কতক আমার বানান নিয়েছেন, কিছু নেন নাই । কারণ ব্যক্তিবিশেষ এই ভুল বানান করেন । যেমন, বাঙালা, বাঙালী । পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ- বঙ্গে 'বাঙ্গালী' ; কিন্তু কয়েকজন বড়লোক বঙ্গের 'গ' উচ্চারণ ক'রতে পারেন না, এই হেতু সকলকে 'বাঙালী' ব'লতে হবে । এইরূপ খুড়ী, মাসী, 'ঈ' লেখা উচিত, তাঁরা লেখেন খুড়ি, মাসি । বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের মানরক্ষার জন্য বিকল্প বিধি করেছেন । এইরূপ খুঁটিনাটি আরও আছে ; সময় পেলে একবার কাগজে আলোচনা ক'রব । এইখানেই ইতি করি ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

পুঃ—টাওরি বাংলা মনে হয় না বোধহয় আমরা বলি 'টাল খেতে খেতে' । আমি খোঁজ নিয়ে জানাব ।

৮

Bankura
24.1.48

সাহিত্য-রচক মহাশয়, নমস্কার !

আপনার পত্র পাইলাম । 'টাউরি'-গবেষণা এখনও সমাপ্ত হয় নাই ; শুনিতেছি কলিকাতা অঞ্চলে আছে, ঠোক্কর অর্থে । অতসীর এক নাম ক্ষুমা, ক্ষুমাজাত ক্ষৌম । বঙ্গদেশে ক্ষৌমবস্ত্র প্রসিদ্ধ ছিল । সূক্ষ্ম ক্ষৌমের নাম দুকূল । বঙ্গদেশে দুকূলও প্রসিদ্ধ ছিল । দ্বাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দে সূক্ষ্ম দুকূলকে মল্ল বলিত । মল্ল সংস্কৃত, উৎকৃষ্ট । এই মল্ল হইতে হিন্দী মলমল, ইংরেজি mull. (অমরকোষের সর্বানন্দী টীকায় মল্ল শব্দ পাইয়াছিলাম) এককালে বস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলাম, সেই হেতু জানি । অতসী বাঙ্গালা তিসি । ইহার বল্কলের অংশু হইতে বস্ত্র হইত । ইংরেজী linen. বৈদ্যক কোষে চারুকেশরা আছে, ইহার নামান্তর তরুণী, কুমারী ইত্যাদি । বাঙ্গালা কুমারীলতা এক বৃহৎ কণ্টকী লতা । গোলাপ নয়, আর গোলাপ এ দেশে বীজ হইতে জন্মে না ।

আপনি সিনেমার জন্য গল্প লিখেন ; কি ভাষায় লিখেন ? মারাঠী ভাষা শিখিয়াছেন ?

ইতি
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

৯

বাঁকুড়া ২১ জ্যৈষ্ঠ

জল্পক মহাশয়,

নমস্কার ! অনেকদিন হইল আপনার এক পত্র পাইয়াছিলাম । আপনি লিখিয়াছিলেন, তৎকালে আপনার শরীর ভাল যাইতেছিল না । আশা করি এক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া সিনেমার জন্য গল্প লিখিতেছেন । আপনি ইংরেজিতে গল্প লেখেন, অন্য একজন তাহার হিন্দী অনুবাদ করে । এইরূপ

ব্যবস্থার হেতু বুঝিতে পারি নাই।

জানিলাম, 'টাউরি' শব্দ কলিকাতা হাওড়া প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত আছে। আমি শব্দটির ব্যুৎপত্তি ধরিতে পারি নাই। আপনার 'বিষকন্যা'য় একস্থানে আছে, 'কঞ্চুকী পরিধান করিলেন'—হইবে কঞ্চুক।

আমি গল্প পড়ি না, কদাচিৎ প্রবাসী ও ভারতবর্ষে প্রকাশিত গল্পে চোখ বুলাই। আর রাখিয়া দিই। আপনার গল্পের বস্তু সাধারণ পাঠকের অজ্ঞাত, ভাষা এত উত্তম, মনে হয় অন্যেরা সে ভাষায় লিখিলে বাঙ্গালা ভাষা উন্নত হইতে পারিত। নিশ্চয় অনেক বই পড়িয়াছেন, যথেষ্ট সাধনা করিয়াছেন।

এখানে এখন দারুণ গ্রীষ্ম চলিতেছে। সেখানে আপনি ইহার উগ্রতা বুঝিতে পারিবেন না।

ইতি শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

১০

বাঁকুড়া
৮ আষাঢ় ১৩৫৫
ইং ২২ জুন ১৯৪৮

চিত্রনাট্যলেখক মহাশয়,

আপনার প্রত্যেক পত্র হ'তেই কিছু-না-কিছু শিখবার থকে। আপনার রচিত একখানি চিত্র-নাট্য নিশ্চয় পাঠিয়ে দেবেন। আমি বুঝেছি, তা'তে চিত্র-নাট্যের স্বরূপ বুঝতে পারব। কেমন করে চিত্র তোলা হয়, কিছু কিছু জানি। আশ্চর্যের কথা বটে, এখানেও চিত্র-নাট্য প্রদর্শিত হ'চ্ছে, কিন্তু আমার একবারও দেখতে ইচ্ছা হয় না। আমি সেকেলে যাত্রাগান শুনতে ভালবাসতাম। কিন্তু কলকাতায় নিজের ইচ্ছায় কখনও থিয়েটার দেখিনি। আমি মানুষ অদ্ভুত রকমের। গান শুনতে ভালবাসি; সুরজ্ঞান লাভেরও চেষ্টা ক'রেছি; রাগরাগিণীর রূপের পরিচয় করেছি, তা' হ'তেই বুঝেছি আপনারও ঐ বিষয়ে জ্ঞান আছে। চিত্রকলার রসাস্বাদ করবার সুযোগ পাই নাই। কিন্তু চেষ্টা করি। চিরকাল বিজ্ঞান চর্চায় কাটিয়েছি। কিন্তু অদ্যাপি ক্লান্তি বোধ করি নাই। এখন দৃষ্টি ক্ষীণ। তথাপি মনের মত গল্প পেলে একটু-আধটু পড়ি। সেই অল্পজ্ঞান হ'তেই বুঝতে পারি বাংলা ভাষায় আপনার যেমন অধিকার তেমন আর কারও নাই। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা পড়েছি। তিনি অনাবশ্যক দীর্ঘ করেন। তিনিই পাগলী বইনের সঙ্গে যুবা ভাইকে গ্রীষ্মকালের দামোদরে নৌকায় বসিয়ে ছিলেন। কেহ বলে, তাঁর 'পথের পাঁচালী' শ্রেষ্ঠ বই। কিন্তু আমার প'ড়তে ইচ্ছা হয় নাই। জানি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব নাম, খুব সমাদর। আমি তাঁর একটা গল্প পড়তে বসেছিলাম। দেখলাম তিনি বাংলা শব্দ অতি অল্প জানেন। আর, পুনঃ পুনঃ 'একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ' করতে আর 'স্তব্ধ হয়ে বসতে' দেখে আর পড়তে পারি নাই। ইংরেজি গল্পের অনুবাদ ক'রতে ক'রতে আমাদের গল্প লেখকেরা হাত পাকিয়েছেন। শুধু তাঁদের দোষ নয়। প্রায় অধিকাংশ ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী নিজেকে হারিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন না।

আপনার একটা কথায় একটু আশ্চর্য বোধ করছি। আমি জানতাম, মারাঠীভাষী বাংলা সাধুভাষা অক্লেশে বুঝতে পারে। অবশ্য আপনার নাট্যের ভাষা অন্যরকম। আমি এককালে মারাঠী ভাষা কিছু কিছু শিখেছিলাম। সাধুভাষায় লিখিত বই বুঝতে পারতাম। মারাঠী, গুজরাতী, ওড়িয়া, বাংলা, বিহারী ভাষার মধ্যে এত সাদৃশ্য আছে, অল্প চেষ্টাতেই এসকল ভাষা শিখতে পারা যায়। কিন্তু হিন্দী সম্পূর্ণ পৃথক। বিহারী নিজের মাতৃভাষা ছেড়ে হিন্দী ধরেছে। আমার বিশ্বাস, এর প্রধান কারণ

বাংলা ভাষার সহিত সাদৃশ্য। বিহারী ও আসামী ও কতকটা ওড়িয়া ক'লকাতার বাঙালীর ঔদ্ধত্যে রুষ্ট হয়ে বাংলা ভাষার সহিত সম্পর্ক ত্যাগের চেষ্টা করছে। এই তিন প্রতিবেশীর কেহই বাঙ্গালীকে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারে না। ইহা বাঙ্গালীর দোষ।

বোম্বাইতে বৃষ্টি খুব, জানি। আপনার প্রতিকৃতি দেখে মনে হয়, আপনার স্বাস্থ্য উত্তম। কিন্তু আপনি বোম্বাই-এর জলবায়ু সইতে পারছেন না। আহার বিষয়ে একটু সাবধান থাকবেন।

মুঙ্গেরের জলবায়ু কোথায় পাবেন ? বর্ষাকালে আমিও ভাল থাকি না। এখানকার দেড় মাস বর্ষা, অনেক দিকে সাবধান হ'য়ে দেহযন্ত্রটাকে কোনরকমে চালিয়ে রাখতে হয়।

মারাঠীভাষীরা হিন্দীভাষায় চিত্রনাট্য বঝতে পারে,—এ ব্যাপারটা একটু নূতন ঠেকছে। আপনার চিত্রনাট্যকারকি হিন্দুস্থানী ? নিশ্চয় মারাঠী ভাষায় চিত্রনাট্য প্রদর্শিত হচ্ছে।

আপনি আমার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রবন্ধ পড়তে ভালবাসেন। আগে জানলে ছাপা প্রবন্ধ কিছু কিছু পাঠাতাম। গত বৎসর দুর্গোৎসব সম্বন্ধে সাতটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম, প্রথম দুইটা পেলাম না। বাকী পাঁচটা আপনার নামে ডাকে পাঠিয়েছি। এই প্রবন্ধের সঙ্গেই 'তন্ত্রের প্রাচীনতা' জুড়ে রাখবেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'শ্রীশ্রীদুর্গা'। তা'তে অনেক নূতন কথা ছিল। প্রথম প্রবন্ধ বঙ্গদেশে দুর্গোৎসবের সামান্য বিবরণ। সেটা না পড়লেও চলে।

আমার পত্রখানিও অতিশয় দীর্ঘ হল। ইতি—

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

১১

বাঁকুড়া

ইং ২০-৭-৪৮

চিত্রনাট্যলেখক মহাশয়,

নমস্কার। আপনার 'পথ বেঁধে দিল' এই চিত্র-নাট্য পড়ে' অতিশয় কৌতুক বোধ করেছি। ধন্য আপনার কল্পনাশক্তি। পূর্বপ্রদত্ত আপনার তিনখানা গল্পের বই পড়ে' মনে হয় নাই আপনি এরূপ হাস্য ও করুণ রসের গল্প লিখিতে পারেন। কলিকাতার শিল্পী যতীন্দ্র সেন আমাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চান নাই, আপনিও লিখেছিলেন, আমি যাই নাই, বেঁচে গেছি। কিন্তু এই চিত্রনাট্য সিনেমায় দেখতে পেলে খুশি হতাম। ইংরেজি নামগুলো বাংলা নাম করেন নাই কেন ? আপনি যোগ্য নাম অক্লেশে করে দিতে পারেন। মাঝে মাঝে যে গান আছে তার রচনাও বেশ। আমি গায়ক নই, গীতজ্ঞও নই। মাস ছয় সেতার বাজিয়েছিলাম। সে সময় কতকগুলো প্রচলিত রাগিণীর রূপ চিনেছিলাম। বাজাতে সময় পেতাম না, হাতও হয় নাই। কিন্তু কেহ রাগিণীতে ভুল ক'রলে কানে সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা পেতাম। ফলে থিয়েটারী সুর ও রেডিও আধুনিক গান আমি এখনও শুনতে পারি না। আমি এসব সুরের নাম রেখেছি 'তিড়িং রাগিণী'। আপনার রচিত গানের নাম আপনি রেখেছেন 'জাপানী গান' (Sic) ; মন্দ হয় নাই। আমি 'গিট' শব্দ শুনেছি। স্থানীয় ভাষার (dialect) শব্দ মনে করি। প্রামাণিক মনে করি না। এই বইখানিতেও বাংলা ভাষায় আপনার অসাধারণ অধিকারের পরিচয় পেয়েছি। আমি বাংলা সাহিত্যের সমালোচক নই। আমার সমালোচনার কোন মূল্যও নাই। তথাপি যদি মনে করেন আমার সমালোচনা পড়ে' ভাবী পাঠক লুব্ধ হবে, আপনি আমার মন্তব্য স্বচ্ছন্দে প্রকাশ ক'রতে পারেন। 'বিজয়লক্ষ্মী' নাটকের ভূমিকায় দেখছিলাম, আপনি নাটকখানি প্রথমে ইংরেজিতে লিখেছিলেন। ইংরেজিতে নাটক লেখা অল্প কথা নয়, ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট অধিকার না থাকলে লিখতে পারা যায় না। দেখছি, আপনি ইংরেজি ভাষাকেও আয়ত্ত করেছেন।

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষাভিজ্ঞ গল্পলেখক আছেন। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় দৃষ্টি আছে কিনা সন্দেহ। কেমন করে' রুমালে ইঁদুর করতে পারা যায়, কেমন করে' পেয়ারা গাছের ফ্যাঁকড়া ডাল দিয়ে গুলতি ক'রতে পারা যায়, আপনি তাহাও লক্ষ্য করেছেন। আর্যেরা অন্য দেশ হ'তে এসেছিলেন কিনা, ঋগ্‌বেদ প্রথমে না অথর্ব বেদ প্রথমে—এসব তর্কেও আপনার চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছে। যিনি এত বিষয় জানেন, তাঁকে আমি পণ্ডিত মনে করি। 'পণ্ডিত' শব্দের অর্থ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে গেছে। যিনি কোনও একটা বিদ্যার পারদর্শী হয়েছেন, তিনিই 'পণ্ডিত' নাম পেয়ে থাকেন। অতএব পণ্ডিত না বলে' 'প্রকৃষ্টচিত্ত' (caultured) ব'ললে অতিশয়োক্তি হবে না। 'কৃষ্টি' শব্দ culture অর্থে আমিই প্রথম ব্যবহার করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ শব্দটির প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করে'ছিলেন। কিন্তু শব্দটি চলে' গেছে। 'কৃষ্টি' শব্দে যে অর্থ আসে, তাঁর সংস্কৃতি শব্দে সে অর্থ আসে না। 'সংস্কৃতি' ব'ললে সভ্যতাও বুঝায় না। সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি—তিনটি শব্দই চাই।

আমি বেদজ্ঞ নই। বেদের 'ব'ও বুঝি না। কিন্তু বেদের প্রধান প্রধান দেবতাদি'কে চিনি, তাঁদের কর্ম বুঝি। বেদবিদ্বানেরা আর এ দেশের পণ্ডিতেরা বেদের শব্দ বিচার করেছেন। কিন্তু বস্তু চিন্তা করেন নাই। আপনি দুর্গোৎসব প্রবন্ধে 'মহিষমর্দিনী' পড়ে' থাকবেন। কিন্তু বেদ বিদ্বানেরা রুদ্র চিনেন না, তাঁর পিণাকও দেখেন নাই। বস্তু চিন্তা দ্বারা আমি বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয় ক'রতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস, ভুল হয় নাই। কারণ সব প্রমাণই প্রায় একস্থানে এসে পড়েছে। খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ আমি চোখের সামনে দেখছি। খ্রীঃ পূঃ ৬০০০, ৮০০০ অব্দ ইন্দ্র দেখিয়ে দিচ্ছেন। আমি কতদূর দেখেছি, খ্রীঃ পূঃ ১০০০০-এর সে দিকের চিহ্ন পাই নাই। আমার বিশ্বাস আর্যেরা মধ্য এসিয়া শকদ্বীপের উত্তরে কোথাও হতে পশ্চিমে ও দক্ষিণে চলে' গেছলেন। এ বিষয়ে তিলক মহাশয় এক বই লিখেছিলেন The Arctic Home in the Vedas. আমি তার যুক্তিজালে বদ্ধ হয়ে তাঁর মত স্বীকার করেছিলাম। তখন আমার বৈদিক বস্তুজ্ঞান হয় নাই। পরে বুঝেছি, তিনি প্রমাণের যে অর্থ করেছেন, সে অর্থ ঠিক হয় নাই। তাঁর প্রথম বই Orion আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছিল। তিনি পথিকৃৎ, নমস্য, কিন্তু পরে বুঝেছি, তার প্রদত্ত বৈদিক উপাখ্যান ব্যাখ্যায় ভুল আছে। তাঁর প্রদর্শিত পথে যেয়ে আমি আমার 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' গ্রন্থে পৌরাণিক উপাখ্যান ব্যাখ্যায় ভুল করেছি। সে বই একখানি, বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়ে একটা প্রকরণ, দুর্গোৎসবের দ্বিতীয় প্রকরণ, পঞ্জিকা সংস্কার সম্বন্ধে বম্বের হেতকরের প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ ও আমার মন্তব্য এবং 'অশ্বিনীর আদি' প্রবন্ধ তিন দিন পূর্বে আপনার নিকট পাঠিয়েছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়ের আটটি প্রকরণ লিখেছিলাম। পত্রিকায় স্থানাভাব অর্থাৎ পরিষদের অর্থাভাব হেতু অবশিষ্ট চারটি প্রকরণ প্রকাশিত হয় নাই। প্রকাশিত আটটির মধ্যে একটি আপনার কাছে পাঠালাম।

প্রবাসীতে বিষ্ণুর চারিটি দিব্য অবতার, বরাহ, কূর্ম, বামন ও মৎস্য—ব্যাখ্যা করেছি। তদ্দ্বারাও বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয় হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার আগ্রহ আছে জানলে আগে এক-একখানা পাঠাতাম। আমি জানি এরূপ প্রবন্ধের পাঠক অতি অল্প। যদি আপনি প'ড়তে চান, বুঝতে চান, আপনার নিকট পাঠাতে পারি। কিন্তু একেবারে দিতে পারব না।

আপনার 'জাতিস্মর' পড়বার সময় বুঝেছিলাম, আপনি জ্যোতিষ চর্চা করেন। আপনি পরিষ্কার লেখেন নাই অমুক গ্রহ অমুক রাশিতে লগ্নের অমুক স্থানে ইত্যাদি। পাঠক সহজে বুঝতে পারবে না। গণকেরা কোষ্ঠী দেখে বিষকন্যা বুঝতে পেরেছিলেন।

আমি নির্মলচন্দ্র লাহিড়ীকে জানি। তিনি আমায় বর্ষে বর্ষে একখানি Ephemeris দিয়ে থাকেন। আমি তাঁর প্রদত্ত অয়নাংশ স্বীকার করি না। অনেক বৎসর হ'ল বোম্বায়ের জ্যোতির্বিদ

বেঙ্কটেশ কেতকর দেখিয়ে ছিলেন, চিত্রা তারার সম্মুখস্থ বিন্দু অশ্বিনীর আদি। অর্থাৎ চিত্রা তারার Longitude হ'তে 180° বাদ দিলে যে স্থান হয় সে স্থান অশ্বিনীর আদি। আমি প্রথম প্রথম তাঁর মত স্বীকার করেছিলাম, এখনও করি। কিন্তু Longitude স্বীকার করি না। তাঁর মারাঠী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করেছিলাম। আপনার নিকট একখণ্ড পাঠালাম। কিন্তু পরে দেখলাম Longitude হ'তে পারে না, চিত্রা তারার ধ্রুবক হবে। সূর্যসিদ্ধান্তে তাহাই আছে। যদি চিত্রা তারা ক্রান্তিবৃত্তে (ecliptic) থাকত, তাহলে এই মতান্তর হ'ত না। চিত্রা তারার 180 অংশ দূরে অশ্বিনীর আদি স্থান পাওয়া যেত। কিন্তু চিত্রা তারা ক্রান্তিবৃত্তের দক্ষিণে প্রায় ২° অংশ দূরে আছে। এই হেতু Longitude আর ধ্রুবক এক হ'তে পারে না। Longitude সেই স্থান যে স্থানে চিত্রা হ'তে লম্বরেখা ক্রান্তিবৃত্ত স্পর্শ করে। আর ধ্রুবক ক্রান্তিবৃত্তের সেই স্থানে, যে স্থানে চিত্রা হ'তে বিষুবৃত্তের লম্ব রেখা ক্রান্তিবৃত্তকে ছেদ করে। চিত্র পশ্য।

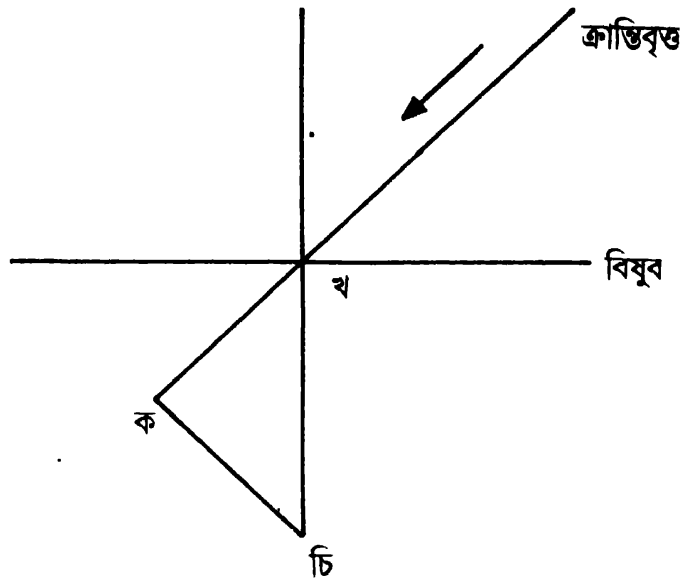

চি ক চিত্রা হ'তে ক্রান্তিবৃত্তের লম্ব। চি খ বিষুবৃত্তের লম্ব ক্রান্তিবৃত্তকে খ স্থানে ছেদ করেছে। খ ধ্রুবক। ক Longitude. কেতকর ক বিন্দুর 180° দূরে অশ্বিনীর আদি বলেছিলেন। আমি প্রথমে তাঁর মত স্বীকার করেছিলাম। পরে বুঝলাম ভুল। যদি চিত্রার ধ্রুবক 180° হয়, চিত্রার অপাংশ প্রায় 181° হবে। প্রভেদ অল্প নয়। এখন 'অশ্বিনীর আদি' প্রবন্ধ পড়তে আপনার সুবিধা হবে।

আমার First Point of Aswini নির্মলববাবু পড়ে' বলেছিলেন, সব বুঝতে পারলাম না। প্রবন্ধটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষায় লিখিত। অভিজ্ঞদের জন্য লিখিত, সাধারণের জন্য নয়। নির্মলবাবু তাড়াতাড়ি পড়ে'থাকবেন। তারপরে আমি 'প্রবাসী'তে অশ্বিনীর আদি প্রবন্ধ লিখি। এই প্রবন্ধ পড়ে' নির্মলবাবু লিখেছিলেন, 'এই মত আগে বলেন নাই কেন ? এখন কেমন করে' সব দিক বজায় রাখি ?' বাস্তবিক এত বৎসর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পত্রিকায় ও Indian Ephemerisপুস্তকে যে অয়নাংশ মেনে এসেছেন তার অন্যথা করলে হাস্যাস্পদ হ'তে হয়। Indian Ephemeris-এ যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন সেটা কিছুই নয়, ছেলেভুলানো বলা যেতে পারে। আমার First Point of Aswini পুস্তিকায় এসব তর্কের খণ্ডন আছে। পুস্তিকাখানি বড় technical, নইলে একখানি আপনাকে দিতে পারতাম। এখন আপনি যা ইচ্ছা তা ধরতে পারেন। আমার কোন অনুরোধ নাই। পত্রখানি অতিশয় দীর্ঘ হ'ল। তথাপি দেখছি, 'পথ বেঁধে

দিল' পুস্তকের দু-একটা ভাষাগত দোষ লেখা হয় নাই। 'গিঁট' নয়, গাঁইট বা গাঁট। যেমন, গাঁটকাটা, গাঁটছড়া, গাঁটরি, এক গাঁট কাপড় ইত্যাদি। মেতি গাছের বেড়া নয়, মেহেদি। 'টেবিলে বসিলেন', 'জানালায় দাঁড়াইলেন'—কি অর্থ হইবে ? আমরা চেয়ারে বসি, টুলে বসি, আসনে বসি ; টেবিলে বসি কি ? আমরা দ্বারে দাঁড়াই, জানালায় দাঁড়াইতে পারি কি ? 'জলের তলে ডুবিলেন' নয়, 'জলে ডুবিলেন'। 'পথ বেঁধে দিল' পুস্তকের শেষে 'অভিসারিকা' আছে। তাতে 'আবহসঙ্গীত' দেখলাম। এ সঙ্গীতের নাম আমি কখনও শুনি নাই। 'আবহ' শব্দের অর্থ atmosphere. এই নাট্যের নির্দেশ আনাড়ীর পক্ষে বুঝা কঠিন।

আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। ইতি—

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

১২

Bankura
28.12.48

পণ্ডিত জল্পক মহাশয়,

আপনার কয়েকখানি পত্র পাইয়াছি। বেতসকুঞ্জ উদ্ধার করিতেছিলাম, উত্তর লিখিবার অবসর পাই নাই। 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষে'র দ্বিতীয় ভাগ লিখিতে পারি নাই। আবশ্যক গ্রন্থ পাই নাই। আপনি প্রথম ভাগখানা দুইবার পড়িয়াছেন। ধন্য আপনার ধৈর্য। আপনি প্রবন্ধও দুইবার পড়িতে পারেন—এই গুণেই আপনি এত শিখিয়াছেন।

বাঙ্গলা নবলিপি সম্বন্ধে আমাদের হাত বাঁধা, যাহা আছে তাহাই রাখিতে হইবে, নচেৎ একেবারে অগ্রাহ্য হয়।

লবঙ্গলতা জুঁই ফুলের নাম। কেবল আসাম ও বঙ্গে প্রচলিত হইয়াছিল। সংস্কৃত কোষে গৃহীত হয় নাই। আমার নিরুপণে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জয়দেবের 'দুকূল' একখানি পাঠাইয়াছি। আপনি পুরাবৃত্ত জানিতে উৎসাহী ; 'দুকূল' ভাল লাগিতে পারে।

এখন আপনার 'বিজয়লক্ষ্মী' ও 'যুগে যুগে' সম্বন্ধে লিখিতেছি। পূর্বের দুইখানা বইতে আপনি 'বাতাবরণ' লিখিয়াছেন। শব্দের অর্থ কি ? কোথায় পাইলেন ? আশ্চর্যের বিষয়, ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ও এক প্রবন্ধে 'বাতাবরণ' লিখিয়াছিলেন। আর এক আশ্চর্য কথা, সেদিন দেখিলাম শরৎ চট্টোপাধ্যায় 'মেজবৌ' উপন্যাসে লিখিয়াছেন, 'পিতলের থালার উপরে ভাত রাখা হইয়াছিল।' তিনি যে ইংরেজির অনুবাদ করিতেছেন, বুঝিতে পারেন নাই। আপনিও এক থালার উপরে ময়দা রাখিয়াছিলেন। টেবিলে বসা, দেখিতেছি প্রায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

আপনার 'বিজয়লক্ষ্মী' পড়িয়াছি, গল্পটি মন্দ নয়। কিন্তু সমাপ্তিতে সিনেমা-গন্ধ বাহির হইতেছে। অট্টালিকা পুড়িতেছে, নল দিয়া ছর্‌ছর্ করিয়া জল পড়িতেছে। লোকেব কোলাহল, ছুটাছুটি চিত্রে প্রদর্শন দ্বারা জনতা আকৃষ্ট হয়। বৃদ্ধটি যখন-তখন যেখানে-সেখানে উপস্থিত হইতেছেন। অসম্ভব মনে হয। বোধহয় সিনেমা ভক্তদের মন্দ লাগিবে না। কয়েকটির শব্দের বানান ভুল হইয়াছে। আপনিও কতকগুলি সংশোধন করিয়াছেন। 'মাচ্‌কোকের' কি ? জানি না। 'রাগি' রাগি হইবে। 'ভারী' ভারি হইবে। গুজব শব্দ বাংলায় চলে না, যদিও গুজ্‌রান আছে। মা-ষষ্ঠী' হইবে মা ষষ্ঠী। Veilয়ে হইবে veilএ। 'আতান্তরে' হইবে আথান্তরে। 'ধোঁকা খাইল' হইবে ধাক্কা খাইল। 'চপকাচ্ছ' হইবে কপচাচ্ছ। আশ্বিন অমাবস্যা দীপান্বিতা। ইহার সহিত লক্ষ্মীর সম্বন্ধ নাই। পিতৃপুরুষকে দীপ দেখাইবার নিমিত্ত দীপাবলী, অবিকল যেমন মহালয়া দীপান্বিতা। লোকে দীপাবলীর উৎপত্তি জানে না।

'যুগে যুগে' উদার-চরিত দস্যুর কীর্তি। দুঃসাহসিক কর্মের বিবরণ শুনিতে ছোকরাদের আগ্রহ আছে। গল্পটির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সিনেমা। রাজপুত দস্যুরা মদ্য পান করিত না? বঙ্গদেশেও এক এক দস্যু বিপন্নের সাহায্য করিত, আর দুঃসাহসিক কর্ম করিয়া লুকাইত। কিন্তু পানদোষে ধরা পড়িত। দেশের বিখ্যাত দস্যুদের কীর্তিকাহিনী ভুলিয়া যাইতেছি। এখন সন্ত্রাসকারী রাজদ্রোহীদের বীরত্ব শুনিতেছি।

কয়েকটি শব্দ ধরিতেছি। 'মগ ডাল' কলিকাতা অঞ্চলে আছে। অন্যত্র 'গাছের টং' (সংস্কৃত তুঙ্গ); হীরা 'ঝলঝল' করে না, জ্বলজ্বল করে। 'বৈরি' বোধহয় সং বধূটী, বাংলা 'বউড়ী' অপভ্রংশে বৌড়ী, পূবর্বঙ্গে 'বৌরী' অপভ্রংশে বৈরী। শব্দের আদ্যে ঔ স্থানবিশেষে ঐ হয়। যেমন যৌবন যৈবন। ইহার বিপরীত, পঁয়ত্রিশ—পৌঁত্রিশ; ভৈরব—ভৌরব। 'পাঁচিল' হইবে পাঁচীল। পাঁচীল চব্বিশ পরগণার, অন্যত্র পাঁচীর। 'আচমনী চট্' কি রকম? 'ঘাঁটি' হইবে ঘাটি। কলিকাতা অর্থাৎ চব্বিশ পরগণায় ও নদীয়া জেলায় চন্দ্রবিন্দুর ছড়াছড়ি বলিলে হয়। আমাদের কানে নূতন ঠেকে। ঘাট-ঘাটি-ঘাটিয়াল, —ঘাটোয়াল, এত শব্দ থাকিতে 'ঘাঁটি' কেমনে আসে? সংস্কৃত খুজ্ ধাতু বাংলায় খুজ, কলিকাতায় খুঁজ ইত্যাদি। বাঁশের 'এড়ো বাঁশী' নয়, আড় বাঁশী (flute) কৃষ্ণ এই বাঁশী বাজাইতেন। পিঠে লাদাই (পৃঃ ৯০); লাদাই শব্দটি আপনি কোথায় শিখিলেন? লাদ ধাতু গ্রামে প্রচলিত, সহুরে লোকেরা শুনে নাই। কিন্তু লাদাই=লাদানা কর্ম, নূতন শুনিতেছি, যদিও শুদ্ধ। 'দন্ত বিকীর্ণ' হইবে কিরূপে? দন্ত বিকশিত? 'এক চিল্‌তা কাগজ' চিলতা বোধহয় হিন্দী। বাংলায় শুনি না। বাংলায় 'চির' বলিতে পারা যায়।

আশা করি এই সকল মন্তব্য দ্বারা আপনার কিছু উপকার হইবে। আমার কাছে আর বই পাঠাইবেন না। ছয়খানা বই পড়িয়াছি। আর কাহারও এত বই পড়ি নাই। আপনি আপনার বই সম্বন্ধে আমার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করিয়া পাঠাইয়া থাকিবেন। কিন্তু আমার অভিমতের কোনও মূল্য নাই। তথাপি আপনাব সন্তোষের নিমিত্ত পৃথক কাগজে কিছু লিখিতেছি। এখানে এখন ভারি শীত। বোম্বাইতে শীত-গ্রীষ্ম নাই। বেশ আছেন। আব কতকাল প্রবাসে থাকিবেন? একটা কথা জানিতে ইচ্ছা হয়। আপনি অনেক বই লিখিয়াছেন, প্রকাশকও পাইয়াছেন, তাঁহারা কি নিজেদের পয়সায় ছাপাইযাছেন? আপনি royalty পান? কি হিসাবে? গল্পের বইয়ের প্রকাশক জোটে, তাঁহারা শুধু বই ছাপান না, লেখককে বিলক্ষণ পারিশ্রমিক দেন। গল্পের বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখি, অন্য বইয়ের নাই।

ইতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

পুনশ্চ: বোম্বাই অঞ্চলে মুড়ি-চালভাজাআছে কি? খই আছে, মুড়কি আছে কি? কোন্ কোন প্রদেশে মুড়ি আছে, আপনি বলিতে পারেন?

১৩

Bankura
2.1.49

বিদ্বদ্‌বরেষু,

Muslim শব্দ ইংরেজি হইয়া গিয়াছে। উৎপত্তি, মেসোপোটেমিয়ার এক নগরের নাম, তাহা হইতে ফরাসী, ফরাসী হইতে ইংরেজি। দুকূল শব্দের ব্যুৎপত্তি ঠিক জানা নাই। টীকাকারেরা

অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িয়াছেন। লতা শব্দের এক অর্থ শাখা। শালপাতা শালবৃক্ষের শাখা। যেহেতু শাখা সোজা ঊর্ধ্বদিকে না উঠিয়া বাঁকিয়া পড়ে। কিন্তু প্রয়োগে বৃক্ষের কাণ্ড হইয়াছে। শকুন্তলায় শমীলতা ছেদনের উপমা আছে। সেখানে শমীশাখা না বুঝিয়া শমীর কাণ্ড বুঝিতে হয়। আমরা পূজার সময় পুত্রকন্যাকে 'উপহার' দিই না। দিই পার্বণী। আপনি বিজয়লক্ষ্মীতে 'উপহার' লিখিয়াছেন।

ইতি
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

১৪

Bankura
West Bengal
3.2.49

বিদ্বদ্‌বরেষু,

"বনবেতসের বাঁশীতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ"—আমার বোধাতীত। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবিরশ্মিতে পড়িয়াছি,—কবি চারুবাবুকে লিখিয়াছিলেন বেতন অর্থে বেত হইতে পারে না ; এক অভিধানে আছে, বেতস বেণু। 'অকৃপণ অভিধানে' পাইবে। আমার বোধহয় তিনি Monier Willians কৃত সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানে পাইয়া থাকিবেন। তাহাতে আছে, বেতস The ratau, a reed, a cane. শকুন্তলার বেতসগৃহ a house of reeds সাহেব ভাবেন নাই। শর, নল কিম্বা বেণু কুঞ্জ হইতে পারে না। আর বেতস একটি লতা, সোজা অনমনীয় গাছ হইতে পারে না। মনে করি যেন বেতস বেণু। তাহাতেই বা কি অর্থে দাঁড়ায় ? আপনি কবি, বলিতে পারেন। আর বনের বেণুর বাঁশী বলার সার্থকতাই বা কি ?

কদম্ব দুই প্রকার। আমার লবঙ্গলতা পড়িবেন। সংস্কৃত কবিরা নীপ ও কদম্বের মধ্যে প্রভেদ রাখেন নাই। বসন্তের কদম্বপুষ্প সুগন্ধ।

আমার অনুলেখক 'শাললতা' সম্বন্ধে লিখিতেছে, আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। তাহার বাড়ির চারিদিকেই শালবন। শালের নবোদ্‌গত শাখা কোমল তনু ও পীতাভ। বোধহয় এই হেতু সীতার উপমা হইতে পারিয়াছে।

আপনি দেখিয়া থাকিবেন বঙ্গীয় বর্তমান কবিরা (জল্পক, পদ্যক ও নাট্যক) বাহ্য প্রকৃতি লক্ষ্য করেন না, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ, পুষ্প ইত্যাদির উপমা দেন না।

এখানে এখনও শীত।

ইতি
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

১৫

বাঁকুড়া
২২ আষাঢ় ১৩৫৬

নাট্যলেখক মহাশয়,

আপনার দুইখানা পত্রই পাইয়াছি। 'দেবী' পদবী লোপ পাইতেছে। কারণ, অন্যেরা দাসী হইতে চাহে না। তারপর. চিত্রনাট্যের "নক্ষত্রেরা" দেবী হইতেছে। নির্মলা "বাব্বী" নয়, নির্মলা

বাবী। এই জেলা [য়] 'বাবী' পদবী বহু প্রচলিত আছে। 'ভারতবর্ষে' আপনার চিত্রনাট্যের বিবরণ পড়িতেছিলাম। কিন্তু এই মাস হইতে 'ভারতবর্ষ' আর পাইব কিনা সন্দেহ। 'ভারতবর্ষ' হইতে একটু অংশ তুলিয়া দিয়া তাহার ইংরেজি-বাংলার নমুনা প্রবাসীতে দেখাইয়াছি। "স্যার যদুনাথ সরকারের ৭৮ বৎসর পূর্ণ হওয়াতে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করা হইয়াছে"...ইত্যাদি। ভারতবর্ষ নিশ্চয় আমার আস্পর্দ্ধায় রুষ্ট হইয়াছে। আপনার তিনটি পরিচ্ছেদ পড়িয়া চিত্রনাট্য নির্মাণের আভাষ পাইয়াছি। আমি কখনও ভাবি নাই একটা ছবি তৈয়ার করিতে দুই তিন লক্ষ টাকা লাগে। এক এক ছবিতে এত খরচ, তবু অসংখ্য ছবির নাম প্রত্যহ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইতেছে। সিনেমার অধিকারী কত টাকা উপার্জন করে ?

আপনি 'আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী' তিনবার পড়িবেন। ধন্য আপনার ধৈর্য। আমি লেখক। লিখিবার সময় ও ছাপাইবার সময় একবার পড়িয়াছি। আর যে কবে ছাপা হইয়াছে, তাহার পর একবারও দেখি নাই। জ্যোতিবিদ্যার আদান প্রদান লিখিবার এমন বিদ্যা নাই, সামর্থ্য নাই। যবনদের নিকট বিশেষত টলেমির নিকট হইতে আমাদের জ্যোতির্বিদেরা কি বিষয়ে ঋণী, এক ইংরেজি গ্রন্থে বাঙ্গালী গাণিতিক তাহা দেখাইয়াছেন। সে সব চর্চা আমার পক্ষে অসম্ভব।

এ বৎসর এখানে গ্রীষ্ম প্রখর হয় নাই।

ইতি
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

১৬

Bankura
W. Bengal
9 Aug. 1949

চিত্রনাটকলেখক মহাশয়,

কলিকাতা আসিয়াছিলেন কি ? বাঁকুড়া বোম্বাই পথে পড়ে না। তথাপি ভাবিয়াছিলাম আসিতে পারেন। বুঝি বাবী চলিবে না, বাঈ চলে কি-না দেখিব। চিত্রের নক্ষত্রমালা দেবী হইয়া দেবী উপাধির ইজ্জত গিয়াছে, তাছাড়া, কেহ দাসী লিখিতে চায় না, দেবী লিখিতেও সাহস হয় না। বেন শব্দ বোধহয় বহিন্ অর্থাৎ বাংলার দিদি। মহিলারা দিদি দি বলেন, কিন্তু তুষ্ট নহেন। ভারতবর্ষ পাইতেছি। আপনার সমাপ্তির অংশ পড়িয়াছি। আপনি চিত্রনাট্যের ভিতরের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া বোধহয় শত্রু সংগ্রহ করিয়াছেন। আপনার এই বই আর পাঠাইতে হইবে না। আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় আমার একটা প্রবন্ধ ছাপা হইবে। পাইলে পড়িবেন। নমস্তে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

মোহিতলাল মজুমদার

38, Nilkhet Rood
Ramna
Dacca 10. 8. 1940

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার বই দুইখানি উপহার পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আপনার লেখা ইতিপূর্বে আমার পড়া ছিল—'বিষকন্যা'র সব গল্পগুলিই পড়িয়াছিলাম। এই গল্পগুলিই আপনার শক্তি সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আপনার উপন্যাস ইতিপূর্বে পড়ি নাই—'ঝিন্দের বন্দী' পড়িলাম।

এককালে Rider Haggard ও Conan Doyle পড়িয়াছি—রোমান্স ও ডিটেকটিভ কাহিনী ভাল না লাগিয়া পারে না—এখনও পড়িতে ভাল লাগে—অমন recreation আর নাই। Anthony Hope-এর কিছু পড়ি নাই ; কিন্তু আপনার এই উপন্যাস যদি তাঁহারই কোন পুস্তকের দেশী রূপান্তর হয়, তবে একথা বলিব যে ওরূপ উপন্যাস পড়িবার বয়স একটাই আছে—দুইবার পড়া যায় না, এ বয়সে একবারও নয়। বাংলা মাসিকপত্র যাঁহারা পড়িয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য এমন মুখরোচক আর কিছু নাই। আপনি এই পুস্তকে যে মুন্সিয়ানা দেখাইয়াছেন তাহার তারিফ অবশ্যই করি, কিন্তু এইরূপ পরিশ্রম করিয়া আপনার শক্তির অপব্যয় করিতে বলি না।

আপনার যে শক্তি ও সাধনা দুই আছে তাহার প্রমাণ আপনার ওই গল্পগুলি। আপনার সাহিত্যিক পাণ্ডিত্য এবং কল্পনাশক্তি দুইই আছে—এই দুয়ের সঙ্গে আপনার মনের যে এক ধরনের romantic প্রবৃত্তি আছে—ভারতের অতীতকে, হিন্দু-ক্ল্যাসিক্যাল বা বৌদ্ধ monastic ভাবরূপকে পুনরুদ্ধার করিবার যে কবিত্বময় স্পৃহা আছে, তার পরিচয় পাইয়া আমি বড় খুশী হইয়াছি—ঐ স্বপ্ন আমারও আছে। এপিক যুগের ভারতের চিত্র আমরা পুরাণ সাহিত্যে বড় কম পাইয়াছি ; কিন্তু এই বৌদ্ধ-হিন্দু ক্ল্যাসিক্যাল যুগের যে পূর্ণতর ভারতীয় সভ্যতা, তাহার জীবন্ত চিত্র কাব্যগত হয় নাই। আপনার গল্পগুলি পড়িয়া মনে হয়, আপনি এ যুগের সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষার্থীর মত অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাহার উপর আপনার যে রোমান্স রচনার শক্তি আছে, তাহাতে আশা হয় আপনি potboiler জাতীয় সাহিত্যকর্ম ত্যাগ করিলে—এই দিকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন—বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের একটা অভাব মোচন হইবে।

আপনাকে এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন করি—কিছু মনে করিবেন না—আপনার সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা থাকা দরকার, আপনার গল্পগুলি কি সম্পূর্ণ মৌলিক ? চন্দনমূর্তি, মরু ও সঙ্ঘ এবং প্রাগজ্যোতিষ—এই গল্পগুলিতে বাহির হইতে কোন উপাদান বা কিছুর ছায়া নাই ত ? অবশ্য আপনি যে অসংখ্য বিদেশী গল্প পড়িয়াছেন তাহা হইতে আপনার কল্পনাকুশলী শিল্পীমন এমন ইঙ্গিত ও উপকরণ চয়ন করিবে—ইহা স্বাভাবিক। 'মরু ও সঙ্ঘ' গল্পটি এক হিসাবে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছে। কেবল, ঐ "অসতো মা সদ্গময়" এই শ্রুতিবাক্য বৌদ্ধশ্রমণের মুখে না দিলেই ভাল হইত।

আপনাকে অন্তরের ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনার লেখা আরও পড়িতে চাই। প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

ইতি
আপনার কুশল অভিলাষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২

38, Nilkhet Road
Ramna
Dacca 30. 8. 1940

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার দ্বিতীয় পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি—উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, সেজন্য দুঃখিত হইবেন না। আমাকে এরূপ পত্র দিলে আমি বিরক্ত হইব না, বরং সুখী হইব, কারণ আপনাদের মত সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ করাই আমার আনন্দ ও কর্তব্য দুই-ই। সে আলাপ চাক্ষুষ হইবার যো নাই, হয়ত (আপনার সঙ্গে) কখনও হইবে না। অতএব পত্রে আপনার সাহিত্য-সাধনা ও সাহিত্যপ্রীতির আলাপন সাগ্রহে পাঠ করিব।

আপনি বিদেশী লেখকের প্রভাব সম্বন্ধে আমার প্রশ্নের উত্তরে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে খুব আশ্বস্ত হইলাম। আপনার লেখায় যে রস আমি আস্বাদন করি, তাহাতে বিদেশীর ছায়া বা কায়াও যদি থাকিত, তাহাতে আপনার শক্তি সম্বন্ধে আমার ধারণা কিন্তু ভিন্ন হইত না; আমি আপনার লেখার অনুরাগী এবং লেখার মধ্যে কোন বস্তুটি প্রতিভার লক্ষণ তাহা আমি জানি। অতএব এ বিষয়ে আপনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইবেন না।

আপনার 'ঝিন্দের বন্দী' সমস্ত উপন্যাসখানির প্রকৃতি যেমনই হৌক— উহার নায়িকার যে চিত্র আপনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা আজও এ বয়সে আমাকে প্রথম যৌবনের কাব্যরসবিহ্বলতায় আবিষ্ট করিয়াছে। মূলে কি আছে জানি না, কিন্তু আমাদের আদি ও শ্রেষ্ঠ রোমান্স-কবি বঙ্কিমচন্দ্রের তুলিকার অনুপযুক্ত নহে। 'মরু ও সঙ্ঘ' আপনার একটি উৎকৃষ্ট রচনা। বোধহয় এ লেখা—অন্যগুলির তুলনায় পরিণততর রচনা। আপনার রচনায় যে ধরনের কবিত্বময় কুশলী কল্পনার অবাধ - সুন্দর গতি আছে—যৌবনদীপ্ত প্রাণবন্ততার সঙ্গে যে বৈদগ্ধ্য ও রসসৃষ্টি আছে তাহা আমার ব্যক্তিগত রুচির পক্ষে বড়ই উপাদেয়। আপনার কাব্যপ্রেরণায় খাঁটি বাঙ্গালীত্ব আছে—কারণ, আপনি যে রোমান্সের ভক্ত, সেই রোমান্স বাঙালীর প্রকৃতিগত—বাংলা সাহিত্যে এই প্রবৃত্তি রুদ্ধ হওয়ায় কাব্য ও উপন্যাস জীবনীশক্তিহীন হইয়াছে। আপনাকে উৎসাহ দিবার কাল আর নাই—আপনি এখন একজন আত্মস্থ আর্টিস্ট—নিজেকে আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাই আশা ও কামনা করি যে, আপনার অন্তরলোকে যে কাব্য ভুবন গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহাকে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলুন।

গত জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে আপনার ছোট একটি রচনা 'রোমান্স' এই মাত্র পড়িলাম, খুব ভাল লাগিল। এইমাত্র 'বনফুলে'র চিঠি পাইলাম। তিনিও আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি দেখিতেছি, নূতন লেখকদের মধ্যে (যাঁহারা ইতিপূর্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা

নয়) আপনারা কয়জন সকল সাহিত্যরসিক বাঙালীর চিত্তে আপন-আপন আসন গ্রহণ করিতে চলিয়াছেন, আপনারাই অতি আধুনিক সাহিত্যে বাঙালীর মান রাখিবেন। তারাশংকর, আপনি, বনফুল, অমূল্য (সম্বুদ্ধ) বিভূতি মুখো—এই কয়জনের লেখায় আমি খাঁটি সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিভার পরিচয় পাই—অথচ সকলের লেখা এক জাতীয় নয়—না হইবারই কথা। যে অ-সাহিত্যের প্রসার ও প্রতিপত্তি দেখিয়া একদিন আমি কাব্যসাধনা ত্যাগ করিয়া—বাঁশি ছাড়িয়া লাঠি ধরিয়াছিলাম, আনন্দকে ত্যাগ করিয়া নিরানন্দকে বরণ করিয়াছিলাম, সেই অ-সাহিত্য—সেই অতিশয় অ-বাঙালী ও কৃত্রিম—অক্ষম ও অস্বাভাবিক উপদ্রব হইতে বাঙালীর রুচি ও রসবোধকে রক্ষা করা যে সম্ভব বলিয়া এতদিনে আশা হইতেছে—তাহা আপনাদের মত কয়েকজন সত্যকার সাহিত্য-প্রাণ লেখকের সাধনায়। আপনারা যে আমাকে আপনাদের সাধনার পথে স্মরণ করিয়া থাকেন, তাহাতে আমার বিশ্বাস হয় যে, হয়ত আমি ভুল করি নাই ; আমার আত্মত্যাগ (আত্মহত্যা ?) হয়ত কিঞ্চিৎ ফলপ্রসূ হইয়াছে।

অন্নসংস্থানের জন্য উঞ্ছবৃত্তি আমাদের সকলকেই করিতে হইতেছে—আমিও করিতেছি ; বাঙালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিদ্যাদান হইয়া থাকে, তাহাতে যে আমিও যুক্ত আছি—ইহার মত অপরাধ আর কি হইতে পারে ? জানিয়া শুনিয়া পেটের দায়ে সরস্বতীর অবমাননায় যোগ দিয়াছি—অসত্য আচরণ করিতেছি। তাহার তুলনায় আপনারা অনেক বেশি নিষ্পাপ। তবু আশঙ্কা হয়—আপনাদের মত সারস্বতগণ সময়ের অভাবে ও 'কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধি'র ফলে, শেষ পর্যন্ত পূর্ণসিদ্ধিলাভে বঞ্চিত আছেন।

আপনার আর যাহা আছে আমাকে পাঠাইলে আনন্দের সহিত উপভোগ করিব। বলা বাহুল্য, আপনার সহিত পত্রালাপ বন্ধ না হইলেই সুখী হইব।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন।

ইতি
গুণমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩

38, Nilkhet Road
Ramma
Dacca 8. 9. 1940

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার আরও দুইখানি বই উপহার পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। বই দুইখানি প্রাপ্তিমাত্র পড়িয়া ফেলিয়াছি।

গল্পগুলির সবগুলিই আনন্দদায়ক—সে আনন্দকে ত্বরিতানন্দও বলিতে পারি, অবশ্য রূঢ় অর্থে নয়। ইংরেজিতে যাহাকে entertaining বলে—আপনার প্রায় সকল গল্পই তাই ; গল্পগুলির অধিকাংশই গল্প এবং সে গল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি—অর্থাৎ পাঠকের মনোহরণ। মনোহরণ বলিলেই খুব বড় একটা কিছু বুঝায় না বটে, কারণ মনোহরণের আর্ট বা

কৌশল সকল ক্ষেত্রে—মার্জিতরুচি শিক্ষিত পাঠকের মনোহরণ করিবার শক্তি যাঁহার আছে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও রসবোধ উচ্চস্তরের হইতেই হইবে। আপনার গল্পগুলিতে কবিমানসের সকল বৃত্তিই অল্পাধিক পরিমাণে আছে—Fancy, Imagination, Invention-এর চপল চটুল ক্রিয়া রহিয়াছে, সেই সঙ্গে সাহিত্যিক শক্তি অর্জনের জন্য যে সাধনার প্রয়োজন, সেই সাধনার পরিচয় সর্বত্র রহিয়াছে। আপনার ভাষার এবং রসের পাক সুসম্পন্ন করিবার জন্য যে সকল মালমশলা ব্যবহার করিয়াছেন—তাহাতে যে-বৈদগ্ধ্য ও সাহিত্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বড়ই তৃপ্তিদায়ক।

রোমান্সই যে আপনার কবিত্বের মূল প্রেরণা তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনি বাস্তবের বাস্তবতা খুঁড়িয়া দেখিতে চান না, জীবনের কোন ব্যাখ্যা বা philosophy আপনার মনকে চাপিয়া ধরে না—সে পিপাসা আপনার নাই; অর্থাৎ আপনি Keats-এর Nightingale-এর মত ভাগ্যবান—মানবমনের বা প্রকৃতির চিরবসন্তের দেশে পলাইয়া বাঁচিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন; সেই দেশ—

Where the daisies are rose-scented
And the rose herself has got
Perfume which on earth is not.
Where the nightingale doth sing...
Tales and golden histories—

আপনারও গানের বস্তু এই 'Tales and golden histories'। আজিকার এই অতিজাগ্রত চেতনার যুগে মানুষের সে শক্তি লোপ পাইতেছে, শুধু তাহাই নয় তাহাদের মনুষ্যত্বও বিকারগ্রস্ত হইতেছে। খুব বড় কবিত্ব অবশ্য তাহাই যা এই ব্যাধি ও বিকার, দ্বন্দ্ব ও সংশয়কেই রসসৃষ্টির উপাদান করিয়া লইতে পারে। আপনার কাজ তাহা নয়—আপনি বেশিদূর যাইতে রাজী ন'ন—passion ও emotionগুলিকে পাক করিয়া একটু রস তৈয়ার করিয়া দেন এবং ইহার জন্য situation, incident ও character নিজের মত করিয়া গড়িয়া লন। এই কবিমনোবৃত্তি আপনি যে এযুগেও রক্ষা করিয়াছেন—আজিকার এই "weariness, fever and fret"-এর দ্বারা কবলিত হইয়াও আপনি যে সুর কানে ধরিতে পারেন—

The same that oft-times hath charmed magic casements, opening on the foam of perilous seas in facry lands forlorn.

—ইহাই আপনার বাহাদুরী।

জানি না, যাহারা এইরূপ কাব্যরসকে এখনকার মানস-উৎকর্ষের গর্বে প্রকাশ্যে তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে তাহারাও আপনার গল্পগুলি পড়িয়া তৃপ্তি পায় কিনা (আমার কথা স্বতন্ত্র, আমি সেকেলে লোক, আমার নিজের কাব্যও (আপনি বোধহয় কিছু কিছু পড়িয়াছেন) সম্পূর্ণ রোমাণ্টিক, আমার আদর্শও আধুনিক নয়—চিরন্তন; তাই আজ আমিও ancient fossil হইয়া গিয়াছি; আমাকে আধুনিকেরা কবিসভা হইতে খারিজ করিয়া দিয়াছে। তাহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই; এযুগে সত্যকার রসিকের সংখ্যা খুবই কম হইবার কথা। কিন্তু আপনার রচনায় যে রসিকতা আছে, তাহা স্বাভাবিক ক্ষুধা তৃষ্ণার মতই—মানুষ মাত্রেই তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবে। প্রকাশ্যে না করিলেও গোপনে করিবে, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

কিন্তু এই যে শক্তি আপনার আছে তাহার অপব্যয় করিলে চলিবে না—রোমান্স জিনিসটা অতি সহজেই খেলো হইয়া যায়; একদিকে যেমন ও-কল্পনা irresponsible, তেমনই অপরদিকে রসপ্রেরণা খাঁটি না হইলে মাটিতে পড়িয়া মাটি হইয়া যায়। চুটকি রচনার আর্টও বড়

আর্ট, কিন্তু point miss করিলে—miss is a mile; খেয়ালমাত্রকেই লিপিবদ্ধ করিবেন না। কেবলমাত্র লেখার গুণেই বা রচনা-কৌশলে রসসৃষ্টি হয় বটে কিন্তু যে লেখায় ঘটনা বা situationই প্রধান, সেখানে কাহিনী সম্পূর্ণ হওয়া চাই—কোন link-এর অভাব না থাকে। জানি না হয়ত সকল গল্পই ভিতরকার তাগিদে লেখা নয়—সেই জন্য কোন কোনটি একই লেখকের লেখা বলিযাই মনে হয় না। কোন গল্পের একটি অংশমাত্র নিখুঁত, বাকিটা তৃতীয় শ্রেণীর কল্পনা। যেমন 'চুয়া-চন্দন'—ইহার আরম্ভটি অনবদ্য, কিন্তু বাকিটা আপনার মত লেখকের উপযুক্ত মোটেই নয়। 'মরণ-ভোমরা'র কল্পনা সার্থক হয় নাই। 'রক্ত খদ্যোৎ'ও প্রায় সেই রূপ। 'চুয়া-চন্দনে'র তিনটি গল্প ভাল হইয়াছে—সর্বোৎকৃষ্ট হইতেছে "বাঘের বাচ্ছা"—একেবারে প্রথম শ্রেণীর। ইহাকেই বলে "reconquest of antiquity"। ইহা আপনার ঐতিহাসিক কল্পনার একটি চূড়ান্ত নিদর্শন। 'কর্তার কীর্তি' স্থূল হাস্যরস হিসাবে সফল হইযাছে। 'রক্তসন্ধ্যা'য আপনি একটু গোলমাল করিয়া ফেলিযাছেন—মূল গল্পটি পৃথকভাবে সুকল্পিত ও সুরচিত হইয়াছে, কিন্তু setting-টা ভাল ফিট করে নাই—দুইটির মধ্যে নাড়ীর যোগ ঘটে নাই—দুই কাহিনীর সংযোগ ব্যাপারেও ফাঁকি আছে। কিন্তু মূল গল্পটি পৃথক করিয়া ধরিলে গল্পটি স্বয়ংপূর্ণ ও সুসম্বন্ধ হইয়াছে। আপনি উহার যে bizarre-রস যুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু তাহা সুপ্রযুক্ত হয় নাই। 'বুমেরাং'-এর সর্বোৎকৃষ্ট গল্প—'হাসি কান্না'। হাস্যরসের দিক দিয়া 'তন্দ্রাহরণ' একটি gem। এবং কল্পনার বৈদগ্ধ্য, সূক্ষ্ম হাস্যরস বা খাঁটি humour ও লেখনির পাকা মুন্সিয়ানার দিক দিয়া 'অমরবৃন্দ' আপনার একটি উৎকৃষ্ট রচনা। নিকৃষ্ট রচনা তিনটি—সবুজ চশমা, বহুবিঘ্নানি, কেতুর পুচ্ছ। বাকিগুলি চলনসই।

আমার মতামতের সঙ্গে আপনার নিজের মিল হইবে কিনা জানি না, তথাপি আশা হয় খুব অমিল হইবে না। আপনার এ দুইখানিও আমি খুব উপভোগ করিয়াছি এবং শেষ করিযা ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নাই। ইহার পর আপনার 'ডিটেকটিভ' গল্পগুলিও পড়িতে চাই। 'জাতিস্মর'-এর বিজ্ঞাপন দেখিলাম, পড়িতে উৎসুক হইয়াছি। পাঠানো সম্ভব হইবে কি? আমার কোনো বই আপনার নিকট আছে কি?

কুশল প্রার্থনা করি।

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ওঁশ্রীহরি

কুড়মিঠা
বাতিকার-ডাকঘর
বীরভূম
পশ্চিমবঙ্গ
১৩৬১/১৮ শ্রাবণ

সোদরপ্রতিমেষু,

আশীর্বাদ লও।

পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমরা—আমি এবং তোমার বৌঠাকুরুণ—মুঙ্গেরের কথা, কয়েকদিনের তোমাদের সাহচর্যের মধুর স্মৃতি প্রায়ই আলোচনা করি। পত্রে তুমিও মুঙ্গেরের

কথা উল্লেখ করিয়াছ। ভাবিয়াছিলাম হয়তো ভুলিয়া গিয়াছ। আমি তোমার জন্য লোকের কাছে গর্ব করিয়া বেড়াই। তুমি এবং বলাই আমার গৌরবের বন্ধু, সোদরাধিক সুহৃদ। অযোগ্য হইলেও আমাকে তোমরা অগ্রজের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিয়াছ। তোমরা দীর্ঘজীবী হও। আরো বড় হও।

আমি শীঘ্রই কলিকাতা যাইব। কলিকাতা মাঝে মাঝে যাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়া দিও যেন বইগুলি আমার হাতে দেন। অত বই ডাকে পাঠাইতে খরচ হইবে। তার প্রয়োজনও নাই। আমি সপ্তাহ মধ্যেই কলিকাতা চলিলাম।

বাঙ্গালার তথা ভারতের ইতিহাস আমার অন্যতম প্রিয় বস্তু। তুমি যখন সেই ইতিহাসের উপকরণ লইয়া গল্প উপন্যাস লেখ, অতীতের সুন্দর বাতাবরণ সৃষ্টি কর, সেকালের সম্রাট, সেনাপতি সামন্ত, সেই নাম ধাম, সেকালের উপযোগী কথোপকথন—সে এক অভিনব কল্পলোক। আমি সব চোখের সম্মুখে দেখি—একেবারে সেকালে গিয়া উপস্থিত হই। দুর্গেশনন্দিনীতে, রাজসিংহেও ইতিহাসের ছায়া আছে। কিন্তু কালের মন্দিরা ও গৌড়মল্লাবের সঙ্গে তাহার পার্থক্য কত।

তুমি চেদীরাজ কর্ণদেব ও বাঙ্গালার পাল সম্রাটদের লইয়া একখানি উপন্যাস লেখ। কর্ণদেব আপন কন্যা যৌবনশ্রীকে বিগ্রহপালের হাতে দিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার সে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। রাঢ়ের তখন বিপুল প্রাচুর্য। চেদীরাজ আট বৎসর ধরিয়া দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

কুশল কামনা করি।

ইতি
আঃ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

২

"সারদা কুটীর"
কুড়মিঠা
ডাকঘর—বাতিকাব
বীবভূম
১৩৬১/১১ কার্তিক

সোদরপ্রতিমেষু,

আশীর্বাদ লও। তোমার পত্র পাইলাম। ঁরাখালদাস বন্দ্যোব বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম খণ্ড ও ঁনগেন্দ্রনাথ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের রাজন্যকান্ড গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে চেদীরাজ কর্ণদেবও নয়পালও বিগ্রহপালের কথা আছে। বাঙ্গালার মাৎস্যন্যায় প্রশমন জন্য বাঙ্গালী প্রধানগণ গোপালদেবকে রাজা নির্বাচিত করেন। গোপালের ইতিহাস বিখ্যাত পুত্র ধর্মপাল। ইঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর নাম গর্গদেব। ইঁহারই মন্ত্রণা কৌশলে ধর্মপাল সমগ্র উত্তরাপথে রাজচক্রবর্তী পদবীতে আরূঢ় হন। এই বংশে নয়পালের উদ্ভব। নর্মদা নদীর তীরবর্তী জব্বলপুরের নিকটস্থিত ত্রিপুরীর অধীশ্বর গাঙ্গেয়দেবের পুত্র চেদীবংশীয় নরনাথ কর্ণদেব জীবনের অধিকাংশ দিন দিগ্বিজয়ে অতিবাহিত করেন। ষাট বৎসর এইরূপে ব্যয়িত হয়। তিনি নয়পালের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া যুবরাজ বিগ্রহপালের করে কন্যা যৌবনশ্রীকে সমর্পণ করেন। কর্ণদেবের জ্যেষ্ঠাকন্যা বীরশ্রীকেও একজন রাজা বিবাহ করেন তাহার নাম জাতবর্মা। তোমার পক্ষে এই কাহিনীই তো যথেষ্ট।

গৌড়মল্লারে তুমি ইতিহাস লিখিয়াছ কতটুকু ! উপাদান কিই বা পাইয়াছ। তাহা অপেক্ষা এ উপকরণ তো যথেষ্ট বলিতে হয়। কর্ণদেব ও নয়পালের যুদ্ধে অতীশ দীপঙ্কর মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মরূপে প্রবলও ছিল। কিন্তু তথাপি হিন্দুধর্মও নিষ্প্রভ ছিল না, এবং রাজগণ হিন্দুমন্ত্রীর অনুগত ছিলেন। হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। কর্ণদেব চর্তুভুজ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের অন্যতম আচার্য দীপঙ্কর প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। তিনি চীনদেশে গিয়েছিলেন।

তুমি রাখাল বন্দ্যোর 'ধর্মপাল' পড়িলে সেকালের বাঙ্গালার অবস্থার আভাষ পাইবে। গৌড়মল্লারে বাঙ্গালার দুর্দিনের চিত্র আঁকিয়াছ। অধঃপতিত রাজবংশের এক কামোন্মাদিনী রানীর ছবি দেখাইয়াছ। ইহারই পরবর্তী অধ্যায় লিখিতে অনুরোধ করিতেছি। স্বাধীন বাঙ্গালার শৌর্যে বীর্যে মহিমান্বিত বাঙ্গালী, চাণক্যপ্রতিম ব্রাহ্মণ মন্ত্রী, ভিন্নধর্মাবলম্বী হইয়াও সর্বধর্মের উৎসাহদাতা বাঙ্গালী সম্রাট। ভাস্কর্যে ধীমান বীতপালের মত শিল্পী। সতীত্ব মুকুট মণ্ডিতা রাজেন্দ্রাণী। গুপ্তযুগের পর এই আর এক স্মরণীয় যুগ। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাকের রামচরিতের অনুবাদ পড়িলে আবার বাঙ্গালীর আর একযুগের পরিচয় পাইবে। আমি যদি কিছু ইহার অধিক পাই একটু অবসর পাইলেই তোমাকে লিখিব। বইগুলি এখনো গুছাইতে পারি নাই। বৃষ্টির অভাবে ফসল মরিয়া গেল, এই দুশ্চিন্তাতেও অস্থির হইয়া আছি। উপায় নাই। আজীবন কষ্টই ভোগ করিলাম। শেষ বয়সেও শান্তি পাইলাম না।

ইতি
আশীর্বাদক
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৩

ওঁশ্রীহরি

সারদা কুটীর
কুড়মিঠা
ডাকঘর—বাতিকার
বীরভূম

১৩৬১/২১ চৈত্র

সোদরপ্রতিমেষু,

আশীর্বাদ জানবে।

গৌড়মল্লারের সমালোচনা একটা লিখিয়া হরিদাসবাবুকে দিলাম। তিনি লিখিলেন ভাদ্রে নারায়ণ গঙ্গো একটা সমালোচনা লিখিয়াছেন অতএব 'ভারতবর্ষে' আর দেওয়া চলিবে না।

আমি কলকাতা গিয়া অন্য কাগজে দেওয়ার চেষ্টা করিব।

১ম মহীপালের পুত্র নয়পাল। তার পুত্র হয় বিগ্রহপাল। জয়পাল নয়, নয়পালই প্রকৃত নাম। ইহাদের রাজধানী ছিল গৌড়ে এবং মগধে। মালদহ এবং পাটনায়। মধ্যে মধ্যে মুদগগিরি অর্থাৎ মুঙ্গেরেও ইহাদের জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত হইত। ১ম মহীপাল রাজ্য হারাইয়া মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে—গয়েসপুরে নিভৃতে রাজধানী স্থাপন করিয়া বলসঞ্চয় করেন। এবং হৃতরাজ্য উদ্ধার করেন। নয়পাল এবং বিগ্রহপালের সঙ্গে চেদীরাজ কর্ণদেবের যুদ্ধ মগধে আরম্ভ হইয়া রাঢ় পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রাঢ়দেশের পাইকোড় (প্রাচীকোট) গ্রামে চেদীকর্ণের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ণদেবের রাজধানী ছিল জব্বলপুরে নর্মদার তীরে ত্রিপুরী। মর্মর পাহাড়ের সৌন্দর্য লালিতা কর্ণদেবের দুই কন্যা জ্যেষ্ঠা বীরশ্রী, জাতবর্মা ইহাকে বিবাহ করেন। বঙ্গ বা সমতট ইহাদের রাজধানী। দ্বিতীয়া কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করেন বিগ্রহপাল। বিবাহ বোধহয় রাঢ়দেশেই হইয়াছিল। পাইকোড়ের লিপি হইতে মনে হয় চেদীরাজ সেখানে কোন দেববিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। খ্রীস্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগের ঘটনা।

তোমার অমোঘবীর্য এক নায়ক কর্ণসুবর্ণের রাজবল্লভ। দ্বিতীয় মানবদেবও অমোঘবীর্য। গোপাও যেমন রাঙাও তেমনই এক রাত্রেই গর্ভবতী। অবশ্য অসম্ভব কিছুই নয়। আর সেকালে হয়তো এমনই হইত। যাক আমার সমালোচনাটিতে এসব কথা নাই। সংক্ষেপে দুই-চার কথা বলিয়াছি। কলিকাতা গিয়া দেখি কোন্ কাগজে দিতে পারি। আমি ৮ই এপ্রিল কলিকাতা পৌঁছিব। তুমি আমাকে কুশলসহ কলিকাতার ঠিকানায় পত্র দিও। কলিকাতাব ঠিকানা—১৯৮ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬।

আঃ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

রাজশেখর বসু

টেলিফোন—সাউথ ৯৬২
৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা
৩০-৬-৫১

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ২৬ তারিখের চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছি। দেশ-পত্রিকায় আমার প্রবন্ধের শেষে যা বলেছি তার উদ্দেশ্য বাঙালী গল্পকারদের হিন্দীতে লিখতে উৎসাহিত করা। বেশি বয়সে সাহিত্যিক হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করা সহজ নয়। তথাপি এই আশায় কয়েকজনের নাম করেছি, যে তাঁদের মধ্যে কারও বা তাঁদের তুল্য শক্তিধর কোনও লেখকের যদি হিন্দীজ্ঞান থাকে তবে তিনি পরীক্ষা করে দেখবেন।

অনুমতি নিয়ে বা না নিয়ে অনেক বাংলা রচনার হিন্দী অনুবাদ হয়। এতে এই প্রমাণ হয় যে বাঙালী ময়রার মিষ্টান্নের মতন বাঙালী লেখকের গল্পও হিন্দীভাষীর প্রিয়। কিন্তু অনুবাদ কখনও মূলের সমান হয় না, অধিকাংশ অনুবাদই অক্ষম লোকের করা। বাঙালী গল্পকার যদি স্বয়ং হিন্দীতে লেখেন তবে ভাষায় কিছু কিছু ভুল থাকলেও তাঁর লেখা অধিকতর জনপ্রিয় হবে। আমার কয়েকজন উত্তরপ্রদেশী ও পঞ্জাবী সাহিত্যানুরাগী বন্ধু এই কথা খুব জোর করেই বলেন।

হিন্দী প্রকাশক উপযুক্ত মূল্য দেবে না তা ঠিক। কিন্তু বাঙালী প্রকাশক যদি সাহস করে যোগ্য বাঙালী লেখকের স্বরচিত গল্প বাজারে ছাড়েন তবে ঠকবেন না। অবশ্য প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য নূতন লেখককে প্রথম প্রথম বিনামূল্যে হিন্দী পত্রিকায় রচনা দিতে হবে।

আঠারো বৎসর বয়সে বিহারের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটেছে, এখন বাহাত্তরের কাছাকাছি পৌঁছেছি। হিন্দীজ্ঞান নগণ্য। সুতরাং শুধু অন্য লোককেই বলতে পারি—লেগে যাও দাদা, কিন্তু নিজের লাগবার সামর্থ্য নেই।

আমি আপনার একজন অনুরাগী পাঠক। আপনার শুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষা এবং প্রাচীন ও বিদেশী পরিবেশ সংবলিত গল্পগুলি (বিশেষত শিবাজী এবং মরাঠী পাত্র-পাত্রী বিষয়ক গল্পগুলি) খুব ভাল লাগে।

নমস্কার জানবেন।

বিনীত
রাজশেখর বসু

২

৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা
৯-৭-৫১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার ৫ তারিখের চিঠি পেয়ে সুখী হলুম। আমার বয়স সত্যই বাহাত্তরের কাছাকাছি, শরীর আর মনও তদ্রূপ, বাড়ির নম্বরও ৭২। তবে মাঝে মাঝে স্বভাবের এক অংশ জীর্ণ দেহ-মনের ওপর বিদ্রোহ করে, তখন যা হয় কিছু লিখি। আপনার সব লেখা না পড়লেও অনেক লেখাই পড়েছি, বৌদ্ধ আর মুসলমানপূর্ব যুগের গল্পও কতকগুলি পড়েছি। আপনার রচনা পেলেই আমি সাগ্রহে পড়ি।

ছেলেবেলায় Conan Doyle-এর Adventures & Exploits of Brigadier Gerard খুব ভাল লাগত, এখনও লাগে। শিবাজী-আরংজেবের বিরোধ উপলক্ষ্য করে এবং একজন বীর সৈনিককে নায়ক করে আপনি যদি ওই ধরনের গল্পাবলী লেখেন তবে তা আবালবৃদ্ধের প্রিয় হবে মনে করি।

আপনি কলকাতায় এলে দেখা পেলে সুখী হব।

আঃ রাজশেখর বসু

৩

টেলিফোন—সাউথ ৯৩২
৭২ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা
১-৮-৫২

প্রীতিভাজনেষু

আপনার ২৫ জুলাই-এর চিঠি পেয়েছি। আপনি হাসতে বারণ করেছেন, তবু হাসি এল। আমার বয়স বাহাত্তর পেরিয়েছে, শরীর মন দুইই অসুস্থ, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি (বোঁচকা বেঁধে সঙ্গে নেবার উপায় নেই), কবে থ্রম্বোসিস বা ওইরকম কোনও ল্যাটিন নামধারী যমদূত আসবে তারই প্রতীক্ষা করছি,—সুতরাং সম্পাদক আমি হব না তো হবে কে? এখন যা দু-একটা মাঝে মাঝে লিখি তা কেবল শরীর-মনের ওপর বিদ্রোহ করে। যাই হ'ক, আপনার প্রস্তাবিত 'হ্লাদিনী' নামটি খাসা। আপনি নিজেই সম্পাদক হবার যোগ্যতম লোক,—অভাবে প্রমথ বিশী। আপনি কলকাতায় এসে ব্যবস্থা করুন।

আশা করি ভাল আছেন।

আপনার
রাজশেখর বসু

৪

৭২ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫
১৩-২-৫৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার ৪ তারিখের চিঠি যথাকালে পেয়েছি। আপনার সকল রচনার মধ্যেই একটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই, যা আর কারও লেখায় নেই—বর্ণনার মাঝে মাঝে আপনার সরস obiter dictum। যেখানে পাঠককে থেমে উপভোগ করতে হয়, যেমন পোলাও খেতে খেতে পেস্তা বাদাম পেলে। আপনার 'অসমাপ্ত' বাদ দেবার দরকার দেখি না।

'দেশ' পত্রে 'দুর্গরহস্য' মাঝে মাঝে পড়েছি। সুন্দর হয়েছে।

নমস্কার জানবেন।

আপনার
রাজশেখর বসু

৫

টেলিফোন—সাউথ ৩৫৯১
৭২ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫
২-৩-৫৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার ১৬ ফেব্রুয়ারির চিঠি আর 'দুর্গরহস্য' যথাকালে পেয়েছি। 'জাবালি'র প্রশংসা আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম। অনেকে বলেছেন, ওর কিছুই বোঝা যায় না।

'তৃতীয়দ্যূতসভা' নামে একটা মহাভারতীয় গল্প অনেকদিন আগে লিখেছিলাম। যদি না পড়ে থাকেন তো পাঠাতে পারি। দ্রৌপদী-পঞ্চপাণ্ডবের দাম্পত্য সম্বন্ধে একটা গল্পের খসড়া লেখা আছে, আপনার কল্পনার অনুযায়ী হবে কিনা জানি না।

আপনি আমার লেখার প্রশংসা করেছেন। মনে করবেন না তারই আমি শোধ দিচ্ছি। আপনার রচনা সম্বন্ধে আমার অনেক বলবার আছে, কিন্তু চোখ ক্রমশ দৃষ্টিহীন হচ্ছে, শরীরও অসুস্থ, সেজন্য লেখাপড়া ছাড়তে হচ্ছে। এখন দু-একটি কথা লিখছি। আজকাল শুদ্ধ বাংলা দুর্লভ হয়েছে, খ্যাত লেখকরাও বিস্তর ভুল করেন। যে অল্প কজন শুদ্ধি বজায় রেখেছেন তাঁদের পুরোভাগে আপনার স্থান। সংস্কৃত শব্দ, বিশেষত সেকেলে শব্দ, দেখলে আধুনিক পাঠক ভড়কে যায়। আশ্চর্য এই—আপনার লেখায় এরকম শব্দ প্রচুর থাকলেও পাঠকরা ভড়কায় না। বোধহয় তার কারণ আপনার প্লটের বা বর্ণনার দুর্নিবার আকর্ষণ। আপনার পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য—গাম্ভীর্যের মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা। Mark Twain-এর ভঙ্গী এইরকম।

'দুর্গরহস্য' ধীরে ধীরে পড়ব। চলন্তিকায় slang আর গ্রাম্য শব্দ অল্পই দিয়েছি। আপনি যে ফর্দ দিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আপনার
রাজশেখর বসু

৬

৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫
২৮-৭-৫৬

প্রীতিভাজনেষু

আপনার ২৩ তারিখের চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। কাল আপনাকে ২ খানা বই বুকপোস্টে পাঠিয়েছি—'বিচিন্তা' আর 'নীলতারা ইঃ গল্প'। অবসর কালে পড়বেন। আপনার কাছ থেকে আরও শিবাজীর গল্প এবং 'বিষকন্যা' জাতীয় গল্প আশা করি। ভর্তৃহরি আর ভানুমতী নিয়েও কিছু লিখুন না। নিশ্চিত ইতিহাস কিছু বোধ হয় পাবেন না, মরাঠী পণ্ডিতরা হয়তো বলতে পারবেন। কিংবদন্তী এই—ভানুমতী ইন্দ্রজালজ্ঞা অসতী, তাঁর জন্যে ভর্তৃহরি মনের দুঃখে বৈরাগ্য নিয়েছিলেন। মতান্তরে ভানুমতী বিক্রমাদিত্যের পত্নী। ব্যাভিচারিণী রানী ইন্দ্রজালবলে ব্যভিচার গোপন করছেন, এই themটি বোধ হয় ভালই হবে।

পূজাসংখ্যার জন্য গোটাকতক লেখা আছে, গত বৎসরের চাইতে কম। আপনার রহস্যকাহিনীর প্রতীক্ষায় রইলাম।

আপনার
রাজশেখর বসু

৭

৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫

প্রিয়বরেষু

আপনার ১২/৩-এর পত্র আর 'বহ্নিপতঙ্গ' পেয়ে সুখী হলাম। ২য় গল্পটি পূর্বে পড়েছি, এখন ১মটি পড়লাম। রোমাঞ্চ সাহিত্যে আপনি এদেশে অদ্বিতীয়, Edgar Wallace [এর] সঙ্গে আপনার সাদৃশ্য পাই। আপনার গল্প নিছক গোয়েন্দা-কাহিনী নয়, উপন্যাসের সব উপকরণই তাতে পাওয়া যায়। আপনার রচনায় অবাঙালী পাত্রপাত্রী যত থাকে ততই ভাল, কারণ অনুবাদ হলে তার পাঠক বিস্তর হবে।

আমার বয়স ৭৭ পার হয়েছে। ওপারে যাবার আগে আপনার সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ হবে আশা করি।

আপনার
রাজশেখর বসু

৮

৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার ২৫ মার্চের পত্র পেয়ে আনন্দিত হলাম। আপনার ডিটেকটিভ গল্প সম্বন্ধে আমার মন্তব্য আপনি যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু তার মূল্য বেশি মনে করি না, কারণ, আধুনিক ইংরেজি আর বাঙলা গল্পের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি কম, প্রচুর অভিজ্ঞতা ভিন্ন সমালোচক হওয়া যায় না। মাসিক পত্রিকাদিতে যাঁরা সমালোচনা লেখেন তাঁরা charitable dispensaryর ডাক্তারের মতন একবার নাড়ী টিপেই prescription লেখেন। আপনার লেখা সমালোচকরা পছন্দ করে না এ কথা কিন্তু বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। প্রাচীন ভারতের জীবিতবৎ চিত্র অঙ্কনে আপনি অদ্বিতীয়, রোমাঞ্চ গল্পেও আপনার স্থান সকলের উপর। আর একটি কথা—যার সম্বন্ধে আধুনিক লেখকরা নিরঙ্কুশ—আপনার পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ ভাষা। বোধ হয় আপনার গল্পে জটিল বিকৃত প্রেমের অভাব আছে সে কারণেই পাঠক আর সমালোচকদের তা যথেষ্ট মুখরোচক নয়।

আপনার
রাজশেখর বসু

৯

টেলিফোন : ৪৮-৩৫৯১
৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫

সুহৃদবরেষু

আপনার ২২/১ এর চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। আমার নূতন বই 'আনন্দীবাঈ' আপনাকে

পাঠাবার জন্য প্রকাশককে বলেছি, আশা করি পেয়েছেন। মার্চের মাঝামাঝি ৭৮ বৎসর পূর্ণ হবে। ভীমরথীর রাত্রি কাটিয়ে উঠেছি, শাস্ত্রে যাকে বলা হয়েছে 'নরাণ্যং দুরতিক্রমা'। আরও আছে—'গতিঃ প্রদক্ষিণং বিষ্ণোর্জল্পনং মন্ত্রভাষণম্। ধ্যানং নিদ্রা সুধাচান্নং ভীমরথ্যাঃ ফলশ্রুতিঃ ॥ অর্থাৎ, আমার চলাফেরা এখন বিষ্ণুপ্রদক্ষিণ, কথাবার্তাই মন্ত্রপাঠ। নিদ্রাই ধ্যান, যে ভাত খাই তাই সুধা। আশা করি আমার এই মহতী দশা দেখে আপনার ঈর্ষা হবে না।

দশ বৎসর আগেও মাঝে মাঝে দিল্লি বোম্বাই যেতাম, এখন ইচ্ছা আছে, শক্তি নেই। যদি খাওয়া ঘটে উঠত তবে আপনার প্লটনির্মাণ পদ্ধতি দেখতাম।

আপনার
রাজশেখর বসু

১০

টেলিফোন : ৪৮-৩৫৯১
৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫

প্রিয়বরেষু

আপনার ১৭/৩-এর চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। আশি বছরের বৃদ্ধকে অভিনন্দনের বদলে condolence জানালেই ভাল হয়। উপেন গাঙ্গুলী মহাশয়ের একটি বাক্য অতি সত্য—বেশি দিন বাঁচতে গেলে বেশি প্রিমিয়মও দিতে হয়। আমার আর প্রিমিয়ম দেবার শক্তি নেই, এখন জীবনধারণ বৃথা।

আশা করি আপনি যথাসম্ভব ভাল আছেন।

আপনার
রাজশেখর বসু

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

॥ শ্রী ॥

Asutosh Building,
The University,
Calcutta
Date 16 June 1951

প্রিয়বরেষু,

শরদিন্দুবাবু, আপনার পত্র এবং তৎসঙ্গে আমার জন্মপত্রিকা (ইংরেজি ও বাঙ্গালা) পাইলাম, এবং তজ্জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনি যে এতটা পরিশ্রম ও সময়ক্ষেপ করিয়া এত যত্ন ও অভিনিবেশের সঙ্গে এই বিরাট দুইখানি ঠিকুজী—মায় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও চরিত্রচিত্রণ—লিখিয়া ও টাইপ করিয়া পাঠাইলেন, সে জন্য কি ভাবে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করিব বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার এই সৌজন্য আমাকে বিস্মিত করিয়াছে। আপনি যে একজন পাকা জ্যোতিষী, তাহা আপনার গণনার সহিত আমার জীবনের বহু ঘটনার অবিকল মিল দেখিয়া বুঝিয়াছি। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত রাশি ও নক্ষত্রের সমাবেশ হইতে আপনি প্রকাশ করিয়াছেন, সেরূপ কথা অন্য মিত্রমুখেও শুনিয়াছি। আপনার গণা এই পত্র দুইখানি বিশেষ যত্নের সঙ্গে রাখিয়া দিব।—আপনি সপ্তম শতকের গৌড়দেশের ঐতিহাসিক পরিবেশের মধ্যে—হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তকে লইয়া—যে উপন্যাস লিখিতেছেন, তৎসম্বন্ধে আমার বিশেষ কৌতূহল হইতেছে। সপ্তম শতকের পূর্বভারতের কথা বলিতে হইলে, আসামের (প্রাগজ্যোতিষ—কামরূপের) রাজা ভাস্করবর্মার কথা এবং চীনা পরিব্রাজক চিত্রিন-থ্সাঙ্-এর কথাও বলিতে হয়। ভাস্করবর্মা এক অদ্ভুত চরিত্রের লোক ছিলেন—তিনি মানসিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অশেষ কৌতূহলী ছিলেন, এবং চীন দেশের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তা সংস্কৃতে যাহাতে অনূদিত হইয়া ভারতীয় পণ্ডিতদের গোচরে আসে সে বিষয়ও চেষ্টিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে যদি কিছু তথ্য চান, Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal-এর শেষ বা চালু সংখ্যায় আমার একটি বেশ বড় প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। Kirata-Jana-Krti (কিরাতজনকৃতি), সেটিতে ভাস্করবর্মার সম্বন্ধে যে অংশটি আছে তাহা দেখিবেন। বোম্বাইয়ে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে, না হয় Bombay Branch of the Royal Asiatic Societyর পাঠাগারে ঐ পত্রিকা পাইবেন। —এইবারে আপনার জিজ্ঞাস্যের কথা। প্রাচীন বাঙ্গালার মুদ্রা ও ভূমির মাপের সম্বন্ধে আপনি ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-এচ্ডি, Epigraphist, Government of India Archaeological Survey, Office of the India Government Epigraphist, Ootacamand, South India—ইঁহাকে লিখুন। এ বিষয়ে ইনি একপত্রী, আমার নাম করিয়া লিখিবেন। সব খবর পাইবেন। কপর্দক=কড়া (<কব্ড্ডর্অ), কপর্দ্দিকা> কব্ড্ডিআ> কড়ী, গ্রীক drakhme> দ্রম্য> দম্ম> দাম (তাম্রমুদ্রা, আগে রজতমুদ্রা), গ্রীক—লাবীন denarius) দীনার (স্বর্ণমুদ্রা); "নানা"—দেবীর মূর্তি অঙ্কিত শকমুদ্রা "নানক" তাহা হইতে "আনা", এই সব প্রচলিত ছিল, তবে আধুনিক মুদ্রার সহিত অনুপাত দীনেশবাবু বলিবেন। প্রাচীন বাঙ্গালায় সমুদ্রগামী পোতের নাম ছিল "বহিত্ত" বা "বুহিত" (সংস্কৃত "বহিত্র" হইতে)। এই শব্দ এখনও যবদ্বীপের ভাষায় মিলে। "মাস্তুল" পোর্তুগীস শব্দ, আমাদের দেশী নাম "গুণবৃক্ষ"। মাস্তুলের আড়াআড়ি একখণ্ড কাঠ হইতে পাল টাঙ্গানো হইত, সেই "আড়কাঠ"-এর উপরে "আড়কাঠী" বা "দিশারু" অর্থাৎ দিগনির্ণয়কারী pilot বসিত। "আড়কাঠী"-র অর্থ বদলাইয়া কুলি বা সিপাহীদের যে পথ দেখাইয়া আনে recruiter, এই অর্থ হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় নৌবিদ্যা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের History of Indian Shipping (Longmans—বিখ্যাত বই) দেখিবেন। "ডেক"কে "পাটী, পাটাতন" বলিত ("পট্টিকা, পট্টপত্তন")। স্বর্গীয় ননীগোপাল মজুমদারের Inscriptions of Bengal, Vol. III (পুরাতন কালের বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রকাশন)-তে প্রাচীন বাঙ্গালার সরকারী কর্মচারীদের নাম ও কাজের তালিকা পাইবেন।

আর যদি কিছু জানিবার থাকে, লিখিবেন। যথাশক্তি যথাজ্ঞান উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। প্রীতি নমস্কার জানিবেন। ইতি

ভবদীয়
শ্রীসুনীতিকুমার।

আমার রাশিচক্র হইতে এই কয়টি বিষয়ও একটু দেখিবেন—(১) চোখের অবস্থা কেমন

থাকিবে ;

(২) ১৯৫১-১৯৫২-তে কোনও বড় বইয়ে হাত দিতে পারিব কিনা। সমাধা হইবে কিনা ;

(৩) জীবনে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কোনও সম্ভাবনা আছে ?

শ্রীসুনীতি।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,

আপনার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য না হইলেও আপনার প্রায় সমস্ত বইই আমি পড়িয়াছি—প্রায় বলিলাম কারণ আমার অজানা ২/১ খানা থাকিতেও পারে। তবে যেসব বইয়ের নাম পাইয়াছি—সকলই পড়িয়াছি। এবং পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছি।

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' কয়েকদিন আগে পাইয়াছি। কিন্তু আপনার ঠিকানা না জানায় চিঠি লিখিতে পারি নাই। এজন্য ২ দিন তারাশঙ্করবাবুকে টেলিফোন করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁকে পাই নাই। এমন সময় আপনার চিঠি পাইলাম।

আপনি বিজয়নগরের অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়া ফুটাইয়া উঠাইয়াছেন—এজন্য আমরা অর্থাৎ ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ—কারণ লোকে ইতিহাস পড়ে না—কিন্তু আপনার বই পড়িবে। Alexander Dumas যে উদ্দেশ্য নিয়া Three Muskateers প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন আপনার দুইখানি উপন্যাসের মধ্য দিয়া তেমনি শশাঙ্কের পরবর্তী সময়কার বাংলা ও দেবরায়ের বিজয়নগর সম্বন্ধে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে 'Delhi Sultanate', P. 460তে আমার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইলতুৎমিসের সময়ে না হউক দেবরায়ের সময়ে ইহার প্রচলন ছিল।

আপনি নিশ্চয়ই ফেরিস্তা বিজয়নগরের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়াছেন। ইহা যখন পড়ি তখন মনে হইয়াছিল ইহার কয়েকটি কাহিনী ঔপন্যাসিকের খোরাক যোগাইতে পারে।

আপনি পুনাতেই কি বরাবর থাকেন ? যদি কখনও কলিকাতা আসেন সংবাদ দিবেন সাক্ষাৎ করিব। ইতি

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

২

৪ বিপিন পাল রোড
কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ৭ই ডিসেম্বরের পত্র ও শঙ্খকঙ্কণ যথাসময়ে পাইয়াছি

শঙ্খকঙ্কণের মধ্যে ইতিহাসের ছাপ প্রথমটাতে খুবই আছে এবং বিশেষ উপভোগ্য। দ্বিতীয়টিতে খুব বেশি না থাকিলেও একটি জাতীয় আদর্শের পটভূমিকায় কাহিনীটি খুব উপভোগ্য। প্রত্নতত্ত্ব ও জাতিস্মরের মিশ্রণে তৃতীয় কাহিনীটিও বেশ ভালই লাগিল। আপনাদের পাকা হাতে যাহা লেখেন সুন্দর হইয়া ওঠে।

আপনার চুয়াচন্দন অনেকদিন আগেই পড়িয়াছি। গল্পটি খুবই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছিল। নবদ্বীপের ও তান্ত্রিকতার পটভূমিতে লেখা—এবং বিস্মৃতপ্রায় বাঙালীর সুদূর দেশে বাণিজ্যযাত্রার কাহিনী—এই উভয়ে মিলিয়া যে একটি সুপরিকল্পিত কাহিনীকে খাড়া করিয়াছেন তাহা বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। আপনার লেখনী জয়যুক্ত হউক এবং আপনি আরও বহুদিন বাংলা সাহিত্যের সেবা ও ইহাকে পরিপুষ্ট করিবেন ইহাই সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।

ইতি
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

৩

৪, বিপিন পাল রোড
কলকাতা

সবিনয় নিবেদন,

আপনার 'রঙীন নিমেষ' পেয়েছি। অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানবেন। আমি ও আমার স্ত্রী—দুজনেরই বেশ ভাল লেগেছে। পূর্ব বাংলায় চলিত কথা আছে যে রাঁধুনীর গুণে সাধারণ দ্রব্যেরও অপূর্ব রসাস্বাদ হয়। আপনার বই পড়ে মনে হল—রচনার গুণে সাধারণ কাহিনীর মধ্য দিয়ে কিরূপ অপূর্ব সাহিত্যরস সৃষ্টি এবং মনুষ্য চিত্তের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা যায় এ বইখানি তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যেগুলি সত্য কাহিনীরূপে বর্ণনা করেছেন—তা যদি সত্য হয়—বলব অদ্ভুত ; আর কল্পনার সৃষ্টি হলে বলব অপূর্ব ও সরস। 'কিষ্টোলাল' টাঙ্গাওয়ালা, গোদাবরী ও ডিকটেটার—এই শ্রেণীভুক্ত। ভূতের গল্পগুলিও বর্ণনা চাতুর্যে অভিনব। 'কা তব কান্তা' সম্বন্ধে এইটুকু বক্তব্য যে বন্ধুদের মধ্যে সাময়িকভাবে পত্নী বিনিময় গ্রীক-রোমক সভ্যতায় প্রচলিত ছিল। সুতরাং বর্তমান ও ভবিষ্যতে যাহাই হউক অতীতে ইহা সত্য ছিল।

আশা করি শরীর মোটামুটি ভালই আছে এবং অবসরমত সাহিত্যচর্চার কোন বিঘ্ন হইতেছে না।

ইতি
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

প্রমথনাথ বিশী

২৬বি, অশ্বিনী দত্ত রোড
কলিকাতা
২১-৪-৪৫

প্রীতিভাজনেষু,

শরদিন্দুবাবু, কি আশ্চর্য ! বোম্বাই গেলেই যে ভুলিয়া যাইতে হইবে—এমন কি আছে।

যাহারা বোম্বাই যায় তাহারা বোধ করি বাংলাদেশের লোককে ভুলিয়া যায় বলিয়াই এমন লিখিতে পারিয়াছেন।

চুয়াচন্দনের সঙ্গে যদি আমার সমালোচনা আমার নামে ছাপিতে চান—তাহাতে আমার আপত্তির কি আছে? বরং গৌরবই বোধ করিব। আশা করি কুশলে আছেন।

নমস্কার লইবেন। পরিমলবাবু এখন স্থায়ীভাবে যুগান্তর পত্রিকায় কাজ করিতেছেন।

ইতি
ভবদীয়
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

২

কলকাতা

প্রীতিভাজনেষু,

'শঙ্খকঙ্কণ' উপহার পেয়ে পড়ে শেষ করেছি। তিনটি গল্পই উৎকৃষ্ট, তন্মধ্যে আমাদের অনেকের মতে (প্রতুলবাবু একজন, জিতেনবাবু আর একজন) প্রত্নকেতকী শ্রেষ্ঠ। বাস্তবে কল্পনায়, প্রত্নে বর্তমানে মেলানো এমন গল্প অল্পই দেখা যায়। গল্পটিতে বোধ করি আপনার শক্তির পূর্বতন সীমাকেও অতিক্রম করিয়াছেন। শঙ্খকঙ্কণের narrative চমৎকার। এমন মধুর প্রাঞ্জল narrative শক্তি বর্তমানে আর কোন লেখকের নাই—কাহারো নাই—এই কাহারোর মধ্যে জীবিত সমস্ত লেখকই পড়েন। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে তুলনীয় প্রভাত মুখোপাধ্যায়। তবে তিনি ইতিহাসে পদক্ষেপ করেন নাই। ইতিহাসকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে আপনার জুড়ি নাই। মনে রাখিবেন আমাদের দু'জনের চুক্তি অনুযায়ী বিন্ধ্য পর্বতের সীমা অতিক্রম করিবেন না—আপনি মাঝে মাঝে করেন—তবে এমন কৌশলে করেন যে ক্ষমার্হ। কবে আসছেন? আপনার বিরহে আমরা অর্থাৎ প্রতুলবাবু, জিতেনবাবু, বিমল মিত্র, গজেন মিত্র ও আমি সকলেই কাতর। আপনি আসিয়া গ্রহনক্ষত্রকে একটু সচল করিয়া দিবেন এই ভরসায় আছি। কাম্য কিছুই ঘটিতেছে না। আশা করি সস্ত্রীক সপরিজন কুশলে আছেন।

নমস্কারান্তে

ইতি
অনুগত
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পি-১৭১, সি, সি, ও, এস
টালা পার্ক
কলিকাতা-২

ভাই শরদিন্দু,

দীর্ঘকাল পর তোমার পত্র পেলাম। অনেক দিন পর। দিনটি জীবনে স্মরণের মালায় গাঁথা রইল। আমার জীবনে অন্তত সাহিত্য জীবনে—প্রতিষ্ঠার জীবনে স্বাদ ঘুচে গিয়েছে। গত এক বৎসর জীবনে জ্বলছি। নিদারুণ অন্তর্দাহ। তাই বোঝা নামাচ্ছি। বইতে পারছি না। কাঁদলে ভাল থাকি। কিন্তু কাঁদতে পারা তো সহজ নয় ভাই।

তোমার কাছে অনেক পেয়েছি। হৃদয়ের স্পর্শ পেয়েছি। তোমার অমিতাভ পড়ে কেঁদেছি। এখনও কাঁদি। তোমার দিঙনাগের মত কেঁদে গলে যেতে চাই পারি না। এ সব মিছে, ভূয়ো মনে হচ্ছে। হাহাকারে ভ'রে গিয়েছে ভিতরটা। যা চেয়েছি তার কিছু পাইনি, শুধু ধুলো শুধু আবর্জনা কুড়িয়ে জমা করেছি। তার স্তূপ আজ আমার জীবনের চারিদিকে অন্ধকূপ রচনা ক'রে আমার শ্বাসরোধ করছে।

পার তো উত্তর দিয়ো।

ইতি
তারাশঙ্কর

২

Phone: 56-3076
Calcutta-2

ভাই শরদিন্দু,

মানুষের কল্পনার চেয়েও কর্মচক্র সময়ে সময়ে অনেক দ্রুততর বেগে আবর্তিত হয়। কল্পনা যেখানে পঙ্গু হয় সেখানে রচনা করা পরিকল্পনা তাসের ঘর—বাতাসে ভেঙে পড়ে। বাতাসে নয় ফুৎকারে। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাই হয়েছে। খবরের কাগজে (বাঙলা দেশের) বেরিয়েছে—দেখে থাকলে জেনেছ যে—আকস্মিকভাবে অলঙ্ঘ্য আকর্ষণে মস্কৌ ঘুরে এসেছি। আমেরিকার ওদের বলেছিলাম—সেপ্টেম্বর পরে সেটা স্থির হয়েছে আগামী মার্চ। ইতিমধ্যে এই কাণ্ড। মস্কৌতে এসিয়া ও আফ্রিকা লেখক-সম্মেলনের উদ্যোগ সমিতির প্রথম মিটিং। ফিরে এসে তোমার পত্র পেলাম। তুমি লিখেছ বাইরে যেতে হলে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যাওয়া উচিত। পরে বাইরে গেলে কোন্ আশঙ্কা কিছু লেখনি। অথচ এখনও পর্যন্ত যা কর্মচক্রের অচ্ছেদ্য বন্ধন বলে মনে হচ্ছে তাতে অক্টোবরে রাশিয়ার সঙ্গে আমি বাঁধা রয়েছি। আমেরিকা মার্চ মাসে, সে দূরের কথা। এমন জড়িয়েছি যে নিজের ইচ্ছায় খুলবার পথ নেই, সাধ্য নেই। কর্মচক্রের বিচিত্র খেলা অদৃষ্টের হাতে। জানিনে। তুমি উঁকি মারতে পার, তাই লিখছি, সেপ্টেম্বরের পর—শুভযোগ অবসান হলে—অশুভটা কোন পথ ধরে আসবে, দেহের

পথ ধরে ? ব্যর্থতা ও অসম্মানের পথ ধরে ? না—দুই পথ ধরে বা অপর কোন অচিন্তিত পথ ধরে ? একটু আলোকপাত করলে সুখী হব।

ভালবাসা নাও। গৃহিণীকে নমস্কার দাও। ছেলে বউ নাতিদের আশীর্বাদ। আমার এখানে সব ভাল।

তোমার প্রীতিমুগ্ধ
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

Bhagalpur

ভাই শরদিন্দু,

মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ব্যথিত হলাম। সবই বুঝি, তবু ব্যথিত হই। আমরা সব জ্ঞানপাপী। তোমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করব না। সময়ই সান্ত্বনা বহন করে আনবে। তোমার মাকে আমিও নিজের মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করতাম। যদিও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার সুযোগ বেশি হয়নি।

তিনি একটু কড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু স্নেহের আকর ছিলেন। আমিও তাঁর স্নেহ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি। তাঁর সাহিত্য-প্রীতিও আমার বিস্ময়ের কারণ ছিল।

আমি ভেবেছিলুম তাঁর কাজের সময় মুঙ্গেরে যাব কিন্তু শেষ পর্যন্ত হ'য়ে উঠল না ভাই।

তোমার মারক-যোগ শুনে চিন্তিত হয়ে আছি। আমাদের সকলেরই মারক-যোগ আসন্ন। দু'দিন আগে বা পরে।

ঁবিজয়ার প্রীতি ও আলিঙ্গন নিও। স-নাতিনী গৃহিণী আশা করি এসে পৌঁছেছেন। উভয়কেই আমার অভিবাদন জানিও। ছেলেদের ও বৌমাদের আশীর্বাদ দিও। ইতি

তোমারই
বলাই

২

ভাগলপুর

ভাই শরদিন্দু,

আশা করি স্বস্থানে ফিরে স্বকীয় সিংহাসনে আরোহণ করেছ। আমিও ফিরে এসেছি। অনেক দিন পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে কি যে আনন্দ পেলাম তা বলবার নয়। আর দেখা হবে কি না জানি না। করবীর বিয়ের দিন স্থির হয়েছে আগামী ৭ই শ্রাবণ (ইং ২৩শে জুলাই)—তুমি আসতে পারবে কি ? বলা বাহুল্য এলে খুবই আনন্দিত হব। কিন্তু এ বয়সে বারবার নড়াচড়া করার কষ্ট আর ঝঞ্ঝাট যে কি তা নিজেই মর্মে মর্মে বুঝি। সুতরাং বেশি পীড়াপীড়ি করব না।

তবে করবীর বিয়েতে একটা ভাল কবিতা তোমাকে লিখতে হবে। সেটা তাড়াতাড়ি পাঠিও, কারণ ছাপাতে হবে। আমি নবকল্লোলের জন্য একটা বড় গল্প লিখেছি, তুমি বোধহয় অমৃতির পাকে পড়েছ।

স-গৃহিণী ভালবাসা নিও। নাতি সাহেবকে আশীর্বাদ দিও।

ইতি
বলাই

৩

ভাগলপুর

ভাই শরদিন্দু,

তোমার কবিতাটা পেয়েছি। বেশ হয়েছে। ছাপব। আমি একটা বড় গল্প নিয়ে নাকানি-চোবানি খাচ্ছি। শেষ করেই কলকাতা দৌড়ুতে হবে। শুনে সুখী হবে করবী B.A. পাস করেছে। বাঘের চামড়ার কথা লিখেছ। বাঘের চামড়ার যিনি ক্লাসিকাল মালিক সেই মহাদেব উল্লেখযোগ্য কোন কাব্য লিখেছেন ব'লে শুনিনি। সংহারের দেবতা তিনি, সংহারই করে চলেছেন। সেটাও অবশ্য একরকম কাব্য। আর তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা বাঘের চামড়ায় বসে গাঁজার কলকে ফাটাচ্ছে। হয়তো আকাদমী পুরস্কার পাবে ওইজন্যেই। আমার ওদিকে লোভ নেই। আশা করি সবাই ভাল আছ। ভালবাসা জেন।

ইতি
তোমারই
বলাই

৪

P 196 Ram Krishna Samadhi Road
C. I. T. Scheme VI M Flat No. 3 Calcutta-54

ভাই শরদিন্দু,

সেদিন অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গ পেয়ে বিমল আনন্দ উপভোগ করে এলুম। আমাদের অতীত জীবনের কিছু মাধুর্য যেন ফিরে পেলাম। তোমার 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' বইটি পড়েও তোমার সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ শিল্পী মনের পরিচয় পেলাম আর একবার। ঐতিহাসিক পরিবেশটি চমৎকার সৃষ্টি করেছ এবং সেটিকে যে ভাষার আধারে স্থাপিত করেছ তার আভিজাত্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি একটি মাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছি (প্রাগৈতিহাসিক বললে আরও ঠিক বলা হয়)—সেটির নাম স্থাবর। সেটি তোমার যদি না পড়া থাকে তাহলে জিতেনের দোকান থেকে সেটি আনিয়ে পড়ে ফেল। আমি এখন স্থাবরের আর একটা খণ্ড আরম্ভ করেছি। তুমি একদিন সুবিধা করে আমার এখানে এস। অমিও আর একদিন যাব। দুর্গা-প্রসাদ এবং তার স্ত্রীকে সেদিন বড় ভালো লেগেছে। কলকাতা শহর এখনও যে সব 'ধূসর' হয়ে

১

কলিকাতা-৬
২৭-৬-৫২

ভাই শরদিন্দু,

তুমি একটি বদ্ধ পাগল। তোমার কালের মন্দিরার ভাল সমালোচনা ৬ মাস আগে যুগান্তরে বেরিয়েছে। ৬-১-৫২ তারিখে। তার cutting অবশ্য প্রকাশককে পাঠানো হয়েছে। বোধ হয় হারিয়ে গেছে। আবার হরিদাসবাবুকে দেখানোর জন্যে আজ আর একটা cutting পাঠিয়েছি। লিখে দিয়েছি—শরদিন্দুকে পাঠানো দরকার—যদি তিনি না পাঠান আমাকে ফেরৎ দিলে আমি পাঠিয়ে দেব।

আগামী ৪ জুলাই বড় মেয়ের বিয়ে—মাত্র কাল ঠিক হয়েছে। আমি তো বরাবর অর্ধমৃত—আমার কনিষ্ঠ পুত্র (যে তোমাকে ব্যোমকেশের গল্প লিখতে বলেছিল) সে আজ ৯ মাস হল লণ্ডনে আছে। সুতরাং বড়ই বিব্রত। পাত্রটি দিল্লীতে অধ্যাপক। এখন ভালয় ভালয় মিটে গেলে বাঁচি।

পুজোর জন্যে লেখা অবিলম্বে পাঠাও। "ইয়ার্কি" হলেই ভাল হয়। তোমার কালের মন্দিরা চমৎকার। বিষকন্যার নূ· সং আজ এখনি পেলাম। পরে জানাব।

চিঠি লিখতে Calcutta 6 লিখো। নইলে দেরি হয়।

পরিমল

২

35-D Kailas Bose St.
Cal-6, 17.9.52

ভাই শরদিন্দু,

দু তিনটি কারণে তুমি একটি পাষণ্ড। তোমার পোস্টকার্ড পেয়ে উত্তর লিখব—কিন্তু সেখানা ঘর থেকে কোথায় উধাও হয়ে গেল। কার্ড সামনে রেখে উত্তর লেখা প্রয়োজন ছিল না, কেননা যা লিখেছিলে তা আজও মুখস্থ আছে। কিন্তু কার্ডখানা গেল কোথায়? কোনো জিনিস হারালে তা খুঁজে বের কারার জন্যে জেদ চেপে যায়, গেল জেদ চেপে। দুদিনে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ব্যয় করেও ব্যর্থ হওয়া গেল। চিঠি লেখা ঝোঁকের মাথায় যেমন হতে পারত তা আর

হল না, সুতরাং প্রেরণা কাটা পড়ে গেল এবং আমার দৈহিক নীতি অনুযায়ী পুনরায় শয্যাশায়ী হলাম। (২০ বৎসর এই নীতিতে একই প্যাটার্নের অসুখ চলছে।) তার পর থেকে পুজোর লেখা, পুজো সংখ্যা সম্পাদনা, অসুস্থ শরীরেও ট্যাক্সি সহযোগে মাঝে মাঝে দুবার অফিসে যাওয়া এবং নানারূপ ইত্যাদির পাল্লায় পড়ে হাঁফিয়ে উঠলাম।

তোমার বিষকন্যার সমালোচনা লিখে দিয়েছি গত রবিবারে যায়নি, সামনের রবিবারে ছাপা হবে অবশ্য। তুমি পুজো সংখ্যায় আমাকে যে গল্প পাঠিয়েছ তাতে বাংলাদেশের স্ত্রীজগৎ তোমার মুণ্ডপাত করবে।

বই বেরিয়েছে, পেয়ে যাবে যথাসময়ে। সমালোচনা কি তোমাকে পাঠিয়ে দেব—না যুগান্তর পড় তুমি রোজ ? কি করব লিখো। আমাদের একটি feature চলছে, "বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।" তোমার জীবনে নিশ্চয় অনেক অভিজ্ঞতা আছে—তার দু চারটে লেখ। অধিকাংশই ভূত দেখার ব্যাপার আসছে। ভাল লাগছে না আর। এক-দেড় কলম কোনো অবোধ্য বা দুর্বোধ্য লেগেছে এমন ঘটনা, নিজের জীবনে যা ঘটেছে—যার কূলে এসে মন জিজ্ঞাসা করেছে কেন এমন হল ? লেখ। বানানো গল্প নয়। এমন ভাবে লিখবে যাতে সত্যের প্রতীতি হয়, convincing হয়। যদি সময় পাও তাহলে তাড়াতাড়ি পাঠাও। পাবলিশার ঘোরাঘুরি করছে—এই collection ছাপবে।

আর একটি কাজের কথা। আমার কনিষ্ঠা মঞ্জু (সরোজ আচার্যের স্ত্রী) তার ছোট ছেলেকে নিয়ে লণ্ডন যাচ্ছে। জাহাজ ছাড়বে ১০ অক্টোবর। ৮ তারিখে বম্বে যাবে। সঙ্গে একটি escort ও মঞ্জুর বড় ছেলে (১১ বছর) থাকবে। তারা কি ২॥ দিনের জন্যে তোমার ওখানে থাকতে পারে ? অসুবিধা না হলে বিশেষ উপকার হবে। নইলে বম্বে অপরিচিত জায়গায় বড়ই অসুবিধা বোধ করতে পারে। তোমার অসুবিধা হলে পত্রপাঠ জানিয়ে দেবে আশা করি।

উত্তর দিতে দেরি কোরো না।

পরিমল

৩

Eastlight Book House
20, Strand Road
Calcutta-1
7 June, '56

ভাই শরদিন্দু,

ভীষণ বিরূপ হয়েছ বোধ হচ্ছে, অনেক দিন নীরব এবং অনেক দিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। আজ তবু স্মরণ করছি, কেননা এককালে ছুরি ও ছড়িতে বন্ধুত্বের চিহ্ন এঁকেছিলে। আর 'বন্ধু' নাটকে।

ইস্টলাইট বুক হাউসের পক্ষ থেকে একখানি ব্যঙ্গ গল্পের সঙ্কলন সম্পাদনাভার পেয়েছি—সকল ব্যঙ্গ লেখকের একটি ক'রে গল্প নিয়ে।

তোমার সেই ঐতিহাসিক পটভূমিতে লেখা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'ইসে' এবং 'কচু' মিশ্রিত গল্পটি গ্রহণের অনুমতি চাই। কোন্ বইতে আছে জানাও।

এঁরা flat rate একটা ধার্য করেছেন। অনুমতির সঙ্গে সঙ্গে সেটি পাঠানো হবে। সবাইকে ২০ দেওয়া হচ্ছে, বুড়ো শুঁড়ো সবাইকে।

হে নরাধম, অনুমতি দিতে দেরি ক'রো না।

পরিমল গোস্বামী

৪

কলিকাতা-৬

ভাই পাষণ্ড,

চিঠিতে শরদিন্দুসুলভ স্বাদ গন্ধের অভাব। শুধু ইঁদুরে আর কতটুকু ক্ষতিপূরণ করতে পারে ?

আমার 'স্মৃতিচিত্রণ' পাঁচ ছ দিনের মধ্যে বাজারে বেরোচ্ছে। প্রকাশককে পাঠাতে বলে দিচ্ছি। পেয়ে তোমার অভিমত জানিও যাতে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা যায়।

আমি তিন দিন শয্যাগত ছিলাম, আজ উঠেছি।

প্রেম জানাই। পুজোর জন্য একটা গল্প অথবা ঐ রকম হাসির কবিতা পাঠাও।

পরিমল

৫

শরদিন্দু,

তোমার মনের পরিবর্তনটা organise তাই পাষণ্ড পামর ইত্যাদি ভাল ভাল সম্বোধন মনের উপরকারমোটা ভাঁজ করা চামড়ায় প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে, অতএব বুড়োকেই সম্বোধন করি।

তোমার লেখা পেয়েছি। হিউমার মার খেয়েছে। কঠিন আত্মগ্লানি ! এবং এত কাণ্ডের পরে !

আমার বই পেয়েছ। অবিলম্বে কিছু লিখে পাঠাও।

পরিমল

৬

6/2 Kalicharan Ghosh Road
Calcutta 50
Phone: 56-3364

চন্দ্রহাস,

এ নামটির কথা মনে এলো। তার কারণ শরদিন্দু বর্তমানে আমার প্রতি বিরূপ। পুনার ঠিকানায় চিঠি দিয়েছি তিন সপ্তাহের উপর, পেলে কিনা জানি না। তোমার মতো হাতের লেখা কে একজন তোমার অটোগ্রাফ রেখে গেছে আমার অফিসে। মনে হল তুমি হয় তো কলকাতা

এসেছ।

দেখা হওয়ার বিশেষ দরকার আছে। দেখা করলে বিশেষ সুখী হব। যুগান্তরে বিকেলে এলে ভাল হয়। আমার এখন নড়বার উপায় নেই, বেশিদূর যাওয়া নিষেধ। ২৩ তারিখে সিঁথিতে এসো যদি পার। কিন্তু কথা হবে না হয় তো।

পরিমল

৭

Jugantar Private Ltd

রে ইত্যাদি,

তোমার কাছে একটি রহস্য গল্প চাওয়া হয়েছে, তুমি চুপ করে আছ এখনও ! এ কি রহস্য ? একটি ছোট ব্যোমকেশ* পাঠাও। অবিলম্বে। আমি ম্রিয়মাণ।

পরিমল গোস্বামী

* Bomb case নয়।

৮

কলিকাতা
২২-৬-৫৩

ভ্রাতঃ,

বোম্বাই বৃষ্টিতে এ চিঠি ভেসে না যায়। তুমি একটি পাপনিষ্ঠ উড়নচণ্ডী।

পুজোর জন্যে "ব্যোমকেশ" চাই। ১৫ দিন সময় দিলাম। চিঠি পাবার পর থেকেই প্লট চিন্তা কর। ছাপা (যুগান্তর পূজা) ৮/১০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যেতে পারে। যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হল। এর চেয়ে অল্প পরিসরে সমাপ্ত হলে আরো ভাল।

কবে পাঠাতে পারবে অবিলম্বে জানাও। ব্যোমকেশ ভিন্ন অন্য কিছু চলবে না—বোম্বেটে নয়, বোম্বেওয়ালি নয়, ব্যোমকেশ।

পরিমল গোস্বামী

শ্রীসুকুমার সেন

২৭ গোয়াবাগান লেন
কলিকাতা ৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শরদিন্দুবাবু, আপনার প্রীতি উপহার 'সসেমিরা' পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। যখন প্রবাসীতে আপনার ঐতিহাসিক গল্পগুলি বেরুত তখন থেকে আমি আপনার অনুরাগী পাঠক।

সসেমিরার গল্পগুলি আগেই আমার পড়া ছিল। আপনার প্রেরিত বইটি পেয়ে আবার পড়লুম। ভারতীয় সাহিত্যে আপনি যে বিলাতি স্ট্যাণ্ডার্ডে একমাত্র crime ও detective গল্পলেখক তার অভ্রান্ত প্রমাণ রয়েছে সসেমিরার গল্পগুলিতে।

আপনি কলকাতায় এসে কিছুদিন ছিলেন। দেখা করবার ইচ্ছা ছিল। গত বৎসর আমি পুনাতে মাস দেড়েক ছিলুম। তখনও দেখা করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঘটে ওঠেনি।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি

আপনার
শ্রীসুকুমার সেন

২

২৭ গোয়াবাগান লেন
কলিকাতা ৬

প্রীতিভাজনেষু

পুনার জিয়োগ্রাফি সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল তাতে মনে হয়নি যে আপনার বাড়ি ভেসে যাবে। আপনার পত্র পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। অসুবিধা কিছুদিন নিশ্চয়ই চলবে। তবে এখনকার দিনে দেবতা ও মানুষ মিলে কখন কি করবে তা কেউ বলতে পারে না। সুতরাং শোচনা নাস্তি।

আমার প্রবন্ধগুলি আপনার ভালো লেগেছে জেনে আনন্দিত হয়েছি।

চণ্ডীদাসের উপর আপনি যদি একটি উপন্যাস লেখেন তো ভাল হয়। চণ্ডীদাস নামটি ঐতিহাসিক, আর কিছুই নয়। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যে রোমাণ্টিক কাহিনীগুলি চলিত আছে—সেগুলিতে ইতিহাস নেই কিন্তু ইতিহাসের বর্ণ ও গন্ধ আছে। সেগুলিকে গেঁথে তুললে ভালো উপন্যাস হবে। এ কাজে আপনারই অধিকার।

আশা করি কুশলে আছেন। নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি

আপনার
শ্রীসুকুমার সেন

৩

॥ শ্রীঃ ॥

কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শরদিন্দুবাবু, আপনার পত্রের উত্তর দিতে দেরি হল, তার কারণ আমি কলকাতায় দিন সাতেক ছিলুম না। আপনার বই প্রকাশক পাঠিয়ে দিয়েছে এবং আমি সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলেছি। অনেকদিন বাংলা বই পড়ে এমন তৃপ্তি পাইনি। আপনি গল্পের মধ্যে অনেক রস প্রবাহিত করেছেন। আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

পুনা যাওয়ার সময় এখনও ঠিক করে উঠতে পারছি না। একটানা দীর্ঘকাল কলকাতার বাইরে থাকায় অনেক অসুবিধা আছে। দু তিনটে Short term করে থাকবার চেষ্টা করছি।

ওখানে গেলে আপনার সঙ্গে দর্শন ও মিলন হবে—এটা আমার পুনা যাওয়ার আর একটা আকর্ষণ।

আপনি কলকাতায় এসেছিলেন। যখন সে খবর পেলুম তখন আমি বাইরে যাবার মুখে, আপনিও ফেরবার মুখে।

আশা করি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমার প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি

আপনার শ্রীসুকুমার সেন

৪

Block 2 Suite 32
10 Raja Rajkissan Street
Calcutta-6

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার চিঠি পেলুম। আগের পত্রও যথাসময়ে পেয়েছিলুম। টেলিগ্রামও ঠিক এসেছিল। আপনাদের আশীর্বাদে ও শুভেচ্ছায় শ্রীমান্ সুভদ্রকুমারের শুভবিবাহ যথারীতি সুসম্পন্ন হয়েছে। বধূমাতা ভালই হইয়াছেন।

আপনার সজারুর কাঁটা এখনও হস্তগত হয়নি।

সাজঘরে আপনার লেখা চারটি ছড়া পড়লুম।

এখানে বৃষ্টি তো হচ্ছে কিন্তু যে উৎপাত চলছে তা তো আধিদৈবিক নয় আধিভৌতিকও নয়, আধাভৌতিক এমনকি পুরোভৌতিকও বলতে পারেন। ভৌতিকের প্রতিকার আছে। কিন্তু যেখানে মানুষ ভূতের আচরণ করে সেখানে প্রতিকার করবে কে? রোগীও ভূতে পাওয়া রোজাও ভূতে পাওয়া। রবীন্দ্রনাথের কর্তার ভূতের উপসংহার লেখবার সময় হয়েছে। আপনি লিখবেন কি? না বনফুল? আপনার ছুরি খুব উজ্জ্বল, ধারালো কিন্তু বনফুলের ছুরি বেশ ভারী। তাতে কাটে গভীর হয়ে।

আশা করি আপনি ও শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় কুশলে আছেন। আমার নমস্কার জানবেন উভয়ে। ইতি

ভবদীয়
শ্রীসুকুমার সেন

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

125 Rashbehari Avenue
Calcutta

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছিলাম। কয়েকদিন আগে শঙ্খ-কঙ্কণ পেয়েছি। এর মধ্যে প্রত্নকেতকী আমার সব চেয়ে প্রিয় গল্প। প্রথম বের হবার সময় পড়েছিলাম। আবার

পড়লাম। অমৃতে প্রকাশিত ভৌতিক ব্যাপারটিও বেশ। আরও কয়েকটি শোনাবেন?

অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় না। সম্ভাবনাও নেই মনে হচ্চে। প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে কথা হচ্চিল আপনার মন সিক্ত করা যায় কিনা। ভেবে কিছু ঠিক করা গেল না। একটি বিষয় কেবল নিবেদন করছি। এবার কলকাতায় প্রকৃতই বসন্তকাল এসেছে। গরম পড়েনি। সকালবেলা ভিজে ভিজে এবং মধুর হাওয়া। পাঁচটার পরে দক্ষিণ পবন। এক কথায় পরিণাম রমণীয়। ক্বচিৎ ঈষাণকোণে বিদ্যুৎ। এ সব যদি দেখতে চান অবিলম্বে চলে আসবেন। ... এবার কিছু লিখতে আরম্ভ করব ভাবছি। গরমের ছুটির জন্য অপেক্ষা।

আমার একরকম কেটে যাচ্চে। আশা করি আপনার কুশল।

ইতি
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

২

১২৫ রাসবিহারী য়্যাভেনিউ
কলিকাতা ২৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ২১শে মে তারিখের চিঠি পেয়েছি। আপনি নানাসাহেব সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাতে খুব খুশি হয়েছি সন্দেহ নেই, কিন্তু লজ্জিতও হয়েছি। আমি স্কুলে ইংরেজিতে কাঁচা ছিলাম। অর্থাৎ বাংলা পড়তে যত আগ্রহ ছিল ইংরেজি পড়তে তত ছিল না। তাছাড়া ভালো স্কুলেও পড়িনি। ভালো লোকের কাছেও নয়। কলেজে এবং কলেজ ছাড়বার পর শিখতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গিয়েছে। প্রায় সব বিদ্যাই অল্পবয়সে আরম্ভ করতে হয়। ইংরেজি লিখবার জন্য যে পরিশ্রম করেছি তার অর্ধেক চেষ্টা করলে আজ চলনসৈ বাংলা লিখতে পারতাম। কিন্তু চলনসৈ ইংরেজি লিখতে শিখিনি, এখনও ভুল হয়। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব।

অনেকদিন নানাসাহেবের সঙ্গে একসঙ্গে কাটিয়েছি। এখন একটু খালি খালি লাগছে। নানাসাহেবকে প্রিয়জন মনে করা কঠিন, কিন্তু আমার অবস্থা অনেকটা প্রিয়জন বিয়োগের মত। আমার ধারনা নানাসাহেব পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাদেশের জমিদারদের পোষ্যপুত্রের মত। অল্পবিদ্যা, অল্পবুদ্ধি, কিঞ্চিৎ মেদ ও অহঙ্কার দিয়ে তৈরি। বেচারী বিপদে জড়িয়ে পড়েছিল, পরিণাম ভয়াবহ জানলে এ পথে পা দিত না। প্রথম থেকেই ঘটনার দাস। দেশনায়ক মনে করবার কোনও কারণ নেই।

আমার শরীর সুস্থ যাচ্চে না। কলকাতার বাইরে যাওয়া নানা কারণে অসম্ভব। নানারকম দুর্ভাবনার কারণ আছে এবং নিস্পৃহ হয়ে যাচ্চি। এ অবস্থা ভাল নয়, গীতার সব উপদেশ পালনের ফল কলিযুগে ভাল হয় না। কুরুক্ষেত্রের পূর্বে অবশ্য আলাদা। নিষ্কাম কর্মের ফল পরলোকে যাই হোক, ইহলোকে ভাল হয় না। কাজের আগ্রহ কমে যায়।

নতুন কাজ হাতে নেওয়া উচিত। কিন্তু করতে পারছি না।

আমার বই সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাতে যথেষ্ট পুরস্কৃত হয়েছি। কোনও তাড়া নেই, আবার যখন ইচ্ছা হবে পড়বেন। মনে হচ্চে আপনিই আমার এদেশে একমাত্র পাঠক। ইতিহাসের লোকেরা পড়েছেন কিনা খবর পাইনি।

আশা করি এখন সুস্থ হয়েছেন। এবং পশ্চিমঘাটের প্রান্তে মৌসুমী বায়ু আসন্ন।

ইতি
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

৩

১২৫ রাসবিহারী য়্যাভিনিউ
কলিকাতা ২৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি হস্তগত হয়েছে। আমি সাধারণত কিছুতেই লজ্জিত হই না। কিন্তু আপনার উচ্চপ্রশংসায় আমারও লজ্জা বোধ হচ্চে। কাজেই এবার ও প্রসঙ্গ মুলতুবী থাক।

একেবারে যে বাংলা লিখি না, তা নয়। তবে কালেভদ্রে। আপনার চোখে পড়বার কি মনে থাকবার মত নয়। বাংলা লিখে মনের যে প্রসন্নতা হয় সে আর কিছুতে হয় না। আপনি উঞ্ছবৃত্তির কথা বলেছেন। আমার উঞ্ছবৃত্তিতে দারুণ উৎসাহ। কিন্তু হয়ে ওঠে না। কাজের মধ্যে ফাঁক না থাকলে লিখবার মত অবস্থা হয় না। আমার সময় কয়েক বৎসর হল একেবারে রন্ধ্রহীন। তাতে আমার লাভ হচ্চে না। আমি আসলে অলসপ্রকৃতি। মন সব সময় উড়ে বেড়াচ্চে, কিন্তু দেহ টেবিলে বাঁধা। এই হয়েছে বিপদ।

কলকাতা সম্বন্ধে ২০০ পৃষ্ঠার একটি ইংরেজি বই, যা বিদেশীরা পড়তে পারবে, লিখে দেবার কথা আছে। লিখতে পারছি না। বাজে কাজে সময়াভাব। তাছাড়া দুটি ইংরেজি উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করছিলাম। অর্ধসমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে। কবে হাত দিতে পারব জানি না।

কাজের ভীড় ছাড়াও আরও একটি কারণ আছে। যাকে বলে at a low ebb. সেই অবস্থায় বহুদিন আছি। আপনি সামুদ্রিক বিদ্যায় বিশ্বাসী। আশা করি আমার অপরাধ নেবেন না। একথা কখনও কেউ বলেননি।

একজন বলেছিলেন আমার জীবনে সব জিনিস দেরিতে আসবে। অন্য জিনিস কি এসেছে জানি না। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় দেরিতে হয়েছে। আপনি আমার চেয়ে বড়, কিন্তু আমার বয়সও কম নয়। হাতে আমাদের বেশি সময় নেই। আরও কিছুদিন আগে পরিচয় হলে ভাল হত।

আশা করি আপনার রোগের উপশম ঘটেছে। বর্ষার শোভা দেখছেন। আমিও একবার বর্ষার সময় পুনায় ছিলাম। কলকাতায় আরম্ভ হয়েছে। মহাসমারোহে মরশুমী বায়ুর প্রথম আক্রমণ। আকাশ নীলাভ মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে বাদ্যোদম ও বর্ষণ হচ্চে।

ইতি
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

৪

কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি যদি মনে করে থাকেন নবসৌধের অহঙ্কারে আমি আপনার চিঠির জবাব যথাসময়ে

দিইনি তাহলে ভুল হবে। নবসৌধ নিয়ে নানাপ্রকার দুর্ভাবনা চলেছে। অর্থাভাবে কাজ সমাপ্ত হচ্চে না। পাওনাদারেরা হামলা করছে। বারে বারে মন্ত্রীমণ্ডলী ও আমলাদের দুয়ার ঠেলছি। কিন্তু দুয়ার খুলছে না। দিল্লীতেও হস্তপ্রসারিত করে রেখেছি। কিন্তু দিল্লী দূর অস্ত্। চিঠি না লিখবার আসল কারণ হচ্চে কিছুকাল যাবৎ শরীর অপটু চলছে। যকৃতের দোষে ভুগছি, একেই বোধহয় হেপাটাইটিস বলে। এখনও পীতবর্ণ হয়ে যাইনি। এইবার বোধহয় হব।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে আমার অনেকদিন পূর্বে পরিচয় হয়েছিল। বোম্বাইতে তাঁর বাড়িতেও গিয়েছি। তিনি মারাঠা ইতিহাসের রসিক। তিনি এখানে আছেন জানতুম। কখনও যাইনি। মনে হয়েছিল তিনি নিশ্চয় আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন। আপনি যখন অভয় দিচ্ছেন অবশ্য যাব।

আপনি এলে উৎপাৎ করব না লিখেছিলাম, ওটা কেবল মুখের কথা। আপনাকে ভুলিয়ে আনবার মতলব। আপনি কি কেবল মুখের বাক্য শুনেছেন?

আমার অক্টোবর মাসে এক মাসের জন্য Czechoslovakia যাবার কথা আছে। নানা কারণে ইচ্ছা করছে না। আপনি যদি বলেন ভবিষ্যৎ অন্ধকার—যাওয়া হবে না, তাহলে মন প্রসন্ন হয়।

আশা করি কুশলে আছেন।

ইতি
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

৫

125, Rashbehari Avenue
Calcutta

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার প্রশ্নের, অন্তত একটি প্রশ্নের সদুত্তর পাবেন না। দক্ষিণের তুর্কিদের মুসলমান না মনে করবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু অন্য প্রশ্নটির উত্তর অত সহজ নয়। 'নালের' আঘাতে বড় বড় পণ্ডিতরা ধরাশায়ী হয়েছেন। যিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন তাঁর নাম P. K. Gode. পুনার বাসিন্দা। কয়েক বৎসর আগে পরলোকগমন করেছেন। আমি শেষ পর্যন্ত সুনীতিবাবুর দ্বারস্থ হয়েছিলাম। নালবিহীন ঘোড়ার ব্যবহার একসময় সর্বত্র প্রচলিত ছিল। অসুবিধা এই যে ঘোড়ার পায়ে নাল আছে কিনা ভাল করে পুরানো ভাস্কর্য থেকে বোঝা যায় না। সংস্কৃত অভিধানে যে সব শব্দ আছে যেমন, 'ক্ষুরক্রম', 'বন্ধন', 'পাদুকা'—এ সবই অবাচীন শব্দ। আমার মনে হচ্চে আপনি নিরঙ্কুশ। যা ইচ্ছা লিখতে পারেন।

আমার যাবার তারিখ এখনও সরকার থেকে বিজ্ঞাপিত হয়নি। বোধহয় এ মাসের শেষে। সম্ভবত ২৮ অক্টোবর। Czechoslaviaয় শীত পড়ে গিয়েছে। আমার মনও যাবার দিকে বিশেষ অনুকূল নয়। ফিরে এসে বড়দিনের সময় পুনা আসবার ইচ্ছা আছে। Indian History Congress একটা কারণ বটে, কিন্তু আসল কারণ আপনার সঙ্গে তিনদিন সাক্ষাৎ। আপনি যদি তখন পুনায় না থাকেন তাহলে আমার যাবার আগ্রহ অর্দ্ধেক কমে যাবে। ··· আশা করি আপনি কুশলে আছেন। ব্যাধির প্রতাপ আর নেই। পূজার কাগজে একটির বেশি

লেখা চোখে পড়ল না। কাগজ খুলে হতাশ হয়েছি। সম্ভবত বড় কিছু লিখছেন।

আমাদের খবর একপ্রকার।

ইতি

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

৬

কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। অনতিবিলম্বে ব্যোমকেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে মনে করে পুলকিত হচ্চি। বরদা কোথায় ? বরদা-সন্দর্শন হলে সোনায় সোহাগা হত। বেশি মাখামাখির ফলে কোনান ডয়েলের শার্লক হোমসের প্রতি বিরাগ হয়েছিল। কিন্তু আপনি বেচারী বরদাকে কাছেই ঘেঁষতে দিচ্ছেন না। একটু রং চড়িয়ে বলা ছাড়া বরদার চরিত্রের আরও কোনও দোষ আমার চোখে পড়েনি। আপনি বেচারীকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিচ্ছেন।

আশা করি আপনার শরীর এখন সুস্থ হয়েছে। উপন্যাস দ্রুতগতিতে পরিণামের দিকে অগ্রসর হচ্চে এবং শরতের আবির্ভাবে বহু গল্পের প্লট আপনার খাতায় বাসা বাঁধবার চেষ্টা করছে।

মহারাষ্ট্র পুরাণের কথা জানতে চেয়েছেন। এই পুঁথি ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে লেখা। ভাস্কর পণ্ডিতের আক্রমণের বিবরণ। বর্গীর হাঙ্গামার প্রায় সব তথ্যই এই পুঁথি থেকে সংগৃহীত। প্রায় ৬০ বৎসব পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত এর প্রকৃত সম্পাদনা কিংবা ইংরেজি অনুবাদ হয়নি। অনুবাদটি আপনার হয়তো খারাপ লাগবে না। আমি কয়েকদিন আগে পড়ে দেখলাম। কয়েক বছর আগেকার কাজ। এখন অন্য লোকের লেখা বলে মনে হয়। মহারাষ্ট্রীয়রা জিনিসটি পছন্দ করবেন বলে মনে হয না।

আমার নিজের কোনও ভাল খবর নেই। শরীর অল্প গোলমাল করছে। আসন্ন বার্ধক্য। নানারকম দুর্ভাবনায় আছি। একেবারে নরক। মাঝে মাঝে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানস ভ্রমণ করি—দিল্লী ও মীরাট। কখনও আর লেখা হবে কিনা জানি না। শাস্ত্রে যদি কিছু বলে জানাবেন।

চিঠি লিখবার সময় মনে হচ্চে গত বৎসর পুনায় কয়েকদিন বড় সুখে ছিলাম।

ইতি

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

৭

কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। মন প্রসন্ন হবে কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। কিন্তু কোনও ফল হল না। Further outlook unsettled. এখনও ইস্পাতের মত আকাশ ও

বজ্রগর্ভ মেঘ। দেখা যাক কি হয়। আপনি যা ভাবছেন তা নয়, শরীর অসুস্থ হয়নি। আপনি লিখেছেন This too shall pass away. আমি একথা খুব বিশ্বাস করি। খারাপ থেকে খারাপতর হবে। এ দিন থাকবে না।

আপনি স্মৃতিকথা লিখতে অনিচ্ছুক। আপনাকে আসামীর কাঠগড়ায় দেখতে আমারও একেবারে ইচ্ছা নেই। কিন্তু ভাল জিনিস কি দেখেননি ? আমার মত লোকও দেখেছে। সরস স্মৃতিকথা আর কার কাছে আশা করব ?

কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করছিল। ইতিহাসের উপকরণে ভারাক্রান্ত নয় অথচ খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস, এইরকম উদাহরণ দিতে গিয়ে একটি ছেলে "গৌড়মল্লার" উল্লেখ করল। তখনই মনে হল ছেলেটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

আশা করি শরীর ভাল আছে। পূজো সংখ্যায় লেখা পড়বার জন্য উৎসুক হয়ে আছি।

ইতি
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

৮

কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ২০ জানুয়ারীর চিঠি পেয়েছি। বোম্বাই যাবার তারিখের এখন একটু গোলমাল হচ্চে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। আমি এখনও প্রস্তুত হতে পারিনি। আপনাকে যাবার আগে জানাব। বোম্বাই বা পুনা যেখানে থাকুন দেখা করব। মার্চ মাসে কি আসা হবে ?

সুকুমারবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। আপনার খবর সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম। শোভনের কাছে শুনলুম 'শজারুর কাঁটা' শেষ হয়েছে। ত্রিকোণ পার্কের কাছে গল্পের আরম্ভ। কাজেই রাসবিহারী এভিনিউর ফুটপাথে ব্যোমকেশের পদধ্বনির প্রতীক্ষা করছি। আপনি তাকে বাড়ি করে দিয়েছেন বটে কিন্তু গাড়ি কিনে দেননি। ব্যোমকেশ যদি আপনার কাছে গাড়ির জন্য দরখাস্ত করে তাহলে কি রকম হয় ? বাস-ট্যাক্সির যা অবস্থা। তাছাড়া এতদিন ট্রাম ছিল না। ভদ্রলোকের বড় কষ্ট হয়েছে। ডিটেকটিভ-গৃহিণী হলেও সত্যবতীর কি থিয়েটার সিনেমা দেখতে ইচ্ছা করে না ?

আনন্দবাজার পত্রিকায় 'প্রেম' গল্পটি খুব সরস হয়েছে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু চিরকুলপ্রবরা বঙ্গ-রমণীরা কি কোনও ভাল জিনিস মনে করে রাখেন ?

আমার সঙ্গে বেগম সাহেবের কিছুদিন দেখা হচ্ছে না। যাদবপুর ফ্যাকটরির কাজ। আরও কিছু কাগজপত্র পাওয়া দরকার। অপেক্ষা করছি। কিন্তু বেশিদিন অদর্শন ভাল নয়।

শীত বেশ পড়েছিল। এখনও সকালে শীত, কিন্তু মধ্যাহ্নরৌদ্র আতপ্ত। কদাচিৎ দক্ষিণ পবনের আভাস এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে কর্পোরেশনের বসন্তের টীকা নেবার আমন্ত্রণ। পৃথিবী যত অকরুণ প্রকৃতি তত নয়।

আশা করি কুশলে আছেন।

ইতি
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনাকে অনেকদিন চিঠি লিখিনি। তার কারণ সবটা আলস্য নয়। শুনেছিলাম বোম্বাই গিয়ে আপনার শরীর ভাল যাচ্চিল না। তখন আর বিরক্ত করতে চাইনি। পুনা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম।

'শজারুর কাঁটা' উৎসাহের সঙ্গে পড়ছি। আমাদের শান্তিপূর্ণ পাড়ায় আপনি খুনখারাপি এনেছেন। আমি পাড়ার থানার দারোগা হলে আপত্তি করতাম। চায়ের দোকানটি খুব পরিচিত। দু'বেলা দেখছি। চরিত্রদের সঙ্গে আস্তে আস্তে পরিচয় হচ্চে। শুধু একটি কথা বলবার আছে। প্রথম দিকে আপনি লিখেছেন শীতের শেষে গরম পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লোক বাড়তে লাগল এবং দোকানপাট দেরিতে বন্ধ হতে লাগল। শিবঠাকুরের আপন দেশে এটি হবার যো নেই। শীতে গ্রীষ্মে দোকান আটটায় বন্ধ হবে। কেবল পুজোর সময় ১৫ দিন ব্যতিক্রম। আইন বসন্তপবনকে অগ্রাহ্য করে।

সত্যবতীকে বকবেন না। সত্যবতী শুধু প্রমাণ করেছে সে মহিলা, বিশেষ করে বঙ্গমহিলা। গাড়ির ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক। অটো-রিক্‌শা কলকাতার পথে বারণ। স্কুটার কিনে দিতে পারেন। কিন্তু মহিলাদের সম্বন্ধে যদিও বলতে নেই, তারও তো বয়স হচ্চে। পড়ে গেলে আর হাড় জোড়া লাগবে না। গাড়িই ভাল। নতুন গাড়ি পেতে অবশ্য কয়েক বছর দেরি হবে।

পুরস্কারের কথা আপনাকে জানাইনি। সরকার জানাবার আগে লিখলে বেআইনি হত। আপনি কি চিঠি পেয়েছেন ? আপনার খবরে সবাই খুব খুশি হয়েছে। পাঠকরা বটেই এমন কি সাহিত্যিকরা পর্যন্ত।

আমার কোনও খবর নেই। লেখাপড়া হচ্চে না। ক্রমশ administration-এ জড়িয়ে পড়ছি। আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আমার পরিণাম কি হবে ?

আশা করি কুশলে আছেন।

ইতি
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

১০

কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আশা করি আমার টেলিগ্রাম পেয়েছেন। আমার কোষ্ঠিতে বিদেশ ভ্রমণ নেই। আমি কি করব ? কাল ভোর হবার আগে টেলিগ্রাম পেলাম যে পরিক্ষার্থিণী নার্সিং হোমে গিয়েছেন। আপাততঃ Viva Voce হবে না।

একটি কথা মনে হচ্চে। এবার তো গেলে একদিনের বেশি থাকতে পারতাম না। ভবিষ্যতে যখন যাব একাধিক দিন থেকে আসব। শুনলাম অনেক রকম সুখাদ্য প্রস্তুত হচ্ছিল। একদিনে কি সুবিচার করতে পারতাম ? আসল কথা আপনি বেশি হতাশ হয়েছেন না আমি বেশি হতাশ হয়েছি বুঝতে পারছি না। বোধহয় বর্ষার সময় যেতে হবে।

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' পরশুদিন পেয়েছি। আবার পড়লাম। আবার ভাল লাগল। ছাপার ভুল চোখে পড়ল না।

আপনার কথাই ঠিক। কেতুর হাতে পড়েছি। লেখাপড়া কিছু হবে না। মনে হচ্চে চিরজীবন কেতুব হাতেই থাকব।

যাই বলুন কলকাতা বেশ রমণীয় হয়েছে। আজ বিকালে আকাশে একেবারে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। বিশ্ববিদ্যালয়ের জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে বর্ষার বিস্মৃতপ্রায় গান মনে হতে লাগল। যতটা ভেবেছিলাম ততটা বর্ষণ হল না। কিন্তু এখন সন্ধ্যার পর সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকা। অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্চে, পথে ঝোড়ো হাওয়া গর্জন করছে এবং বিদ্যুৎ চমকাচ্চে। এর চেয়ে সুখের সন্ধ্যা আর কি হতে পারে? যেটির অভাব বোধ করছি, সেটি হচ্চে শ্রীহস্তে প্রস্তুত তপ্ত চা ও কবোষ্ণ পেঁয়াজের বড়া।

আপনি মনে করছেন আমার কলম কিঞ্চিৎ রসসিক্ত হয়েছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? প্রথম বর্ষণে শুধু কলাপীরা নৃত্য করবে মানবহৃদয় করবে না এ রকম কোনও নিয়মের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেননি।

আশা করি কুশলে আছেন। মিসেস ব্যানার্জিকে আমার নমস্কার জানাবেন।

ইতি
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

১১

কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

২৩ তারিখের চিঠি পেয়েছি। পুনা বোধহয় এতদিন সুশীতল হয়েছে। এখানে অসহ্য গরম। সূর্যের উত্তাপ, তার উপর দাঙ্গার উত্তাপ। যাই হোক অল্পের উপর দিয়ে গিয়েছে মনে হচ্চে। এখন দাঙ্গা ঠাণ্ডা, দিনের তাপ সেই রকমই আছে।

'শজারুর কাঁটা' শেষ হল। আপনার বেশির ভাগ পাঠকই আপনি যে পথে তাদের চালিত করতে চেয়েছিলেন সেই পথেই গিয়েছে। অর্থাৎ নৃপতিকে দোষী মনে করেছে। আমাকে একটি বালিকা টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি প্রবাল গুপ্তকে অপরাধী মনে করেছিলাম কিনা। আমার উত্তর, যে ব্যক্তি রেডিওতে 'আধুনিক' গান গায় তার পক্ষে খুনী হওয়া অসম্ভব নয়। আপনি ঠিকই করেছেন, poetic justice হয়েছে। বই কবে বের হবে? ··· কোনও নতুন খবর নেই। প্রমথবাবুর সঙ্গে দেখা হয় না। গজেনবাবু পূজোর উপন্যাস লিখতে জগন্নাথধামে গিয়েছিলেন। ফিরেছেন কিনা জানি না। যাদের চিনি তারা পরীক্ষার খাতা দেখছে ও গরমে হা-হুতাশ করছে। কেউবা গিরি-শিখরে বা সমুদ্রতীরে। বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত মন এবং চেহারা দুই-ই ধূসর।

আশা করি কুশলে আছেন।

ইতি
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

১২

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আজ সকালে কফি, টোস্ট, খবরের কাগজ শেষ না হতেই বাহকহস্তে 'বেণীসংহার' পেলাম। সুপ্রভাত। তখনই দ্বিতীয়বার বেণীসংহার গল্পটি পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু সুকঠোর কর্তব্য। তার কথা মনে করে অচিরে ক্ষান্ত হতে হল। রাত্রে কম্বলের উষ্ণ আরামে পড়া যাবে।

কাল রাত্রে আটটার সময় বাড়ি ফিরছি এমন সময়, না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ব্যোমকেশ সত্যবতী, কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি। আমি বলতে যাচ্ছিলাম তখন খুব শীত পড়েছিল। দেখা হলেও চিনতে পারতাম না। রাস্তায় যা কুয়াসা। কালিদাস বলেছেন উজ্জয়িনী মেঘের ছায়ায় অন্ধকার হত। সন্ধ্যার কুয়াসায় মনে হয় কলকাতার পথের দীপনির্বাণ হয়েছে।

এখন নিশ্চয় পুনার আবহাওয়া খুব সুন্দর।

কল্পনা করছি প্রায় ২৫০ বছর আগে এমন দিনে বাজিরাও পেশোয়া উটের পিঠে মধু, গুড়, আখরোট, জিলিপি, ফরাসী পানীয় এবং হাতির পিঠে মস্তানীকে নিয়ে আপনার বাড়ির সামনের পথ দিয়ে পার্বতী মন্দিরেব দিকে যাচ্চেন।

ইতি
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

১৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠির উত্তর দিতে দেরি হল। আসলকথা ব্যোমকেশেব কি হল জানতে না পেরে মন খারাপ আছে। বোধহয় লোকলজ্জায় দেশান্তরী হয়েছে। কলকাতায় এত খুন জখম বাহাজানি ব্যাংক লুঠ হচ্চে। গাড়ি থাকলে ব্যোমকেশ সব ধরে দিত। আমরাও শান্তিতে থাকতুম। গাড়ির অভাবে বেচারীকে 'কীচকবধ' দেখে সময় কাটাতে হচ্চে। যাই হোক খবর পেলে আমাকে জানাবেন। আপনার খুব সন্দিগ্ধ মন। নইলে সত্যবতীব কথা জিজ্ঞাসা করতুম।

কিছুদিন তো অসহ্য গরম গিয়েছে। ২/৩ দিন হল কাগজে বৃষ্টি বৃষ্টি বলছিল কিন্তু বৃষ্টিব কোনও আভাস ছিল না। কাল দুপুবে রেডিও আপিসে গিয়েছিলাম। ফিববাব সময় দেখলাম গঙ্গার উপর থেকে কালো মেঘ নেমে আসছে, পাখি উড়ছে। মন প্রসন্ন হল। কিন্তু বৃষ্টি হল না। খুব ভোরে অর্থাৎ চারটের পর কি হল জানেন? ঘুম ভেঙ্গে শুনলাম বৃষ্টি পড়ছে। প্রথমে বিশ্বাস হল না। তারপরে উঠে বারান্দায় বসে রইলাম। মহাসমারোহে বর্ষা আসেনি। কিন্তু সকাল থেকে কালো মেঘে আকাশ ঢাকা। চিঠি লিখতে লিখতে আবার বৃষ্টি এল।

আপনার শরীর কেমন আছে? আমি দেখেছি কলকাতায় এলেই আপনি ভাল থাকেন। ব্যোমকেশ তো নেই, ব্যোমকেশের বাড়ি নিশ্চয় খালি পড়ে আছে। বর্ষায় কলকাতা কি বকম হয় জানেন। রাস্তায় কেয়া-কদম কিনতে পাওয়া যায়। আজ দেখলাম বাজারে ইলিস মাছ যাচ্চে। এ সবেও কি আপনার মন ভিজবে না? তাছাড়া কলকাতা এলে আপনি ব্যোমকেশের জন্য পছন্দসই গাড়িও কিনতে পারতেন। যাই হোক শরীর কেমন আছে লিখবেন।

আমার কাজকর্ম অল্প অল্প হচ্চে। ছাত্রবিভ্রাটে আছি, নইলে আর একটু তাড়াতাড়ি হত। আমার Faculty ঠাণ্ডা। কিন্তু ভরসা নেই। 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?'

ইতি
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

১৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কিছুদিন পূর্বে আপনাকে চিঠি দিয়েছি। আশা করি পেয়েছেন। শোভনের কাছে শুনলুম আপনার শরীর আবার খারাপ হয়েছে। একেবারে সুস্থ না হলে চিঠি লিখবেন না। আমি মাঝে মাঝে লিখব। কিছুদিন না হয় একতরফা হবে।

আপনার 'খারাপ' গল্পটি পড়লাম। উৎকৃষ্ট গল্প হয়েছে। পড়বার সময় আমার হঠাৎ প্রভাতবাবুর 'কাশীবাসিনী' গল্পের কথা মনে হল। অথচ দুই গল্পের মেজাজ এক নয়।

আপনার রক্তচাপ বাড়বার কারণ ডাক্তাররা জানেন না। আমি জানি। অনেকদিন ব্যোমকেশের সঙ্গে দেখা হচ্চে না। সত্যবতীর নাম করছি না, করলে আপনি নানারকম কুকথা বলবেন। অত রাগ করা কি ভাল? না হয় একটা গাড়িই দিলেন। ক্রমশ আবার দাম বেড়ে যাচ্ছে। আপনি অসন্তুষ্ট হবেন এই ভয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্চি না। নইলে দুদিনে ওদের খুঁজে বের করতাম।

আমি পূজোর সময় এখানেই আছি। বারান্দা ছেড়ে এক পা নড়ব না। ছুটির আগে দুদিনের জন্য ডিব্রুগড় যেতে পারি। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে।

কাল সকালে তারাপদ মুখোপাধ্যায় সপরিবারে অর্থাৎ পত্নী ও দুই কন্যা সমভিব্যাহারে দেশে আসছে। তারাপদ এক বছর লেখাপড়া করবার ছুটি পেয়েছে। এমার আর বিদেশে যাবার ইচ্ছা নেই। ভাল কাজ ইত্যাদি ছেড়ে আসছে, বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত।

ইতি
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত